ফিক্‌হশাস্ত্রে মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ্‌-এর অবদান :একটি পর্যালোচনা

পি-এইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মুহাম্মদ আব্দুল বাকী
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষক
মোঃ জসিম উদ্দিন
রেজিস্ট্রেশন নং ও শিক্ষাবর্ষ
৬/২০০৭-০৮
পুনঃ রেজিঃ নং ও শিক্ষাবর্ষ
৫২/২০১২-১৩
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পি-এইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ

২০১৬

সূচীপত্র

সংকেতসূচীঃ

* মুফতী সাহেব : মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ র.।
* হাটহাজারী মাদ্রাসা : জামিয়া আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্রাসা। প্রতিষ্ঠাকাল ১৯০১ খৃস্টাব্দ।
* মেখল মাদ্রাসা : হামিউস্ সুন্নাহ্ মাদ্রাসা, মেখল, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৩১ খৃস্টাব্দ। প্রতিষ্ঠাতা মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ।
* ***হায়াতে মুফতী আযম*** : গ্রন্থের লেখক মুফতী ইযহারুল ইসলাম চৌধুরী, প্রকাশক, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, প্রকাশকাল ১৩৯৭ হিজরী।
* নোমান : মাওলানা মুহাম্মদ নোমান ও মাওলানা মুহাম্মদ আসিম সংকলিত গ্রন্থ ***মুফতী আযম আকাবিরে উম্মত কি নযর মে,*** প্রকাশক ফয়যিয়া ইসলামিক রিচার্স ফাউণ্ডেশন, মহেশখালী, কক্সবাজার, প্রকাশকাল ১৪০৮ হিজরী।
* ***ফয়যুল কালাম*** : (হাদীসের সংকলন) সংকলক মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ র. প্রকাশক, কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, প্রকাশকাল ১৩৯৯ হিজরী।

ই. ফা. বা. : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

সা. : সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

আ. : আলাইহিস সালাম।

রা. : রাদিয়াল্লাহু আনহু।

র. : রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

হি. : হিজরী।

খৃ. : খৃস্টাব্দ।

জ. : জন্ম।

মৃ. : মৃত্যু।

তা. বি. : তারিখ বিহীন।

সং. : সংস্করণ।

খ. : খন্ড।

পৃ. : পৃষ্ঠা।

ফিক্‌হশাস্ত্রে মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ-এর অবদান : একটি পর্যালোচনা -এর এ্যাবস্ট্রাক্ট

মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ র. (১৩১০-১৩৯৬ হি. / ১৮৯২-১৯৭৬ খৃ.) ছিলেন বিংশ শতাব্দীর একজন ক্ষণজন্মা প্রতিভাবান আলিম, মুহাদ্দিস, ফকীহ, মুফতী, বিভিন্ন শাস্ত্রের অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী মনীষী। 'মুফতী আযম' হিসেবে ভূষিত। সুন্নতে নববী সা.-এর পূর্ণ অনুসারী কামিল ওয়ালী। ১৩১০ হি. চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানাধীন মেখল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সী হিদায়াত উল্লাহ। ১৩২০ হি. তাঁর আনুষ্ঠানিক লেখাপড়া আরম্ভ হয়। দীর্ঘ দশ বছর হাটহাজারী মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভের পর এশিয়ার সর্ব বৃহৎ দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলূম দেওবন্দ হতে হাদীস ও অন্যান্য বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করেন। সেখান থেকে ফিরে এসে হাটহাজারী মাদ্রাসায় কর্মজীবন আরম্ভ করেন। প্রথমে একজন মুদাররিস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে হাদীস, তাফসীর, ফিক্‌হ ইত্যাদি বিষয়ে শীর্ষস্থানীয় শিক্ষক হিসেবে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হন। ফাতাওয়া বিভাগে মুফতী হিসেবেও দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। কালক্রমে তিনি ফাতাওয়া, ফিক্‌হশাস্ত্রে গবেষণা ও উদ্ভাবনী শক্তি অর্জন করেন এবং ফিক্‌হশাস্ত্রে স্বকীয় ও স্বতন্ত্র ভূমিকা রাখতে সক্ষম হন। ফলে তিনি মুফতী আযম হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। বিংশ শতাব্দীতে বিস্তৃত ঈমান, আকীদা সম্পর্কিত নানা ফিতনা, বিদআত, কুসংস্কারসমূহের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে এবং বিরোধী মতবাদসমূহ দলীল, প্রমাণ, যুক্তির মাধ্যমে খন্ডন করতে সক্ষম হন। কালপরিক্রমায় আধুনিক মতবাদ, দর্শনের প্রভাবে যে সব জিজ্ঞাসার উদ্ভব হয়েছিল, সেসবের সময়োপযোগী সমাধান দিতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি ফিক্‌হশাস্ত্র সহ বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তা, চেতনা, গবেষণা ও উদ্ভাবনী শক্তিকে অনবদ্য লিখনীর মাধ্যমে প্রচার করে গেছেন। এতদসংক্রান্ত তিনি বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেগুলো ফিক্‌হ শাস্ত্রের অমরদান। তিনি হাদীস শাস্ত্রের খ্যাতিমান মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর রচিত হাদীস গ্রন্থসমূহ তাঁকে শীর্ষস্থানীয় হাদীসশাস্ত্রবিদের মর্যাদা এনে দিয়েছেন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি পুস্তক রচনা আরম্ভ করেন। আরবী, উর্দূ, ফার্সী ও অন্যান্য ভাষায় তিনি প্রায় একশ' গ্রন্থ রচনা করেছেন। ১৩৯৬ হি. ১২ শাওয়াল মোতাবেক ১৯৭৬ খৃ. ৭ অক্টোবর তিনি ইন্তিকাল করেছেন। এ মনীষী কুরআন সুন্নাহর নিকটতম মর্মস্থল পর্যন্ত পৌঁছার লক্ষ্যে নিরলস জ্ঞান সাধনা করেছেন এবং নিজের প্রতিভা ও গবেষণাকে কাজে লাগিয়েছেন। নিজস্ব অভিমত প্রকাশ করেছেন। জ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে অন্যের মত হতে ভিন্নমত প্রকাশ করতে দ্বিধা সংকোচ ত্যাগ করেছেন। ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যকার সম্পর্ক বিষয়ে মনস্তত্ত্ব, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছেন। প্রচলিত প্রথা পদ্ধতি সম্বন্ধে একটি সঠিক, নির্ভুল, সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ়পন্থা গ্রহণ করেছেন। দ্বীনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মেঘের যে ঘনঘটা জমেছিল এবং যেসব ভাল কাজ যুগের আলিমগণের বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভাল মনে হচ্ছিল, কিন্তু ভবিষ্যতে সেগুলো মানুষকে গুমরাহীর দিকে নিয়ে যাওয়ার আশংকা ছিল; তিনি সেগুলো সংশোধন করেছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, শিক্ষকতা, ফাতাওয়া রচনা, অসংখ্য গ্রন্থ রচনা, সংস্কার সাধনা, আধ্যাত্মিক সাধনা ও তাবলীগের মাধ্যমে ইসলামের খেদমত করেছেন। পত্র দাওয়াতের মাধ্যমে তৎকালীন পাকিস্তান প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানসহ দেশের ক্ষমতাধর কর্মকর্তা, কর্মচারী, বড় থেকে ছোট সকলের নিকট ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার ও আত্মসংশোধনের আহ্বান জানিয়েছিলেন। ঈমান, আকীদা, জাতীয় স্বকীয়তা, ইসলামী তাহযীব-তমদ্দুন ও সুন্নত পুনরুজ্জীবনদানে অভিভাবকের ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর ইল্‌ম, চরিত্র, ব্যক্তিত্বের প্রভাবে অসংখ্য মানুষের জীবনধারায় পরিবর্তন এসেছে। মুসলিম জনগোষ্ঠীর মনে শির্‌ক, বিদআতের বিরুদ্ধে ঘৃণা জন্মাতে এবং সুন্নত, ইবাদত, আখিরাতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। বহুমূখী প্রতিভার অধিকারী এ ক্ষণজন্মা মনীষী বিংশ শতাব্দীতে ইসলামের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে ফিক্‌হ শাস্ত্রে যে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন তা সত্যিই অতুলনীয়। তাঁর ইলম, ফিক্‌হ, ফাতাওয়ার খ্যাতি ছড়িয়ে আছে দুনিয়াব্যাপী। তাঁর জীবনের মিশন ছিল পঠন, ফাতাওয়া প্রদান, লিখনী পরিচালনা, সুন্নাহ্‌র প্রচার ও বিদ'আত প্রত্যাখ্যান। তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল শির্‌ক ও জাহিলিয়্যাতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। তাঁর নেশা ও পেশা ছিল ফিক্‌হী মাসআলার খুঁটিনাটি বিষয়ের উপর প্রয়োজনীয় দলীল-প্রমাণ সংগ্রহ করা। তিনি মুজতাহিদ সুলভ জ্ঞান, প্রজ্ঞা দ্বারা দলীল প্রমাণের মাধ্যমে যুগের চাহিদা পূরণে গৌরবজনক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছেন। ফিক্‌হ ও ফাতাওয়া রচনায় পবিত্র কুরআনের উপর তাঁর দীর্ঘ গবেষণা, বিস্ময়কর সম্পৃক্ততা, গভীর জ্ঞান, আয়াতসমূহের সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের সাথে আত্মিক আকর্ষণ এবং মেধার প্রখরতার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এর ফলে প্রজ্ঞাবান ও দূরদর্শীগণ বিবেচনা করতে পেরেছেন যে, মুফতী সাহেবের জ্ঞান, প্রজ্ঞা, পুথিগত অর্জন ছিল না। এর সম্পর্ক মহান আল্লাহ তাআলার অনুকম্পার সাথে। আল্লাহ প্রদত্ত রূহানী শক্তি, কাজের উপর দৃঢ়তা, কলম শক্তি ও ভাষা জ্ঞানকে তিনি মানব কল্যাণে ব্যয় করেছেন। ঈমান ও মা'রিফাতে ইলাহীর নূরের বদৌলতে ইসলামের সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম বিষয়গুলো অনুধাবন করতে সক্ষম

হয়েছেন। ফিক্হ ইসলামীতে ইজতিহাদী যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। কুরআন সুন্নাহর নিকটতম মর্মস্থলে পৌঁছার চেষ্টা করেছেন। তিনি ইসলামের সঠিক বক্তব্য প্রকাশ করতে কখনো দ্বিধা করেননি। প্রচলিত প্রথা পদ্ধতি সম্বন্ধে একটি সঠিক, নির্ভুল, সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় পন্থা গ্রহণ করেছেন। দ্বীনের মৌলিক বিষয়, দ্বীনি ফিক্হ ও বিধি বিধান জানতে তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো আলিম সমাজের জন্য আবশ্যিক হয়ে গেছে। হিজরী প্রথম শতাব্দীতে ফিক্হ প্রণয়ন ও সংকলনের যে কাজ আরম্ভ হয়ে হিজরী দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে পূর্ণতা লাভ করেছিল; মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ ঐসব ফকীহ ও মুহাদ্দিসের খিদমত, চার মাযহাবের ইমামগণের বৈশিষ্ট্যসমূহ ও তাঁদের মর্যাদাকে পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়েছেন। চার মাযহাবের ইমামগণ যে অক্লান্ত পরিশ্রম সাধনার মাধ্যমে ইসলামী শরীআতের জন্য সুবিন্যস্ত আইন-কানুন, বিধি- বিধান রচনা করেছেন তাদের ফিক্হর ভান্ডারকে তিনি মূল্যবান ও কল্যাণকর সম্পদে পরিণত করেছেন। এ থেকে বিচ্যুতিকে ধ্বংস ও ক্ষতির কারণ মনে করেছেন। হানাফী ফিক্হ বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। বিশ্বের সব দেশেই ইসলামী মনীষীগণ ফিক্হ হানাফী নিয়ে গবেষণা ও সূক্ষ্ণ বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। মুফতী ফয়যুল্লাহ ছিলেন হানাফী মাযহাবের বিশ্লেষক ও আন্ত মুজতাহিদ। তিনি হানাফী মাযহাব মতে ফিক্হ ও ফাতাওয়া চর্চা করেছেন। তাঁর নিকট শিক্ষা লাভ করে অসংখ্য আলিম, মুফতী, মুহাদ্দিস, মুফাস্সির, ইসলামী গবেষক, চিন্তাবিদ লেখকের জন্ম হয়েছে। তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের স্পর্শে বহু আধ্যাত্ম পুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। এ বর্ণাঢ্য কর্মজীবন ও জ্যোতির্ময় প্রাণ মনীষীর জীবন, কর্ম, সমাজচিন্তা ও ফিক্হশাস্ত্রে তাঁর অবদান নিয়ে বাংলা ভাষায় কোন গবেষণা কর্ম হয়নি। তিনি পূর্বাপর আমাদের নিকট অপরিচিত রয়ে গেছেন। এ মনীষীর ইলমী কামালিয়াতের পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ এবং আরবী, ফার্সী ও উর্দূ ভাষায় রচিত তাঁর গ্রন্থসমূহের উপর আলোচনা-সমালোচনা ও গবেষণা করা হয়নি। তাঁর সমসাময়িক যুগে দ্বীনদার আলিম, ইসলামী ব্যক্তিত্ব এবং পরবর্তী যুগের মনীষীগণ তাঁর সম্বন্ধে কি অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা জাতির সামনে তুলে ধরা হয়নি। তিনি ছিলেন এমন এক মনীষী যিনি এককভাবে তাজদীদের শর্তাদি পূরণ করেছেন এবং ধর্মীয় পুনর্জাগরণ সম্ভব করেছেন। এ অসামান্য মনীষীর বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবন, গৌরবময় সাধনা, ফিক্হ- ফাতাওয়ায় অসামান্য অবদানসমূহ তুলে ধরার লক্ষ্যে, নতুন প্রজন্মের সামনে এ কীর্তিমান মনীষীকে পরিচয় করিয়ে দিতে মুফতী সাহেবের ইন্তিকালের (১৯৭৬ খৃ.) চল্লিশতম বর্ষে একটি গবেষণা কর্ম '***ফিক্হশাস্ত্রে মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ -এর অবদান: একটি পর্যালোচনা***' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ সম্পন্ন করা হল। আশা করি এ গবেষণাকর্ম গবেষণা জগতে একটি নতুন সংযোজন হিসেবে গণ্য হবে। গবেষক ও পাঠক মহলে এটি সমাদর লাভ করবে। এ মহান মনীষীর কর্মময় জীবন, চরিত্র মাধুর্য আমাদের পথ চলতে দিকনির্দেশনা দিবে। আরবী, ফার্সী ও উর্দূ ভাষায় রচিত তাঁর গ্রন্থসমূহের বিষয়বস্তু, বক্তব্য বাংলাভাষী পাঠকদের সামনে উপস্থাপিত হবে। জাতির কাছে তিনি আরো অধিক পরিচিতি লাভ করবেন। মুফতী সাহেব উম্মতের জন্য ব্যথিত হয়েছেন, শিশুর মত কেঁদেছেন, সংস্কার কর্মসূচীর মাধ্যমে জাতিকে সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। তাঁর আধ্যাত্মিক বিদ্যা ও সংস্কার কর্মসূচী শায়খ আহমদ সেরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফেসানী র. (১৫৬৩-১৬২৪খৃ.)-এর গবেষণা ও সংস্কার কর্মসূচীর সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

এ ধরণের মুখলিস আল্লাহওয়ালা বর্ষীয়ান মনীষীর উপর অভিসন্দর্ভ রচনা করা বড়ই কঠিন এবং চ্যালেঞ্জতুল্য। কারণ, বাংলাদেশের ইসলামী মনীষীগণ জীবদ্দশায় তাঁদের জীবনের উপর কোন তত্ত্ব ও তথ্য রেখে যান না। জীবনের স্মরণীয় ঘটনাগুলো এবং চিঠি পত্রে সন, তারিখ উল্লেখ করেন না। তবে মুফতী ফয়যুল্লাহ সুহৃদদের অসংখ্য অনুরোধের প্রেক্ষিতে একটি সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী লিখে গেছেন। এর মাধ্যমে জীবনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমাদেরকে দিয়ে গেছেন। এ পর্যন্ত তাঁর জীবনীর উপর উর্দূ ভাষায় মুফতী মুহাম্মদ ইজহারুল ইসলাম চৌধুরীর রচিত ***হায়াতে মুফতী আযম*** (حيات مفتي اعظم) নামক একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থও পাওয়া গেছে এবং মাওলানা মুহাম্মদ নোমান ও মাওলানা মুহাম্মদ আসিম রচিত অপর একটি (উর্দূ ভাষায়) সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ ***মুফতী আযম আকাবিরে উম্মত কি নযর মে*** (مفتي اعظم اكابر امت كي نظر مين) রচিত হয়েছে। তবে পুস্তক দুটোতে মুফতী সাহেবের ফিক্হী অবদান ও অপরাপর বিষয় নিয়ে বৃহৎ কোন আলোচনা বা মূল্যায়ন হয়নি। যা করা উচিত ছিল। মানুষ মাত্রই পরিবেশের সৃষ্টি । পারিপার্শ্বিক বিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের অবস্থারও পরিবর্তন হয়। যা পরবর্তীতে নতুন মন-মানস সৃষ্টি এবং চিন্তাধারার পরিবর্তনে প্রভাব বিস্তার করে। আমি আমার গবেষণায় উক্ত দুটো পুস্তককে মৌলিক উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছি এবং টীকা ও সূত্র উল্লেখ করতে মুফতী মুহাম্মদ ইজহারুল ইসলাম চৌধুরীর রচিত গ্রন্থটিকে ***হায়াতে মুফতী আযম*** বলে উল্লেখ করেছি। অপর গ্রন্থের উল্লেখ শুধুমাত্র ***নোমান*** নামে করেছি। এছাড়া মুফতী ইজাহারুল ইসলাম চৌধুরী যিনি মুফতী ফয়যুল্লাহর নাতিন জামাই এবং একাধারে ২০ বছর মুফতী সাহেবের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছেন; তাঁর জবানী বক্তব্যকে গবেষণার উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছি। মুফতী ফয়যুল্লাহ রচিত গ্রন্থ ও

তাঁর আত্মজীবনী হতে তথ্য সংগ্রহ করেছি। মুফতী সাহেবের অপর নাতি এবং বর্তমানে মেখল মাদ্রাসার প্রধান পরিচালক মাওলানা মুহাম্মদ নোমান সাহেবের বক্তব্যকেও উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছি। হাটহাজারী মাদ্রাসার প্রবীণ শিক্ষকগণ, বর্তমান মহাপরিচালক আল্লামা আহমদ শফী (দা.বা.), মুফতী সাহেবের ছাত্রগণসহ স্থানীয় লোকদের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করেছি। এছাড়া-

১। মুফতী সাহেবের রচনাবলী সংগ্রহ করে,

২। তাঁর পারিবারিক সদস্য, সমসাময়িক বিশেষ ব্যক্তি, আত্মীয় স্বজন, সহকর্মী, ছাত্র ও পরিচিত ব্যক্তিবর্গের স্বাক্ষাৎকার গ্রহণ করে,

৩। তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কীয় বিভিন্ন তথ্য মাধ্যম সংগ্রহ করে,

৪। বিভিন্ন গ্রন্থাগারে তাঁর সম্বন্ধে সংগৃহীত তথ্যসমূহ,

৫। সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ঘটনা প্রবাহ, ইতিহাস, দলীল -দস্তাবেজ, পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী সংগ্রহ এবং ব্যাপক অধ্যয়ন,

৬। মুফতী সাহেবের জন্মস্থান, তৎকালে সেখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি সরজমিনে গিয়ে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেছি।

এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি নিম্নোক্ত পরিকল্পনা অনুসারে সাজিয়েছি:

অভিসন্দর্ভ রচনায় মুফতী সাহেবের উল্লেখযোগ্য শিক্ষক, ছাত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ মনীষীগণের সংক্ষিপ্ত জীবনেতিহাস, গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি পাদটীকা ও মূলপাঠে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁদের সময়কাল মৃত্যুর তারিখ উল্লেখ করা যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। যাদের জন্ম, মৃত্যুর সন, তারিখ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি সেগুলো খালি রয়েছে। মুফতী সাহেবের বিশাল রচনা ভান্ডারকে কয়েকটি বিষয়ে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমে তাঁর প্রকাশিত পাণ্ডুলিপি এবং মুদ্রিত গ্রন্থাবলীর আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তীতে অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির আলোচনা করা হয়েছে। যেসব পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি সেগুলোর শিরোনাম উল্লেখ করা হয়েছে। কেউ তাঁর গ্রন্থ সমূহের আলোচনা, সমালোচনা, মন্তব্য, প্রশংসা করে থাকলে সেগুলোর বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। রচনায় তিনি যেসব উৎস উপাদানের সাহায্য নিয়েছেন সেগুলো উল্লেখ, সেসবের বিশদ পরিচিতি, উৎস এবং প্রণেতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা হয়েছে। গ্রন্থালোচনায় বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ উল্লেখ করার পর সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা হয়েছে। মুদ্রিত গ্রন্থের প্রকাশক, প্রকাশকাল ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভ রচনায় যেসব প্রতিষ্ঠান ও লাইব্রেরী থেকে সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে যেমন-

১। ব্যক্তিগত লাইব্রেরী।

২। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার।

৩। দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্রাসা কুতুবখানা।

৪। মাদ্রাসা হামিউস সুন্নাহ মেখল গ্রন্থাগার।

৫। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, বায়তুল মুকাররম ঢাকা।

৬। আল আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লাইব্রেরী, তোপখানা রোড, ঢাকা।

৭। বাংলাদেশ ইসলামিক ল রিসার্চ এণ্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, পল্টন ঢাকা।

৮। ইত্যাদি।

এ অভিসন্দর্ভ রচনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যানুসন্ধান ও গবেষণা করার কাজে আমাকে অনেক প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তবুও যথাসাধ্য নির্ভুল তথ্য দেওয়ার জন্য গবেষক চেষ্টা করেছেন। তারপরও এ গবেষণাই যে চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গ এমন দাবী করা ঠিক হবে না। এ বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে অনাগত ভবিষ্যতে আরো ব্যাপক গবেষণার পথ উন্মুক্ত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। আমি অসংকোচে স্বীকার করছি যে, এ অভিসন্দর্ভ রচনা করার জন্য যতটুকু সময়, শান্ত ও নিরিবিলি পরিবেশ, গভীর অধ্যয়ন, বিস্তৃত ও সৃষ্টিশীল জ্ঞানের দরকার ছিল তা এ গবেষকের নেই। জ্ঞান ও গবেষণাকর্মে যোগ্যতার দৈন্যতা সত্ত্বেও যতটুকু কর্ম হয়েছে তা একমাত্র আল্লাহ তাআলার সাহায্য, সমর্থনেই হয়েছে। তিনিই একমাত্র সাহায্যকারী ও তাওফীক দাতা।

মো: জসিম উদ্দিন
পি-এইচ.ডি. গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
রেজিস্ট্রেশন নং ও শিক্ষাবর্ষ
৬/২০০৭-০৮
পুনঃ রেজিঃ নং ও শিক্ষাবর্ষ
৫২/২০১২-১৩

তারিখ: ২৯-০২-২০১৬ খৃ.

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়ানাসতাঈনুহু ওয়ানাসতাগফিরুহু ওয়ানু'মিনুবিহী ওয়ানাতাওয়াক্কালু আলাইহি। ওয়া সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলা খাইরি খালকিহী মুহাম্মাদিও ওয়াআলা আলিহী ওয়াসাহবিহী আজমাঈন।

চার মাযহাবের মুজতাহিদ ইমামগণ- ইমাম আবূ হানীফা র. (৮০-১৫০হি./৬৯৯-৭৬৭খৃ.), ইমাম শাফি'ঈ র. (১৫০-২০৪ হি.), ইমাম মালিক র. (৯৩-১৭৯ হি.) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. (১৬৪-২৪১হি./৭৮০-৮৫৫খৃ.) ফিক্হশাস্ত্রে মুসলিম উম্মাহর জন্য অসামান্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন এবং তাদের মাযহাব তথা অভিমত প্রতিষ্ঠা করেছেন। মানব জীবনের সকল বিষয়ের জন্য তাঁরা ইসলামী আইন প্রণয়ন করেছেন। পরবর্তীতে তাঁদের উদ্ভাবিত মূলনীতির আলোকে ইজতিহাদ প্রক্রিয়া যুগে যুগে চলতে থাকে এবং নতুন নতুন মাসআলা ও সমস্যার সমাধান বের হতে থাকে। তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ইমাম আবূ হানীফা র.-এর প্রতিষ্ঠিত হানাফী ফিক্হ ও ফকীহগণের কর্মপন্থা মুসলিম উম্মাহ সাদরে গ্রহণ করেছে ও স্বীকৃতি দিয়েছে। হানাফী ফিক্হর ক্রমবিকাশ অত্যন্ত দীর্ঘ। হানাফী মাযহাব বিশ্বের বিভিন্ন দেশসহ ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে এবং হানাফী ফিক্হ নিয়ে অধিক গবেষণা ও সুক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ হয়েছে। হানাফী ফিক্হ মানবজীবনের বাস্তবক্ষেত্রে সর্ব বিষয়ে প্রয়োগের অভিজ্ঞতায় উত্তীর্ণ।

এক্ষেত্রে যেসব মনীষী নিজেদের উপযুক্ত প্রতিভা ও গবেষণা শক্তিকে যথাসাধ্য প্রয়োগ করে অনবদ্য অবদান রেখেছেন মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ র. (১৩১০-১৩৯৬ হি./১৮৯২-১৯৭৬ খৃ.) ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। একজন প্রতিভাধর বিশ্লেষক, গবেষক ও উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী আন্তমুজতাহিদ ছিলেন মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ র.। তিনি ছিলেন বিংশ শতাব্দীর একজন ক্ষণজন্মা আলিম, মুহাদ্দিস, ফকীহ, বিভিন্ন শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী, সুন্নতে নববীর পূর্ণ অনুসারী কামিল ওয়ালী। তিনি ১৩১০ হি. / ১৮৯২ খৃ. চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানাধীন মেখল গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সী হিদায়াত আলী। ১৩২০ হি. তাঁর আনুষ্ঠানিক লেখা-পড়া আরম্ভ। হাটহাজারী মাদ্রাসায় শিক্ষা সমাপ্তির পর এশিয়ার সর্ববৃহৎ দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে হাদীস ও অন্যান্য বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করেন। সেখান থেকে ফিরে এসে হাটহাজারী মাদ্রাসায় কর্মজীবন আরম্ভ করেন। প্রথমে একজন মুদাররিস হিসেবে পরবর্তীতে হাদীস, তাফসীর, ইত্যাদি বিষয়ের শীর্ষ স্থানীয় শিক্ষক এবং ফাতাওয়া বিভাগে মুফতী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কালক্রমে তিনি ফাতাওয়া, ফিক্হশাস্ত্রে গবেষণা, উদ্ভাবনী শক্তি অর্জন করেন এবং ফিক্হশাস্ত্রে স্বকীয় ও স্বতন্ত্র ভূমিকা রাখার মাধ্যমে মুফতী আযম হিসেবে স্বীকৃতি ও খ্যাতি লাভে ধন্য হন। বিংশ শতাব্দীতে বিস্তৃত ঈমান, আকীদা সম্পর্কিত নানা ফিতনা, বিদ'আত, কুসংস্কারসমূহের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে এবং বিরোধী মতবাদসমূহ যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে খন্ডন করতে সক্ষম হন। কালপরিক্রমায় আধুনিক মতবাদ ও দর্শনের প্রভাবে যে সকল জিজ্ঞাসার উদ্ভব হয়েছিল সেগুলোর সময়োপযোগী ও সঠিক সমাধান পেশ করতে সক্ষম হয়েছেন। ফিক্হ ও অন্যান্য শাস্ত্রে মৌলিক চিন্তা -চেতনা, গবেষণা ও উদ্ভাবনী শক্তিকে অনবদ্য লিখনীর মাধ্যমে প্রচার করেছেন। এতদসংক্রান্ত তিনি অনেক বই-পুস্তক রচনা করেছেন। যেগুলো ফিক্হশাস্ত্রের অমর দান। তিনি হাদীস শাস্ত্রেরও খ্যাতিমান মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর রচিত হাদীস গ্রন্থসমূহ তাঁকে শীর্ষ স্থানীয় হাদীস শাস্ত্রবিদের মর্যাদা এনে দিয়েছে। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি পুস্তক রচনা আরম্ভ করেছিলেন। ১৩৯৬ হি./১৯৭৬ খৃ. তিনি ইন্তিকাল করেন। এ মনীষী কুরআন-সুন্নাহর নিকটতম মর্মস্থল পর্যন্ত পৌঁছার লক্ষ্যে নিজের প্রতিভা ও মেধাশক্তিকে পূর্ণ কাজে লাগিয়েছেন। নিজের অভিমত নি:সঙ্কোচে প্রকাশ করেছেন। তিনি ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যকার সম্পর্ক বিষয়ে মনস্তত্ত্ব, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছেন। প্রচলিত প্রথা পদ্ধতি সম্বন্ধে একটি সঠিক, নির্ভুল ও সুদৃঢ় পন্থা গ্রহণ করেছেন। যেসব ভাল কাজ সমকালীন আলিমগণের দৃষ্টিতে ভাল মনে হচ্ছিল কিন্তু ভবিষ্যতে সেগুলো মানুষকে গুমরাহীর দিকে নিয়ে যাবার আশংকা ছিল, সেগুলোও তিনি সংশোধনের চেষ্টা করেছেন। পত্রদাওয়াতের মাধ্যমে তৎকালীন পাকিস্তান প্রেসিডেন্ট আইয়ূব খানসহ ক্ষমতাধর থেকে সাধারণ কর্মচারী এবং বড় থেকে ছোট সকলের কাছে ইসলামী শাসন

প্রতিষ্ঠা ও আত্মসংশোধনের আহ্বান জানিয়েছেন। ঈমান, আকীদা ও জাতীয় স্বকীয়তা রক্ষার ক্ষেত্রে অভিভাবকের ভূমিকা পালন করেছেন। সুতীক্ষ্ণ মেধা, সুউচ্চ যোগ্যতা, বিদগ্ধ ফকীহ্, মুফতী, নিরলস সাধক, মুহিউস্সুন্নাহ, মাহিউল বিদ'আত, আবিদ, জাহিদ, রাহে নবুওয়্যাতের পথ প্রদর্শক এবং সুযোগ্য সংস্কারক হিসেবে উপমহাদেশে আলিম সমাজে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। বহুমূখী প্রতিভার অধিকারী এই ক্ষনজন্মা মনীষী বিংশ শতাব্দীতে ইসলামের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ করে ফিক্হশাস্ত্রে যে অসামান্য অবদান রেখেছেন, তা সত্যি অতুলনীয়। ফিক্হ অনুশীলনে যুগান্তকারী স্বাক্ষর রেখেছেন। ইল্মে দ্বীনের পাঠদান, ইল্মী গবেষণা, বিভিন্ন বিষয়ে মৌলিক গ্রন্থ রচনা করে শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতায় অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছেন। জ্ঞান অনুশীলন ও শিক্ষানুরাগী হিসেবে মহান আদর্শ স্থাপন করেছেন। তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মজীবন দেশ ও মানুষের কল্যাণে নিবেদন করেছেন। কর্মের গুণে দেশ ও জাতির মনে যুগ যুগ ধরে চিরস্থায়ী আসন লাভ করেছেন। তাঁর জীবনের মিশন ছিল পঠন, ফাতাওয়া প্রদান, লিখনী পরিচালনা, সুন্নাহ্র প্রচার ও বিদ'আত প্রত্যাখ্যান। তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল শির্ক ও জাহিলিয়্যাতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। তাঁর নেশা ও পেশা ছিল ফিক্হী মাসআলার খুঁটিনাটি বিষয়ের উপর প্রয়োজনীয় দলীল-প্রমাণ সংগ্রহ করা। তাঁর নিকট শিক্ষা লাভ করে অসংখ্য আলিম, মুফতী, মুহাদ্দিস, মুফাস্সির, ইসলামী গবেষক, চিন্তাবিদ লেখকের জন্ম হয়েছে। তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের স্পর্শে বহু আধ্যাত্ম পুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। এ বর্ণাঢ্য কর্মজীবন ও জ্যোতির্ময়প্রাণ মনীষীর জীবন ও কর্ম, সমাজচিন্তা ও ফিক্হশাস্ত্রে তাঁর অবদান নিয়ে বাংলা ভাষায় দেশ-বিদেশে আজ পর্যন্ত কোন গবেষণাকর্ম হয়নি। তিনি পূর্বাপর আমাদের নিকট অজানা রয়ে গেছেন। এ মনীষীর ইলমী কামালিয়াতের পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ এবং আরবী, ফার্সী ও উর্দূ ভাষায় রচিত তাঁর গ্রন্থসমূহের উপর আলোচনা-সমালোচনা ও গবেষণা হয়নি। তাঁর সমসাময়িক যুগে দ্বীনদার আলিম, ইসলামী ব্যক্তিত্ব এবং পরবর্তী যুগের মনীষীগণ তাঁর সম্বন্ধে কি অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা জাতির সামনে আজও তুলে ধরা হয়নি। তিনি ছিলেন এমন এক মনীষী যিনি এককভাবে তাজদীদের শর্তাদি পূরণ করেছেন এবং ধর্মীয় পুনর্জাগরণ সম্ভব করেছেন। এই বিদগ্ধ পণ্ডিত ও ইসলামী চিন্তাবিদের উপর একটি মৌলিক গবেষণা প্রয়োজন ছিল, যা অদ্যাবধি হয়নি। তাই এ অসামান্য মনীষীর বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবন, গৌরবময় সাধনা, ফিক্হ- ফাতাওয়ায় তাঁর অসামান্য অবদানসমূহ তুলে ধরার লক্ষ্যে, নতুন প্রজন্মের সামনে এ কীর্তিমান মনীষীকে পরিচয় করিয়ে দিতে এবং উপরোক্ত শূন্যতাসমূহ পূরণের লক্ষ্যে মুফতী সাহেবের ইন্তিকালের (১৯৭৬ খৃ.) চল্লিশতম বর্ষে একটি গবেষণাকর্ম '***ফিক্হশাস্ত্রে মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ-এর অবদানঃ একটি পর্যালোচনা***' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হল। যে গবেষণা কর্মটি এদেশের পণ্ডিত, গবেষকদের মাধ্যমে অনেক আগেই হওয়া উচিত ছিল। আশা করি এ গবেষণাকর্ম গবেষণা জগতে একটি নতুন সংযোজন হিসেবে গণ্য হবে। গবেষক ও পাঠক মহলে এটি সমাদর লাভ করবে। এ মহান মনীষীর কর্মময় জীবন, চরিত্র মাধুর্য আমাদের পথ চলতে দিকনির্দেশনা দিবে। আরবী, ফার্সী ও উর্দূ ভাষায় রচিত তাঁর গ্রন্থসমূহের বিষয়বস্তু, বক্তব্য বাংলাভাষী পাঠকদের সামনে উপস্থাপিত হবে। জাতির কাছে তিনি আরো অধিক পরিচিতি লাভ করবেন। মুফতী সাহেব উম্মতের জন্য ব্যথিত হয়েছেন, শিশুর মত কেঁদেছেন, সংস্কার কর্মসূচীর মাধ্যমে জাতিকে সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। তাঁর আধ্যাত্মিক বিদ্যা ও সংস্কার কর্মসূচী শায়খ আহমদ সেরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফেসানী র. (১৫৬৩-১৬২৪খৃ.)-এর গবেষণা ও সংস্কার কর্মসূচীর সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

এ ধরণের মুখলিস আল্লাহওয়ালা বর্ষীয়ান মনীষীর উপর অভিসন্দর্ভ রচনা করা বড়ই কঠিন এবং চ্যালেঞ্জতুল্য। কারণ, বাংলাদেশের ইসলামী মনীষীগণ জীবদ্দশায় তাঁদের জীবনের উপর কোন তথ্য ও তত্ত্ব রেখে যান না। জীবনের স্মরণীয় ঘটনাগুলো এবং চিঠি পত্রে সন, তারিখ উল্লেখ করেন না। তবে মুফতী ফয়যুল্লাহ সুহৃদদের অসংখ্য অনুরোধের প্রেক্ষিতে একটি সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী লিখে গেছেন। এর মাধ্যমে জীবনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমাদেরকে দিয়ে গেছেন। এ পর্যন্ত তাঁর জীবনীর উপর উর্দূ ভাষায় মুফতী মুহাম্মদ ইজহারুল ইসলাম চৌধুরী রচিত ***হায়াতে মুফতী আযম*** (حيات مفتي اعظم) নামক একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থও পাওয়া গেছে এবং মাওলানা মুহাম্মদ নোমান ও মাওলানা মুহাম্মদ আসিম রচিত অপর

একটি (উর্দূ ভাষায়) সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ ***মুফতী আযম আকাবিরে উম্মত কি নযর মে*** (اكابر امت كي
مفتي اعظم نظر مين) রচিত হয়েছে। তবে পুস্তক দুটোতে মুফতী সাহেবের ফিক্হী অবদান ও অপরাপর বিষয় নিয়ে বৃহৎ কোন আলোচনা বা মূল্যায়ন হয়নি। যা করা উচিত ছিল। মানুষ মাত্রই পরিবেশের সৃষ্টি, পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত। পারিপার্শ্বিক বিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের অবস্থারও পরিবর্তন হয়; যা পরবর্তীতে নতুন মন-মানস সৃষ্টি এবং চিন্তাধারার পরিবর্তনে প্রভাব বিস্তার করে; সে বিষয়েও কোন আলোকপাত করা হয়নি। আমি আমার গবেষণায় উক্ত দুটো পুস্তককে মৌলিক উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছি এবং টীকা ও সূত্র উল্লেখ করতে মুফতী মুহাম্মদ ইজহারুল ইসলাম চৌধুরী রচিত গ্রন্থটিকে ***হায়াতে মুফতী আযম*** বলে উল্লেখ করেছি। অপর গ্রন্থের উল্লেখ শুধুমাত্র ***নোমান*** নামে করেছি। এছাড়া মুফতী ইজাহারুল ইসলাম চৌধুরী যিনি মুফতী ফয়যুল্লাহর নাতিন জামাই এবং একাধারে ২০ বছর মুফতী সাহেবের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছেন; তাঁর জবানী বক্তব্যকে গবেষণার উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছি। মুফতী ফয়যুল্লাহ রচিত গ্রন্থ ও তাঁর আত্মজীবনী হতে তথ্য সংগ্রহ করেছি। মুফতী সাহেবের অপর নাতি এবং বর্তমানে মেখল মাদ্রাসার প্রধান পরিচালক মাওলানা মুহাম্মদ নোমান সাহেবের বক্তব্যকেও গবেষণার উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছি। হাটহাজারী মাদ্রাসার প্রবীণ শিক্ষকগণ, বর্তমান মহাপরিচালক আল্লামা আহমদ শফী (দা.বা.), মুফতী সাহেবের ছাত্রগণসহ স্থানীয় লোকদের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করেছি। এছাড়া-

১। মুফতী সাহেবের রচনাবলী সংগ্রহ করে,

২। তাঁর পারিবারিক সদস্য, সমসাময়িক বিশেষ ব্যক্তি, আত্মীয়-স্বজন, সহকর্মী, ছাত্র ও পরিচিত ব্যক্তিবর্গের স্বাক্ষাৎকার গ্রহণ করে,

৩। তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কীয় খন্ডাকারে রচিত বিভিন্ন মাধ্যম থেকে তথ্য সংগ্রহ করে,

৪। বিভিন্ন গ্রন্থাগারে তাঁর সম্বন্ধে সংগৃহীত তথ্যসমূহ অনুসন্ধান করে,

৫। সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ঘটনা প্রবাহ, ইতিহাস, দলীল - দস্তাবেজ, পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী সংগ্রহ ও ব্যাপক অধ্যয়নের মাধ্যমে এবং

৬। মুফতী সাহেবের জন্মস্থান, তৎকালে সেখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি সরজমিনে গিয়ে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেছি।

এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি নিম্নোক্ত পরিকল্পনা অনুসারে সাজিয়েছি:

ভূমিকা

অভিসন্দর্ভ রচনায় মুফতী সাহেবের উল্লেখযোগ্য শিক্ষক, ছাত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ মনীষীগণের সংক্ষিপ্ত জীবনেতিহাস, গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি পাদটীকা ও মূলপাঠে উল্লেখ করেছি। তাঁদের সময়কাল, মৃত্যুর তারিখ উল্লেখ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। যাদের জন্ম, মৃত্যুর সন, তারিখ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি সেগুলো খালি রেখে দিয়েছি। মুফতী সাহেবের বিশাল রচনা ভান্ডারকে কয়েকটি বিষয়ে ভাগ করেছি। প্রথমে তাঁর প্রকাশিত পাণ্ডুলিপি এবং মুদ্রিত গ্রন্থাবলীর আলোচনা করেছি। পরবর্তীতে অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির আলোচনা করেছি। যেসব পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি সেগুলোর শিরোনাম উল্লেখ করেছি। কেউ তাঁর গ্রন্থ সমূহের আলোচনা, সমালোচনা, মন্তব্য, প্রশংসা করে থাকলে সেগুলো উল্লেখ করেছি। রচনায় তিনি যেসব উৎস, উপাদানের সাহায্য নিয়েছেন সেগুলো উল্লেখ করেছি, সেসবের বিশদ পরিচিতি, উৎস এবং প্রণেতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করেছি। গ্রন্থালোচনায় সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছি এবং মুদ্রিত গ্রন্থের প্রকাশক, প্রকাশকাল ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করেছি। গ্রন্থের বিষয়বস্তুর প্রয়োজনীয় সারসংক্ষেপ, আলোচনা, সমালোচনা ও মন্তব্য উল্লেখ করেছি।

এ অভিসন্দর্ভ নির্বাচন ও রচনায় যিনি আমাকে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিয়েছেন এবং এ বলে উদ্বুদ্ধ করেছেন, 'আল্লাহর ওয়ালীদের জীবনী আলোচনা আল্লাহতাআলার রহমত প্রাপ্তি ও গুনাহ মাফের মাধ্যম' তিনি হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য শিক্ষক, দর্শন বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান, ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবকদের প্রিয় ব্যক্তিত্ব ড. মুহাম্মদ আনিসুজ্জামান। স্যারের পরামর্শ ও আন্তরিক সহযোগিতার জন্য আমি চিরঋণী। ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক সাবেক বিভাগীয় প্রধান, আমার পি-এইচ.ডি. গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক, আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক ড. মুহাম্মদ আব্দুল বাকী স্যারের প্রতি আমি চিরদিন ঋণী ও কৃতজ্ঞ। স্যারের পরিবারের সদস্যগণের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ । তাঁদেরকে আমি প্রায়শই বিরক্ত করি। স্যারকে সময়-অসময় বিরক্ত করলেও তিনি হাসিমুখে সব বরণ করে নেন। এর পূর্বে এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য স্যারকে তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে খুবই বিরক্ত করেছি। স্যার সর্বদা আমাকে অসামান্য মমতা, বই পুস্তক ও সুপরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন। অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও অভিসন্দর্ভের প্রুফগুলো দেখে দিয়েছেন, ভুল-ত্রুটি সংশোধন করেছেন এবং দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। তাঁর এ অকৃত্রিম ঋণ কোনদিন শোধ হওয়ার নয়। অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ বর্তমান বিভাগীয় চেয়ারম্যান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; স্যারের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ সুপরামর্শ এবং আমাকে সাহস শক্তি যোগানোর জন্য। মুফতী ফয়যুল্লাহর নিকটাত্মীয়গণের সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে তাঁদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য মাওলানা ফজলুর রহমান (নাগড়া), মাওলানা আবুল কাসেম (বোয়ালজানা)- এর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। মুফতী সাহেবের গ্রন্থসমূহ সংগ্রহের ব্যবস্থা করে এবং

হাটহাজারী ও মেখল এলাকায় মুফতী সাহেবের স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহ পরিদর্শনের সুযোগ করে দিয়ে মুফতী মুহাম্মদ ইযহারুল ইসলাম চৌধুরী ও তাঁর সুযোগ্য পুত্র মাওলানা মুহাম্মদ মূসা বিন ইযহার চৌধুরী আমাকে কৃতজ্ঞতায় ও ঋণে আবদ্ধ করেছেন। তাঁদের মাধ্যমে মুফতী ফয়যুল্লাহর প্রাচীন ঘরবাড়ি, কাচারী, মসজিদ, মাদ্রাসা ইত্যাদি পরিদর্শনের সুযোগ লাভ করেছি। মুফতী সাহেবের অপর নাতি মেখল মাদ্রাসার বর্তমান মুহতামিম মাওলানা মুহাম্মদ নোমান সাহেব আমাকে বিভিন্ন পুস্তক, তথ্য, উপাত্ত দিয়ে সাহায্য করেছেন। তাঁকেও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। আমার সুহৃদ ও হিতাকাঙ্খী যারা এ গবেষণাকর্মে নিরন্তর উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে গন্তব্যে পৌঁছতে সাহায্য করেছেন তাঁদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ। এ গবেষণা সম্পন্ন করতে যেয়ে আমার স্ত্রী, পুত্র-কন্যাকে আমার সান্নিধ্য লাভ থেকে বঞ্চিত করার জন্য আন্তরিকভাবে দু:খিত। তাদের কাছে আমি ঋণী। এ অভিসন্দর্ভ কম্পিউটার কম্পোজে যিনি অত্যন্ত পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করেছেন জনাব হাফেজ আনোয়ার হুসাইন খান সোহেল-এর প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ। অভিসন্দর্ভ রচনায় যেসব প্রতিষ্ঠান ও লাইব্রেরী থেকে সাহায্য গ্রহণ করেছি যেমন-

১। ব্যক্তিগত লাইব্রেরী
২। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার।
৩। দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্রাসা কুতুবখানা।
৪। মাদ্রাসা হামিউস সুন্নাহ মেখল গ্রন্থাগার।
৫। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, বায়তুল মুকাররম ঢাকা।
৬। আল আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লাইব্রেরী, তোপখানা রোড, ঢাকা।
৭। বাংলাদেশ ইসলামিক ল রিসার্চ এণ্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, পল্টন ঢাকা।
৮। ইত্যাদি। তাঁদের ঋণ স্বীকার করছি। আল্লাহ তাআলা সকলকে জাযায়ে খায়ের দান করুন এই নিবেদন করছি।

এ অভিসন্দর্ভ রচনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যানুসন্ধান ও গবেষণা করার কাজে আমাকে অনেক প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তবুও যথাসাধ্য নির্ভুল তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করেছি। তারপরও এ গবেষণাই যে চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গ এমন দাবী করা ঠিক হবে না। এ বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে অনাগত ভবিষ্যতে আরো ব্যাপক গবেষণার পথ উন্মুক্ত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। আমি অসংকোচে স্বীকার করছি যে, এ অভিসন্দর্ভ রচনা করার জন্য যতটুকু সময়, শান্ত ও নিরিবিলি পরিবেশ, গভীর অধ্যয়ন, বিস্তৃত ও সৃষ্টিশীল জ্ঞানের দরকার ছিল তা এ গবেষকের নেই। আমার জ্ঞান ও গবেষণাকর্মে যোগ্যতার দৈন্যতা সত্ত্বেও যতটুকু কর্ম হয়েছে তা একমাত্র আল্লাহ তাআলার সাহায্য, সমর্থনেই হয়েছে। তিনিই একমাত্র সাহায্যকারী ও তাওফীক দাতা।

তারিখ: ২৯-০২-২০১৬ খৃ.

মো: জসিম উদ্দিন
পি-এইচ.ডি. গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রথম অধ্যায় :
ফিক্‌হশাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

ভূমিকা: ইসলামী জ্ঞান রাজ্যের বিশাল ভান্ডার দখল করে আছে ফিক্‌হশাস্ত্র। প্রতিটি মুসলমান যাবতীয় কার্যক্রম ইসলামী বিধান মতে পরিচালনা করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। কারণ, এটা অহী নিসৃত শাস্ত্র । মানব জীবনে কোন কাজটি হালাল, কোন কাজটি হারাম, কোনটি ঠিক, কোনটি বেঠিক, কোনটি সত্য, কোনটি মিথ্যা, কোনটি উচিৎ ,কোনটি অনুচিত, কোনটি বৈধ, কোনটি অবৈধ; এসব বিষয় জানতে ও মানতে মুসলমানগণ সর্বদা প্রচন্ড আগ্রহী। আর এসবের জ্ঞান রয়েছে ফিক্‌হশাস্ত্রে। ফিক্‌হ'র প্রয়োগ ও ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের জীবনে উন্নতি ও সমৃদ্ধি এসেছে ও জীবনের সফলতা অর্জিত হয়েছে। ফিক্‌হকে অবহেলার কারণে জীবন কোনঠাসা হয়েছে। জীবনকে সৌন্দর্য মন্ডিত করতে, শরী'আত মতে চলতে দরকার ফিক্‌হ'র। পবিত্র কুরআন জীবন সমস্যার সমাধান বর্ণনা করেছে, রাসুলুল্লাহ সা. বিভিন্ন বিধান বর্ণনা করেছেন, কালক্রমে সাহাবা ও তাবি'ঈগণের মাধ্যমে এ কাজ সম্পাদিত হয়েছে, অতপর মুজতাহিদ ইমাম-ইমাম আবূ হানীফা র. ইমাম মালিক র. ইমাম শাফি'ঈ র. ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. শরী'আতের বিধি-বিধান তথা ফিক্‌হশাস্ত্রের পরিকল্পিত বিন্যাস করেছেন। তাদের ফিক্‌হী কর্মকে মুসলিম উম্মাহ সাদরে গ্রহণ করেছে, স্বীকৃতি দিয়েছে এবং এ শাস্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে ও এর মাধ্যমে চরিত্রবান, আদর্শ মানুষ তৈরিতে অবদান রেখেছে। যুগে যুগে এ শাস্ত্রের অনেক উথ্থান -পতন হয়েছে, ক্রমোন্নতি হয়েছে আবার বাধাগ্রস্থও হয়েছে। তার পরও যুগ যুগ ধরে টিকে আছে এ শাস্ত্র। তার মজবুত ভিত্তি ও বলিষ্ঠ কাঠামোর বলে দৃঢ়তার সাথে যুগের চাহিদা মোকাবিলা করে যাচ্ছে। এ নিবন্ধে ফিক্‌হশাস্ত্রের পরিচিতি, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস তুলে ধরা হল:

ফিক্‌হর সংজ্ঞা: আল্লামা হাসকাফী র. 'দুররুল মুখতার' গ্রন্থে লিখেন, ' ' ফিকহ্ শব্দের আভিধানিক অর্থ কোন বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া। পরবর্তিতে শব্দটি শর'ঈ বিষয়াদি সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া অর্থে নির্দিষ্ট হয়ে যায়। শব্দটি বাবে সামিয়া' থেকে ব্যবহৃত অর্থ হবে জানা। আর বাবে কারুমা থেকে আসলে মাসদার হবেঅ অর্থ ফকীহ হওয়া। আল্লামা খায়রুদ্দীন রামালী র. মিনহাতুল খালিক আ'লা বাহরির রায়িক' গ্রন্থে ,

সে জ্ঞাত হয়েছে আর অবগত হওয়ার ক্ষেত্রে সে অপরের তুলনায় অগ্রগামী হয়েছে'। আল্লামা রশীদ রিযা মিসরী তার তাফসীর গ্রন্থে লিখেন,'ফিক্‌হ শব্দটি পবিত্র কুরআনে বিশটি স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। তন্মধ্যে উনিশ স্থানে গভীর জ্ঞান ও সুক্ষ ইল্‌ম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[১]

পরিভাষায় ফিক্‌হ বলে:

ইসলামী শরী'আতের বিস্তারিত প্রমানাদির মাধ্যমে শরী'আতের বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া।' বিস্তারিত প্রমান বলতে কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াসকে বুঝানো হয়েছে।

শায়খ ইবনুল হুমাম বলেন, শরী'আতের অকাট্য বিধি- বিধানের যথাযথ অনুধাবনকে ফিক্‌হ বলে। আততাওযীহ গ্রন্থে এসেছে, ইমাম আযম আবু হানীফা র.- এর মতে ফিক্‌হ হল: 'নফস ও আত্মার জন্য যা কল্যাণকর এবং যা অকল্যাণকর তাসহ নফস সম্বন্ধে অবগত হওয়াকে ফিক্‌হ বলে।' ইমাম গাযযালী র. বলেন, ' শরী'আতের শাখা-প্রশাখা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা এবং সুক্ষ ইল্লত সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়াকে ফিক্‌হ বলে ।'

'কাশফু ইসতিলাহাতিল ফুনূন' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এসেছে, ইমাম শাফি'ঈ র.-এর অনুসারীদের মতে ফিক্‌হ হল বিস্তারিত দলীল-প্রমানাদির মাধ্যমে শরী'আতের আমলসমূহ সম্পর্কিত বিধি-বিধানকে জানা।'

মাজাজাতুল আহকামিল আমলিয়্যা' গ্রন্থ মতে ফিক্‌হ হল আমল সম্পর্কিত শরী'আতের খুঁটিনাটি বিধি-বিধানের জ্ঞান যা বিস্তারিত দলীল-প্রমান হতে গৃহীত। মাজমাউস্ সুলূক' গ্রন্থে বলা হয়েছে, ফিক্‌হ হল কোন ব্যক্তি কর্তৃক স্বীয় দ্বীনি অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করা।'এ সংজ্ঞা মতে যাবতীয় দ্বীনি ইলম অর্জন করা ফিক্‌হর অর্ন্তভুক্ত। সূফী সাধকগনের মতে ইলম ও আমলের সমষ্টির নাম ফিক্‌হ্ । যেমন হাসান বসরী র. বলেন,

'পরকালমুখী, ইহকাল বিমুখ, স্বীয় দ্বীনের প্রতি সতর্ক দ্রষ্টা, পালনকর্তার ইবাদতে সবর্দা লিপ্ত, মুসলমানদের ইজ্জত ভূলুন্ঠিত করা হতে বিরত এবং সতর্কতা অবলম্বনকারীকে বলে ফকীহ।' প্রথম যুগে ফিক্‌হ শব্দটি আখিরাত সম্পর্কিত জ্ঞান, আখিরাতের রহস্য সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান লাভ করা এবং দুনিয়াকে তুচ্ছ জ্ঞান করা অর্থে ব্যবহৃত হত।[২]

---

১. সম্পাদনা পরিষদ কতৃক সম্পাদিত, ফাতাওয়া ও মাসাইল', ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬, খ. ১ম, পৃ ১ ; 'ইসলামী আইন ও বিচার', ৭ম বর্ষ, ২৫ সংখ্যা, জানু-মার্চ ২০১১, পৃ ১০২।

২. আমীমুল ইহসান, সায়্যিদ, মুফতী, 'কাওয়াইদুল ফিক্‌হ', দেওবন্দ, দারুল কিতাব, ১৯৯১, পৃ ৪১৪-১৬; ফাতাওয়া ও মাসাইল,' প্রাগুক্ত, পৃ ৫; ইসলামী বিশ্বকোষ,' সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিক, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬, খন্ড প্রথম, পৃ ৬৯-৭১; ইসলামী আইন ও বিচার. বর্ষ ৫ম, সংখ্যা ২০, অক্টো-ডিসেম্বর ২০০৯. পৃ ৩৬-৩৭;'আলমাওসূয়াতুল ফিকহিয়্যা,' কুয়েত, ধর্ম বিষয়মন্ত্রণালয়, ২০০৭ , পৃ ১৪।

উসূলবিদগণের মতে ফিক্‌হ: উসূলবিদগণের মতে ফিক্‌হ শব্দটি শারউন -এর প্রতিশব্দ। এর অর্থ মহান আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়া। যেগুলো মানুষের আকীদা-বিশ্বাস ,আখলাক ও বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্যক্রমের সাথে সম্ক্তৃক্ত।তাঁদের মতে যে শাস্ত্রে ফিক্‌হর মূল উৎসসমূহ এবং শরয়ী দলীলসমূহ বিষয়ে আলোচনা হয তাকে উসূল আল-ফিক্‌হ বলে। তাঁদের মতে ফিক্‌হর সজ্ঞা হল; বিশদ দলীল-প্রমানের ভিত্তিতে শরী'আতের ব্যবহারিক আনুসাঙ্গিক বিষয়ের বিধান সম্পর্কিত জ্ঞানকে ফিক্‌হ বলে।[১]

ফিক্‌হ ও কানূন: কেউ কেউ ফিক্‌হ ও কানূন শব্দদ্বকে একই অর্থে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন। তবে বর্তমান প্রচলিত অর্থে কানূন ইসলামী ফিক্‌হর একটি অংশ মাত্র। মানুষের পারস্পরিক লেন-দেন, কাজ-কারবার ও বিভিন্ন অপরাধের শাস্তি সর্ম্পকিত বিধানকে কানূন বা আইন বলে। পক্ষান্তরে ফিক্‌হ হল ব্যাপকতর একটি জীবন ব্যবস্থার নাম। এটা আল্লাহ প্রদত্ত আইন। যা মানব জাতিকে সীরাতে মুস্তাকীমের উপর পরিচালিত করে। এ আইন মানুষের অধিকারের পূর্ণ স্বীকৃতি প্রদান করে। কানূন মানব রচিত আইনকে বলে বিধায় ফকীহগণ কানূন শব্দটিকে ফিক্‌হ অর্থে কদাচিত ব্যবহার করেছেন। কানূন শব্দটি অনারব। গ্রীক ভাষা হতে সুরিয়ানী ভাষার মাধ্যমে আরবী ভাষায় প্রবেশ করেছে। এর মূল কোন বস্তুকে পরিমাপ করার যন্ত্র। কানূনের লক্ষ ইনসাফ ও ন্যায় বিচারের দাবী পূরণ করা। ফিক্‌হর লক্ষ ইনসাফ ও ন্যায় বিচারের দাবী পূরণ করা, ন্যায়ের পথে মানুষকে আহবান করা এবং অন্যায় হতে বিরত রাখার মাধ্যমে ব্যক্তির আত্মাকে পবিত্র রাখা। ফিক্‌হ আল্লাহ প্রদত্ত ,এর মূলনীতির কোন পরিবর্তন হয়না। আল্লাহর বাণীর কোন পরিবর্তন হয়না'।২ ফিকহ পূর্ণতার স্থরে পৌছেছে, কানুন নিত্য পরিবর্তনশীল, এখনও পূর্ণতা লাভ করতে পারেনি।[৩]

ফকীহ কে? ফিক্‌হ শাস্ত্রবিদকে ফকীহ বলে। যার উদ্ভাবনী দক্ষতা ও প্রতিভা রয়েছে তাকে ফকীহ বলে। কি পরিমান জ্ঞান আয়ত্ব করলে কোন মনীষীকে ফকীহ বলা যাবে বিষয়টি নিয়ে ফকীহগণের অভিমত হল-তা 'উরপের উপর নির্ভরশীল। আমাদের বর্তমান 'উরপ অনুযায়ী যিনি ফিক্‌হর সুবিস্তৃত জ্ঞানে জ্ঞানী, গভীর উপলব্ধির অধিকারী এবং সুস্থ ফিকহী স্বভাব সম্পন্ন তিনি ফকীহ। এভাবে বলা যায়, যার উদ্ভাবনী দক্ষতা ও প্রতিভা আছে এবং যিনি দলীল- প্রমান থেকে বিধানসমূহ উদ্ভাবনে সক্ষম তিনি ফকীহ। যিনি মানবিক প্রয়োজনের সামাজিক অবস্থা ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে কুরআন, সুন্নাহ হতে সমাধান বের করতে পারেন তিনি মুজতাহিদ ফকীহ। প্রত্যেক মুজতাহিদ ফকীহ কিন্তু প্রত্যেক ফকীহর মুজতাহিদ হওয়া জরুরী নয়।৪

ফিক্‌হর আলোচ্য বিষয়ঃ কুররাতুল উয়ুন ফী তাযকিরাতিল ফুনূন') গ্রন্থে বলা হয়েছে, ফিক্‌হর আলোচ্য বিষয় মুকাল্লাফ তথা প্রাপ্ত বয়স্ক জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের কর্মসমূহ। অর্থাৎ আমলসমূহের মধ্যে কোনটি ফরয, কোনটি ওয়াজিব, কোনটি সুন্নাত,কোনটি মুস্তাহাব,কোনটি মুস্তাহসান, কোনটি জায়িয বা নাজায়িয, কোনটি হালাল বা হারাম বা মাকরুহ ইত্যাদির নির্দেশ করা। আকাইদ, ইবাদত, মু'আমালাত,মু'আশারাত, উকূবাত ,আদব-আখলাক, পারস্পরিক বিরোধ, সন্ধিচুক্তি, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা ইত্যাদি ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়সমূহ ফিক্‌হশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়।৫

ফিক্‌হ শিক্ষার গুরুত্বঃ ব্যক্তির যাবতীয় অধিকার ও কর্তব্যসমূহ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ করাকে ফিক্‌হ বলে। এ অর্থে 'আলিম গায়রে 'আলিম প্রত্যেকের উপর ফিক্‌হর এতটুকু জ্ঞানার্জন করা ফরয যতটুকু ব্যতীত মুসলমানের দ্বীনি জিন্দেগী, ইবাদত ও 'আমল সম্ভব নয়। তবে এতটুকু পরিমান ফিক্‌হ জানলে তাকে ফকীহ বলা যাবেনা। ফিক্‌হ শিক্ষার গুরুত্ব প্রসংগে পবিত্র কুরআনে এসেছে, 'তাদের প্রতিটি দল থেকে কিছু লোক কেন বের হয়না, যাতে তারা দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। এবং সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসে। যাতে তারা সতর্ক হয়।৬

---

১. ইসলামী আইন ও বিচার,' বর্ষ ৭ম, সংখ্যা ২৫, জানু-মার্চ ২০১১, পৃ ১০২।

২. আল-কুরআন, ১০:৬৪

৩. ছাইদুল হক, মুহাম্মদ, ড. ইসলামী বিচার ব্যবস্থা, প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, (অপ্রকাশিত থিসিস) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৭, পৃ ৬; আব্দুর রহীম, মাওলানা, ইসলামী অর্থনীতির ভূমিকা', ঢাকা, খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৮৭, পৃ ১৬১; ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, প্র ৮৪।

৪. আলমাউসূয়াতুল ফিকহিয়্যা,' প্রাগুক্ত, পৃ ১৫; আমীমুল ইহসান, সায়্যিদ, মুফতী, কাওয়াইদুল ফিক্‌হ,' প্রাগুক্ত, পৃ ৪১৫; ইসলামী আইন ও বিচার', বর্ষ ৭ম,সংখ্যা২৫. জানু-মার্চ ২০১১, পৃ ১০২।

৫. ফাতাওয়া ও মাসাইল, প্রাগুক্ত, পৃ ৫; ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৬।

৬. আলকুরআন, ৯:১১২।

পবিত্র কুরআনে আরো এসেছে, 'যারা বিশ্বাসী এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে. আল্লাহ তা'আলা তাদের মর্তবা উঁচু করেছেন।১ পবিত্র কুরআনে আরো এসেছে, 'জিজ্ঞেস করুন, যারা জ্ঞানী এবং যারা জ্ঞানহীন তারা কি সমান হতে পারে?'২ মহানবী সা. তাঁর পবিত্র বাণীতে বলেন, আল্লাগহ পাক যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন এবং তার অন্তরে সৎপথ ইলহাম করেন।৩ রাসূলুল্লাহ সা. আরো বলেন, 'দুটি স্বভাব মুনাফিকদের মধ্যে পাওয়া যায়না:ক. সুন্দর প্রথপ্রদর্শন খ. ধর্ম সম্পর্কিত জ্ঞান।৪ রাসূলুল্লাহ সা. আরো বলেন,' জ্ঞানী ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ইবাদতকারীর উপর এমন যেমন আমার শ্রেষ্ঠত্ব সাহাবীদের উপর।৫ রাসূলুল্লাহ সা. আরো বলেন, একজন ফকীহ শয়তানের বিপক্ষে হাজার 'আবিদ অপেক্ষা মারাত্নক।'৬ ইসলাম আল্লাহ তা'আলার সর্বশেষ পয়গাম, পূর্ণাঙ্গ পয়গাম ও বিশ্বজনিন পয়গামঃ আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের উপর আমার নি'আমত পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।৭ ইসলাম যেমন পূর্ণাঙ্গ দ্বীন তেমনি গতিময়, পরিবর্তনশীল এবং চিরযৌবনা। আল্লাহ তা'আলা ইসলামে এমন যোগ্যতা রেখে দিয়েছেন যা সর্বযুগে সর্বকালে সর্বাবস্থায় মানব সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম। যেন শিল্পে নৈপুন্যে ভরপুর। জাগিতিক সব সমস্যার সমাধান দিতে আল্লাহ তা'আলা এ উম্মতকে দুটি বৈশিষ্টে ঐশ্বর্যমন্ডিত করেছেন। ক. রাসূলুল্লাহ সা. কে একটি পরিপূর্ণ জীবন্ত শিক্ষাব্যবস্থা দান করেছেন, যা প্রতিটি সংকট ও পরিবর্তনের মোকাবিলা করতে সক্ষম। খ. দ্বীনকে সমুন্নত ও উজ্জীবিত রাখতে যুগে যুগে এমন সব মহামনীষীর আগমন ঘটিয়েছেন যাঁরা দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুসলিম উম্মাহর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছেন এবং সবধরনের সংকটের মোকাবিলা করেছেন। এ নি'আমত বিশ্বের অন্য কোন জাতিকে দেয়া হয়নি। এ উম্মাহকে দেয় যুগটি সর্বাধিক পরিবর্তনশীল, বিপ্লবপূর্ণ. নিত্যনতুন সৃষ্টিশীল। আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ যে, তিনি যুগে যুগে এমন যোগ্যতাসম্পন্ন ও শক্তিমান মুসলিম মনীষী এ উম্মাহকে দান করেছেন যাঁরা ইসলামের অস্তিত্ব ধরে রেখেছেন, জীবন সংগ্রামে নিত্য নতুন বিজয় অর্জন করেছেন। যদি ঐ সময় কুরআন সুন্নাহর আইন- কানূন রচনা ও ফিক্হ বিন্নাসে বিলম্ব হত তাহলে রোমক কিংবা পারসিক আইন দিয়ে কাজ চালাতে হত। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দ্বীনের হিফাজত এ উম্মাহর 'আলিমে দ্বীন, মুজাহিদ, মুজহাহিদ ও মুজাদ্দিদগণ দ্বারা করিয়েছেন । সে সময় 'আলিমগণের সামান্যতম গাফিলতি মেধাগত আলস্য আরামপ্রিয়তা এ উম্মাহকে হাজার বছরের জন্য ইসলামী আইন ও ফিক্হর বরকত থেকে মাহরুম হত। ৮

ফিক্হর উৎসঃ ফিক্হর উৎস চারটি। ১. কুরআন, ২. সুন্নাহ, ৩. ইজমা, ৪. কিয়াস।

কুরআনঃ পবিত্র কুরআন শরী'আতের মূল উৎস। এতে ইসলামী 'আকীদাসমূহের বিস্তারিত বিবরণ , 'ইবাদত, অধিকার, কর্তব্য, ক্রয়-বিক্রয়, হালাল-হারাম, আর্থিক ও সামাজিক লেন-দেন ইত্যাদি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে। সুন্নাহয় রয়েছে এর বিস্তারিত ব্যখ্যা। তবে সম্পত্তির উত্তরাধিকার, অপরাধের শাস্তি, মৃত্যুদন্ড, যেসব নারীকে বিয়েকে বিয়ে করা হারাম ইত্যাদির অপেক্ষাকৃত বিশদ বিবরণ পবিত্র কুরআনে রয়েছে।

সুন্নাহঃ ফিক্হর দ্বিতীয় উৎস সুন্নাহ। রাসূলুল্লাহ সা.-এর বাণী, কর্ম, সম্মতি এবং সাহাবাগণের বাণী ও আচরন সুন্নাহর অর্ন্তভুক্ত্। যেসব কর্ম ও আচরন রাসূলুল্লাহর যুগ হতে বিস্তৃতকাল ধরে বিপুল সংখ্যক মুসলমান পরম্পরাভাবে সম্পাদনা করে আসছেন এবং পরবর্তীকালের মুসলমান কর্তৃক অব্যাহতভাবে অনুসৃত হয়ে আসছে তা সুন্নাহর অর্ন্তভুক্ত। ইসলামী জ্ঞানের উৎস হিসেবে পবিত্র কুরআনের পরই সুন্নাহর স্থান। সুন্নাহ পবিত্র কুরআনেরই ব্যাখ্যা , পবিত্র কুরআনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। সুন্নাহ জীবন চলার পথে সর্বোত্তম আদর্শ। সুন্নাহ ব্যতীত ইসলামী জ্ঞান ও জীবন দর্শন সর্ম্পকে ধারনা লাভ করা সম্ভব নয়। পবিত্র কুরআন যেখানে জীবন ব্যবস্থার মৌলিক নীতিমালা পেশ করেছে সুন্নাহ তার বিস্তারিত বিবরণ ও বিশ্লেষণ প্রকাশ করেছে। কুরআন ইসলামের প্রদীপ্ত স্তম্ভ সুন্নাহ তার বিচ্ছুরিত আলোর ন্যায়। পবিত্র কুরআন জ্ঞানের মূল উৎস ও কান্ড, সুন্নাহ তার শাখা-প্রশাখা। কুরআন ইসলামী জ্ঞানের প্রাসাদের পরিকল্পিত চিত্র, সে অনুযায়ী নির্মিত প্রাসাদই সুন্নাহ।৯

১. আলকুরআন, ৫৮:১১
২. আলকুরআন, ৩৯:৯
৩. মিশকাতুল মাসাবীহ,'(নূর মুহাম্মদ আ'জমী র. অনূ) ঢাকা, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৮৭, ৫ম সংস্করণ, পৃ ৬।
৪. প্রাগুক্ত, পৃ ২০; ইয়াহইয়াউ উলূমিদ্দীন,(মুহি উদ্দীন খান অনূ), ঢাকা, মদীনা পাবলিকেশান্স, ২০১০, ২৭তম সংস্করণ, খন্ড ১ম, পৃ১৬।
৫. প্রাগুক্ত, পৃ ১৮।
৬. মিশকাতুল মাসাবীহ,' প্রাগুক্ত, পৃ ১৮।
৭ .আলকুরআন, ৫:৩।
৮. সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস,' (আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী অনূ) ঢাকা, মুহাম্মদ ব্রাদার্স,২০১০, খন্ড ১ম, পৃ ২৬-২৮,৮৩-৮৪।
৯. আব্দুর রহীম, হাদীস সংকলনের ইতিহাস, ' ঢাকা, ইসলামি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬, ৪র্থ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৯,১।

ইজমাঃ ইজমা ফিক্হর তৃতীয় উৎস। শরী'আতের কোন বিধান বিষয়ে যুগের মুজতাহিদগণ একমত হওয়াকে ইজমা বলে। ইজমা ফিক্হর একটি শক্তিশালী উৎস। ইজমা দু'প্রকার। ক. বাচনিক খ. মৌনসম্মতিমূলক। বাচনিক ইজমার অর্থ হল কোন

যুগের ফকীহগণ শরী'আতের কোন বিধান বিষয়ে সর্বসম্মতভাবে একমত প্রকাশ করা। সাহাবাগণ ইজমার উপর আমল করার চেষ্টা করেছেন। যেসব বিষয়ে সাহাবাগণের মধ্যে দ্বিমত ছিল মুজতাহিদ ইমামগণ বিশ্লেষনের মাধ্যমে একটিকে প্রাধান্য দিতে পারতেন। যেমনটি ইমাম বুখারী র. (১৯৪-২৫৬ হি.) দিয়েছেন।১

কিয়াসঃ ফিক্হর চতুর্থ উৎস কিয়াস। কিয়াস অর্থ তুলনা করা, পরিমাপ করা,সামঞ্জস্যপূর্ণ করা, সমন্বয় করা, যুক্ত করা, অনুমান করা ইত্যাদি। শরী'আতের পরিভাষায়-শরী'আত কর্তৃক প্রদত্ত কোন বিধানকে মুজতাহিদ ইমাম কর্তৃক পরস্পর সাদৃশ্যের কারণে অপর বিষয়ের মধ্যে প্রয়োগ করাকে কিয়াস কলে। যে বিষয় সম্পর্কে কুরআন, হাদীস ও ইজমায় স্পষ্ট নেই, উক্ত বিষয়কে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমায় বর্ণিত বিষয়ের বিধানের সাথে সাদৃশ্যের ভিত্তিতে উক্ত বিধান প্রয়োগ করা। ইজমার তুলনায় কিয়াস অধিকতর ব্যাপক ও সহজে বাস্তবায়নযোগ্য গবেষণা পদ্ধতি । এটা শরী'আতের সুদূরপ্রসারী উৎস। এর মাধ্যমে ফিক্হ ব্যাপকতা লাভ করেছে এবং যুগের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার উপকরণ যুগিয়ে যাচ্ছে, যুগ পরিবর্তনে উদ্ভূত নব নব সমস্যার শরী'আত সম্মত সমাধান দিয়ে যাচ্ছে। কিয়াসের প্রয়োগ স্বপক্ষে মহানবী সা.-এর হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। আবূ দাউদ শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সা. যখন হযরত মু'আয ইবন জাবাল রা. কে ইয়ামানের গভর্ণর করে পাঠাচ্ছিলেন তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, (হে মু'আয) তোমার নিকট কোন মুকদ্দমা আসলে তুমি কিভাবে মীমাংসা করবে? হযরত মু'আয বললেন, আমি আল্লাহর কিতাবের সাহায্যে মীমাংসা করব। রাসূলুল্লাহ সা. জিজ্ঞেস করলেন, যদি আল্লাহর কিতাবে এর মীমাংসা না পাও তাহলে কি করবে? তিনি বললেন, তখন রাসূলুল্লাহর সুন্নাহ দ্বারা মীমাংসা করব। রাসূলুল্লাহ সা. পুন জিজ্ঞেস করলেন, যদি কিতাবুল্লাহ ও রাসূলের সুন্নাহ না পাও তখন কি করবে? হযরত মু'আয রা. বললেন, তখন আমি আমার জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা ইজতিহাদ করব। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সা. মু'আযের বুকে হাত রেখে বললেন, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি তাঁর রাসূল যা পছন্দ করেন তা তাঁর রাসূলের প্রতিনিধিকে বুঝার তাওফিক দান করেছেন।' হযরত ওমর রা. একদা হযরত আবূ মূসা আশ'আরী রা.কে এক লিখিত পত্রে আর্থিক লেন-দেন ও অন্যান্য বিরোধ নিষ্পত্তি মামলায় অনুরূপ পন্থা অবলম্বনে আদেশ দিয়েছিলেন।২

ফিক্হ শাস্ত্রের উৎপত্তির কারণঃ তৎকালিন দুনিয়ার মুসলিম সাম্রাজ্র ছিল সর্ববৃহৎ। প্রতিনিয়ত মুসলিম সাম্রাজ্রের বিস্তৃতি ঘটছিল। ফলে নিত্য নতুন অবস্থা, পরিবেশ, পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছিল মুসলিম উম্মহ। তখন মুসলিম উম্মহর রূহ, চরিত্র, আখলাক হিফাজতের সংগে সংগে মুসলিম উম্মাহর সামাজিক জীবন, রীতি-নীতি, পারস্পরিক লেন-দেন ইত্যাদি ইসলামের আলোকে হিফাজতের প্রয়োজন দেখা দেয়। প্রচলিত রীতি-নীতির বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহনসহ অসংখ্য নতুন নতুন বিষয় ইসলামী হুকুমতের সামনে অপেক্ষায় ছিল।উমাইয়া ও আব্বাসীয় যগুের কাযীগণ (বিচারক) নিজস্ব ইজতিহাদের মাধ্যমে মাসআলা দিতেন ,ফলে তাদের প্রদত্ত রায়ে ভিন্নতা দেখা দেয়। এতে রাজ্যে বিশৃংখলা দেখা দেয়। পবিত্র কুরআনের কোন কোন আয়াতের একাধিক ব্যাখ্যা গ্রহণের সম্ভাবনা থাকায় এবং বাহ্যিক দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী আয়াতের প্রয়োগ নিয়ে ফাতাওয়া দাতাগণের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়।ব্যবসা- বাণিজ্য, কলকারখানা, কৃষি,খাজনা,রাজস্ব,জিজিয়া ও খিরাজ আদায় নিয়ে উদ্ভব হয় নানা সমস্যার। প্রাচীন রীতি-নীতির স্থলে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের প্রয়োজন দেখা দেয়। এক্ষেত্রে নিশ্চয়তার প্রয়োজন ছিল যে, এগুলো ইসলামের মূলনীতি ও আইন-কানূন মোতাবিক পরিচালিত হবে।এসব সমস্যা এড়িয়ে যাবার মত কোন সুযোগ ছিলনা বরং রাষ্ট্র ও জনগণ এসবের বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ সমাধানের অপেক্ষায় ছিল। ফলে ইসলামী আইন তথা ফিক্হশাস্ত্র'র জন্ম দেয়া সময়ের দাবী হয়ে ওঠে। এ কাজটি মুসলমানগণ আল্লাহ তা'আলার অশেষ রহমতে সম্পন্ন করতে সক্ষম হন। আল্লাহ তা'আলা অশেষ রহমত স্বরূপ ইমাম আবূ হানীফা র.(৮০-১৫০ হি.), ইমাম মালিক র.(৯৩-১৭৯হি.), ইমাম শাফি'ঈ র.(১৫০-২০৪ হি.) ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র.(১৬৪-২৪১ হি.) কে ফিক্হশাস্ত্রের উদ্ভাবক হিসেবে দুনিয়াতে প্রেরন করেন। মুসলিম সৌভাগ্য হিসেবে এ চার ইমামের আগমন ঘটে। তাঁরা ছিলেন মেধা,প্রতিভা, সাধুতা, ইখলাছ ও জ্ঞানের রাজ্যে খ্যাতিমান মনীষী। তাঁরা তাঁদের গোটা জীবন এবং সমস্ত যোগ্যতা দিয়ে ফিক্হ সংকলন করেন।৩

ফিক্হশাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশঃ

ফিক্হশাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশকে পাঁচটি স্তর বা যুগে ভাগ করা যায়। ফিক্হশাস্ত্র এ স্তরগুলো অতিক্রম করে বিকাশ লাভ করেছে ও বিকশিত হয়েছে। জ্ঞানের প্রতিটি বিষয়কে ফিক্হর আওতাভুক্ত করেছে। যুগে যুগে এ শাস্ত্রের অনেক উথ্থান্ পতন ঘটেছে। কখনো ক্রমোন্নতি হয়েছে আবার কখনো বাধাগ্রস্থ হয়েছে। তার পরও ফিক্হশাস্ত্র তার মজবুত ভিত্তি ও বলিষ্ঠ কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে যুগের চ্যালেঞ্জ ও প্রয়োজনের মোকাবিলা করে যাচ্ছে।

১. আব্দুল্লাহ, মোঃ, মুফতী, 'মাযহাব মানব কেন', সাভার, বাতিল প্রবিরোধ লাইব্রেরী, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ১২৭।

২. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ ৭২।

৩. আব্দুল্লাহ, মোঃ, প্রাগুক্ত, পৃ ১২৭।

প্রথম যুগঃ এ যুগ রাসূলূল্লাহ সা.-এর নবুওয়্যত প্রাপ্তির পর থেকে ইন্তিকাল পর্যন্ত বিস্তৃত। এ যুগে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়। এ যুগে মানব জীবনের মৌলশক্তি ও গুনাবলী বিকশিত হয়েছে। এ যুগে আইন প্রণয়ন, বিচার মীমাংসা ইত্যাদি যাবতীয় কাজ রাসূলুল্লাহ সা. সম্পাদনা করতেন। তখন অন্য কেউ আইন প্রণয়নের অধিকার রাখতনা। তাঁর প্রদত্ত বিধানসমূহ অবশ্যই অনুসরণ যোগ্য। রাসূলুল্লাহর সমস্ত কথা, কর্ম অহীর ভিত্তিতে পরিচালিত হত। 'সে

মনগড়া কথা বলেনা, এটা তো অহী-যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।'১ তবে তখনকার জীবন যাত্রার প্রয়োজন সীমিত হবার কারণে এগুলো সংকলিত হতনা। এযুগে ফিক্‌হর উৎস ছিল দুটি: ক, পবিত্র কুরআন, খ. রাসূলুল্লাহ সা.-এস হাদীস। সময়ের প্রেক্ষিতে পবিত্র কুরআনে বিধান নাযি ল হয়েছে। এমনকি বিপদ প্রতিরোধের বিধানও নাযিল হয়েছে। প্রয়োজনের তাগিদে এবং বিভ্রান্তি এড়াতে রাসূলুল্লাহ সা. কুরআনে বর্ণিত শিক্ষার ব্যাখ্যা দিয়েছেন, কখনো স্থান-কাল নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এ যুড়ে খুব বেশী জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন হয়নি, বরং রাসূলুল্লাহ'র সান্নিধ্য এতই প্রভাবশালী ছিল যে, তাঁর অনুকরণে সমাজ জীবনের কাঠামো বদলে যেত। রাসূলুল্লাহ দুনিয়া হতে ঠিক তখনি বিদায় নিলেন যখন ইসলামের বুনিয়াদ পূর্ণতা পেয়েছিল। তিনি ইসলামী আইন সংকলনের ভবিষ্যত প্রয়োজন মিঠাবার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ কাঠামো তৈরী করেন এবং প্রবর্তনের মাধ্যমে পরবর্তীদের জন্য কার্যকর পথ আবিষ্কার করে যান। পরে এটাই ইসলামী ফিক্‌হ রচনা মৌলিক কাঠামো হিসেবে গণ্য করা হয়। মহানবী সা. বিধান প্রবর্তনে প্রত্যক্ষ অহীর অপেক্ষা করতেন, প্রত্যক্ষ অহী না আসলে পরোক্ষ অহীর মাধ্যমে (হাদীস) সমাধান দিতেন। এ যুগের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। রাসূলুল্লাহ সা. কর্তৃক প্রবর্তিত বিধানসমূহ খোদায়ী বিধানের অর্ন্তভুক্ত। কারণ, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সা. কে ভুল সিদ্ধান্তের উপর অবস্থান করার সুযোগ দেননি। সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহর বাচনিক ও কর্মমূলক ব্যাখ্যাসমূহ নিজেদের জীবনে সংযোজিত করতেন, আত্মশুদ্ধিমূলক হিদায়াতসমূহ মনে প্রাণে গ্রহণ করতেন। তাঁরা নিজেদের জান-মাল কুরবানী দিয়ে নবীর মিশনকে এগিয়ে নিয়েছেন।[২]

দ্বিতীয় যুগঃ এ যুগ রাসূলুল্লাহ সা. এর ইন্তিকাল পরবর্তী যুগ। খুলাফা-ই রাশিদীন ও সাহাবাগণের যুগ। এ যুগ হিজরী ৪১ সন পর্যন্ত স্থায়ী। এ যুগ রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা উদ্ভবের যুগ। মুসলমানদের অসংখ্য বিজয়াভিযান ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক জীবনের মুখোমুখি হবার যুগ। নব উদ্ভত সমস্যাসমূহ সমাধানের যুগ। ইসলামী আইনের বিশ্লেষণের যুগ। কুরআন-হাদীসে অস্পষ্ট বিধানসমূহের সাহাবাগণের মূল্যবান অভিমত প্রকাশের যুগ। এ যুগে বিধান রচনায় আইনের উৎস সম্প্রসারিত হয়। ইজমা (মুজতাহিদগণের সম্মিলিত অভিমত) ও কিয়াস (মুজতাহিদের ব্যক্তিগত অভিমত) এর উদ্ভব হয়। এ যুগে ইজমাকে প্রতিষ্ঠিত রূপদান করা হয়। এ যুগে যোগ্যতাসম্পন্ন সাহাবাগণের একটি কমিটি গঠিত হয়। তাঁরা কোন সমস্যার সমাধান কুরআন, হাদীসে না পেলে কিয়াস করতেন এবং আইন প্রণয়নের লক্ষ্য সামনে রেখে সীদ্ধান্তে উপনীত হতেন। আল্লামা বগভী র. বলেন, বিবাদমান হযরত আবূ বকর রা.-নিকট উপস্থিত হলে তিনি আল্লাহর কিতাবে সমাধান খুঁজতেন এবং সে মোতাবিক সমাধান দিতেন। পবিত্র কুরআনে না পেলে সুন্নাহর মাধ্যমে সমাধান দিতেন। তা সম্ভব না হলে তিনি মুসলমানদের সামনে বের হতেন আর বলতেন, আমার সামনে এ সমস্যা উপস্থিত হয়েছে, এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ কি সমাধান দিয়েছেন তোমাদের কি জানা আছে? কেউ সে বিষয়ে অনুসন্ধান দিতে পারলে তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে আল্লাহর প্রশংসা করতেন। রাসূলুল্লাহর কোন নির্দেশ না পেলে শীর্ষস্থানীয় সাহাবা-ই কিরামকে একত্রিত করতেন এবং সম্মিলিত সিদ্ধান্তমতে ফয়সালা দিতেন। হযরত ওমর রা. ও অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। তাঁর শাসনামলে মিসর ইসলামের করতলগত হলে ইসলাম অনারব জাতিসমূহের নিকট পৌঁছে যায়। শাহ ওয়ালী উল্লাহ র.'রিসালা দর মাযহাব-ই ফারূক-ই আযম' গ্রন্থে লিখেন, হযরত ওমরের প্রেরিত প্রশাসনিক পত্রসমূহে লিখতেন, কুরআন-সুন্নাহর পর আহলুল 'ইলমগণের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত (ইজমা) মোতাবিক বিচার কাজ সম্পাদনা করবে। তাতে সমাধান না পেলে ইতিপূর্বেকার অধিকাংশ আহলূল 'ইলমগণের ইজতিহাদের আলোকে মীমাংশা করবে। তা জানা না থাকলে কিয়াস করবে। হযরত ওমর রা. নিজেও একজন প্রতিভাবান মুজতাহিদ ছিলেন। কারণেই চার মাযহাবের ইমামগণ তাঁর অনুসরণ করেছেন। সাহাবাগণ কোন বিষয়ে একমত হতে পারলে হত- উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে সাহাবাগণ একমত হয়েছেন।'এটা ইজমার মূল ভিত্তি, যা পরবর্তীতে ফিক্‌হর তৃতীয় উৎস হিসেবে গণ্য হয়েছে।৩ এ যুগে সমস্যাসমূহ নিয়ন্ত্রন করাই ছিল প্রধান দায়িত্ব। এ যুগে শুধু উপস্থিত সমস্যাসমূহের সমাধান দেয়া হত। কারণেই এ যুগের ফাতাওয়া সংখ্যা কম। এ যুগ পরবর্তীকালের জন্য অনেক সম্পদ রেখে গেছে। প্রবীন সাহাবাগণের ইজতিহাদের আলোকে বলা যায়, তাঁরা পবিত্র কুরআন-সুন্নাহর মর্মস্থল, প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য পর্যন্ত পৌঁছতে কঠোর সাধনা ও গবেষণা করেছেন। পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা গ্রহণে সাহাবাগণের মধ্যে দ্বিমত হয়েছে। ফলে তাঁদের ফাতাওয়ায় ভিন্নতা এসেছে। ইয়াতীমের মালে যাকাত ওয়াজিব হওয়া, তালাক ও ইদ্দতের মাসআলায় তাঁদের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে। কোন কোন সাহাবী রাসূলুল্লাহ সা.-এর সমুদয় হাদীস বিষয়ে অনবিহত থাকার কারণেও তাঁদের ফাতাওয়ায় দ্বিমত হয়েছে। এ যুগের মুসলিম জাহানের ফাতাওয়ার কেন্দ্রসমূহ ছিল: ক. মদীনা, খ. মক্কা, গ. কূফা, ঘ. বসরা, ঙ. সিরিয়া, চ. মিসর ও ছ. ইয়ামান।[৪]

১. আল-কুরআন, ৫৩:৩-৪।

২. ইসলামী আইন ও বিচার, বর্ষ ৫ম, সংখ্যা-২০; প্রাগুক্ত, পৃ ১৭-১৯ ; ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৪।

৩. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৫।

৪. নূর মোহাম্মদ আ'জমী র., মাওলানা, 'হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস,' ঢাকা, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯২, ৪র্থ সংস্করণ, পৃ ৪৮-৫০ ; ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৫-৭৬।

এ যুগের গভীর জ্ঞানসম্পন্ন সাহাবা ছিলেনঃ ১. হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রা.(১৩ হি./৬৩৪ খৃ.) , ২.হযরত ওমর রা.(মৃ-২৩ হি.), ৩.হযরত উসমান রা. (মৃ-৩৫ হি.), ৪. আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ রা. (মৃ-৩২ হি.), ৫. আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ওমর রা. (মৃ-৭৩ হি.), ৬.আবূ মূসা 'আশ'আরী রা.(মৃ-৫৪ হি.),৭.মু'আয ইব্‌ন জাবাল রা. (মৃ-১৮ হি.), ৮.উবাই ইব্‌ন কা'ব রা. (মৃ-২১ হি.), ৯.যায়িদ ইব্‌ন সাবিত রা. (মৃ-৪৮ হি.), প্রমূখ ।

তৃতীয় যুগঃ তৃতীয় যুগ হল বয়োকনিষ্ট সাহাবা ও তাবি‘ঈগণের যুগ। ফিক্হর ভিত্তি স্থাপনের যুগ। এ হযরত মুয়াবিয়া রা. এর শাসনামল(৪১ হি.) হতে শুরু হয়ে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর সূচনাকাল পর্যন্ত বিস্তৃত। ফিক্হর সংকলন, লিপিব্ধকরন,বিন্যাস ও গ্রন্থনা এ যুগে সম্পন্ন হয়। এ যুগে ইসলামের বিজয় ধারা চীন সীমান্ত হতে স্পেন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ফলে নব নব সমস্যার উদ্ভব হয়। খারিজী, শিয়াদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। উভয় দল নিজেদের মনগড়া মতবাদ প্রচারে লিপ্ত হয়। এ যুগে খলীফা ওমর ইব্ন ‘আব্দুল ‘আযীয র. (৭২০-২১ খৃ.) হাদীস সংরক্ষণের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ ক্ষেত্রে ইব্ন শিহাব যুহরী র. (মৃ-১২৪ হি.) অসামান্য অবদান রাখতে সক্ষম হন। এ যুগে ফকীহ ও আলিমগণ বিভিন্ন বিজিত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। তাঁদের শিক্ষাদানের ফলে তাবি‘ঈগণের একটি জামা‘আত সাহাবাগণের যোগ্য স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁদের অনেকেই ফাতাওয়া ও বিধান বর্ণনায় সাহাবগণের সমকক্ষ হয়ে ওঠেন। এ যুগে হাদীস বর্ণনা, হাদীস শ্রবণ ও শিক্ষাদান পাঠ্যক্রমের অর্ন্তভুক্ত হয়। তেরী হয় সাহাবাগণ নিজেদের জ্ঞাত সমস্ত হাদীস, নিজেদের পবিত্র জীবন ধারা,খুলাফা-ই রাশেদীনের আমলের মুসলিম মিল্লাতের ‘আকীদা-বিশ্বাস তাবি‘ঈগণের হাতে সমর্পণ করেন। এ যুগে শিক্ষিত ও প্রশিক্ষপ্রাপ্ত অনারবদের একটি বিরাট জামা‘আত । যোগ্যতার দিক দিয়ে তাঁরা আরবদের চেয়ে কোন অংশে কম ছিলেননা। তাঁরা ইসলামী সাম্রাজ্যের প্রতিটি শহর- বন্দরে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেন। এ যুগে হাদীস ও রায় নিয়ে মতবাদ হয়েছে। একদলের ফাতাওয়া ছিল প্রাপ্ত হাদীসের ভিত্তিতে। তবে তাঁদের ফাতাওয়ার পরিমান ছিল কম। তাঁদের কেন্দ্র ছিল মদীনা। হিযাযবাসী তাঁদের প্রতি অনুরক্ত ছিল। অপর দল ফাতাওয়া দিতে রায় ও কিয়াসের আশ্রয় নিয়েছেন। কোন বিষয়ে হাদীস না পাওয়া গেলে তাঁরা এমন করেছেন। তাঁদের প্রদত্ত ফাতাওয়ার পরিমান ছিল প্রচুর। তাঁদের কেন্দ্র ছিল কূফা। ইরাকীগণ ছিলেন তাঁদের প্রতি অনুরক্ত। এটা স্পষ্ট কথা যে, হিযাযীদের পক্ষে হাদীসের অনসন্ধান করা যতটা সহজ ছিল ইরাকীদের পক্ষে ততটা সহজ ছিলনা।এ ছাড়া উভয় দলের তামদ্দুনিক, সাংস্কৃতিক ও জীবন ধারায় বৈচিত্র ছিল। দুদলের দৃষ্টিভংগির মধ্যেও তফাৎ ছিল। কারণেই তাঁদের ফাতাওয়া ও মাসাইল বর্ণনায় মত পার্থক্য সৃষ্টি হয়। এযুগের মদীনার প্রসিদ্ধ ফকীহ মুফতীগণ হলেনঃ ১. উম্মুল মু’মিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা রা. (মৃ-৫৭ হি.), ২.‘আব্দুল্লাহ ইব্ন ওমর রা. (মৃ-৭৩ হি.), ৩.আবূ হুরায়রা রা. (মৃ-৫৭ হি.), ৪.সা‘ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব রা. (মৃ-৯৫ হি.), ৫. উরওয়া ইব্ন যুবাইর রা. (মৃ-৯৫ হি.), ৬.আবূ বকর ইব্ন ‘আব্দুর রহমান রা. (মৃ-৯৪ হি.), ৭. আলী ইব্ন হুসাইন রা. যয়নুল আবেদীন (মৃ-৯৪ হি.),৮. মুসলিম ইব্ন ‘আব্দুল্লাহ ইব্ন ওমর রা. (মৃ-১০৬ হি.), ৯. সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার রা. (মৃ-১০৭ হি.), ১০. কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর রা. (মৃ-১০৬ হি.), ১১. হযরত নাফে’ রা. (মৃ-১১৭ হি.), ১২. মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন শিহাব যুহরী র. (মৃ ১২৪ হি.), ১৩. ইয়াহইয়া ইব্ন সা‘ঈদ আল-আনসারী র. (মৃ-১৪৪ হি.), ১৪. আনাস ইব্ন মালিক রা. (মৃ-৯৩ হি.) প্রমুখ।

মক্কার প্রসিদ্ধ ফকীহ মুফতীগণঃ ১.‘আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস রা. (মৃ-৬৮ হি.), ২. মুজাহিদ ইব্ন যুবায়র রা. (মৃ-১০৭ হি.),৩. ইকরামা রা. (মৃ-১০৭ হি.), ৪.আতা ইব্ন আবী রাবাহ র. (মৃ-১১৪ হি.) প্রমুখ।

কূফার প্রসিদ্ধ ফকীহ মুফতীগণঃ ১.আলকামাহ ইব্ন কায়স নখয়ী র. (মৃ-১১৪ হি.), ২. উবায়দা ইব্ন আমর সালমানী র.(মৃ-৯২ হি.), ৩. আসওয়াদ ইব্ন ইয়াযিদ নখয়ী র. (মৃ-৯৫ হি.), ৪. ইবরাহীম ইব্ন ইয়াযিদ নখয়ী র.(মৃ-৯৫ হি.), ৫. সা‘ঈদ ইব্ন যুবায়র র.(মৃ-৯৫ হি.), ৬. আমর ইব্ন শুরাহবিল র.(মৃ-৬৪ হি.), ৭. আমীর শা‘বী র.(মৃ-১০৪ হি.), ৮. হাম্মাদ ইব্ন আবি সুলায়মান র.(মৃ-১২০ হি.) প্রমুখ।

বসরার প্রসিদ্ধ ফকীহ মুফতীগণঃ ১. আনাস ইব্ন মালিক আনসারী রা.,আবুল ‘আলিয়া ইব্ন মিহরান র.(মৃ-৯০ হি.), ৩. আবূ শা‘শা জাবির ইব্ন ইয়াযিদ র.(মৃ-৯৩ হি.), ৪. কাতাদাহ ইব্ন দা‘আমাহ র.(মৃ-১১৮ হি.), ৫. মুহাম্মদ ইব্ন সিরীন র.(মৃ-১৩১ হি.) প্রমুখ।

সিরিয়ার প্রসিদ্ধ ফকীহ মুফতীগণঃ আব্দুর রহমান ইব্ন গানাম র.(মৃ-৭৮ হি.),২. আবূ ইদরীস খাওলানী আশ‘আরী র.(মৃ-৮০ হি.),৩. মাকহূল ইব্ন আবূ মুসলিম র.(মৃ-১১৩ হি.), ৪.ওমর ইব্ন ‘আব্দুল ‘আযীয র.(মৃ-১০১ হি.) প্রমুখ।

মিসরের প্রসিদ্ধ ফকীহ মুফতীগণঃ ১.‘আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর ইবনুল ‘আস রা.(মৃ-৬৩ হি,), ২. আবূ খায়র মুরশিদ ইব্ন ‘আব্দুল্লাহ র.(মৃ-৯০ হি.), ৩.ইয়াযিদ ইব্ন ইব্ন আবূ হাবীব র.(মৃ-১২৮ হি.) প্রমুখ।

ইয়ামানের প্রসিদ্ধ ফকীহ মুফতীগণঃ তাউস ইব্ন কায়সান জুনদী র.(মৃ-১০৬ হি.), ওয়াহাব ইব্ন মুনাব্বিহ র. (মৃ-১১৪ হি.), ইয়াহইয়া ইব্ন আবূ কাসিম র.(মৃ-১২৯ হি.) প্রমুখ।

উপরোক্ত ফকীহগণ হাদীস ও ফিক্হর গুণে সমৃদ্ধ ছিলেন। তাঁরা নিজ নিজ শহরে সাধারণের আকর্ষণের কেন্দ্র বিন্দু ছিলেন। জনগণ ফকীহগণের কাছ থেকে ফাতাওয়া গ্রহণ করতেন। ফকীহগণ ছাড়া বিভিন্ন শহরে সরকারী কাযী নিযুক্ত ছিলেন। তাঁরা কুরআন ও হাদীস অনুপাতে বিচার করতেন। কুরআন হাদীসে কোন বিধান না পেলে ফকীহগণের নিকট হতে জেনে নিতেন। কখনো পত্র মাধ্যমে খলীফা নিকট হতে জানতেন। এ যুগে খারিজী ও শিয়াদের উৎপাদ বৃদ্ধি পায়, জাল হাদীর রচনার প্রবণতা মাথাচড়া দিয়ে ওঠে। ফলে মুহাদ্দিসগণ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের কাজ করতেন।[১]

চতুর্থ যুগঃ এ যুগের ভিত্তি স্থাপিত হয় তৃতীয় যুগের পর। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভ হতে চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত এ যুগ। এর স্থায়িত্ব আড়াইশ’ বছর। এটা আইন সংকলক ইজতিহাদকারী ইমামগণের যুগ। এ যুগে ইসলামী আইন সংকলন ও লিপিবদ্ধকরণ হয় স্বতস্ফূর্ত ভাবে। এ যুগে মুসলিম বিশ্বের খ্যাতিমান চার ইমামের মাযহাব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং

তাঁদের অনুসারীগণ দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েন। এ যুগে ফিক্‌হ জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বতন্ত্র রূপ লাভ করে। এ যুগে মুজতাহিদ ইমামগণের ইজতিহাদ, গবেষণা নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা ও সমালোচনা হয়েছে।এটা ফিক্‌হ প্রণয়নের স্বর্ণ যুগ। ফিক্‌হর পরিপক্কতা অর্জনের যুগ। ফিক্‌হ সমৃদ্ধশালী হবার যুগ।এ যুগে সাহাবা, তাবি'ঈ ও তাবে'তাবি'ঈগণের ফাতাওয়াসমূহ এবং রাসূলুল্লাহ সা.-হাদীসসমূহ সংকলিত হয়। ই যুগে হাদীসের ছয়টি বিশুদ্ধ কিতাবসহ হাদীসের অসংখ্য কিতাব সংকলিত হয়। হাদীসের সাথে সাহাবা ও তাবি'ঈগণের বক্তব্যও যুক্ত করার নীতি প্রচলিত হয়। এ যুগে মুহাদ্দিসগণ হাদীস বর্ণনাকারীদের ব্যক্তিগত, নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলী, স্মরণশক্তি ধারনশক্তি ইত্যাদির অনুসন্ধান,পর্যালোচনাকে নিজেদের অভিষ্ঠ লক্ষে পরিণত করেন। এ যুগে ফিক্‌হর মূলনীতিসমূহ রচিত হয়। ভবিষ্যতে সংঘটিত হতে পারে এমন ধারণার উপরও বিধান রচিত হয়। এ ক্ষেত্রে ইরাকের ফকীহগণ ছিলেন অগ্রগামী। এ যুগের সমূদয় রচনাবলী সংরক্ষিত আছে।[২]

এ যুগে ফিক্‌হী মতবাদে বিরাট মতপার্থক্য সৃষ্টি হয় নিম্নোক্ত কারণেঃ

১.হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা যাচাইয়ে মতবিরোধ। প্রত্যেক ফকীহ নিজ মানদন্ড অনুযায়ী হাদীস যাচাইয়ের নীতি নির্ধারণ করেন।

২.কিয়াস ও ইসতিহসানকে ফিক্‌হর উৎস গণ্য করতে মতবিরেধ। মুহাদ্দিসগণ ছিলেন কিয়াস ব্যবহারের বিপক্ষে। ইমাম শাফি'ঈ র. ছিলেন ইসতিহসানের বিপক্ষে। ইমাম দাউদ জাহেরীর অনুসারীগণ ছিলেন কিয়াসের বিপক্ষে এবং শব্দের প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণের পক্ষে।

৩. ইমামগণের মধ্যে ইজমার শর্তসমূহের বিষয়ে দ্বিমত।

৪. ফিক্‌হী কোন বিধানের কি মর্যাদা এবং কোন দলীল দ্বারা তা সাব্যস্ত হয়েছে এ নিয়ে মতবিরোধ।

চতুর্থ যুগের ফকীহগণ ফিক্‌হর মূলনীতি বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। তদ্বারা পরবর্তী ফকীহগণ পথনির্দেশ লাভ করেছেন। এ যুগে বিধানসমূহের শ্রেণীবিন্যাস হয়েছে। যেমন-ফরয, ওয়াযিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব মুবাহ ইত্যাদি নির্ধারণ করা হয়েছে। কারণেই ইমামগণের অভিমতে দ্বিমত রয়েছে।

এ যুগের বিখ্যাত ফকীহগণ হলেনঃ ১. ইমাম আবূ হানীফা র. (৮০-১৫০ হি.), ২. সুফিয়ান সাওরী র., ৩. শাকীক ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ নখঈ র., ৪.মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আব্দুর রহমান র., ৫.ইমাম আবূ ইউসুফ র. (১১৩-১৮২ হি.), ৬. ইমাম মুহাম্মদ র. (১৩১-১৮৯ হি.), ৭. ইমাম যুফার র. (১১০-১৫৮ হি.), ৮. হাসান ইব্‌ন যিয়াদ কূফী র., ৯. ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস র. (৯৩-১৭৯ হি.), ১০. ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম শাফি'ঈ র. (১৫০-২০৪ হি.), ১১. ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল র. (১৬৪-২৪১ হি.) প্রমুখ।[৩]

পঞ্চম যুগঃ এ যুগ ফিকাহশাস্ত্রের তাকলীদ তথা অনুসরণ অনুকরণের যুগ। ইজতিহাদ, গবেষণা নতুন অভিমত (মাযহাব) সৃষ্টির রুদ্ধ যুগ।

ফিক্‌হশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ চার ইমামের জীবনীঃ

ইমাম আবূ হানীফা র. ইমাম আবূ হানীফা র. (৮০/৬৯৯-১৫০/৭৬৭) এর প্রকৃত নাম নু'মান। পিতার নাম সাবিত। কুনিয়্যাত আবূ হানীফা। উপাধী ইমাম 'আযম। উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালিকের রাজত্যকালে (৬৮৫-৭০৫ খৃ.) তাঁর জন্ম। আব্বাসীয় খিলাফতের প্রারম্ভে তাঁর ইন্তিকাল। বাগদাদে তাঁর মাজার। তাঁর মাজার এখনো একটি প্রসিদ্ধ স্থান। মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে সবার আগে তাঁর নাম। ইমার আয-যাহাবী র. (মৃ-৮৫২/১৪৪৮), ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী র. (মৃ-৮৫২ হি.) ইবন হাজার মক্কী র. প্রমুখের মতে তিনি তাবি'ঈ। আল্লামা 'আলাউদ্দিন দুররুল মুখতার গ্রন্থের' ভূমিকায় লিখেন, বয়স হিসেবে তিনি প্রায় বিশজন সাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন। গুনিয়াতুল মুফতী 'গ্রন্থের বরাত দিয়ে তিনি আরো বলেন, 'ইমাম আবূহানীফা র.সাতজন সাহাবার নিকট হতে হাদীস শ্রবন করেছেন। এটা প্রমানিত সত্য'।[৪] তার পিতা সাবিত হযরত আলী রা.- এর একান্ত সাক্ষাতে ধন্য হয়েছেন।

১-২. ইসলামী আইনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ ২১-২৭। নূর মোঃ আজমী, হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫-৭৭; ফাতাওয়া ও মাসাইল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০-২৪; ইসলামী আইন ও বিচার', বর্ষ ৫ম, সংখ্যা-২০, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০-২৭।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

৪. আব্দুল কাইয়্যুম, হাক্কানী, 'ইমাম 'আযম আবূহানীফা র., দেওবন্দ, মাকতবাতুর রিয়াদ, তাবি, পৃ ৪৮; জামাল উদ্দীন, মুহাম্মদ, ড. ,রিজালশাস্ত্র ও জালহাদীসের ইতিবৃত্ত, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ ৪০৫; সিরাজুর ইসলাম, এম, এম, এ, 'ইমাম 'আযম আবূ হানীফা র.,' ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭, ৩য় সংস্করণ, পৃ২৭।

হযরত আলী রা. সাবিতের সন্তানদের জন্য দু'আ করেছেন। আবূ হাফ্‌স কাবীরের মতে মুসলিম জাহানের বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রায় সাড়ে চার হাজার মুহাদ্দিসের নিকট হতে হাদীস শ্রবন করেছেন। তাঁর নিকট হতেও বিপুল সংখ্যক রাবী হাদীস শ্রবন করেছেন। তাঁর শিষ্যদের সংখ্যা এত অধিক ছিলা যে, তাঁদের মধ্যে ৮৮০ জন যুগের শ্রেষ্ঠ ফকীহ কাযী ছিলেন। ইব্‌ন ইউসুফ আস-সালিহী বলেন, 'আবূ হানীফা হাদীসের বড় বড় হাফিজ ও ইমামগণের মধ্যে গণ্য'। হাদীসের প্রতি অতি মরোযোগী ও ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন না হলে ফিক্‌হর মাসআলা বের করতে পারতেননা। ইয়াহইয়া ইব্‌ন সা'ঈদ আল-কাত্তান র.

বলেন, আল্লাহর শপথ আবূ হানীফা বর্তমান উম্মতের মধ্যে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের হাদীস সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী।[১] তিনি আরো বলেন, 'আবূ হানীফা অত্যন্ত দ্বীনদার , বিশ্বস্ত, সত্যবাদী ও নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ছিলেন। কেউ তাঁকে মিথ্যা বর্ণনা অভিযোগে অভিযুক্ত করেনি। তিনি আল্লাহর দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। হাদীস বর্ণনায় পূর্ণ সত্যবাদী ছিলেন।২ আল-আইনীর দ্বিতীয় খন্ডে এসেছে, বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইয়াহইয়া ইব্‌ন মু'ঈন (মৃ-২৩৩/৮৪৮) ইমাম আবূ হানীফা সম্বন্ধে বার বার বলতেন, অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত, ভুলভ্রান্তিমুক্ত, হাদীসে কিউ তাঁকে দুর্বল, অগ্রহণযোগ্য বলেছেন বলে শুনিনি। তিনি আরো বলেন.

' ইমাম আবূ হানীফা র. খুবই নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি স্বীয় মুখস্ত ও সংরক্ষিত হাদীস বর্ণনা করতেন। যা তাঁর মুখস্ত নেই তা কখনো বর্ণনা করেননি।'৩ শায়খুল ইসলাম ইয়াযিদ ইব্‌ন হারূন বলেন, ইমাম আযম অত্যন্ত মুত্তাকী, পরিচ্ছন্ন গুণসম্পন্ন সাধক, 'আলিম, সত্যবাদী ও সমসাময়িক কালের হাদীসের সর্বাপেক্ষা বড় হাফিজ ছিলেন।৪ তিনি ছিলেন আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত তীক্ষ্ণ প্রতিভা, মেধা, প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত এবং অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী। সুন্দর ও আকর্ষণীয় চেহারা, উন্নত ললাটধারী, উত্তম পোষাকে ভূষিত, আতর সুগন্ধিতে অভ্যস্ত, উঁচুমানের দ্বীনদার, 'আলিম, 'আবিদ,পরহিজগার, সাধক, 'ইবাদতগুজার, রাতে সালাতে নিমগ্ন, দিনে রোজাদার, কুরআনে হাদীসে অভিজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য, পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি আসক্ত, দানশীল, মহৎপ্রাণ, অসীম সাহসী, সত্যবলায় নির্ভিক ও অটল এবং উন্নত ভাষা প্রয়োগের অধিকারী। সত্যের উপর অটল থেকে কারাগারে জীবন দিয়েছেন। তিনি ধনসম্পদ ও 'ইলম বিতরণে ছিলেন উদার। তারীখে বাগদাদ' গ্রন্থে বলখের ইমাম আইউবের উদ্ধৃতি এসেছে, 'প্রকৃত 'ইলম মহান আল্লাহর পক্ষ হতে মুহাম্মদ সা.- এর নিকট পৌঁছেছে, তারপর সাহাবাগণ তা লাভ করেছেন, সাহাবাগণের নিকট হতে তাবি'ঈগণ পেয়েছেন। আর তাবি'ঈগণ হতে তা কেন্দ্রীভূত হয়েছে ও পরিপূর্ণতা পেয়েছে ইমাম আবূ হানীফার মধ্যে।৫ ইমাম আযমই প্রথম মনীষী যিনি হাদীস সংকলনের নীতি এবং হাদীসসমূহকে বিভিন্ন অধ্যায়ে অনুচ্ছেদে বিন্যাস করেছেন। তাঁর সর্বাধিক কৃতিত্ব হল 'ইলমে ফিক্‌হর বুনিয়াদ স্থাপন করা, নীতিমালা গঠন করা এবং মাসাইলের উদ্ভাবনের পদ্ধতি আবিষ্কার করা। এ বিষয়ে তিনি মহানপথিকৃত। তাঁর পথ ধরে ইমাম মালিক, ইমাম শাফি'ঈ , ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র.সহ অসংখ্য মুজতাহিদ তাঁর মূলনীতিকে সমর্থন করেছেন। যুগের অগ্রবর্তিতা, ফিক্‌হর পরিপূর্ণতা এবং অনুসারীদের সংখ্যায় তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। 'ইলম ফিক্‌হকে সুসংঘবদ্ধ রূপদান তাঁর অমর কৃতিত্ব। তাঁর অসাধারণ প্রতিভা, প্রজ্ঞা ও কঠোর সাধনার শ্বাশত শরয়ী আইন পেয়ে মুসলিম দুনিয়া ধন্য। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কোটি কোটি মুসলমান তাঁর উদ্ভাবিত ফিক্‌হর ফলে সহজে ইসলামকে অনুসরণ করা যাচ্ছে। জ্ঞানসাধনা , ইজতিহাদ ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। এ কাজে তিনি লাভ করেছেন বিরাট সফলতা, আকাশচুম্বি খ্যাতি, বিশ্বময় শ্রদ্ধা ও সম্মান। তাঁর বিপরীত চিন্তাধারীগণও তাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখিয়েছেন এবং তাঁর প্রশংসায় পুস্তক রচনা করেছেন।৬

ফিক্‌হ সংকলনের জন্য ইমাম আবূ হানীফা র. চল্লিশজন ফকীহ মুজতাহিদের সমন্বয়ে একটি বোর্ড গঠন করেন। উক্ত বোর্ডে দীর্ঘালোচনা পর ফিক্‌হী মাসআলা লিপিবদ্ধ করতেন। তাঁদের ফিক্‌হ সংকলন ছিল ভুলের উর্ধ্বে। বিখ্যাত মুহাদ্দিস ওয়াকী ইবনুল জাররাহ বলেন,

কেমন করে ইমাম আবূ হানীফা র. ভুলের শিকার হবেন? তাঁর সাথে রয়েছেন ইমাম আবূ ইউসুফ, যুফার ও মুহাম্মদ- এর মত মুজতাহিদ ও কিয়াস বিশেষজ্ঞগণ। ইয়াহইয়া ইবন যায়িদা, হাফস ইব্‌ন গিয়াস, হাব্বান ও মিনদাল- এর ন্যায় হাফিজে হাদীস ও হাদীস বিশেষজ্ঞগণ। কাসিম ইব্‌ন মুঈন- এর মত আরবী ভাষা বিশেষজ্ঞ, দাউদ ইব্‌ন নাসীর আত-তায়ী এবং ফুযাইল ইব্‌ন আয়ায- এর মত 'আবিদ ও জাহিদগণ । যাঁর গবেষণার সংগী ছিলেন এমন মানের ব্যক্তিগণ তিনি কি করে ভুল করেন।৭

১.আব্দুর রহীম, হাদীস সংকলনের ইতিহাস,' ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,১৯৮৬, পৃ ৩৩৩ ; মাসিক মদীনা', বর্ষ ৪৮. সংখ্যা ৩, জুন ২০১২ , পৃ ৩৩ ।
২.জামাল উদ্দীন, মুহাম্মদ, ড. ,প্রাগুক্ত, পৃ ৪০৬।
৩-৪.আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ ৪০৬।
৫. সিরাজুল ইসলাম, এম, এম, এ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪০।
৬.মুয়াত্তা ইমাম মালিক,' রেজাউল করীম ইসলামাবাদী অনূ), ঢাকা, ইফা বা, ১৯৮৭, পৃ ৪ ।৭. সিরাজুল ইসলাম, এম , এম, এ, প্রাগুক্ত, পৃ নয়-দশ।

তাঁর গঠিত বোর্ড দীর্ঘ বাইশ বছর ফিক্‌হ সংকলনের কাজ আঞ্জাম দিয়েছে। ১৪৪ হিজরী পর্যন্ত তাঁরা তিরাশি হাজার মাসআলা প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে আটত্রিশ হাজার 'ইবাদত, পঁয়তাল্লিশ হাজার মু'আশারাত, মু'আমালাত, ও উক্তবাদ সম্মন্ধে। পরবর্তীতে এর পরিমান আরো বাড়তে থাকে। তাঁর বন্দি জীবনেও এ কাজ অব্যাহত ছিল। অবশেষে এর সংখ্যা পাঁচ লাখে পৌঁছে ১। এ সমূহ মাসআলার মধ্যে তৎকালীন দৃশ্যমান সমস্যাবলী ছাড়াও ভবিষ্যতে উদ্ভুত হতে পারে এ সমস্যার সমাধানও ছিল। উক্ত বোর্ড যে কোন মাসআলার বিষয়ে ইজতিহাদ , আলোচনা, পর্যালোচনা করার পর যে সমাধানে পৌঁছতেন তা লিপিবদ্ধ করতেন। প্রতিটি মাসআলা নিয়ে পরিষদে তিন দিন পর্যন্ত আলোচনা পর্যালোচনা হত। অবশেষে যে সমাধানে পৌঁছতেন তা ফিকহে হানাফীতে লিপিবদ্ধ হত।২ তাঁরা প্রতিটি মাসআলার গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করতেন। উক্ত পরিষদই সর্ব প্রথম আর্ন্তজাতিক আইন প্রণয়ন করেন।৩

ফিক্হ হানাফীর মূলনীতিঃ সুফিয়ান বলেন, আমি ইমাম আবূ হানীফাকে বলতে শুনেছি, আমি ফিক্হী বিষয়ে প্রথমে কিতাবুল্লাহ হতে বিধান গ্রহণ করি। কিতাবুল্লাহয় উক্ত বিষয়ে হুকুম না পেলে রাসূলের সুন্নাহ থেকে গ্রহণ করি। উক্ত দুটোতে না পেলে রাসূলের সাহাবাগণের মধ্যে যার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য মনে করি তা গ্রহণ করি। সাহাবাগণের বক্তব্যে কোন হুকুম না পাওয়া গেলে ইবরাহীম নখয়ী, শা'বী,ইব্‌ন সীরীন, হাসান, আতা সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব-এর ন্যায় শ্রেষ্ঠ তাবি'ঈগণের নিকট জিজ্ঞেস করি। তবে যেহেতু তাঁদের বক্তব্য ইজতিহাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, তদ্রূপ আমিও কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূলকে সামনে রেখে ইজতিহাদ করি যেমনটি তাঁরা করতেন।৪ ইমাম আবূ হানীফা মনে করতেন, মুজতাহিদের দায়িত্ব হল জন সাধারণের জন্য ফিক্হী মাসআলা বের করার রাস্তা উম্মুক্ত করা। মুজতাহিদকে অবশ্যই এমন সব বিষয়ে জ্ঞান থাকতে হবে যা এখনো সংঘটিত হয়নি তকে ভবিষ্যতে হতে পারে। তিনি ফিক্হর মূলনীতি এবং শাখা- প্রশাখার

বিন্যাস এবং ফিক্হী মাসাইল উদ্ভাবনে বিশাল কর্ম পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। শায়খুল আইম্মা কারদানী র. বলেন, ইমাম আবু হানীফার মাসআলার সংখ্যা ছয় লাখ।৫ তাঁর ফিক্হী কর্ম যেভাবে মুসলিম জাহানকে আলোকিত করেছে তা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। তার পরও তাঁর প্রতি সমালোচনা কম হয়নি। তাঁর সমালোচনা এ ভাবে বিধৃত হয়েছে,

'আবূ হানীফা সংঘটিত মাসাইল সর্ম্পকে সবচেয়ে বেশী অজ্ঞ ছিলেন এবং সংঘটিত হতে পারে এমন সর্ম্পকে বেশী জ্ঞানী ছিলেন।৬ তাঁর বিরুদ্ধে আরো দুটি অভিযোগ হল- ক.ইমাম আবূ হানীফা হাদীস সর্ম্পকে অজ্ঞ ছিলেন। খ.তিনি সহীহ ও বিশুদ্ধ হাদীসের উপর রায় ও কিয়াসকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

এ কথা চির সত্য যে, ইমাম আবূ হানীফার 'ইলম ,সম্মন ও সখ্যাতি ছিল শীর্ষে। তাই তাঁর বিরুদ্ধে এমন যঘন্য উক্তি। এসব অভিযোগ সম্বন্ধে মুহাক্কিক 'আলিমগণের বক্তব্য হল- এগুলো সত্যের অপলাপ মাত্র। তিনি মুজতাহিদ ইমামগণের শিরোমণি, তাঁর মাযহাবের অনুসারীদের সংখ্যা কোটি কোটি মুসলমান। তাঁর অনুসারী বিরোধী সকলে একথা স্বীকার করেন যে , তিনি অবিসংবাদিত ইমাম , মুজতাহিদ। মুজতাহিদের জন্য আবশ্যিক হল- শরয়ী বিধান সর্ম্পকিত সকল হাদীস জানা থাকা। অন্যথায় তিনি মুজতাহিদ হতে পারেনন। অন্যান্য ইমামগণ তাঁর উপর আস্তা স্থাপন করতেননা। বরং তাঁর শত শত ফিকহী মাসআলা বিশুদ্ধ হাদীসের উপর প্রতিষ্ঠিত। সায়্যিদ মুরতাযা যুবাইদী তাঁর হাজার হাজার মাসআলার উপর গবেষণা করে সহীহ হাদীসের বিপরীত মাত্র ১২৫ টি মাসআলা বের করতে সক্ষম হয়েছেন। এতে প্রতিয়মান হয় যে, তাঁর হাজার হাজার মাসআলা সহীহ হাদীসের উপর প্রতিষ্ঠিত। মিসরের বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাফিজ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ আস-সালিহানী 'আল-উকুদুল জিমান' গ্রন্থে ২৩ তম অধ্যায়ে লিখেন, 'ইমাম আবূ হানীফা যদিও হিফজে হাদীসে বিরাট কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন তথাপী তাঁর নিকট হতে খুব কম হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এর কারণ. তিনি হাদীস বর্ণনার পরিবর্তে হাদীস থেকে মাসআলা বের করতে সর্বদা মশগুল থাকতেন। হাদীস বর্ণনা করার মত অবসর তাঁর ছিলনা। যেমনটি হযরত আবূ বকর রা. ও হযরত ওমর রা.-এর জীবনে হয়েছে। খিলাফতের দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে তাঁরা হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারেননি। যারা ইমাম আযমের সান্নিধ্য পেয়েছেন তাদের ভুল ভেঙ্গেছে এবং তারা তার প্রশংসা করেছেন। ইমাম শাফি'ঈ র. বলেন, 'মুসলিম জাতি ফিক্হশাস্ত্রে ইমাম আবূ হানীফার সন্তান।৭ইমাম আবূ হানীফা র. নির্ভরযোগ্য সনদ ও রাবীদের বর্ণিত হাদীসের উপর রায় কিংবা কিয়াস কিংবা ইসতিহসানকে প্রাধান্য দেননি। মুয়াফ্ফাক আল-খাওয়ারিজমী স্বীয় সনদসূত্রে আল-'আলিম ওয়াল মুতায়াল্লিম' গ্রন্থে বলেন, ইমাম আবূ হানীফা র. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সা. যা বলেছেন তা আমাদের মাথার মুকুট। তাতে আমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী। আমরা সাক্ষ্য দেই যে, তিনি যা বলেছেন সে কথাই ঠিক। হাফিজ ইব্‌ন আব্দুল বার আল-ইনতিফা' গ্রন্থে লিখেন, ইমাম আবূ হানীফা র. বলেছেন, যে ব্যক্তি রাসূলের কথার বিরুদ্ধাচরণ করল তার উপর আল্লাহর লা'নত। তাঁরই বদৌলতে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ঈমানের মর্যাদা দান করেছেন।৮কিয়াস প্রসংগে ইমাম আবূ হানীফা র. বলেন, আমর একান্ত প্রয়োজনের সময় বাধ্য হয়ে কিয়াস করতাম। আমরা প্রথমে কোন বিষয়ের দলীল পবিত্র কুরআনে খুঁজতাম , তার পর সুন্নাতে রাসূলে , তার পর সাহাবাগণের ইজতিহাদী

। ১.প্রাগুক্ত, পৃ দশ।
২.ইসলামী শরীয়াহ ও সুন্নাহ,' সিরাজুল ইসলাম, এম, এম, এ, অনূ), ইফা, ১৯৮৯, পৃ ৪৬৭
৩.হামীদুল্লাহ মুহাম্মদ, তানবীনে কানূনে ইসলামী আওর ইমাম আবূ হানীফা,' করাচী, খন্ড ১ম, পৃ ২৮২।
৪.ইসলামী শরীয়াহ ও সুন্নাহ,' প্রাগুক্ত, পৃ৪৩১-৩২।
৫.নেছার উদ্দিন, ম, ই,আ,ড.,'ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন, প্রেক্ষিত বাংলাদেশ,' ঢাকা, ইফা,২০০৫ ; সিরাজুল ইসলাম, এম, এম, এ, প্রাগুক্ত, পৃ ৩১।
৬-৮. ইসলামীশরীয়াহ ও সুন্নাহ,' প্রাগুক্ত, পৃ ৪৩৫-৩৬ , ৪৪৪-৪৫।

ফয়সালার মধ্যে উক্ত বিষয়ের দলীল কোথাও না পেলে কিয়াস করতাম। ইমাম আবূ হানীফা র. কখনো ইজতিহাদী রায় ও কিয়াসকে সহীহ হাদীসের উপর প্রাধান্য দেননি।১ সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী র. বলেন, 'সিহাহ সিত্তা সংকলকগণের কেউ হানাফী ছিলেননা। তাঁরা নিজ নিজ ফিক্হ অনুসারে গ্রন্ধ সংকলন করেছেন। ফলে হানাফী ফিক্হ হাদীস থেকে দূরে এমন ধারণার উদ্রেক হয়েছে। মাদানী র. হানাফী ফিক্হকে সিহাহ সিত্তার আলোকে এমন ভাবে প্রমানের চেষ্টা করেছেন যে, মনে হয় হানাফী ফিক্হই হাদীসের অনুকূল ২। দ্বিতীয়ত ইরাক ছিল ফিতনা-ফাসাদের কেন্দ্র , জাল হাদীস উৎক্ষেপণ এবং রাসুলের হাদীস বিকৃত করার অপচেষ্টার কেন্দ্রভূমি। এ ভয়াবহ ফিৎনার কারনে ইরাকের ফকীহগণ হাদীস গ্রহণে কঠোরতা অবলম্বন করেন এবং হাদীস গ্রহণে নির্ভরযোগ্য ও সুপরিচিত হওয়ার শর্তারোপ করেন।৩আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মোবারক র. বলেন,'ইমাম আযম শুধুমাত্র ঐসব হাদীস গ্রহণ করতেন যেগুলো রাসূল সা. হতে নির্ভরযোগ্য ভাবে প্রমানিত হয়েছে। তিনি

নাসিখ মানসুখ সর্ম্পকে পারদর্শী ছিলেন। তিনি নির্ভরযোগ্য হাদীস খুঁজতেন। তিনি বলতেন, রাসূলের হাদীস সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ করা হবে। কোন মাসআলায় সাহাবাগণের মতভেদ থাকলে একটি মত গ্রহণ করা হবে। তাঁদের মতের বাইরে যাবনা। তাবি'ঈগণ ইজতিহাদ করে থাকলে আমরাও ইজতিহাদ করব। তিনি এও বলতেন, আমার অভিমত রাসূল কিংবা সাহাবাগণের অভিমতের পরিপন্থি হলে তা পরিত্যাগ কর। বিশুদ্ধ হাদীসই আমার মাযহাব।৪ 'আল-মুগনী' কিতাবে এসেছে, প্রখ্যাত মুহাদ্দিস কিরমানী শাফি'ঈ বলেন, ফিকহে হানাফীতে যদি মহান আল্লাহর গোপন রহস্য না থাকত তাহলে ইসলামের অর্ধেক জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই বিপুল সমাবেশ হতনা, এত বিপুল সংখ্যক লোক তাঁর অনুসরণ করতনা। এমনকি আব্দুল্লাহ ইব্ন মোবারকও তাঁর ফিক্হ গ্রহণ করতেননা। সাড়ে চারশ' বছর ধরে তাঁর ফিক্হ ও রায়ের উপর যেভাবে গণমানুষ আমল করে আসছে এটা তার বিশুদ্ধতার প্রমান।৫

মূলত ইমাম আযম র. 'ইলমে ফিক্হ লিপিবদ্ধ করে সারা দুনিয়ায় সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। ইমাম আযম উপাধীতে ভূষিত হয়েছেন। হাজার বছর ধরে তাঁর ফিক্হ গণমানুষের সার্বিক চাহিদা পূরণ করছে। মানুষের ঈমান, আকীদা, আমল , আখলাক, কাজ-কারবার , ব্যাবসা-বাণিজ্য ,আইন-আদালতসহ জীবনের সকর ক্ষেত্রে অনন্য সেবা দিয়ে আসছে।৬

হানাফী ফকীহগণঃ

হানাফী ফিক্হর বুনিয়াদ রচিত হয়েছে ইমাম আযমের সুযোগ্য ছাত্র শিষ্যবৃন্দের সম্মিলিত প্রচেষ্টা দ্বারা। এর বুনিয়াদকে সুদৃঢ় রূপদান করেছেন যারা তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেনঃ

ইমাম আবূ ইউসুফ র. ঃ নাম আবূ ইউসুফ ইয়াকুব ইব্ন ইবরাহীম আল-আনসারী। (১১৩/৭৩১-১৮২/৭৯৮) তিনি ইব্ন আবূ লায়লার নিকট হতে 'ইলম ফিক্হ শিক্ষা করেন এবং কিছুদিন তার সান্নিধ্যে কাটান। অতঃপর ইমাম আবূ হানীফার মজলিসে উপস্থিত হয়ে তাঁর ছাত্র ও শিষ্যে পরিণত হন। হানাফী মাযহাবের উপর তিনি বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'কিতাবুল খারাজ' একটি অমর গ্রন্থ। তিনি ছিলেন খলীফা হারুনুর রশীদের রাজত্বকালের (৭৮৬-৮০৯ খৃ.) প্রধান বিচারপতি। তাঁর ইজতিহাদ নীতি ছিল কুরআন সুন্নাহ বিধান বের করা। উক্ত দুটোতে না পেলে সাহাবাগণের ইজমার মধ্যে সমাধান খুঁজতেন। তাতে না পেলে ইজতিহাদ , অভিজ্ঞতা , মনস্তাত্বিক প্রজ্ঞার মাধ্যমে সমাধান বের করতেন। তাঁর বিচারিক অভিজ্ঞতা তাকে ইজতিহাদে ব্যাপক সহায়তা করেছে।৭

ইমাম মুহাম্মদ র. ঃ পূর্ণ নাম মুহাম্মদ ইব্ন হাসান আশ-শায়বানী। (১৩১/৭৪৮-১৮৯/৮০৪) ইমাম আবূ হানীফার মজলিসে উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট 'ইলম অর্জন করেন। পরবর্তীতে ইমাম আবূ ইউসুফের নিকট 'ইলম অর্জন করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে আল-জামিউস সাগীর' , 'আল-জামিউল কাবীর', আস-সিয়ারুল কাবীর', আস-সিয়ারুস সাগীর', 'নাওয়াদির' ইত্যাতি তাঁকে অমরত্ব দান করেছে।৮

প্রাথমিক যুগের অন্যান্য হানাফী ফকীহগণঃ ১.হাসান ইব্ন যিয়াদ লুলুই (মৃ ২০৪ হি.) , ২.ঈসা ইব্ন আবান (মৃ ২২১ হি.) , ৩.হিলাল ইব্ন ইয়াহইয়া ইব্ন মুসলিম (মৃ ২৪৫ হি.) , ৪. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন সামা'আ আল-মীমী (মৃ ২৩৩ হি.), ৫. আহমদ ইব্ন ওমর আল-খাসসাফ (মৃ ২৬১ হি.), ৬. ইমাম তাহাবী র. (১২৯/৮৫৩-৩২১/৯৩৩) প্রমুখ।৯

হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভ হতে আব্বাসীয় খিলাফতের অবসান পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য হানাফী ফকীহগণঃ

১.আবুল হাসান উবায়দুল্লাহ ইব্ন হাসান আল-কারখী র.(মৃ ৩৪০ হি.), ২.আবূ বকর আল-যাস্সাস (মৃ ৩৭০), ৩.আবুল লায়স নাসর ইব্ন মুহাম্মদ আল-সামারকান্দী র. (মৃ ৩৭০ হি.), ৪. ইউসুফ ইব্ন মুহাম্মদ আল-যুরকানী র. (মৃ ৩৮৯ হি.), ৫.আবুল হাসান আল-কুদূরী র. (মৃ ৪২৮ হি.),৬. শামসুল আইম্মা মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ আস্সুরাখসী র. (মৃ ৫৯০ হি.)

১.প্রাগুক্ত, পৃ ৪৫৬।

২. শায়খুল ইসলাম মাদানী কা তরীকে দরস,' মাসিক আল-ইরশাদ, পেশোয়ার, ১৯৭৮,পৃ ১৮।

৩.ইসলামী আইনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস,' প্রাগুক্ত, পৃ ৬৪।

৪-৫.সিরাজুল ইসলাম, এম, এম, এ, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩ ,দশ।

৬.মাসিক মদীনা', প্রাগুক্ত, পৃ ৩২।

৭-৮. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৮-৭৯।

৯.প্রাগুক্ত,পৃ ৮০ ।

৭. আলী ইব্ন মুহাম্মদ আল-বাযদবী র. (মৃ ৪৮২ হি.), ৮. আবূ বকর ইব্ন মাসউদ ইব্ন আহমদ আল কাসানী (মৃ ৫৮৭ হি.), ৯. ফখরুদ্দীন হাসান ইব্ন মানসূর র. (মৃ ৫৯২ হি.), ১০. আলী ইব্ন আবূ বকর আল-ফারগানী আল-মুরগীনানী র. (মৃ ৫৯৩ হি.)। তাঁর রচিত হিদায়া তাঁকে অমরত্ব দান করেছে। এসকল ফকীহ হানাফী মাযহাবের বৃিধানসমূহের অধিকতর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তাঁরা নির্দিষ্টি সীমানা ও পরিবেশে থেকে ইজতিহাদ করেছেন।১

ইমাম মালিক র.ঃ পূর্ণ নাম মালিক ইব্ন আনাস ইব্ন মালিক ইব্ন আবূ আমির। কুনিয়্যাত আবূ আব্দুল্লাহ। মৃত্যুকারে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। মদীনার জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়েছে। তিনি ছিলেন মদীনার খ্যাতিমান 'আলিম, হাদীস ও ফিক্হর ইমাম এবং মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি নাফে' , মাওলা ইব্ন ওমর, মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির র. ,আবূ যুবাইর র. , আয-যুহরী, 'আব্দুল্লাহ দীনার র. প্রমুখ মদীনার বড় বড় মুহাদ্দিসগণের নিকট হতে হাদীস শ্রবণ করেছেন। ফিক্হশাস্ত্র শায়খ রবী'আতুর রায়সহ অন্যান্য উস্তাদগণের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। ফিক্হশাস্ত্রে তিনি হিযাযের ইমাম বলে

খ্যাত। তিনি হাদীস শাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য ইমাম ছিলেন। তাঁর নিকট হতে অসংখ্য মুহাদ্দিস হাদীস শ্রবণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন-১. আব্দুল্লাহ ইব্ন মোবারক (মৃ ১৮১হি.), ইয়াহইয়া আল-কাত্তান ,৩. ইবনুল মাহদী , ৪. ইব্ন ওয়াহাব , ৫. ইবনুল কাসিম , ৬. ইব্ন ইউসুফ, ৭. সা'ঈদ ইব্ন মানসূর প্রমূখ। ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম মুহাম্মদ তাঁর ছাত্র। ইমাম মালিক সুক্ষ্মভাবে চিন্তা ভাবনা করে হাদীসের উস্তাদ নির্বাচন করতেন। তাঁদের দ্বীনদারী, স্মৃতিশক্তি, হাদীস বর্ণনার যোগ্যতা ও শর্তাবলী বিবেচনা করে তাদের পছন্দ করতেন।২

ইমাম মালিক মাসআলা ইজতিহাদে মদীনা বাসীর আমলকে প্রাধান্য দিতেন। মদীনা বাসীর আমল ও খবরে ওয়াহিদের মধ্যে বিরোধ বাঁধলে তিনি মদীনা বাসীর আমলকে প্রাধান্য দিতেন। তাঁর বিশ্বাসমতে মদীনা বাসীর আমল পূর্বপুরুষদের নিকট হতে প্রাপ্ত। আর তারা তা সাহাবাগণ হতে সংগ্রহ করেছিলেন। তাই তিনি খবরে ওয়াহিদের উপর তাদের আমলকে প্রাধান্য দিতেন। ইমাম মালিক সুন্নাহর পর কিয়াসের আশ্রয় নিতেন

মালিকী মাযহাবের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল আল-মুয়াত্তা। ফিকহী গ্রন্থের রীতি অনুযায়ী এর পরিচ্ছেদসমূহ সাজানো। অতঃপর হাদীস সাহাবাগণের আসার উক্ত পরিচ্ছিদে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম শাফি'ঈ র. এর মতে আল্লাহর কিতাবের পর সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ গ্রন্থ মুয়াত্তা। এ মাযহাবের মৌলিক ও প্রধান মাসআলাসমূহ 'আল-মুদাওয়ানাহ.' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এ গ্রন্থে মাসআলা সংখ্যা ছত্রিশ হাজার। এ ছাড়া 'আল-মুখতাসারুল কাবীর' মালিকী মাযহাবের একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। এর রচয়িতা আব্দুল্লাহ ইব্ন আবুল হাকাম আল-মিসরী। অপর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-মুসতাখরাজ' অপর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। এর রচয়িতা মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ আল-কুরতুবী। এ ছাড়া মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ রচিত 'আল-জামী' , মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম রচিত

ফিক্হ শিক্ষার গুরুত্বঃ ব্যক্তির যাবতীয় অধিকার ও কর্তব্যসমূহ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ করাকে ফিক্হ বলে। এ অর্থে 'আলিম গায়রে 'আলিম প্রত্যেকের উপর ফিক্হর এতটুকু জ্ঞানার্জন করা ফরয যতটুকু ব্যতীত মুসলমানের দ্বীনি জিন্দেগী, ইবাদত ও 'আমল সম্ভব নয়। তবে এতটুকু পরিমান ফিক্হ জানলে তাকে ফকীহ বলা যাবেনা। ফিক্হ শিক্ষার গুরুত্ব প্রসংগে পবিত্র কুরআনে এসেছে, 'তাদের প্রতিটি দল থেকে কিছু লোক কেন বের হয়না, যাতে তারা দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। এবং সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসে। যাতে তারা সতর্ক হয়।[২]

১.ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ ৮০।
২. জামাল উদ্দিন, মুহাম্মদ, ড. , প্রাগুক্ত, পৃ ৪১১।
৩.ইসলামী আইনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস,' প্রাগুক্ত, পৃ ৭৪।

১.আব্দুর রহীম,মাওলানা, 'হাদীস সংকলনের ইতিহাস', প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩৩ ; মাসিক মদীনা', বর্ষ ৪৮,সংখ্যা ৩, জুন,২০১২, পৃ ৩০।

দ্বিতীয় অধ্যায় :
মাযহাবসমূহের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

প্রস্তাবনাঃ মাযহাব ( ) , ইজতিহাদ ( ) ও তাকলীদ ( ) শব্দগুলো মুসলিম সমাজে ব্যাপক ভাবে পরিচিত। মুষ্টিমেয় কিছু জনসংখ্যা ছাড়া সবাই এসবের অধীন রয়েছি। আমাদের পূর্বসূরী মুজতাহিদ ইমামগণ যেসব মাযহাব তথা অভিমত সৃষ্টি করেছেন মুসলিম দুনিয়া সেগুলো দ্বারা অনুসৃত হচ্ছে। এর বাইরে থাকার মত সুযোগ নেই। সহীহ দ্বীনের উপর চলতে মাযহাব অনুসরণের বিকল্প নেই। তবে ইসলামের পূর্ণঙ্গতা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বদৌলতে উদ্ভাবিত নতুন নতুন সমস্যাসমূহের সমাধান কল্পে যোগ্য মনীষীগণের জন্য ইজতিহাদের রাস্তা উম্মুক্ত রাখা হয়েছে।

মাযহাবঃ মাযহাব ( ) আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ মত, মতবাদ, শিক্ষা, চলার পথ, ধর্মমত, অনুসৃত পথ, রাস্তা বিশ্বাস, ইত্যাদি।[১] পরিভাষায় শরী'আতের বিভিন্ন আইন-কানূন, আমল, লেন-দেন, পারস্পরিক মেলামেশা, ইবাদত সম্পর্কিত মৌলিক বিষয় সমূহ অভিন্ন রেখে এগুলোর ব্যবহারিক দিক এবং শাখা-প্রশাখায় যোগ্যতাসম্পন্ন মুজতাহিদ

'আলিমগণের যে ভিন্ন ভিন্ন মতামত গড়ে ওঠেছে তাকে মাযহাব বলে। এভাবেও বলা যায়, মাযহাব হল ইসলামী শরী'আতের বিষয়ে দলীল-প্রমানের ভিত্তিতে মুজতাহিদ কর্তৃক সুষম ব্যাখ্যা।[২] এভাবেও বলা যায়, কুরআন-সুন্নাহ থেকে বিধান উদ্ভাবনে মতভেদ থেকে সৃষ্ট মুসলমানদের মধ্যে বিভক্ত চিন্তার গোষ্ঠীসমূহকে বুঝাতে মাযহাব শব্দটি ব্যবহৃত হয়।৩

ইজতিহাদ ( )ঃ ইজতিহাদের শাব্দিক অর্থ অধ্যবসায়, প্রচেষ্টা, প্রয়াস, কঠোরশ্রম, উদ্দিষ্ট লক্ষ অর্জনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা, ইত্যাদি। পরিভাষায় ইজতিহাদ বলে, কুরআন- সুন্নাহর মধ্যে কোন বিষয়ে স্পষ্ট বিধান না পাওয়া গেলে উক্ত বিষয়ে সঠিক বিধান নির্ণয়ের জন্য মুজতাহিদ ফকীহ কর্তৃক তাঁর সর্ব শক্তি, যোগ্যতা ও সামর্থ নিয়োগ করা।' এভাবেও বলা যায়, কুরআন-হাদীসে যেসব বিধান প্রচ্ছন্ন রয়েছে সেগুলো চিন্তাগবেষণার মাধ্যমে আহরণ করা। যিনি একাজটি করেন তিনি মুজতাহিদ। এভাবেও বলা যায়, যিনি কুরআন-হাদীস বুঝে আমল করেন তিনি মুজতাহিদ আর মুজতাহিদ প্রদত্ত ব্যাখ্যার অনুসরনকে বলে মুকাল্লিদ।[৪]

রাসূলুল্লাহ সা.-এর জীবনকাল হতে এখন পর্যন্ত ইজতিহাদের অস্তিত্ব রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা. সব সমস্যার সমাধান অহীর মাধ্যমে দিয়েছেন। কোন বিষয়ে অহী না পেলে ইজতিহাদ করেছেন। আবূ দাউদ শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে,

'দুই ব্যক্তির মধ্যে বিবাধ মিমাংসার সময় তিনি বলেন, এ বিষয়ে আমার রায় প্রয়োগ করেই তোমাদের মীমাংসা করে দেব।'৫ রাসূলুল্লাহ সা.-এর জীবদ্দশায় সাহাবাগণের ইজতিহাদেও দ্বিমত হয়েছে। বনী কুরায়জার যুদ্ধ এর প্রমান। রাসূলুল্লাহ সা. বনী কুরায়জার উপর আক্রমণ উদ্দেশ্যে সৈন্যবাহিনী প্রেরণকালে তাদেরকে বনী কুরায়জার বস্তিতে পৌঁছে আসরের নামায আদায় করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে আসর নামাযের সময় হলে কেউ রাস্তায় নামায আদায় করলেন কেউ বনী কুরায়জায় পৌঁছে আদায় করলেন । অর্থাৎ তাঁদের ইজতিহাদে দ্বিমত হল। একদল সাহাবী হাদীসটির সরাসরি অর্থ গ্রহণ করলেন, অপর দল হাদীসের নিহিত তাৎপর্যের দিকে লক্ষ করলেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য দ্রুত বনীকুরায়জায় পৌঁছা , রাস্তায় নামায আদায় না করা উদ্দেশ্য নয়। তাই রাস্তায় নামায পড়ে নিলেন। ঘটনাটি শুনে রাসূলুল্লাহ সা. কাউকে দোষারোপ করেননি।[৬]

পবিত্র কুরআনে অসংখ্য স্থানে বান্দার জ্ঞানকে পরিশীলন করতে বলা হয়েছে । এ ছাড়া মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা. সর্বশেষ নবী। তাঁর দ্বীন কিয়ামত পর্যন্ত আব্যাত থাকবে। এ সুদীর্ঘ সময়ের যাবতীয় নতুন সমস্যা ও অবস্থার সমাধান দিতে হবে। তাই ইজতিহাদের ধারা অব্যাহত থাকবে। তিরমিযী ও আবূ দাউদ শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সা.হযরত মু'আয বিন জাবালকে ইয়ামানের গভর্ণর নিয়োগ করে পাঠাবার সময় ইজতিহাদের অনুমতি দিলেন এবং ইজতিহাদের যোগ্যাতা সম্পন্নদের প্রশংসা করলেন। অপর এক হাদীসে এসেছে, ( )
'রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, আল্লাহ তা'আলা প্রতি শতাব্দীতে উম্মতের জন্য এমন লোক পাঠাবেন যিনি দ্বীনকে নবায়িত করবেন।'[৭] এ হাদীস প্রমান করে যে, আল্লাহ তা'আলা প্রতি শতাব্দীতে উদ্ভূত সমস্যা সমূহ দূর করার জন্য মুজতাহিদ অথবা মুজাদ্দিদ প্রেরন করবেন। এ ভাবে ইসলাম নবায়িত হয়ে কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। সুতরাং ইজতিহাদ ইসলামের নিরবচ্ছিন্ন অংশ। কুরআন-হাদীস যেমন শরী'আতের মূল তেমনি এ দুটি উৎসের ভিত্তিতে কাল পরিক্রমায় উদ্ভাবিত ইজতিহাদ প্রসূত ইজমা ও কিয়াস শরয়ী বিধানের উৎস। পার্থক্য এতটুকু যে, কুরআন-সুন্নাহ তর্কাতীত উৎস, পক্ষান্তরে ইজতিহাদে তর্কের অবকাশ রয়েছে। তবে কুরআন-হাদীসের মূলনীতি ও আদর্শের আলোকে জীবনের প্রতিটি নতুন অবস্থা ও পরিস্থিতির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে ইজতিহাদ, ইসতিমবাতের আবশ্যকীয়তা রয়েছে।[৮]

১. আল-মুনজিদ,' দেওবন্দ, কুতুবখানা-ই মুস্তাফাফিয়্যাহ, ১৯৭৪, পৃ ৩৫৭।
~~২. আলী হায়দার, এ, আর, এম, ড., 'উচ্চ~~ মাধ্যমিক ইসলাম শিক্ষা,' ঢাকা, পাঞ্জেরী পাবলিকেশান্স লিঃ, ২০০৩, পৃ২১৮।
৩. ইসলামী আইন ও বিচার,' বর্ষ ৭ম, সংখ্যা২৫, প্রাগুক্ত,পৃ ১০৩-৪।
৪. আল-মুনজিদ,' প্রাগুক্ত, পৃ ৮৩১ ; ফজলুর রহমান, মুহাম্মদ, ড., ' আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান,' ঢাকা, রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৭, ৪র্থ সংস্করণ, পৃ ২৫৬ ; মোল্লা জিউন আহমদ, 'নূরুল আনওয়ার,' ঢাকা, এমদাদিয়া লাইব্রেরী,১৩৯৬ বাং, পৃ ৩৬৫।
৫. তোহা, ড., 'দিরাসাতুল ফিল ইখতিলাফাত আল-ফিকহিয়্যা,' বৈরূত, মাকতবাতুর রিসালাহ, ১৯৮৫,পৃ ৫৮ ; মাহমুদুল হাসান বুলন্দ শহরী, মুফতী, 'গায়রে মুকাল্লিদীন কা মাযহাব,' নতুন দিল্লী. ফরীদ বুক ডিপো লিঃ, তা বি, পৃ ৩।
৬. তোহা, ড., প্রাগুক্ত, পৃ ৫ ; মাহমুদুর হাসান বুরন্দ শহরী , মুফতী, প্রাগৃক্ত, পৃ ৩।
৭. মিশকাতুল মাসাবীহ', প্রাগুক্ত, পৃ ৩০।
৮. সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস', প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড ,পৃ ৮৪।

ইজতিহাদে মতানৈক্য এবং বিভিন্ন মাযহাব উৎপত্তির কারণঃ

১.পবিত্র কুরআন ও মহানবী সা.-এর হাদীসে একাধিক অর্থবোধক শব্দের ব্যবহারের কারণে

যেমন-পবিত্র কুরআনে এসেছে, ( ) 'তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তিন কুরুকাল প্রতীক্ষায় থাকবে।'১ ইমাম আবূ হানীফা র. কুরু শব্দ দ্বারা হায়িজ তথা মাসিক শ্রাব অর্থগ্রহণ করেছেন। অপর দিকে ইমাম শাফি'ঈ র. কুরু শব্দ দ্বারা তুহুর তথা পবিত্রতা অর্থগ্রহণ করেছেন। আরবদের নিকট দুটো অর্থই প্রচলিত আছে।

অপর উদাহরণঃ রাসূলুল্লাহ সা.-এর হাদীসে এসেছে- 'তোমরা গোঁফ ছাঁট এবং দাড়ি লম্বা কর।' হাদীসে দ্বারা কেউ অর্থগ্রহণ করেছেন বৃদ্ধি করা, কেউ অর্থগ্রহণ করেছেন হ্রাস করা। শব্দটি আরবী ভাষায় উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়।

২. শব্দের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অর্থগ্রহণে মত পার্থক্য

যেমন-পবিত্র কুরআনের বাণী ' 'অথবা তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করবে।'২ আয়াতে শব্দের অর্থ হাত দ্বারা স্পর্শ করা। হানাফী মাযহাব মতে এর পরোক্ষ অর্থ সহবাস করা। উপরোক্ত কারণে মুজতাহিদগণের মধ্যে পবিত্রতা সংক্রান্ত

মাসআলায় দ্বিমত সৃষ্টি হয়েছে। আরো দৃষ্টান্তঃ রাসূলুল্লাহ সা.-এর হাদীস- 'উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) তিলাওয়াত ব্যতীত নামায শুদ্ধ হয়না', । হাদীসে ব্যবহৃত নাসূচক শব্দটি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অর্থের সম্ভাবনা রাখে। শাফি'ঈ মাযহাবের ফকীহগণ প্রত্যক্ষ অর্থ গ্রহণ করে বলেছেন সূরা ফাতিহা পাঠ না করলে নামায শুদ্ধ হবেনা। হানাফী ফকীহগণ পরোক্ষ অর্থ গ্রহণ করে বলেছেন নামায পূর্ণ হবেনা।[৩]

৩. নাসখ তথা রহিতকরণ বিতর্কের কারণে

পবিত্র কুরআনের নাসিখ (রহিতকারী) ও মানসুখ (রহিত) আয়াত বিষয়ে ফকীহগণের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে। কেউ বলেছেন রহিত হতে পারেনা, কেউ বলেছেন পবিত্র কুরআন দ্বারা কুরআন রহিদত হতে পারে। কেউ বলেছেন বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারাও কুরআনের আয়াত রহিত হতে পারে। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে- 'তোমাদের মধ্যে কারো কৃত্যুকাল উপস্থিত হলে সে যদি ধনসম্পদ রেখে যায় তবে ন্যায়ানুগ প্রথা অনুযায়ী তার পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য অসিয়ত করার বিধান তোমাদেরকে দেয়া হল।,'৪ এ আয়াতকে নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা রহিত করা হয়েছে-

'আল্লাহ তোমাদের সন্তান সম্বদ্ধে নির্দেশ দিয়েছেন এক পুত্রের অংশ দুই কণ্যার সমান।'৫

রহিতকরণের অপর দৃষ্টান্ত ঃ একটি পশু দুটি পশুর বিনিময়ে বাকীতে বিক্রি করার বিষয়ে মতভেদ। ইমাম আবূ হানীফা র.-মতে এটি বেধ নয়। কারণ, হযরত সামুরা রা. বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. এধরনের বিক্রি নিষেধ করেছেন।৬ পক্ষান্তরে ইমাম শাফি'ঈ র. হযরত আবূ রাফি' রা. বর্ণিত হাদীস দ্বারা এধরনের বিক্রি জায়িয বলেছেন। শাফি'ঈনগণের বক্তব্য হল আবূ রাফি' বর্ণিত হাদীস সামূরা বর্ণিত হাদীসকে রহিত করেছে। হানাফীগণের বক্তব্য হল সামূরার হাদীস আবূ রাফি' বর্ণিত হাদীসকে রহিদ করেছে। মোটকথা ফকীহগণের নিকট হাদীসের জ্ঞান পৌঁছা ও না পৌঁছার কারণে ইজতিহাদে দ্বিমত হয়েছে।[৭]

৪.হাদীস সহীহ কিংবা দুর্বল সাব্যস্ত হয় সনদের ভিত্তিতে। উক্ত সনদ গ্রহণ বিষয়ে ফকীহগণের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে।

কোন মুজতাহিদের নিকট কোন বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য মনে হলে তার হাদীস গ্রহণ করেছেন। অপর মুজতাহিদের নিকট তিনি নির্ভরযোগ্য না হওয়ায় তার হাদীস গ্রহণ করেননি। ফলে উক্ত হাদীসের উপর আমল করা নিয়ে মুজতাহিদগণের মধ্যে দ্বিমত হয়েছে।[৮]

৫. হাদীসের শব্দের ভিন্নতার কারণে মুজতাহিদগণের মধ্যে দ্বিমত হয়েছে।

যেমন-রাসূলুল্লাহ সা.-হাদীস 'যে ব্যক্তি মসজিদে জানাযার নামায পড়বে তার জন্য কোন সওয়াব নেই'। অপর বর্ণনা হাদীসটি এভাবে এসেছে 'যে ব্যক্তি মসজিদে জানাযার নামায পড়বে তার কোন অপরাধ হবেনা'। প্রথম বর্ণনাকে শুদ্ধ মনে করে হানাফীগণ বলেন, মসজিদে জানাযা পড়া অপছন্দনীয়। দ্বিতীয় বর্ণনাকে শুদ্ধ মনে করে শাফি'গণ বলেন , মসজিদে জানাযা পড়া অপছন্দনীয় নয়।[৯]

৬. হাদীস বর্ণনাকারী হাদীসের বিপরীত আমল করার কারণে মুজতাহিদগণের মধ্যে দ্বিমত হয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা র. বর্ণনাকারীর বর্ণনার তুলনায় তার আমলের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তাঁর মতে বর্ণনাকারী বর্ণনার বিপরীত আমর করলে উক্ত বর্ণনা অকার্যকর হয়ে যায়। কারণেই হানাফী ফকীহ মুজতাহিদগণ রুকুতে ওঠানামার সময় দুহাদ উত্তোলন করা সমর্থন করেননি। কারণ, সংশ্লিষ্ট হাদীসের বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ওমর রা. নিজে এমন আমল

১. আল-কুরআন-২ঃ ২২৮।
২. আল-কুরআন- ৪ঃ ৪৩।
৩. হুসাইন, হামিদ , হাসান, আলমাদখান, 'আল-মারিফাতুল ইলাল ফিকহিল ইসলামী'. জর্দান, ২০০৭ ,পৃ ১৭৮।
৪. আল-কুরআন-২ ঃ ১৮০ ।
৫. আল-কুরআন- ৪ঃ ১১।
৬. সুয়ূতী , ইমাম, 'আল-জামিউস সাগীর', কায়রো, মাকতাবাতুল হাদীস, ১৯৭১, খন্ড ২য় , পৃ ১৯২।
৭-৯. ইসলামী আইন ও বিচার', ৭ম বর্ষ, সংখ্যা ২৫, প্রাগুক্ত, পৃ ১১৩, ১১৪, ১১৫ ।

করতেননা। পক্ষান্তরে জমহুর মুজতাহিদগণের মতে বর্ণনাকারী ব্যক্তিগত ইজতিহাদের ফলে স্বীয় বর্ণনার বিপরীত আমল করতে পারেন। তার আমল ধর্তব্য নয় বরং বর্ণনা ধর্তব্য।[১]

৭. প্রত্যেক মুজতাহিদের জ্ঞানের বৈচিত্র দৃষ্টিভংগির পার্থক্যের কারণে কুরআন, সুন্নাহর অর্থ, মর্ম উপলদ্ধিতেও মুজতাহিদগণের মত পার্থক্য হয়েছে। এমর্মে পবিত্র কুরআনে এসেছে 'প্রত্যেকের একটি ব্যক্তিগত অভিমত আছে যে দিকে সে মুখ ফেরায়'।[২] এতে বলা যায় প্রত্যেক ফকীহ মুজতাহিদের নিজস্ব দৃষ্টিভংগি থাকতে পারে।

৮. সাহাবাগণ প্রদত্ত ফাতাওয়াসমূহ গ্রহণে ইমামগণের মতানৈক্য

৯. এক বর্ণনার উপর অপর বর্ণনার প্রাধান্য দেয়ার মানদন্ডে ইমামগণের মতানৈক্য

১০. ধর্মীয় ও সামাজিক পরিবেশের পার্থক্যের ফিক্‌হ প্রণয়নে ইমামগণের মতবিরোধ

১১. কিয়াস গ্রহণ করার বিষয়ে ইমামগণের মতানৈক্য

১২. মুজতাহিদগণ সবাই সমান মেধা, প্রজ্ঞা ও যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেননা

১৩ আইনের ব্যাখ্যাদাতা অসংখ্য হবার কারণে

এসমুহ কারণে মুজতাহিদ ইমামগণের ফাতাওয়া , ঘটনা বর্ণনা এবং মামলার বিধানসমূহ বিভিন্ন অভিমত প্রকাশ পেয়েছে এবং বিভিন্ন মাযহাবের সৃষ্টি হয়েছে। তবে ফিক্হর উৎস ও বুনিয়াদ বিষয়ে তারা সকলে একমত ছিলেন আইনের শাখা-প্রশাখায় শুধু তাঁদের দ্বিমত রয়েছে।[৩] সাহাবা-ই কিরামের যুগ হতে ইজতিহাদী বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে , একই বিষয়ে তাঁদের মধ্যে মতানৈক্য হয়েছে। যেমন-সকল সাহাবার ফাতাওয়া ছিল ইয়াতীমের মালে যাকাত ওয়াযিব হবেনা। কিন্তু হযরত আলী রা. নিসাব পূর্ণ হলে ইয়াতীমের মাল থেকেও যাকাত আদায় করতেন। অনুরূপ তালাক ও ইদ্দতের মাসআলায় বড় বড় সাহাবাগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। বিধান উদ্ভাবনে মুজতাহিদগণের মতপার্থক্য ইসলামের জন্য ক্ষতিকর নয় বরং শরী'আতের অনুসরনকে সহজ করে দিয়েছে। কারণেই কুরআন সুন্নাহর আলোকে সত্যনিষ্টভাবে ইজতিহাদ করলে ভুল হলেও এক নেকী আর শুদ্ধ হলে দুনেকীর প্রতিশ্রুতি রয়েছে।[৪]

প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের বিকাশ

হানাফী মাযহাবঃ মুসলিম দুনিয়ায় প্রচলিত চারটি মাযহাবের মধ্যে হানাফী মাযহাব শ্রেষ্ঠ , সর্বাগ্রে প্রতিষ্ঠিত ও সর্বাধিক প্রচলিত। ইমাম আযম আবূ হানীফা র. (৮০-১৫০ হি.) এর প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর পূর্ণ নাম নু'মান বিন সাবিত। কুনিয়াত আবূ হানীফা। উপাধী ইমাম আযম। ৮০ হিজরীতে কুফায় জন্ম এবং ১৫০ হিজরীতে বাগদাদে ইন্তিকাল। বাগদাদে তাঁর মাযার অবস্থিত। ইব্ন হাজার আল-আসক্বালানী র. (মৃ ৮৫২ হি.) এবং ইব্ন হাজার আল-মক্কী র. প্রমুখের মতে তিনি তাবি'ঈ। তিনি সাত জন সাহাবীর নিকট হাদীস শ্রবণ করেছেন। তিনি মজতাহিদকুল শিরোমণি। তিনিই সর্ব প্রথম ফিক্হ সংকলন ও প্রণয়নের দ্বার উম্মুক্ত করেন। তিনি ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম যুফার, হাসান ইব্ন যিয়াদ, আব্দুল্লাহ ইব্ন মোবারক, ওয়াকী ইবনুল জাররাহ, হাফস ইব্স গিয়াস, আদী ইব্ন আমর, ইউসুফ ইব্ন খালিদ রাহিমাহুমুল্লাহ পমুখ চল্লিশ অথবা পঞ্চাশ অথবা সত্তর জন ফকীহ মুজতাহিদের একটি শক্তিশালী বোর্ড গঠন করে ফিক্হ সংকলন করেন। এ বোর্ড সমষ্টিগত ভাবে পারস্পরিক সংলাপ , আলোচনা ,যাচাই ,পরীক্ষা ও গবেষণার পর সমস্যার সমাধান বের করতেন। তাঁরা একটি মাসআলা নিয়ে তিন দিন পর্যন্ত আলোচনা, পর্যালোচনা ও গবেষণা করতেন। এ বোর্ড শেষ পর্যন্ত পাঁচ লাখ মাসআলার সমাধান বের করতে সক্ষম হয়েছিল বলে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এ মাযহাবে মানবিক শক্তি সামর্থের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং উপযোগী এমন মাসআলার সমাধান রয়েছে। খলীফা হারুনুর রশীদ (৭৮৬-৮০৯ খৃ.) ১৭০ হিজরীতে ইমাম আবূ ইউসুফকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করে ফিক্হ হানাফীকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বাস্তবায়ন করেন। ইমাম আবূ ইউসুফ ছাড়াও ইমাম আবূ হানীফার প্রায় পঞ্চাশ জন ছাত্র বিচারপতির (কাযী) পদ অলংকৃত করেছিলেন। এতে হানাফী ফিক্হ বিপুল জনসমর্থন লাভ করে। আল্লামা শিবলী নু'মানী বলেন, হানাফী ফিক্হ জনসমর্থন লাভের একটি কারণ হল এটা উন্নত তাহযীব তমদ্দুনের সাথে বেশী সংগতিশীল। পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশ মানুষ হানাফী মাযহাবের অনুসারী। বসরা, আফ্রিকা , স্পেন ,ইয়ামান , ইরাক ,সিরিয়া, প্রাচ্যের খুরাসান, সিজিস্তান, পূর্ব-পশ্চিমে তুর্কিস্তান , সিন্ধু ইত্যাদি দেশ , শহর, বন্দর , গ্রাম হানাফী ফিক্হর অনুসারী দ্বারা ভরপুর। বাংলাদোশ, ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান , মধ্য এশিয়া , মিসরসহ অধিকাংশ দেশের মুসলমানের মাযহাব হানাফী। হানাফী ফিক্হর ক্রমবিকাশের ইতিহাস অত্যন্ত দীর্ঘ। অনেক মুজতাহিদ ইমাম নিজের মাযহাব প্রতিষ্ঠা না করে হানাফী ফিক্হর অনুসরণ করেছেন। যেমন-ইমাম আবূ ইউসুফ,ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম যুফার র. প্রমুখ।[৫]

১. প্রাগুক্ত, পৃ ১১৫।
২. আল-কুরআন।
৩. আব্দুল্লাহ , মুহাম্মদ , মুফতী , প্রাগুক্ত , পৃ ১১০-১২; ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা', বর্ষ ৪৮, সংখ্যা ৩য় (জানু-মার্চ ২০০৯) , পৃ ১২৭।
৪. ফাতাওয়া ও মাসাইল', প্রাগুক্ত ,পৃ ৮৩-৮৬।
৫. আকলা, মুহাম্মদ, ড., 'দিরাসাতুন ফিল ফিকহিল মুকারিন', জর্দান, মাকতাবাতুর রিসালাহ.১৯৮৩ , পৃ ১১ ; ইসলামী বিশ্বকোষ , প্রাগুক্ত, পৃ ৮০ ; সীরাতুন্নোমান', দিল্লী , তা বি, খন্ড ২য় , পৃ ১৩১ ; 'ইসলামী শরী'আহ ও সুন্নাহ,' প্রাগুক্ত , পৃ ৪৬৩ ; হামীদুল্লাহ , মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত , পৃ ২৮২ ; সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, 'ফাতাওয়ায়ে রাহমানিয়া,' ঢাকা, মাকতাবাতুল আশরাফ, ১৪৩১ হি. ১ম খন্ড , ভূমিকা দ্র.

হানাফী ফিক্হ'র বৈশিষ্টসমূহ ঃ

১. হানাফী ফিক্হর মাসআলাসমূহ তত্ত্ব, তথ্য, হিকমত ও কল্যাণের উপর প্রতিষ্ঠিত।
২. হানাফী ফিক্হ একান্তই সহজ সরল। যেমন- ইসলামের বিধান হল চুরি করলে হাত কাটা যাবে। হানাফী ফিক্হ এখানে কিছু অবকাশ দিয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক চুরি, কুরআন শরীফ , কাফন চুরি , পিতা-মাতার সম্পদ চুরি ইত্যাদিতে হানাফী মাযহাব মতে হাত কাটা যাবেনা। এমনি ভাবে শিশু চোর , এক স্বর্ণমুদ্রার কম চুরি অথবা কয়েকজন মিলে এক স্বর্ণমুদ্রা চুরি করলে হাত কাটা যাবেনা।
৩. হানাফী ফিকহে মানুষের পার্থিব প্রয়োজন , লেন-দেন গভীরভাবে পর্যবেক্ষন করা হয়েছে। কারণেই প্রাপ্ত বয়স্কা কন্যা সেচ্ছায় বিয়ে করতে পারবে। শাফি'ঈ মাযহাব মতে পারবেনা।
৪. হানাফী ফিকহে অমুসলিমদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করা হয়েছে। জিম্মি নাগরিকদের মধ্যে অগ্নি উপাসীদের নিজ মেয়েদের বিয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু শাফি'ঈ মাযহাবে এ অনুমতি দেয়া হয়নি।
৫. ইখতিলাফী বিষয়সমূহে হানাফী ফিক্হ অধিকতর শক্তিশালী প্রমানসমূহ গ্রহণ করেছে। যেমন হানাফী মাযহাব মতে অযুতে চার ফরয। কারণ , পবিত্র কুরআনে চারটির কথা উল্লেখ রয়েছে। পক্ষান্তরে শাফি'ঈ মাযহাব মতে অযুর ফরয ছয়টি আর হাম্বলী মাযহাব মতে ছয়টির বেশী।

৬. হানাফী ফিক্হ কুরআন, হাদীসের বিষয়সমূহ যুক্তির নিরিখে গ্রহণ করেছে। মূল উদ্দেশ্য , জনকল্যাণ ইসলামের প্রাণ শক্তিকে বিবেচনা করা হয়েছে। শব্দের আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করা হয়নি।
৭. ইজমাকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।
৮. কিয়াসকে আইনের উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।
৯. এ মাযহাবে ইসতিহসান নীতি প্রবর্তিত হয়েছে।
১০. যেসব হাদীসে সাহাবা ও তাবি'ঈগনের সমালোচনা বা আপত্তি নেই সেগুলো গ্রহণ করা হয়েছে , আপত্তি থাকলে গ্রগণ করা হয়নি। মুতাওয়াতির ও মশহুর হাদীস গ্রহণ করা হয়েছে। তবে বর্ণনাকারীর মধ্যে হাদীসের পরিপন্থি আমল পাওয়া গেলে তা প্রত্যাখ্যান করা হবে।
১১. ইত্যাদি।[১]

মালিকী মাযহাব ঃ এ মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম মালিক র.। পূর্ণ নাম আবূ আব্দুল্লাহ মালিক ইব্ন আনাস আল-আসবাহী। উপাধী ইমাম ইব্ন দারুল হিজরত। হিযাযের ইমাম ও মদীনার আলিম উপাধীতে ভূষিত। ৯৩ হিজরীতে পবিত্র মদীনায় তাঁর জন্ম। ৮৬ বছর বয়সে ১৭৯ হিজরীতে মদীনা ইন্তিকাল করেন। জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত হয়েছেন। 'ইলম হাদীস ও 'ইলম ফিক্হ দুটিরই ইমাম ছিলেন তিনি। মদীনার বিখ্যাত মুজতাহিদ রবী'আতুর রায়-এর নিকট 'ইলম হাদীস ও 'ইলম ফিক্হ অর্জন করেন। অধিকাংশ হাদীস ইমাম যুহরীর নিকট শ্রবণ করেছেন। সোনালী সূত্র বলে খ্যাত ইমাম নাফে' হতেও হাদীস শ্রবণ করেছেন। তাঁর সংকলিত গ্রন্থ 'আল-মুয়াত্তা' তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছে। তিনি মসজিদে নববীতে হাদীসের দরস দিতেন। দরসের সময় শ্বানদার পোষাক ও খুশবু ব্যবহার করতেন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ছাত্ররা তাঁর নিকট হতে হাদীস ও ফিক্হ শিক্ষা লাভ করেছে। তিনি মালিকী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। এ মাযহাবের উৎপত্তি পবিত্র মদীনায়। অতঃপর মিসর , পুরো আফ্রিকা, স্পেন, বাহরাইন, সিসিলি, সুদানে বিস্তৃতি লাভ করে। পরবর্তীতে খুরাসান, খাযবীন, ইয়ামান, নিশাপুর ,পারস্য, রোম ও সিরিয়ার শহরসমূহে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। মুয়াজ ইব্ন বাদীস তার শাসনামলে উচুঁ পদসমুহে মালিকী মাযহাবের লোকদের নিয়োগদান করেন। ফলে পশ্চিম আফ্রিকায় মালিকী মাযহাব প্রাধান্য লাভ করে। স্পেনের শাসনকর্তা হিশাম ইব্ন আব্দুর রহমান মালিকী মাযহাব অনুসরণের রাষ্ট্রীয় ফরমান জারী করে ছিলেন। পূর্বাঞ্চলীয় দেশসমূহেও মালিকী মাযহাবের অনেক অনুসারী ছিল।[২]

মালিকী মাযহাবের বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

১. এ মাযহাবে পবিত্র কুরআনের প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে।
২. হাদীসে মুরসাল গ্রহণ করা হয়েছে।
৩. মদীনার বিশেষজ্ঞ আলিমগনের অভিমত ও আমলকে খবরে ওয়াহিদের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। যেহেতু ঐসব আমল তাঁরা উত্তরাধিকার সূত্রে রাসূলুল্লাহ সা. হতে লাভ করেছিলেন।
৪. ইজমাকে ফিক্হর উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।
৫. খুলাফা-ই রাশিদীনসহ বড় বড় সাহাবাগনের মতামত মারফু হাদীসের পরিপন্থি না হলে গ্রহণ করা হয়েছে।
৬. সাহাবাগনের মতামতকে কিয়াসের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।
৭. কুরআন , সুন্নাহ, ইজমা ,কিয়াসকে ফিক্হর উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছ।
৮. এ মাযহাবে ইসতিস্লাহ ও মাসালিহে মুরসালাহ (অনির্দিষ্ট কল্যানমূলক উদ্দেশ্যাবলী) কে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।৩

---

১. আকলা, মুহাম্মদ, ড., প্রাগুক্ত, পৃ ১১ ; ইসলামী বিশ্বকোষ , প্রাগুক্ত, পৃ ৮০ ; সীরাতুন্নোমান', দিল্লী , তা বি, খন্ড ২য় , পৃ ১৩১ ; 'ইসলামী শরী'আহ ও সুন্নাহ,' প্রাগুক্ত , পৃ ৪৬৩ ; হামীদুল্লাহ , মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত , পৃ ২৮২; 'ফাতাওয়ায়ে রাহমানিয়া,' প্রাগুক্ত , পৃ ভূমিকা দ্র.

২-৩. ইসলামী আইনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস', প্রাগুক্ত, পৃ ৭৪-৭৫ ; ইসলামী শরী'আ ও সুন্নাহ', প্রাগুক্ত, পৃ ৪৭৩ ; মুস্তফা , ড. , প্রাগুক্ত , পৃ ৩৭-৩৯ ; হাসান, হুসাইন, হামিদ, ড. , প্রাগুক্ত, পৃ ৬০ , ১৫৮ ; ইসলামী বিশ্বকোষ , প্রাগুক্ত , পৃ ৮৩।

শাফি'ঈ মাযহাব ঃ ফিক্হশাস্ত্রের তৃতীয় মাযহাব হল শাফি'ঈ মাযহাব। ইমাম শাফি'ঈ র. এর প্রতিষ্ঠাতা। পূর্ণ নাম আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইদরীস ইব্ন আব্বাস আশ-শায়বানী শাফি'ঈ আল-মুত্তালিবী র. (১৫০-২০৪ হি.)। তিনি ছিলেন ইমাম মালিকের ছাত্র। হানাফী ফকীহ ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন হাসান-এর সাহচর্যও লাভ করেছেন। মাত্র দশ বছর বয়সে পবিত্র কুরআন এবং ইমাম মালিকের মুয়াত্তা মুখস্ত করেন। বিশুদ্ধ ভাষা বলার ক্ষেত্রে ছিলেন দৃষ্টান্ত স্বরূপ। হাদীসে তাঁর উস্তাদের সংখ্যা ৮১ জন। 'কিতাবুল উম্ম' তাঁর বিখ্যাত রচনা। এটি সাত খন্ডে সমাপ্ত। তাঁকে ফিক্হশাস্ত্রের মূলনীতির জনক বলা হয়। তাঁর রচিত 'আর-রিসালাতু ফিল উসূল' উসূলে ফিক্হর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। ১৯৫ হিজরীতে তিনি নিজ মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেন। ২০৪ হিজরীতে তিনি মিসরে ইন্তিকাল করেন এবং সেখানেই সমাহিত হন। তাঁর অধিকাংশ ছাত্রই ছিলেন মিসরীয়। এরপর ইরাকেও এ মাযহাবের বিস্তৃতি ঘটে। তৃতীয় শতাব্দীতে হিযায, বাগদাদ, খুরাসান, তুরান, সিরিয়া, ইয়ামান, লেবানন, পারস্য, জাভা, আফ্রিকা ,স্পেন , ভারতসহ বিভিন্ন এলাকায় শাফি'ঈ মাযহাবের বিস্তৃতি ঘটে।আল্লামা ইব্ন আসীর র. বলেন, ' আফ্রিকায় ইয়াকুব ইব্ন ইউসুফ ইব্ন আব্দুল মু'মিন তাঁর শাসনামলের শেষ ভাগে শাফি'ঈ মাযহাবের প্রতি অনুরক্ত হন এবং এ মাযহাবের লোকদের বিচারক পদে নিয়োগ দান করেন। তাঁর এ মাযহাবকে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে দিতে যাঁরা অসামান্য অবদান রেখেছেন তাঁরা হলেন-১. আবূ ইসহাক ফিরোজাবাদী র. (মৃ ৪৭৬ হি.) ,২.ইমাম গাযযালী র. (মৃ ৫০৫ হি.), ৩. আবুল কাসিম আর-রাফি'ঈ র. (মৃ ৬২৩ হি.), ৪. মুহিউদ্দীন আন-নাওয়াবী র. (মৃ ৬৭৬ হি.), ৫. তকী উদ্দীন আস-সুবুকী র. (মৃ ৭৫৬ হি.), ৬. জালাল উদ্দীন আস-সুয়ূতী র.।১

শাফি'ঈ মাযহাবের বৈশিষ্ট্যসমূহঃ

১. পবিত্র কুরআনের সরাসরি অর্থগ্রহণের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে । অতঃপর হাদীসকে ফিক্হর উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।
২. হাদীস বর্ণনাকারীর জন্য সরাসরি উস্তাদ থেকে শোনার শর্তারোপ করা হয়েছে।
৩. হযরত সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব ব্যতীত অন্য কারো মুরসাল হাদীস গ্রহণ করা হয়নি।
৪. সাহাবাগনের মতামতকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করা হয়নি। ঐসব মতামত ইজতিহাদ প্রসুত বিধায় ভুলের আশংকা রয়েছে।
৫. হাদীস ও খবরে ওয়াহিদের পরিপন্থি না হলে ইজমা গ্রহণ করা হয়েছে।
৬. ইসতিহসানকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।
৭. এ মাযহাব অনেক ক্ষেত্রে হানাফী ও মালিকী মাযহাবের মধ্যবর্তী অবস্থানে রয়েছে। এদুটির মাঝে সমন্বয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। তবে মালিকী মাযহাবের প্রতি প্রবণতা বেশী রয়েছে।
৮. খবরে ওয়াহিদ ও হাদীস অনুমোদিত সাহাবাগনের আমলকে গ্রহণ করা হয়েছে।২

হাম্বলী মাযহাবঃ

এ মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল র.। পুরো নাম আব্দুল্লাহ আহমদ ইব্ন হাম্বল আশ-শায়বানী। তিনি ১৬৪ হিজরীতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই লালিত পালিত হন। ইমাম আবূ ইউসুফ র. সহ বিভিন্ন শায়খের নিকট হতে 'ইলমে ফিক্হ অর্জন করেন। ইমাম বুখারী র. (১৯৪-২৫৬ হি.) ও ইমাম মুসলিম র. (২০৪-২৬১ হি.) তাঁর ছাত্র ছিলেন।তিনি ইমাম শাফি'ঈ'র নিকট 'ইলম ফিক্হ অর্জন করেন। তাকওয়া, দ্বীনদারী, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি, বিশ্বস্ততা এবং সত্যের উপর অবিচল থাকার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। 'খালক্বে কুরআন' মাসআলায় চরম দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন। রাজদ্রোহে পতিত হয়ে বন্দি জীবন ও কঠিন শারীরিক নির্যাতন ভোগ করেছেন। তবেও সত্যের উপর অবিচল , অটল থেকে মুসলিম জাতির চেতনার উৎস হয়ে আছেন। ইমাম হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। ইমাম আহমদ র. ২৪১ হিজরীতে বাগদাদে ইন্তিকাল করেছেন। তাঁর জানাযায় ষাট হাজার মহিলাসহ দশ লাখ লোকের সমাগম হয়েছিল। ইমাম আহমদ হাম্বলী মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেন। বাগদাদ ছিল এ মাযহাবের কেন্দ্র। আল্লামা সুয়ূতীর মতে হাম্বলী মাযহাব বাগদাদ ও ইরাকের সীমা অতিক্রম করে অন্যান্য দেশেও বিস্তৃতি লাভ করে। আল্লামা ইব্ন কারহূনের মতে হিজরী সপ্তম শতাব্দীর পর হাম্বলী মাযহাব সিরিয়ায় প্রাধান্য বিস্তার করে। বর্তমানে হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী সাউদী আরব ছাড়াও অন্যান্য আরব দেশে রয়েছে। ইমাম আহমদ র. রচিত 'আল-মুসনাদ' গ্রন্থটি ছয় খন্ডে সমাপ্ত। এতে চল্লিশ হাজার হাদীস রয়েছে। উসূল আল-ফিক্হ বিষয়ে তিনি 'আন-নাসিখ ওয়াল মানসুখ' এবং 'কিতাবুল ইলাল' নামক দুটি গ্রন্থ রচনা করেছেন।৩

হাম্বলী মাযহাবের বৈশিষ্ট্যসমূহঃ

১. এ মাযহাবে ফিক্হী মাসআলা উদ্ভাবনে পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের উপর অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। হাদীসকে ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।
২. দুর্বল ও মুরসাল হাদীস গ্রহণ করা হয়েছে।
৩. এ মাযহাবে মাসালিহে মুরসালাহ (পরিবর্তিত জনকল্যাণ) এবং অকল্যাণের উৎস বন্ধ করার নীতিকে শরী'আতের উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।
৪. যাহিরে হাদীসের উপর অধিক নির্ভর করা হয়েছে।
৫. এ মাযহাবে ফিক্হর উৎস হিসেবে কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াসকে গ্রহণ করা হয়েছে।
৬. সাহাবাগনের রায় ও ফাতাওয়াকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কোন বিষয়ে তাঁদের একাধিক অভিমত থাকলে সবগুলো গ্রহণ করা হয়েছে।
৭. ইব্ন খালদুনের মতে এ মাযহাবে ইজতিহাদের ব্যবহার কম।৪

১-৪. আকলা, মুহাম্মদ, ড. , প্রাগুক্ত , পৃ ১৪ ; ফাতাওয়া ও মাসাইল , প্রাগুক্ত, পৃ ৮২-৮৩ ; নেছার উদ্দিন, ম, ই, আ, ড. ,প্রাগুক্ত, পৃ ৪৩ ; ইসলামী আইনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস', প্রাগুক্ত, পৃ ৭৫-৭৬। ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা', বর্ষ ৪৫, সংখ্যা ২য়, (অক্টোবর-ডিসেম্বর-২০০৫) পৃ ৮৩ ; ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৫ ; 'ইসলামী শরী'আ ও সুন্নাহ', প্রাগুক্ত, পৃ ৪৮৫ ; ফাতাওয়া ও মাসাইল', প্রাগুক্ত, পৃ ৮১-৮৫ ; 'ইসলামী আইন ও বিচার', বর্ষ ৭ম, সংখ্যা ২৫, প্রাগুক্ত, পৃ ১০৮-০৯।

তাকলীদ ( ) ঃ তাকলীদ শব্দের আভিধানিক অর্থ অনুসরন করা, অনুকরন করা, নকল করা, নিয়োগ দান, বেড়ী লাগানো, গলায় তরবারী ঝুলানো, কুরবানীর পশুর গলায় কোন নির্দশন লটকিয়ে দেয়া, হার পরিধান করা, ধর্মমত গ্রহণ করা, কোন কাজ কারো দায়িত্বে অর্পণ করা এবং তামিলের জন্য জারিকৃত শাহী ফরমান।[১]

পরিভাষায় তাকলীদ বলা হয় 'তাকলীদ কোন মানুষের পক্ষে অন্য কাউকে অনুসরন করা এমন ধারনায় যে, তিনি যা বলেন বা করেন তা সঠিক, কোন রকম দলীলের অপেক্ষা না করে। যেমন বলা হয় - এ অনুসারী অন্যো কাজ বা কথাকে কোন প্রমান ছাড়াই গলার হার বানিয়েছে।'২ ইমাম গাযযলী র. এবং আল্লামা ইব্ন মালিক মিসরীর 'শরহুল মানার' গ্রন্থ মতে ' তাকলীদ হল অন্যের কথা বা কাজকে সঠিক সত্য বিশ্বাস করে দলীলের অপেক্ষা না করে অনুসরন করা।[৩] মুফতী আমীমুল ইহসান র. বলেন, তাকলীদ বলা হয় কোন ব্যক্তি কর্তৃক কাউকে কোন বিষয়ে দলীল প্রমান ছাড়াই সত্য বলে বিশ্বাস করতঃ তার অনুসরন করা। অথবা প্রমান ছাড়াই কারো কথাকে গ্রহণ করে নেয়া।[৪] আল্লামা ইউসুফ লুদিয়ানবী র. বলেন, 'তাকলীদ মানে কোন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কথা বা মতামতকে দলীল-প্রমানের অপেক্ষা না করে মেনে নেয়া।[৫] মুফতী তকী উসমানী বলেন, ' বিনা দলীলে মুজতাহিদের সিদ্ধান্ত মোতাবিক আমল করার নাম তাকলীদ।'[৬]

মোট কথা কুরআন, হাদীস হতে নিঃসৃত ও গৃহীত মুসলিম পন্ডিত, গবেষক, মুজতাহিদ কর্তৃক উদ্ভাবিত ইজতিহাদী অভিমত মেনে নেয়াকে তাকলীদ বলে।

তাকলীদের আবশ্যকীয়তাঃ শাহ ওয়ালী উল্লাহ র. (১১১৪-১১৭৬ হি.) 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' গ্রন্থে বলেন, 'তাকলীদের সূচনা রাসূল্লাহ সা.- এর জীবদ্দশাতে হয়েছে তাঁরই নির্দেশে। অতপর সাহাবাগণের মধ্যে তাকলীদ বরাবরই বিদ্যমান ছিল। কোন কোন সাহাবা একাধিক সাহাবার তাকলীদ করতেন, কেউ একজনের তাকলীদ করতেন। যেমন- হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস রা. য়খন থেকে মক্কায় অবস্থান করা শুরু করেন তখন অনেক মাসআলায় অন্যদের বিরোধিতা করলেন।

মাযহাব চারটির মধ্যেই সীমাবদ্ধঃ দুনিয়াতে যত ফকীহ , মুজতাহিদ , ইমাম ছিলেন মাযহাবও ততটা হওয়ার কথা ছিল। যেমন- ইমাম বুখারী র., ইমাম মুসলিম র., ইমাম তিরমিযী র. সহ বড় বড় মুহাদ্দিসগণ মুজতাহিদ ছিলেন। এ ছাড়া সুফিয়ান সাওরী র. (মৃ ১৬১ হি.) , হাসান বসরী র. , ইমাম আওযায়ী র. (১৫৭ হি.)- এর মাযহাব ছিল। নিম্নের তিনটি মাযহাব হিজরী তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত চালু ছিল। ইমাম দাউদ যাহিরী র. (মৃ ২৭০ হি.), ইসহাক ইব্ন রাহওয়া র. (মৃ ২৩৮ হি.) , সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনা র. , ইব্ন জারীর আত-তাবারী র. (মৃ৩১০ হি.), লাইস ইব্ন সা'আদ র.(১৭৫ হি.) , ইমাম আবূ হানীফা র.- এর উস্তাদ হাম্মাদ ইব্ন আবূ সুলায়মান র. , রবী'আতুর রায় র. , ইব্ন শিহাব যুহরী র., ইমাম মালিকের উস্তাদ ইয়াহইয়া ইব্ন সা'ঈদ র. প্রমুখের মাযহাব এক সময় চালু ছিল। কিন্তু তাঁদের মাযহাব প্রচলিত হতে পারেনি। বর্তমান দুনিয়ায় চার মাযহাবের বাইরে কোন মাযহাব প্রচলিত নেই। কারণ চার মাযহাবের বাইরের ইমামগণের মাযহাব ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়নি। যে কারণে চারটি মাযহাবই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। কারণ, হানাফী, মালিকী, শাফি'ঈ ও হাম্বলী প্রতিটি পরিপূর্ণ মাযহাব। অন্যান্য ইমামগণের মাযহাব সামগ্রিক বিষয়ে ছিলনা বরং আংশিক ছিল। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে সুস্পষ্ট মীমাংসা নেই এ রকম যত সমস্যা আছে সেগুলোর সমাধান চার মাযহাবে পাওয়া যায় , অন্যান্য মুজতাহিদগণের গবেষণায় পাওয়া যায়না। কারণেই বর্তমানে চার মাযহাবের বাইরে অন্য কোন মাযহাব প্রচলিত নয়।[১]

বিখ্যাত মুফাচ্ছির, ফকীহ কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী র. (মৃ ১২৩৫ হি.) তাফসীরে মাযহারীতে বলেন, 'হিজরী তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীর পর আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত চার মাযহাব অনুসরণে বিভক্ত হয়ে গেছেন। শাখা- প্রশাখা মূলক বিধি-বিধানে অন্য কোন মাযহাব অবশিষ্ট থাকল্না। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায়, মুসলিম উম্মাহ সর্বসম্মতিক্রমে এ মর্মে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে যে, চার মাযহাব পরিপন্থি মতামত প্রত্যাখ্যাত হবে। পবিত্র কুরআনে এসেছে, 'আর যদি কেউ সৎপথ প্রকাশিত হওয়ার পর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মু'মিনের পথ ব্যতীত অন্য কোন পথের অনুসরণ করে তবে সে যা করতে চায় আমি তাকে তা করতে দেব এবং এরপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব, কতই জঘণ্য আবাস।'[২] ফকীহগণ এ আয়াত দ্বারা ইজমা অর্থাৎ উম্মতের ঐকমত্যকে শরী'আতের দলীল হওয়ার ভিত্তি নির্ধারণ করেছেন এবং মু'মিনগণের পথ অনুসরণকে ওয়াযিব বলে গণ্য করেছেন। এর বিরোধিতা মানে কুরআন, সুন্নাহর বিরোধিতা বলে গণ্য হবে, যা অবৈধ।[৩]

চার মাযহাবের অনুসরণের বিষয়ে ইজমা সংঘটিত হওয়ার পর যে দু'একজন মুহাদ্দিস নিজের ইজতিহাদ অনুযায়ী আমল করতেন তারাও চার ইমামের ইজতিহাদলব্ধ ফিকহী বিধানের বিরোধিতা করেননি। চার মুজতাহিদ ইমামের অনুসরণ এক খোদা প্রদত্ত রহস্য। বিষয়টির রহস্য আল্লাহ তা'আলা 'আলিমগণের অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন এবং তাদেরকে এবিষয়ে ঐক্যবদ্ধ করেছেন। চাই তারা তাকলীদের উপকারিতা সম্পর্কে জ্ঞাত থাকুক বা না থাকুক।[৪] শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী র. 'মুয়াত্তা' গ্রন্থের ব্যাখ্যায় বলেন, 'চার মাযহাবের ইমাম এমন পর্যায়ে রয়েছেন যে, তাঁদের 'ইলম সারা দুনিয়াকে ঘিরে রেখেছে। এ চার মাযহাব সুশৃংখলভাবে সংকলিত ও প্রণিত হয়েছে। মুসলিম উম্মাহর নির্ভরযোগ্য মনীষীগণ এ প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের বিষয়ে সম্মিলিত সিদ্ধান্তে (ইজমা) উপনীত হয়েছেন। যা আজো অব্যাহতভাবে চলছে।[৫] অন্যান্য মুজতাহিদগণের মাযহাব এমনভাবে সংরক্ষণ করা হয়নি যে, দীর্ঘ দিন টিকে থাকতে পারে। যে কারণে চতুর্থ শতাব্দীর পর চার মাযহাব ব্যতীত অন্য কোন মাযহাব অবশিষ্ট থাকেনি। তিনি আরো বলেন, এটা আল্লাহ পাকের মেহেরবানী যে, চার মাযহাবে তাকলীদ সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। এ চার মাযহাবের অনুসরণ মানে বুহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠীর অর্ন্তভুক্ত থাকা। চার মাযহাবের কোন একটির অনুসরণ থেকে বিমুখ হওয়া মানে মুসলিম উম্মাহ থেকে বের হয়ে যাওয়া।[৬]

প্রসিদ্ধ চার ইমামের মাযহাব ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেছে, জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছে এবং গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়ে টিকে আছে। পূর্ববর্তী ইমামগণের কয়েকটি মাযহাব কিছুকাল অনুসৃত হয়েছে। কিন্তু সেগুলো খ্যাতি অর্জন করতে পারেনি, তদপুরি সেগুলো ছিল বিক্ষিপ্ত। ফলে চার মাযহাবের প্রভাবে সেগুলো টিকে থাকতে পারেনি। চার মাযহাবের ইমামগণের শাগরিদগণ ছিলেন খ্যাতিমান, মর্যাদাসম্পন্ন। তাঁরা উস্তাদগণের মাযহাবকে জনগণের সামনে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। কোন কোন মাযহাব যেমন হানাফী মাযহাব জনগণের চাহিদা পূরণ করতে অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন ছিল বিধায় সরকারী আইনে পরিণত হয়।[৭]

আল্লামা ইব্ন হাজার মক্কী র. (মৃ ৮৫২ হি.) 'ফাতহুল মুবীন ফী শারহি আরবা'ঈন' গ্রন্থে বলেন, 'আমাদের যুগে শরী'আত বিশেষজ্ঞগণের সিদ্ধান্ত হল চার ইমাম- আবূ হানীফা র., ইমাম মালিক র., ইমাম শাফি'ঈ র. ও ইমাম ইব্ন হাম্বল র. ব্যতীত অন্য কারো তাকলীদ বৈধ নয়।'১ বিখ্যাত মুহাদ্দিস এবং মুসলিম শরীফের ভাষ্যকার আল্লামা শেখ মুহি উদ্দীন নববী র. 'রাওযাতুত তালিবীন' গ্রন্থে লিখেন, 'আলিমগণ পূর্ণ ইজতিহাদ সম্পন্নদের বেলায় বলেন যে, তা চার ইমাম পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে। 'আলিমগণ চার ইমামের কোন একজনের অনুসরণ মুসলিম উম্মাহর জন্য ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছেন।'২ বিখ্যাত ফকীহ আল্লামা ইব্ন নুজাইম র.(মৃ ৯৭০ হি.) 'আল-আশবাহ ওয়ান-নাযায়ির' গ্রন্থে লিখেন, 'চার ইমামের বিপরীত মত পোষন করলে মুসলিম উম্মাহর সর্ব সিদ্ধান্ত পরিপন্থি হবে এবং প্রত্যাখ্যাত হবে।'৩ আল্লামা তাহতাবী র. যিনি প্রথম জীবনে শাফি'ঈ ছিলেন পরবর্তীতে হানাফী মাযহাব অনুসরণ করেছেন তিনি 'দুররে মুখতার' গ্রন্থের টীকায় লিখেন, যে ব্যক্তি চার মাযহাব থেকে বেরিয়ে যাবে সে বিদ'আতপন্থী ও জাহান্নামী হবে।'[৪] মোল্লা জীবন র. 'তাফসীরে আহমদী' গ্রন্থে লিখেন, 'ন্যায়সংগত কথা হল মাযহাবসমূহ শুধু চারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা আল্লাহ তা'আলা বিশেষ অনুগ্রহ ব্যতীত অন্য কিছু নয়। এতে যুক্তি তর্কে লিপ্ত হওয়া বা দলীল-প্রমাণ তালাশ করে লাভ নেই।'৫ হাফিজে হাদীস আল্লামা ইব্ন হুমাম র. (মৃ ৮৬১ হি.)'আত-তাহরীর ফী উসূলিল ফিকহি' গ্রন্থে লিখেন, ' পরবর্তীকালের নির্ভরযোগ্য শরী'আত বিশেষজ্ঞ 'আলিমগণ বলেছেন, ' শুধুমাত্র চার ইমামের অনুসরণ নির্দিষ্ট। অন্য কারো অনুসরণ শুদ্ধ হবেনা। কারণ চার মাযহাব সর্ব বিষয়ে

সামগ্রিকভাবে খুঁটিনাটিসহ সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে বিদ্যমান। অন্য মুজতাহিদগণের গবেষণায় এ পর্যন্ত (৮৬১ হি.) তেমন কিছু পাওয়া যায়নি।৬ শায়খ ইবনুল হুমাম 'ফাতহুল কাদীর' গ্রন্থে বলেন, 'মুসলিম উম্মাহর নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিগণের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যে, উক্ত চার মাযহাবের বাইরে অন্য কারো অনুসরণ চলবেনা।'৭ সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী র. (মৃ ২০০০ খৃ.) বলেন, 'মাযহাব চারটি মুসলিম স্বতস্ফূর্ত ভাবে গ্রহণ করেছে এবং নৈতিক ভাবে স্বীকার করেছে যে, এ চার মাযহাবই সত্য এবং এগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এ চার মাযহাব গ্রহণ করার মধ্যেই বিরাট উপকারিতা ও কল্যান আর উপেক্ষা করার মধ্যে রয়েছে বিরাট অকল্যাণ ও বিপর্যয়।'৮ দুনিয়ার অসংখ্য ধর্মীয় 'আলিম, পন্ডিত, মুহাদ্দিস, মুফাসসির ,ফকীহ ও আল্লাহর ওয়ালীগণ মুকাল্লিদ ছিলেন। ইমাম তিরমিযী র. , ইমাম তাহাবী র. ইমাম আবূ ইউসুফ র., ইমাম মুহাম্মদ র. প্রমুখ অনেক উঁচু মাপের 'আলিম মুজতাহিদ ছিলেন, তারপরও তাঁরা তাকলীদ করেছেন। সুতরাং মাযহাব মানার বিকল্প থাকতে পারেনা।[৯]

হানাফী মাযহাবের শেষ্ঠত্ব চার মাযহাবের মধ্যে হানাফী মাযহাব শ্রেষ্ঠ। এ মাযহাবের বিধি-বিধান সবচেয়ে বেশী যুগোপযোগী, সহজ, সরল এবং যুক্তি সংগত। পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশ মানুষ হানাফী মাযহাবের অনুসারী। আল্লামা আব্দুরল ওয়াহাব শারানী র. বলেন,'মুজতাহিদ ইমামগণ আল্লাহর দ্বীন বিষয়ে মনগড়া ব্যাখ্যা থেকে পবিত্র থেকেোছেন। তাঁদের মাযহাব কুরআন সুন্নাহর ভিত্তিতে লিপিবদ্ধ। যা স্বর্ণ ও মুক্তার মত উজ্জল। তাদের সবার মাযহাব ও অভিমতসমূহ বুননকৃত কাপড়ের উভয় দিকের মত সুশৃংখল ও সুনিয়ন্ত্রিত। সুতরাং তাদের কারো তাকলীদ করতে আপত্তি থাকতে পারেনা। উল্লেখিত চার মাযহাবই জান্নাতে পৌঁছার সহজ সরল পথ স্বরূপ। তাঁদের ব্যাপারে সমালোচনা করা, গালমন্দ করা অজ্ঞতার প্রমাণ।বিশেষ করে ইমাম আবূ হানীফার ক্ষেত্রে। তাঁর অগাধ পান্ডিত্ব, অস্বাভাবিক তাকওয়া পরহিযগারী, 'ইবাদত, দূরদর্শীতা অতুলনীয়। এ মাযহাবের বিধানসমূহ বিবেচনা ও যুক্তির সাথে সংগতীপূর্ণ। এ মাযহাবে অমুসলিমদের দাবীসমূহ সদয় ও স্বাধীন ভাবে বিবেচনা করা হয়েছে। এ ফিক্‌হমতে রাষ্ট্র পরিচালনা সহজ হয়েছে।'[১০] শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী র. বলেন,'রাসূলুল্লাহ সা. আমাকে স্বপ্নে/ কাশফে/ ইলহামে বলেছেন, হানাফী মাযহাবে অন্তস্থিত এমন একটি তরীকা রয়েছে যা ঐসব সুন্নাতের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ যেগুলোর সম্পাদনা ইমাম বুখারী ও তাঁর সমসাময়িক মুহাদ্দিসগণ করেছেন।'[১১] ইমাম আ'মাশ র. একদিন একটি জরুরী মাসআলা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়ে অসংকোচে বললেন,' এ সমস্যার সমাধান নু'মান ইব্ন সাবিত উত্তম ভাবে দিতে পারবে। আমার ধারণা তাঁর 'ইলমে আল্লাহ প্রদত্ত বরকত রয়েছে।'[১২]শায়খ আহমদ সেরহিন্দী র. মুজাদ্দিদে আলফে সানী র. মুজতাহিদ পর্যায়ের আলিম হওয়ার পরও তিনি হানাফী মাযহাবের অনুসরণ করেছেন।[১৩]

১.ইসলামী বিশ্বকোষ', প্রাগুক্ত, পৃ ৮৩।
২.আল-কুরআন, ৪ ঃ ১১৫।
৩-৪. আব্দুল্লাহ , মো. , মুফতী, প্রাগুক্ত, পৃ ১১৫।
৫. শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী , 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা', প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬১।
৬. শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী, 'ইকদুল জীদ আল আহকাম আল ইজতিহাদ ওয়াত তাকলীদ', প্রাগুক্ত , পৃ ৩৮।
৭.ইসলামী আইন ও বিচার', বর্ষ ৫ম, সংখ্যা ২০, প্রাগুক্ত, পৃ ৩০-৩১।

তৃতীয় অধ্যায় :
বাংলাদেশে ফিক্‌হ চর্চা

ভূমিকা ঃ ইসলামী শিক্ষা তথা ফিক্‌হ চর্চার এক অনন্য ঐতিহ্যবাহী জনপদ বাংলাদেশ। মুসলিম জন অধ্যুষিত এ দেশে প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহ ইসলামী শিক্ষা তথা ফিক্‌হ চর্চার গৌরবময় ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করে চলছে। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ শাখা হল ফিক্‌হ। বিশদ দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে সংকলিত শরী'আতের আনুসাঙ্গিক ব্যবহারিক বিষয়ের বিধান সম্পর্কিত জ্ঞানকে বলা হয় ফিক্‌হ। যা মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনকে নিয়ন্ত্রন করে। রাসূলুল্লাহ সা.-এর যে শিক্ষা ব্যবস্থা বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতি লাভ করেছে, যার মাধ্যমে লক্ষ্য লক্ষ্য মুজতাহিদ, মুফতী,ফকীহ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির, দার্শনিক ,ইমাম, মুজাহিদ সৃষ্টি হয়েছেন; উক্ত জ্ঞান চর্চায় বাংলাদেশেরও রয়েছে গৌরবময় ভূমিকা। যা এখনো অব্যাহত আছে। বাংলাদেশে এ শিক্ষা বিস্তারে রাসূলুল্লাহ সা.- এর সাহাবা থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত মহা মনীষীগণের অসামান্য ত্যাগ, কুরবানী ও রক্তঝড়া শ্রম রয়েছে। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার গোড়া পত্তন আরব ভূখন্ডে হলেও অল্প দিনের ব্যবধানে এ শিক্ষা দেশ, মহাদেশ , কাল , মহাকাল পাড়ি দিয়েছে। এ শিক্ষার ঐতিহ্যে লালিত বাংলাদেশ। এ দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতি, জীবন-জীবিকা, আচার-আচরণ, ভাষা, সাহিত্যসহ সব কিছুতে ইসলামী শিক্ষার ভাবধারা বিদ্যমান। বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার ও ইসলামী শিক্ষা তথা ফিক্‌হ চর্চায় যাঁরা শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেছেন

তাঁদের মধ্যে পাঁচ শেণীর মনীষী রয়েছেনঃ ১. আরব বণিক , ২. সূফী সাধক , ৩. মুসলিম শাসক, ৪. মুজাহিদ, ৫. 'আলিম, ফকীহ ও মুফতীগণ। বক্ষমান প্রবন্ধে বাংলার ভৌগলিক পরিচয়, বাংলার সাথে আরবদের পুরনো সম্পর্ক, ইসলামের আগমন, ফিক্হ চর্চায় সূফী সাধক, মুসলিম শাসক, মুজাহিদ, 'আলিম , মুফতী, ফকীহগণের অবদান, আলিয়া মাদ্রাসা ও কাওমী মাদ্রাসাসমূহের ভূমিকাসহ বিভিন্ন মাধ্যমের কথা তুলে ধরা হয়েছে।

বাংলার ভৌগলিক পরিচিতি ঃ

বাংলাদেশ বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। নদী বিধৌত এ দেশটির আয়তন ৫৫.৫৯৮ বর্গমাইল বা ১৪৩৯৯৮.৬০ বর্গ কিলোমিটার। প্রায় ৮০ হাজার বর্গমাইল নদী বিধৌত পলি দ্বারা গঠিত বিশাল সমভূমি এ বাংলা।১ প্রাচীন বাংলার সীমানা নির্ধারণ মোটেও সহজ কাজ নয়। কারণ, আজকের যুগে বাংলা বলতে আমরা যে সব এলাকাকে বুঝি প্রাচীন যুগে সেসব এলাকার একটি মাত্র নাম ছিলনা ; বরং এসব এলাকার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত হত। এসব এলাকায় প্রতিষ্ঠিত ছিল একাধিক স্বাধীন রাজ্য। আবার বিভিন্ন সময়ে এদের নামের পরিবর্তন হয়েছে। ১৯৪৭ এর পূর্বে বৃটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রদেশই বাংলা নামে পরিচিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিম বঙ্গ ছিল বেঙ্গল প্রদেশ। পূর্বে বর্তমান বাংলাদেশের উত্তরাংশ ও পশ্চিম বঙ্গের উত্তর পূর্বাংশ জড়ে ছিল পুন্ড্রবর্ধন, বরেন্দ্র ও লক্ষ্নণাবর্তী। এর রাজধানী ছিল পুন্ড্রনগর। বর্তমান বগুড়ার মহাস্থানগড় সেকালের পুন্ড্রনগর । দক্ষিণ পূর্বাংশের পরিচয় ছিল সমতট, হরিকেল ও বেঙ্গল নামে। পশ্চিমাংশ সুক্ষ ও দন্ডভুক্তি নামে অভিহিত হত। আবার উত্তর পশ্চিমাংশের কিয়দাংশ এক সময় গৌড় নামে পরিচিত ছিল। বৃহত্তর ঢাকা, বৃহত্তর ফরিদপুর , বৃহত্তর যশোর নিয়ে গঠিত অঞ্চলের নাম ছিল বঙ্গ। আর দক্ষিণের অঞ্চল পরিচিত ছিল বঙ্গাল নামে। বৃহত্তর কুমিল্লা, বৃহত্তর নোয়াখালী ও বৃহত্তর চট্রগ্রামকে একত্রে বলা হত হরিকেল। যুগে যুগে এসব রাজ্যের সীমানার পরিবর্তন ঘটেছে , পরিবর্তন হয়েছে নামেরও।২ তাই প্রাচীন বাংলার সীমানা নির্দেশ এভাবে করা যায়ঃ উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে ত্রিপুরা, গারো, খাসিয়া, লুসাই পর্বতমালা, জয়ন্তিয়া ,ত্রিপুরা ও চট্রগ্রাম শৈলশ্রেণী এবং পশ্চিমে বিহারের রাজমহল পাহাড়, ছোট নাগপুর পর্বতরাজি ও কলিঙ্গ।৩

খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে রাজা শশাংক সর্ব প্রথম বাংলার বিছিন্ন ও বিভক্ত জনপদগুলোকে একত্রিত করার চেষ্টা করেন। শশাংকের পর বাংলা ১. গৌড়, ২. পুন্ড্র, ৩. বঙ্গ এ তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। মুসলিম শাসনামলে এসব বিক্ষিপ্ত অঞ্চল একত্রিত করার চেষ্টা সফল হয়। মুসলমানরাই সর্ব প্রথম বাংলার সমগ্র অঞ্চলকে বাঙ্গালাহ নামে অভিহিত করেন। বাংলার আদি নাম বঙ্গ।৪ বাংলা পাঠান যুগের পূর্ব হতে পশ্চিম বঙ্গ 'গৌড়' এবং পূর্ববঙ্গ 'বঙ্গ' এ দুনামে চিহ্নিত হত। ষোড়শ শতকে মোগল শাসনামল থেকে এসব এলাকা বাঙ্গালা নামে অভিহিত হয়। সম্রাট আকবরের শাসনামলে (১৫৫৬-১৬০৫ খৃ) সমগ্র বাংলাদেশ 'সুবা-ই বাঙ্গালা' নামে পরিচিত ছিল। বাংলার নামকরণ সম্পর্কে আবুল ফজল তার 'আইন-ই আকবরী' গ্রন্থে লিখেনঃ 'এ দেশের প্রাচীন নাম বঙ্গ এবং প্রাচীনকালে এদেশের লোকেরা দশ গজ উঁচু ও বিশ গজ বিস্তৃত প্রকান্ড আল বেঁধে বন্যার পানি থেকে জমির ফসল রক্ষা করত। সময়ের ব্যবধানে 'আল' শব্দটি দেশের নামের সাথে যুক্ত হয়ে বঙ্গ+আল= বঙ্গাল বা বাঙ্গালাহ শব্দের উৎপত্তি হয়।'[৫]

১.এম,এইচ, আলী, 'বাংলাদেশ বিষয়াবলী', ঢাকা, মিলারস প্রকাশনী, ২০০৫ , পৃ ৩৬।

২. এ, কে, এম, নজীর আহমদ.'বাংলাদেশে ইসলামের আগমন', ঢাকা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৯, পৃ ৭।

৩. আব্দুর রহীম , মুহাম্মদ, ড. , 'বাংলাদেশের ইতিহাস', ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান , ২০০১ , পৃ ১৭।

৪. আব্দুল করিম , 'বাংলার ইতিহাস ,সুলতানী আমল', ঢাকা , বাংলা একাডেমী , ১৯৮৭ , ২য় সং, পৃ ১১।

৫. এম , এ , রহীম , ড. , 'বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস' , ঢাকা , বাংলা একাডেমী , ১৯৮২ , খন্ড প্রথম , পৃ ৩-৪।

ঐতিহাসিকগণ এ গবেষণায় উপনীত হয়েছেন যে, হযরত নূহ 'আলাইহিস সালাম মহাপ্লাবনের পর তাঁর অনুসারী ও বংশধরদের পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বসবাসের নির্দেশ দেন । হযরত নূহ আ.-এর তিন পুত্র ছিলেন। ১.হাম , ২. সাম ও ৩. ইয়াফিস। হামের ছয় পুত্রের মধ্যে একজনের নাম ছিল হিন্দ। তাঁর মাধ্যমে ভারতবর্ষ আবাদ হয়েছিল বলে ভূখন্ডটি হিন্দ বা হিন্দুস্তান নামে পরিচিত। হিন্দের ছিল চার পুত্র। ১.পূরব, ২. বঙ, ৩. দাকন ও ৪. নাহরাওয়ান। দ্বিতীয় পুত্র বঙ ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন । বঙ-্‌ এর বংশধরগণের আবাসস্থলই বঙ বা বাঙ্গালা নামে পরিচিত হয়। ১

-- সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ'র (১৩৯০-১৪১৫ খৃ.) সময় থেকে বাংলা নামের বিস্তৃতি ঘটে এবং সমগ্র বাংলাদেশ বাংলা নামে পরিচিত হয়। তাঁর আধিপত্যে লক্ষণাবর্তী ও বাঙ্গালা একত্রীভূত হয় ।তিনি বাংলার স্বাধীন সুলতানী আমলের সূচনা করেন। যুক্ত অঞ্চলগুলোকে বাঙ্গালা নামে এবং এর অধিবাসীদেরকে বাঙ্গালী নামে অভিহিত করেন। তিনি বাঙ্গালা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীকে একটি জাতিতে পরিণত করেন। যা সার্বজনীনতা লাভ করে এবং এ নামে পরিচয় দিতে বাঙ্গালী গর্ববোধ করে। তিনি দিল্লী থেকে বাংলার স্বাধীনতা সংরক্ষণ করেন। যা পরবর্তীতে দু'শত বছর স্থায়ী ছিল।২ বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ উদ্দৌলাহর আমলে (১৭৫৬-৫৭ খৃ.) বাংলা , বিহার, উড়িষ্যা একত্রে ছিল বাংলাদেশ। ইংরেজ শাসনামলে বঙ্গভঙ্গের (১৯০৫ খৃ.) আগ পর্যন্ত এ অবস্থা বিরাজমান ছিল। বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল পূর্ববঙ্গ ও আসাম স্বতন্ত্র প্রদেশের মর্যাদা লাভ করে। ১৯১১ খৃ. বঙ্গভঙ্গ রদ হলেও বাংলাদেশ তার পূর্ববর্তী সীমানা

ফিরে পায়নি। বিহার উড়িষ্যা , আসাম পৃথক প্রদেশের মর্যাদা লাভ করে। নতুন ব্যবস্থায় পূর্ববঙ্গ, দার্জিলিং ও পশ্চিম বঙ্গ নিয়ে বাংলাদেশ গঠিত হয়। ফলে এক দিকে বাংলাভাষী সিলেট, কাসার, শিলচর ও গোয়ালপাড়া জেলা আসামে থেকে যায়। অন্যদিকে পুটিয়া মালভূম, সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি বাংলাভাষী জেলাগুলো বিহারের অর্ন্তভুক্ত থাকে। **১৯৪৭** খৃ. আসামের সিলেটসহ পূর্ববঙ্গ পূর্ব পাকিস্তান নামে পাকিস্তানের অর্ন্তভুক্ত স্বাধীন সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। **১৯৭১** খৃ. রক্তক্ষয়ী মুক্তিসংগ্রামের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন বাংলাদেশে রূপান্তরিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের সীমানা হলঃ পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয়, অরুণাচল ও আসাম রাজ্য, পূর্বে ভারতের আসাম, ত্রিপুরা রাজ্য ও বার্মা এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ।৩

আরব বণিক ও সাহাবাগণের মাধ্যমে বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ও ফিক্‌হ চর্চার সূচনা

পবিত্র কুরআনের বর্ণনামতে প্রত্যেক জাতি ও গোষ্ঠীর নিকট মানব সভ্যতার প্রতিটি যুগে আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তিনি বলেন, ' প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য আছে পথ প্রদর্শক' ।৪ তিনি আরো বলেন, 'এমন কোন জাতি নেই যাদের কাছে সতর্ককারী প্রেরিত হয়নি' ।৫ নবী-রাসূলগণ মানুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে মানব সভ্যতার গোড়া পত্তন করেন। পবিত্র কুরআনের সূত্রমতে ভারত উপমহাদেশে নবী-রাসূল প্রেরিত হয়েছেন তা নিদ্বিধায় বলা যায়। কিন্তু যেহেতু পবিত্র কুরআন ও হাদীসে তাঁদের নাম সরাসরি উল্লেখ নেই তাই নির্দিষ্ট করে কারো নাম উল্লেখ করা যায়না ।৬ তবে আধুনিক কালের কোন কোন গবেষকের মতে ভারতবর্ষের আদি বাসিন্দা ছিলেন পৃথিবীর প্রথম মানব ও প্রথম নবী হযরত আদম আ. এবং হযরত নূহ আ. - এর বংশধরগণ ।৭ ঐতিহাসিক কাসিম ফিরিশতার মতে হযরত আদম আ. সর্ব প্রথম ভারত উপমহাদেশে অবতরণ করেন। অতঃপর আরব উপদ্বীপে যেয়ে বসতি স্থাপন করেন ।৮

বাংলাদেশে ফিক্‌হ চর্চা প্রসংগটি আলোচনা করতে গেলে এদেশে ইসলাম প্রচারের প্রসংগটিও এসে যায়। কারণ, একটি অপরটির সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের কাজ একদল আরব বণিক, সূফী সাধক, মুসলিম শাসক, ইসলাম প্রচারক, 'আলিম, ফকীহ, মুফতী, মুহাদ্দিস, মুজাহিদ ও আধ্যাত্মিক মনীষীগণের মাধ্যমে হয়েছে। তাঁরা মুসলিম জনসাধারণের মাঝে ইসলাম প্রচার ও ধর্মীয় শিক্ষার আলো জালাবার সেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করে বিস্ময়কর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হন। তাঁদের ইসলামী শিক্ষা ছিল খানকাহ কেন্দ্রিক। পরবর্তীতে ছাত্রদের শিক্ষাদানের জন্য গড়ে তোলেন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা। আগত ভক্ত, মুরীদগণের সামনে ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহার, দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে ইসলামের বিধান ও মাসআলাসমূহ তুলে ধরতেন। এ ভাবে এ দেশে ইসলাম প্রচার ও ফিক্‌হ চর্চার সূচনা হয়। এসব আরব বণিক, সূফী সাধক, 'আলিম, ফকীহ, মুজাহিদ আরব, ইয়ামান, ইরাক, ইরান খুরাসান, মধ্য এশিয়া ও উত্তর ভারত থেকে বাংলাদেশে আগমন করেন ।৯

১-২. এম, এ,আজিজ, ড. ; আহমদ আনিসুর রহমান ,ড.,'বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ', ঢাকা, ইফা বা ,১৯৯৩, পৃ ১৬৯ ; কাসিম ফিরিশতা, মুহাম্মদ (আব্দুল হাই অনূ) , 'তারীখে ফিরিশতা', দেওবন্দ , মাকতবা-ই মিল্লাত, ১৯৮৩ , পৃ ৫৯ ; শামস নাবীদ উসমানী, মাওলানা, ' আবি আগর না জাগে তু', লাহোর, পাকিস্তান ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯০ ,পৃ ৫২॥
৩. রইস উদ্দীন খান , ড. , ' বাংলাদেশের ইতিহাস পরিক্রমা', ঢাকা, খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানী, ১৯৯৬ , ৬ ষ্ট সংস্করণ , পৃ২২।
৪. আল-কুরআন, ১৩ ঃ ৭।
৫. আল-কুরআন, ৩৫ ঃ ২৪ ।
৬. শিবলী নোমানী , আল্লামা ; সুলায়মান নদবী , আল্লামা, 'সীরাতুন্নবী সা.', করাচী, দারুল ইশা'আত, ১৯৮৫ , খন্ড ৪র্থ, পৃ ৩১১।
৭. আল-কুরআন, ২ ঃ ৩০-৩১।
৮. কাসিম ফিরিশতা , মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত , পৃ ৫৯ ; শাসম নাবীদ উসমানী , প্রাগুক্ত , পৃ ৫১-৫২
৯. 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা', ঢাকা, ইফাবা, ৪৯ বর্ষ ,২য় সংখ্যা, (অক্টো-ডিসেম্বর ২০০৯), পৃ ১৫০-৫২।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা.- এর আবির্ভাবের পূর্বেই আরবগণ ভারত উপমহাদেশের সাথে অর্থ উপার্জনের প্রধান অবলম্বন হিসেবে বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্থাপন করেন ।১ তাদের বাণিজ্যিক বহর আরব সাগর পার হয়ে ভারত মহাসাগর দিয়ে জাভা, সুমাত্রা, বোর্ণিও ও মালাবার উপকূলে পাড়ি জমাত এবং আরো উত্তরে অগ্রসর হয়ে বঙ্গোপসাগরের তীরে গাঙ্গেয় মোহনায় নোঙর করত। খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতকের চট্টগ্রাম ও আরাকানের ঘটনাবলীতে তার প্রমান রয়েছে। আরব বণিকগণ বাংলার দক্ষিণাঞ্চলীয় বন্দরগুলোতে এসে চন্দন কাঠ, হাতীর দাঁত, মসলা ও সূতী কাপড় ক্রয় করে জাহাজ বোঝাই করে নিজ দেশে নিয়ে যেত। এভাবে একই সূত্র ধরে ভারতবর্ষের উপকূল অঞ্চলে অবস্থিত বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোর আশে পাশে আরবদের স্থায়ী উপনিবেশ গড়ে ওঠে। দক্ষিণ ভারতের মালাবার, কালিকট, চেরর, চট্টগ্রাম ও আরাকান উপকূলে আরবদের বসতি গড়ে ওঠেছিল ইসলাম প্রচারের কয়েক শতাব্দী আগেই। আরবরা বছরে কমপক্ষে দু'বার এ উপমহাদেশে নোঙর করত। আরব নাবিক ও বণিকদের জাহাজ মালাবার হয়ে বঙ্গদেশ ও কামরূপ হয়ে চীনে প্রবেশ করত। ভারতের পশ্চিম উপকূল পার হয়ে চীন যাবার পথে বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করার সময় বাংলার উপকূলে তাদের আনা-গোনা হত। সপ্তম অষ্টম শতাব্দীতে বঙ্গোপসাগর জাহাজ চলাচল ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল। আরবে ইসলাম বিস্তারের পর আরবরা পূর্ব পুরুষদের পেশা অবলম্বন করে সমুদ্র পথে প্রাচ্যে যাতায়াত কালে ছট্রগ্রাম বন্দরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত থাকে। বাংলার উপকূলে তাম্রলিপি (তমলুক) ও শৎগঙ্গ (চট্রগ্রাম) ছিল প্রধান বন্দর। এভাবে আরব বণিকদের মাধ্যমে সমুদ্র পথে ইসলামের বাণী ভারত মহাসাগরের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত দেশগুলোতে পৌঁছেছে ও শেকড় গেড়েছে। আর দক্ষিণের পথেই

অষ্টম শতকে বাংলার দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল ও উপকূলে ইসলামের বাণী প্রবেশ করেছে বলে অনুমান হয় । অতঃপর পূর্ব পথ দিয়ে ইসলাম প্রচারকের দল বিভিন্ন সময় বিচ্ছিন্ন ভাবে বাংলার বিভিন্ন স্থানে এমন কি ঘরে ঘরে ইসলামের বাণী পৌঁছে যায় ।২

রাসূলুল্লাহ সা. ও সাহাবাগণ ইসলামের সত্য, শান্তি ও ন্যায়ের বাণী বিশ্বের প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়াকে নিজেদের ধর্মীয় প্রধান কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করেন। কারণেই মহানবীর সা. জীবদ্দশায় ও তাঁর ইন্তিকালের পর সাহাবাগণ বিশ্বের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েন। এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপসহ সারা বিশ্বে ইসলাম প্রচারে তাঁরা আত্মনিয়োগ করেন। পবিত্র নগরী মক্কা মদীনা থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে প্রাচ্যের চীনেও ছড়িয়ে পড়েছিলেন। মুসলমানগণ বিশ্বের যেখানেই কেন্দ্র স্থাপন করেছেন সেখানেই ইসলাম প্রচার ও ইসলামী জীবন ধারা তথা ফিক্হ চর্চার ধারা প্রবাহিত করেছেন। পারস্য, ইরাক, খুরাসান, হিরাত প্রভৃতি শহর-বন্দরে তাঁরা শক্তিশালী ফিক্হ চর্চার কেন্দ্র গড়ে তুলেছেন। এসব কেন্দ্র হতেই পরবর্তীকালে 'আলিম, ফকীহ, মুবাল্লিগ, মুজাহিদ, সূফী সাধক, ইসলাম প্রচারকগণ ইসলামের বাণী হিমালায়ন উপমহাদেশে ভিত গেড়েছেন। তাঁদেরই কয়েকটি দল দিল্লী অতিক্রম করে পূর্বাঞ্চলের গাঙ্গেয় বদ্বীপে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির বাংলা অভিযানের (১২০৪ খৃ.) অন্তত দুই আড়াইশ' বছর আগে ।৩

রাসূলুল্লাহ সা. ৬ষ্ট হিজরীতে (৬২৮ খৃ.) হুদায়বিয়ার সন্ধির পর থেকে বর্হিবিশ্বে চিঠিসহ দূত প্রেরণের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত প্রেরণ আরম্ভ করেন। তখন তাঁর দরবারে দূর প্রাচ্যের ভারতবর্ষ সর্ম্পকে আলোচনা হত। এমন কি মহানবী সা. হিন্দ তথা ভারতবর্ষ বিজয় সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন,

'হযরত সাওবান রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, আমার উম্মতের অর্ন্তভুক্ত দুটি সৈন্যবাহিনীকে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের আগুন থেকে নিষ্কৃতি দেবেন। তন্মধ্যে একটি হল হিন্দ (ভারত) অভিযানকারী সৈন্যদল আর দ্বিতীয়টি হল হযরত ঈসা ইব্ন মারয়াম আলাইহিমাস্ সালাম- এর সৈন্যদল' ।৪ অপর বর্ণনায় এসেছে,

'রাসূলুল্লাহ সা. আমাদেরকে হিন্দ বিজয়ের ওয়াদা দিয়েছেন। তাই সে সময়ে আমি জীবিত থাকলে অবশ্যই আমার ধন-সম্পদ ও জীবন দিতে কুণ্ঠিত হবনা। ঐ যুদ্ধে আমি নিহত হলে শাহাদতের মর্যাদা পাব আর মঙ্গলমত ফিরে আসলে আমি আবূ হুরায়রা জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি পাব ।'৫

নবুওয়্যতের সপ্তম বছরে রাসূলুল্লাহ সা.-এর মামা আবূ ওয়াককাস রা. হাবসা থেকে একটি সমুদ্রগামী জাহাজ নিয়ে উরওয়া ইব্ন আছাছা রা. , কায়স ইব্ন হুযায়ফা রা. ও আবূ কায়স ইব্ন হারিস রা. এ তিন জন সাথীসহ জাহাজ নিয়ে পূর্বদিকে সুদীর্ঘ বাণিজ্যের পথ ধরে বেরিয়ে পড়েন। প্রথমে ভারতের মালাবার রাজ্যে (কেরালা) উপনীত হন এবং চেরুমল,পেরুমলসহ অসংখ্য লোককে ইসলামে দীক্ষিত করেন। সেখানকার হিন্দু রাজা চেরুমল , পেরুমল ইচ্ছাপূর্বক

১.আব্বাস আলী খান, 'বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস', ঢাকা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার , ১৯৯৪ , পৃ ১৪।
২-৩. আকরম খাঁ, মাওলানা, 'মুসলিম বাংলার সামাজিক ইতিহাস', কলিকাতা,১৩৫৮ বাং, পৃ ৪৮-৮৯ ; আব্দুর রহমান, মুহাম্মদ , ড. ও অন্যান্য, 'বাংলাদেশের ইতিহাস', ঢাকা,১৯৭৭ , পৃ ১৬৩ ; মুহি উদ্দীন খান , মাওলানা, 'বাংলাদেশে ইসলাম কয়েকটি তথ্যসূত্র', ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ঢাকা,১৯৮৮ , পৃ ৩৪৫ ; আব্দুল করিম, ড. , 'চট্টগ্রামে ইসলাম', চট্টগ্রাম, পৃ ৯ ; তোফায়েল আহমদ, 'যুগে যুগে বাংলাদেশ', ঢাকা, ১৯৯২ , পৃ ৩৮ ।
৪-৫. 'সুনান আন-নাসায়ী', দেওবন্দ, দারুল কিতাব, ১৩৫০ হি., খন্ড ২য় , পৃ ৫২।

ইচ্ছাপূর্বক সিংহাসন ত্যাগ করে তাওহীদি চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মক্কায় গমন করেন এবং রাসূলুল্লাহ সা.-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। এ সময় মালাবার বহু সংখ্যক হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করেন।১ তৎকালীন গুজরাটের রাজা ভোজ ইমারতের ছাদে ওঠে চাঁদকে দ্বিখন্ডিত দেখতে পেয়ে ব্রাম্মণদের মাধ্যমে জানতে পারেন যে, আরবের সত্য নবীর আংগুলের ইশারায় এমন হয়েছে। এতে তিনি প্রভাবিত হয়ে মহানবীর নিকট দূত পাঠালে রাসূলুল্লাহ সা. একজন সাহাবাকে ভারতে পাঠান। উক্ত সাহাবা রাজা ভোজকে ইসলামে দীক্ষিত করে তার নাম রাখেন আব্দুল্লাহ। উক্ত সাহাবা ও রাজা ভোজের কবর গুজরাটের দারদা শহরে রয়েছে।২ অপর বর্ণনায় এসেছে, বাবা রতন আল-হিন্দ নামক জনৈক ব্যক্তি মক্কায় গমন করে রাসূলুল্লাহ সা.-এর দরবারে ইসলাম গ্রহণ করে সাহাবা হওয়ার গৌরব অর্জন করেন ।৩

সাহাবী আবু ওয়াক্কস রা. এর বাণিজ্যিক জাহাজ ৬১৭ খৃ. মালাবার হয়ে দীর্ঘ নয় বছরে ৬২৬ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে চীনের ক্যান্টন বন্দরে উপনীত হয়। আবূ ওয়াক্কাস রা. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কোয়াংটা মসজিদটি সমুদ্র তীরে এখনো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। মসজিদের অদূরে তাঁর সমাধি। অপর সাথী উপকূলীয় চুয়ামচু বন্দরের নিকট নিরং নামক পাহাড়ের উপর সমাহিত। তৃতীয় জন দেশের অভ্যন্তরে চলে গিয়েছিলেন। ঐতিহাসিকগণের ধারণা, এ কাফেলা মাঝখানে চট্টগ্রাম কক্সবাজারের মধ্যবর্তী জাহাজ শিল্প নির্মাণ হিসেবে পরিচিত একটি স্থানে যাত্রা বিরতি দিয়েছিলেন এবং মানুষকে ইসলামে দীক্ষিত করেন ।৪

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর রা. এর শাসনামলে সিন্ধুর সাথে আরবদের যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তখন কয়েকজন সম্মানিত সাহাবা ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁরা হলেনঃ **১.** হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইতবান রা.। তিনি ছিলেন আনসারদের বণী হুবালা গোত্রের লোক। তিনি কূফা ও বসরার গর্ভণর ছিলেন। অতঃপর ইরান ও

ভারতবর্ষ অভিযানে বের হন। ২. হযরত ‘আসিম ইব্‌ন আমর আত-তামীমি রা.। তিনি খ্যাতিমান সাহাবা ও সৈনিক ছিলেন। ইরাক বিজয়ে খালিদ ইব্‌ন ওয়ালিদের অন্যতম সহযোগী ছিলেন। সিন্ধু বিজয়ে অংশগ্রহণ করেন। ৩. হযরত সুহার ইবনুল আদবী রা.। তিনি ছিলেন মক্কার কায়েস গোত্রের। ৮ম হিজরীতে মদীনায় ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত ওমরের রাজত্বকালে বসরায় গমন করেন। তিনি পূর্বাঞ্চলীয় যুদ্ধসমুহে অংশগ্রহণ করেন। ৪. হযরত সুহাল ইব্‌ন আদী রা.। আযদ গোত্রের বনু আশহাম শাখার লোক। ১৭ হিজরীতে আল-জাজীরা বিজয়ে সামরিক অভিযানে নেতৃত্ব দেন। ৫. হযরত হাফস ইব্‌ন আবুল আস আস-সাকাফী রা.। তিনি ছিলেন বসরায় হিজরতকারী সাহাবা। হাদীস বর্ণনায় তাঁর অংশগ্রহণ রয়েছে।৫

অপর বর্ণনায় এসেছে, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রা. এর খিলাফতকালে যে কয়জন ইসলাম প্রচারক বাংলাদেশে আগমন করেন তাঁদের দলপতি ছিলেন সাহাবা মাহমূদ ও মুহাইমিন রা.। তখন সাহাবাগণের পাঁচটি দল একের পর এক বাংলাদেশে আগমন করেন। তাঁরা ইসলামে দীক্ষিত নওমুসলিমদের ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা দিতেন। হযরত ওমরের খিলাফতকালে ভারতে রাজা হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে (৬০৬-৬৪৭ খৃ.) একটি ছোট্ট প্রতিনিধি দল বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের জন্য এসেছিলেন বলে জানা গেছে।৬

খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত ওসমান রা. এর রাজত্বকালে (৬৪৪-৬৫৬ খৃ.) দু'জন সাহাবা ভারতবর্ষে এসেছিলেন দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে। তাঁদের একজন হলেন উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মা'মার আত-তামীমি রা. । তিনি ছিলেন মদীনার একজন বিত্তশালী অধিবাসী। হযরত ওসমান রা. তাকে মাকরান ও সিন্ধু উপজাতি বিদ্রোহে পাঠিয়ে ছিলেন। অপর জন হলেন হযরত আব্দুর রহমান ইব্‌ন সামুরা ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন ‘আবদি শামস রা.। তিনি ছিলেন কুরাইশ বংশোদ্ভব। মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেন। ৯ হিজরীতে তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ৬৫০ খৃ. তিনি সিস্তানের গভর্ণর নিযুক্ত হন এবং ভারত সীমান্ত পর্যন্ত জয় করেন। ৫০ হি. /৬৭০ খৃ. তিনি ইন্তিকাল করেন। উমাইয়া খলীফা হযরত আমীর মুয়াবিয়া রা. (৪৪ হি./৬৭৩ খৃ.) এর শাসনামলে এসেছিলেন হযরত সিনান ইব্‌ন সালামাহ ইব্‌ন আল-হুযালী রা. প্রমুখ। তাঁরা মুলতান, বান্না ও আহওয়াজ নামক স্থানে পৌঁছতে সক্ষম হন। এভাবে জলপথের ন্যায় স্থলপথেও মুসলিম ধর্ম প্রচারকগণ ভারতবর্ষে আগমন করেন। উত্তর পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত গিরিপথ দিয়ে তাঁরা প্রবেশ করেন।৭

১.হাসান জামান , ড. , সমাজ, সংস্কৃতি সাহিত্য', ঢাকা , ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র , ১৯৮০ , পৃ ২১২ ; দ্বীন মুহাম্মদ , কাজী , ড. , ‘বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ' , ঢাকা , ইফা বা ,১৯৯৩ , পৃ ১৭৬ ; আব্দুল মান্নান , মোহাম্মদ , ‘বাংলা বাঙালী মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা' , ঢাকা , সৃজন প্রকাশনী , ১৩৯৭ বাংলা , পৃ ১০৪।

২. মহি উদ্দীন , এম , কে , এ , ‘চট্টগ্রামে ইসলাম' , ঢাকা , ইফা বা , ১৯৯৬ , পৃ ১৫-১৬।

৩. ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী র. ‘ইসাবা ফী তামইজে সাহাবা', সিনর , মাতবাউস সা‘আদাহ , ১৩২৮ হি. , খন্ড ১ম , পৃ ১০৯৫ ; গোলাম আহমদ মোর্তজা, ‘ চেপে রাখা ইতিহাস' , ঢাকা , মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ একাডেমী , ২০০৩ , পৃ ৩৩ ; আবুল বাশার , মোঃ , ‘ইসলামে তাসাউফ তত্ত্ব ও বাংলাদেশে এর প্রভাব' , অপ্রকাশিত এম. ফিল থিসিস , ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় , পৃ১৭।

৪. সুলায়মান নদবী , সাইয়্যিদ , ‘আরব হিন্দ কা তায়াল্লুকাত' , এলাহাবাদ ,১৯৩০ , পৃ ৬৯ ; রূহুল আমীন , মুহাম্মদ , ‘বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সূফীদের অবদান' , পি-এইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ , ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় , ১৯৯৬ , পৃ ৫৫।

৫. ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী , প্রাগুক্ত , খন্ড ২য় , পৃ ৩৩৭ , ২৪৭ , ১১৮ ,৯৩ ; ইব্‌ন আব্দিল বার ,‘ আল- ইস্তিয়াবা ফী মা‘আরিফিল আসহাব' , মিসর , মাকতবাহ নাহদাহ , তা বি , খন্ড ২য় , পৃ ৭৮৪ ; ইব্‌ন সা‘আদ , আত-তাবকাত' , করাচী , নাফীস একাডেমী , ১৯৭২ , খন্ড ৮ম , পৃ ১০২।

৬. আব্দুল গফুর , অধ্যাপক ,‘ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ' , ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা , মুসলিম বিশ্ব সংখ্যা , পৃ ৯৭ ; মহি উদ্দীন , এম , কে , এ , প্রাগুক্ত , পৃ ৩১।

৭. ‘ ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা' , ঢাকা , বর্ষ ৪৯ , সংখ্যা ১ম , (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৯ , পৃ ১২২ ; ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী , প্রাগুক্ত , ধন্ড ২য় , পৃ ৪০০-৪০১ ; ইবন সা‘আদাত , প্রাগুক্ত , পৃ ৩৭৮ ; ইব্‌ন আব্দিল বার , প্রাগুক্ত , খন্ড ২য় , পৃ৮৩৫ ; ইসহাক , মো. , ড. , ‘ইলমে হাদীসে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান' , ঢাকা , ইফা বা , ১৯৯০ , পৃ ১২-১৬।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ের মাধ্যমে (৯৩ হি./৭১২ খৃ.) ভারতবর্ষে এক নতুন যুগ ও নতুন ধারার সূচনা হয়। ভারতবাসী তখন নতুন ধর্ম , নতুন শিক্ষা, নতুন ভাষা, নতুন শিল্প-সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হয়। আরবগণ সিন্ধু ও মুলতানে বসতি স্থাপন করতে থাকেন। মুসলমানগণ অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের মত ভারতবর্ষে ইসলাম ইসলামী শিক্ষা প্রচারে ব্যাপক আয়োজন গ্রহণ করেন।১ ৭৫০ খৃ. বাংলায় শুরু হয় পাল বংশের রাজত্ব। অপর দিকে ৭৫০ খৃ. বাগদাদে প্রতিষ্ঠিত হয় আব্বাসীয় খিলাফত। রাজশাহীর পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার খননকালে আব্বাসীয় যুগের (হারুনুর রশীদের রাজত্বকালের ৭৮৬-৮০৯ খৃ.) মুদ্রা পাওয়া গেছে। বৃহত্তর রংপুর জেলার তিস্তা নদীর অদূরে লালমনিরহাট জেলার পঞ্চগ্রাম ইউনিয়নে ৬৯ হিজরীতে প্রতিষ্ঠিত মসজিদের সন্ধান পাওয়া গেছে। এ সমূহ ঐতিহাসিক ঘটনা ও নিদর্শনাবলীর ভিত্তিতে বলা যায় , হিজরী প্রথম শতাব্দীতে বাংলায় ইসলামের আগমন ঘটেছে।২

দশম-একাদশ শতকে আল্লাহর মনোনীত দ্বীন ইসলামের সাম্য, মৈত্রী ও ইনসাফের বাণী গৌড় , চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগের সমুদ্র উপকূল অঞ্চল এবং সিলেট থেকে মঙ্গলকোটসহ সমগ্র বাংলার গ্রামে গঞ্জে গুঞ্জরিত হচ্ছিল। আরব, তুরস্ক ও মধ্য এশিয়ার অসংখ্য পীর, দরবেশ, সূফী সাধক, ‘আলিম, ফকীহ ও মুজাহিদ ইসলাম ধর্ম ও ইসলামী শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে আগমন করেন এবং বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। তাঁরা মুজাহিদ, বিজেতা, শাসক, শিক্ষাক, দ্বীন প্রচারক ও ভাগ্যান্বেষী হিসেবে এদেশে আগমন করেন। ধর্মীয় কর্তব্যের খাতিরে তাঁরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেন। তাঁরা দেশের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ, মাদ্রাসা , খানকাহ ও মকতব প্রতিষ্ঠা করে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তাঁরা এদেশের ভাষা আয়ত্ব করে শিক্ষা সম্প্রসারণের রাস্তা উম্মুক্ত করেন। তাঁদের আমল, আখলাক ও সামাজিক উন্নয়ন মূলক কার্যাবলী সাধারণ মানুষকে ইসলামের প্রতি প্রচন্ড আকর্ষণ করে। ইসলামের নিখুঁত আদর্শের প্রতি ভারতবাসী মুগ্ধ হয়। ইসলাম প্রচারকগণের

সত্যানুরাগ, ধার্মিকতা, মানবতাবোধ, মানবীয় আচরণ ,চারিত্রিক গুণাবলী ভারতীয়দেরকে ইসলাম গ্রহণে সাহায্য করে। মুসলিম ধর্মপ্রচারকগণ এ দেশে আগমন করে ভারতের মাটি , মানুষ, প্রকৃতি ও পরিবেশকে স্থায়ীভাবে গ্রহণ করেন, স্থানীয় মহিলাদের বিয়ে করেন। এভাবে তাদের সাথে মিশে যান। সবার সাথে সহাবস্থানের নীতি গ্রহণ করেন। তৎকালীন বাংলার জাতিভেদ, অভিজাত-অস্পৃশ্য , উঁচু-নীচু ভেদ চিন্তার উর্দ্ধে থেকে ইসলামের মহান আদর্শ তাদের সামনে তুলে ধরেন। বঙ্গদেশকে তারা স্বদেশ রূপে গ্রহণ করেন। ভারতবাসীও তাঁদের সাথে ঘনিষ্ট মেলামেশার মাধ্যমে ইসলামের অমীয় বাণী, আখলাক, ফিকহী জীবন ধারা শিখে নেন। এভাবে আগত দ্বীন প্রচারক, সূফী সাধক, 'আলিম আর ভারতীয় মুসলমানদের সমন্বয়ে বাংলার মুসলিম সমাজ গড়ে ওঠে।৩

সূফীসাধকগণের মাধ্যমে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার ও ফিক্হ চর্চা

মানুষের মধ্যে যাঁরা আল্লাহর অধিকতর নিকটবর্তী তাঁরা জনসমাজে সূফী নামে পরিচিত। তাঁরা চারিত্রিক উন্নতি সাধন করেছেন কুরআন হাদীসকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উৎস হিসেবে গ্রহণ করে। মুসলিম শাসকগণের বাংলা বিজয়ের পূর্বেই সূফী সাধকগণের মাধ্যমে বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার ও ফিক্হ চর্চা হয়েছে। মুসলিম শাসকগণ ঐসব সূফী সাধক মজাহিদ 'আলিমগণের মাধ্যমে বাংলা জয় করতে সক্ষম হয়েছেন। সূফীগণ ছিলেন ফিক্হশাস্ত্রের পন্ডিত ফরীদ উদ্দীন শুক্করগঞ্জ (মৃ-১২৬৯ খৃ.), মাখদূম শাহ সৈয়দ উলুবরী আল-হুজরী ওরফে দাতা গঞ্জেবখশ (মৃ–১০৭৫ খৃ.), খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার উসীর (মৃ-১২৩৬ খৃ.), শেখ বাহা উদ্দীন যাকারিয়া (১১৬৯-১২৬৯ খৃ.), শ্রেষ্ঠ সূফী সাধক ও আধ্যাত্মিক রাহবর খাজা মুঈন উদ্দীন চিশতী র. (১১৪৪-১২৩৫ খৃ.), হযরত শাহ জালাল মুজাররদে ইয়ামানী র.(মৃ-১৩৪৭ খৃ.) প্রমুখের নাম পাওয়া যায়। উপরোক্ত সূফীগণের কেউ কেউ বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর বাংলায় আগমন করেন। তবে এমন তিন জন সূফী সাধকের নাম পাওয়া যায় যাঁরা বাংলাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার আগেই ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ফিক্হ শিক্ষাদানে অসামান্য অবদান রেখেছেন। তাঁরা হলেনঃ ১. শায়খ আহমদ বিন হামযাহ নিশাপুরী র. (মৃ ২৮৮ হি./ ৯০০ খৃ.)। ২. শায়খ ইসমাঈল বিন নাযানদ নিশাপুরী র. (মৃ ৩৪১ হি. /৯৫২ খৃ.) ৩. শায়খ আহমদ তকী র. (মৃ ৫৬৬ হি. /১১৬৯ খৃ.)। এসব সূফী মনীষী সমকালীন প্রয়োজনের তাগিদে ইসলাম প্রচার , ইসলামী শিক্ষা বিস্তার ও ফিক্হ চর্চায় বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। তাঁদের বিষয়ে অসংখ্য কিংবদন্তী ও লোক কাহিনী রয়েছে।১

বাংলার স্বাধীন সুলতানদের আমলে ফিক্হ চর্চা

ভারতীয় জনগোষ্ঠী ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার ফলে মুসলিম শাসনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। ধর্মপ্রচারকগণের ক্রমাগত প্রচারাভিযান মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রকে আরো সম্ভাবনাময়ী করে তুলে। ফলে উপমহাদেশের পশ্চিম-উত্তর সীমানায় উড্ডীন হয় মুসলিম শাসনের বিজয় পতাকা।২ মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের পর অসংখ্য 'আলিম,ফকীহ ও সূফী সাধক বাংলাদেশে আগমন করেন। দ্বাদশ শতকের শেষের দিকে শিহাব উদ্দীন মুহাম্মদ ঘুড়ী দিল্লী অধিকার করে (১১৭৩ খৃ.) ভারতে মুসলিম রাজত্বের গোড়া পত্তন করেন। দিল্লীর পরবর্তী মুসলিম শাসক দাশ বংশের কুতুব উদ্দীন আইবেক এর রাজত্বকালে (১২০৬ -১০ খৃ.) মুসলিম শাসন বিহার পর্যন্ত অগ্রসর হয়। ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী বিহার থেকে যাত্রা করে দ্রুত অগ্রসর হয়ে অতর্কিত ভাবে নদীয়া (রংপুর) শহরে প্রবেশ করে অভিযান চালিয়ে রাজা লক্ষনসেনের অবকাশ যাপনকালীন রাজধানী নদীয়া (রংপুর) দখল করে লাখনৌতে রাজধানী স্থাপন করে বঙ্গদেশে (বাংলাদেশ ও পশ্চিম বঙ্গ) মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন করেন। অতঃপর ক্রমান্বয়ে সমগ্র বাংলাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। যা ১৭৫৭ খৃ. পলাশীর বিপর্যয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর বাংলা জয়ের পর ইসলাম রাষ্ট্রীয় ভাবে স্বীকৃতি লাভ করে ও পৃষ্ঠপোষকতা পায়। বাংলা ভুখন্ডে প্রতিষ্টিত হয় অসংখ্য মসুজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহ। এগুলোতে কুরআন, হাদীস ও ফিক্হর ব্যাপক চর্চা হত। সূফী ও 'আলিমগণ নিজেদেরকে ফিক্হ চর্চায় ব্যস্ত রাখেন। তখন বিহার ছিল 'আলিমে দ্বীনের পূণ্যভূমি। অনেক 'আলিম সরকারী বড় বড় পদে চাকুরি করেছেন।৩ সুলতান ইলতুতমিশ (১২১১ -১২১৩ খৃ.) ছিলেন শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি বিকাশের একজন মহাপুরুষ। বাগদাদের উন নামক স্থানের কুতুব উদ্দীন নামক জনৈক ধর্মীয় পন্ডিত ইলতুতমিশের শাসনামলে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে তিনি দিল্লীর কুতুব মিনার তৈরি করেন। তাঁর শাসনামলে দিল্লীতে অসংখ্য মাদ্রাসা স্থাপিত হয় এবং দিল্লী ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়।৪ সুলতান গিয়াস উদ্দীন আযম শাহ (১৩৯২ -১৪১০ খৃ.) ছিলেন ইসলামী শিক্ষার বলিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক। সুদূর আরবের পবিত্র মক্কা নগরীতে তিনি একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রচুর অর্থ ও ভূমি ক্রয় করে ওয়াক্ফ করেন। সুলতান আলা উদ্দীন হোসেন শাহর শাসনামলে (১৪৯৩ -১৫১৯ খৃ.) তাঁর প্রচেষ্টায় এ দেশে কুরআন, হাদীস, ফিক্হ চর্চার ব্যাপক উন্নতি হয়। শিক্ষা সম্প্রসারণে তিনি অসামান্য ভূমিকা রাখেন। তিনি দূর এলাকায় বসবাসরত আলিমদেরকে নিজ এলাকায় নিমন্ত্রণ জানাতেন ও তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তিনি বিদ্যান ও ধর্মবেত্তাগণের জন্য ভাতার প্রবর্তন করেন। তিনি আরবী, ফার্সী ও বাংলা সাহিত্যের প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করতে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তাঁর ও অন্যান্য স্বাধীন সুলতানগণের প্রচষ্টায় এ দেশে অনেক মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। বর্তমানে দিনাজপুরের মাহিসন্তোষ নামক স্থানে অবস্থিত মাওলানা তকী উদ্দীন আরাবী কর্তৃক স্থাপিত মাদ্রাসা, সোনারগাঁও-এ শায়খ শরফ উদ্দীন আবূ তাওয়ামা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা, রাজশাহীর বাঘায় মাওলানা শাহ দৌলার প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা ও গৌড়ে অবস্থিত আলা উদ্দীন হোসেন শাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা তাঁদের কর্মের নীরব সাক্ষী। সুলতান নাসির উদ্দীন নুসরাত শাহ

(১৫১৯ -১৫৩২ খৃ.) ইসলামী সম্প্রসারণে অসাধারণ ভূমিকা রাখেন। তিনি বিভিন্ন স্থানে মসজিদ, মাদ্রাসা ও অনেক পবিত্র স্থান গড়ে তোলেন। গৌড়ের বড় সোনা মসজিদ, কদমরাসূল ও বাঘা মসজিদ তাঁর আমলে নির্মিত। এসব শাসক শাসনকার্যে ইসলামী রূপরেখা আলিমদের নিকট হতে জেনে নিতেন।আলিমগণ অনৈসলামিক কাজে বাধা প্রদান করতেন৫।

১.আব্দুল মান্নান তালিব, 'বাংলাদেশে ইসলাম' , ঢাকা , ইফা বা , ২০০২ , পৃ ৮১ ; আব্দুল করিম , ড. , ' মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য' , ঢাকা , বাংলা একাডেমী , ১৯৯৪ , পৃ ১৭ ; এম , এ , রহিম , ড. , প্রাগুক্ত , পৃ ৬৬ ; আসখার ইবনে শায়খ , 'মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা' , ঢাকা , ইফা বা ,২০০৩ , ২য় সংস্করণ , পৃ ২৫১।
২. তারা চাঁদ , ড. , 'ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব' , ঢাকা , ইফা বা , ১৯৯১ , পৃ ৪১-৪২।
৩. আব্দুল মান্নান তালিব , প্রাগুক্ত , পৃ ৬৪-৬৫ ; আব্দুল করিম , ড. , প্রাগুক্ত , পৃ ২১২-২২১ ; আমীমুল ইহসান , মুহাম্মদ , মুফতী , সায়্যিদ , 'তারীখে 'ইলমে ফিক্হ' , দিল্লী , কুরআন বাজার উর্দু জামে মসজিদ , ১৯৬২ , পৃ ১৫৫ ; কে আলী , ' পাক ভারতের ইতিহাস' , ঢাকা , গ্লোব লাইব্রেরী , ১৯৯৪ , পৃ ৩০।
৪. কে আলী , প্রাগুক্ত , পৃ ২৭৮ ; সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত , ' শিক্ষা দর্শন ও ইসলাম' , ঢাকা , ইফা বা , ২০০৪ , পৃ ৪২-৪৩।
৫. আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ , ড. , 'বাংলাদেশের খ্যাতিনামা আরবীবিদ' , ঢাকা , ইফা বা ,১৯৮৬ , পৃ ২-৮ ; রহিম , এ , এম , ড. , প্রাগুক্ত , পৃ ১৮২।

যেসব সূফী সাধক,'আলিম, ফকীহ বাংলাদেশে ফিক্হ চর্চার জগতে অসামান্য অবদান রেখে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম কয়েকজন হলেনঃ

শায়খ জালাল উদ্দীন তাবরিজী র.

শায়খ জালাল উদ্দীন তাবরিজী র. বাংলাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বেই একজন ইসলাম প্রচারক, সূফী ও ফকীহ হিসেবে বাংলাদেশে **১২১৬** খৃ. আগমন করেছেন বলে জানা গেছে। তিনি হাজার হাজার অমুসলিমকে ইসলামে দীক্ষিত করতে সক্ষম হন। তিনি ভারতের পান্ডুয়ায় অবস্থানকালে সেখানকার সূফী, ফকীহ, মুহাদ্দিস বাহা উদ্দীন যাকারিয়া মুলতানীর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং তাঁর সাথে দেশ-বিদেশে সফর করেন। শেখ জালাল উদ্দীন তাবরিজীর অলৌকিক বিষয়ে মুগ্ধ হয়ে রাজা লক্ষনসেন তাঁকে একটি মসজিদ নির্মাণের অনুমতি দান করেন এবং উক্ত মসজিদ ও খানকাহ পরিচালনার জন্য কয়েকটি গ্রাম দান করেন। শায়খ জালাল উদ্দীন তাবরিজী র. সেখানে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন এবং নব দীক্ষিত মুসলমানদের ইসলামী জ্ঞান তথা ফিক্হ শিক্ষাদান করেন। **১২২৫** খৃ. তিনি জান্নাতবাসী হন।১

মাওলানা তকী উদ্দীন আরাবী র.

ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধে আরব থেকে বাংলায় আগত একজন খ্যাতিমান ইসলাম প্রচারক হলেন মাওলানা তকী উদ্দীন ইব্ন আনইনুদ্দীন আরাবী। তিনি বাংলাদেশে আগমন করে রাজশাহী (নওগাঁ) ও মাহিসুন (মাহিসন্তোষ) – এ ইসলাম প্রচার করেন এবং ইসলামী শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত এ মাদ্রাসা বাংলায় প্রথম ফিক্হ চর্চা কেন্দ্র বলা যায়। তকী উদ্দীন ছিলেন একজন উঁচু মাপের 'আলিম, মুহাদ্দিস ও ফকীহ। তিনি 'কুদওয়াতুল

ফুকাহা ওয়াল মুহাদ্দিসীন' উপাধীতে ভূষিত ছিলেন। তাঁর খ্যাতি বাংলার বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি সোনারগাঁও-এ একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন বলে জানা গেছে। তার মৃত্যু ও জীবনকাল সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। মাহিসুনে তাঁর মাজার রয়েছে।২

কাজী রুকনুদ্দীন সমরকন্দী র.

কাজী রুকনুদ্দীন সমরকন্দী র. ছিলেন বাংলায় মুসলিম শাসনামলের প্রথম যুগের একজন বিজ্ঞ পন্ডিত। সমরকন্দের বুখারায় তাঁর জন্ম এবং সেখানেই শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। তিনি হাদীস ও ফিক্হশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি আলী মার্দান খিলজীর আমলে (১২১০-১২১৩ খৃ.) বাংলায় আগমন করেন। তিনি বেশ কিছু পুস্তক রচনা করেছেন। তন্মধ্যে 'কিতাবুল ইরশাদ' এবং 'আল-খিলাফ ওয়াল জাদাল' উল্লেখ যোগ্য। তিনি বাংলাদেশে কিছু দিন অবস্থান করে বুখারায় ফিরে যান এবং ৬১৫ হি. সেখানে ইন্তিকাল করেন।৩

শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা র.

মুসলমানদের বাংলা জয়ের পর যে খ্যাতিমান সূফী, 'আলিম, ফকীহ্, মুহাদ্দিস, মুজাহিদ, সমাজসেবী বাংলায় আগমন করেন এবং ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষা প্রসারে অসাধারণ ভূমিকা রাখেন তিনি হলেন শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামাহ র.। তাঁর সার্বিক যোগ্যতা সম্বন্ধে তাঁর শিষ্য শায়খ শরফুদ্দীন আহমদ ইয়াহয়া মানেরী র. (৬৬১-৭৮২ হি.) বলেন,

'মাওলানা শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামাহ এমন একজন 'আলিম ছিলেন যে, সমগ্র ভারতের দৃষ্টিই ছিল তাঁর দিকে। আর জ্ঞানের জগতে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিলনা।' ইয়াহয়া মানেরী আরো বলেন, সোনারগাঁও পৌঁছে তিনি ইলমী সেবায় একান্তভাবে নিবিষ্ট হন।' এ মনীষীর জন্ম ইসলামের লীলাভূমি বুখারায়। তিনি শিক্ষাগ্রহণ করেন খুরাসানে। তাঁর জ্ঞান ও পান্ডিত্যের খ্যাতি অল্প দিনের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ১২৬০ খৃ. তিনি দিল্লীতে আসেন। অল্প দিনের মধ্যে দিল্লী বাসী তাঁর প্রতি অনুরক্ত হন। দিল্লীতে তাঁর পরিচালিত লঙ্গরখানা ব্যাপক সাড়া জাগিয়ে তোলে। তাঁর এ বর্ধিষ্ণু জনপ্রিয়তায় দিল্লীর সুলতান গিয়াস উদ্দীন বলবন(১২৬৫-১২৮৭ খৃ.) আতঙ্কিত হন। তাই তাঁকে সোনারগাঁও চলে আসতে বলেন। ১২৭০/১২৭৮ খৃ. তিনি দিল্লী হতে সোনারগাঁও চলে আসেন। বাংলায় আগমন পথে তিনি বিহারের মানের নামক স্থানে কিছু দিন অবস্থান করে শায়খ ইয়াহইয়া মানেরী নামক মনীষীর আতিথ্য গ্রহণ করেন। আবূ তাওয়ামাহ ইয়াহইয়া মানেরীর অল্প বয়স্ক পুত্র শরফুদ্দীন এর মেধা দেখে মুগ্ধ হন এবং তাকে সংগে করে সোনারগাঁও নিয়ে আসেন। সোনারগাঁও এসে তিনি অমুসলমানদের মধ্যে ইসলাম প্রচার ও হাদীস, ফিক্হ শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করেন। সোনারগাঁও-এ তিনি একটি মাদ্রাসা
স্থাপন করেন। ইতিপূর্বে বাংলাদেশে কোথাও এত বড় মাদ্রাসা স্থাপিত হয়নি। বাংলায় সর্ব প্রথম তিনি হাদীসের বিখ্যাত দুই

১.আব্দুল মান্নান তালিব , প্রাগুক্ত . পৃ ৯১-৯৪ ; ওবায়দুল হক , এম , মাওলানা , 'বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ' , ফেনী , হামিদিয়া লাইব্রেরী , ১৯৬৯ , পৃ ২৭১।
২. আব্দুল করিম , মোঃ , 'রাজশাহী জেলার কতিপয় সূফী সাধক' , 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা' ,৪১ বর্ষ , ৪র্থ সংখ্যা , (এপ্রিল-জুন ২০০২) , পৃ ১৫২ ; আব্দুল করিম , ড. , প্রাগুক্ত , পৃ ১৮৬ ; এসহাক , মোহাম্মদ , ড. , ' ইন্ডিয়ান কনসটিটিউশান টু দ্যা স্টাডি অব হাদীস লিটারেচার' , ঢাকা , দি ইউনির্ভাসিটি প্রেস অব ঢাকা , ১৯৭৬ , পৃ ৫।
৩. নূরুল আলম , এম , কে , এ , ও আফাজ উদ্দীন মুহাম্মদ , প্রাগুক্ত , পৃ ৮৬।

কিতাব বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ শিক্ষাদান করেন। তিনি হাদীস ও ফিক্হ শিক্ষাদানে প্রাতিষ্ঠানিক ধারা চালু করেন। বাংলার বাইর থেকেও অসংখ্য শিক্ষার্থী সোনারগাঁয়ে ভীড় করত। সোনারগাঁয়ে তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি বাংলার মুসলিম সমাজের আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনাকে কুরআন-হাদীস ও ফিক্হ অনুযায়ী গঠনে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত হানাফী ফকীহ। হাদীস , ফিক্হ ছাড়া রসায়ন ও প্রকৃতি বিদ্যায়ও পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত একশ' পংক্তি বিশিষ্ট 'মসনবী বনামে হক' ফিক্হশাস্ত্রের মূল্যবান অবদান। এ মনীষী ১৩০০ খৃ. সোনারগাঁয়ে ইন্তিকাল করেন এবং সেখানেই তাঁর মাজার রয়েছে।১

শায়ক শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরী র.

শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরী র. বিহারের মানের শহরে ১২৬৩ খৃ. জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র পনের বছর বয়সে শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামাহ'র সংগে সোনারগাঁও আসেন এবং পনের বছর সেখানে অবস্থান করে শায়খ আবূ তাওয়ামাহ'র নিকট হাদীস, ফিক্হ ও অন্যান্য বিষয়ে ব্যৎপত্তি অর্জন করেন। সাথে আধ্যাত্মিক সবকও অর্জন করেন। তিনি অধ্যয়ন, জ্ঞানচর্চা ও গবেষণায় এতটাই তন্ময় থাকতেন যে, বাড়ী থেকে আগত চিঠিপত্র পড়ার সময় পেতেন না। শিক্ষা সমাপ্তি ও আধ্যাত্মিক সবক অর্জনের পর সযত্নে রক্ষিত চিঠিগুলো পড়ে পিতার মৃত্যু সংবাদ সর্ম্পকে অবগত হন। তিনি উস্তাদের কন্যার সাথে পরিনয় সূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁর জ্ঞান ও পান্ডিত্যের খ্যাতি অল্প দিনের মধ্যে ভারতবর্ষের চতুরদিকে ছড়িয়ে পড়ে। উস্তাদ শিষ্যের সমন্বিত প্রচেষ্টায় সোনারগাঁয়ের ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি হাদীস ও ফিক্হ শিক্ষাদানে শ্রেষ্ঠতম অবদান রাখতে সক্ষম হয়। শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহয়া মানেরী রচিত গ্রন্থসমূহ তাঁর জ্ঞান ও পান্ডিত্যের

মাখদুম-ই জাহানিয়্যান

মাখদুম-ই জাহানিয়্যান ১৩০৭ খৃ. উচ্চ নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। খাজা বাহাউদ্দীন উচ্চী এবং মুহাদ্দিস জালাল উদ্দীনের নিকট প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণ করেন। পরে বাহা উদ্দীন যাকারিয়ার মাদ্রাসায় ভর্ত্তি হন। সেখানে ইলমে হাদীস ও ফিক্হ'র জ্ঞান লাভ করেন।

পরবর্তীতে তিনি একজন সূফী, মুহাদ্দিস ও ফকীহ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। ১৩৮৩ খৃ. তিনি ইন্তিকাল করেন। উচ্চ নগরীতে তাঁকে সমাহিত করা হয়েছে।১

শায়খ আলা উদ্দীন আলাউল হক র.

শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবীর র. 'তাযকিরা-ই আউলিয়া' গ্রন্থের বর্ণনামতে ৭০১ হি./১৩০১ খৃ. তাঁর জন্ম। তাঁর পূর্ব পুরুষগণ অর্থাৎ পিতা উমর ইব্‌ন আসাদ খালিদী ১৩০১ খৃ. লাহোর থেকে বাংলায় আগমন করেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। শায়খ আলাউদ্দীন আলাউল হক-এর শৈশবকাল কেটেছে বাংলায়। অতঃপর তিনি পান্ডুয়ায় আঁখি সিরাজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং হাদীস, ফিক্‌হ ও অন্যান্য বিষয়ে পান্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি পান্ডুয়ায় বসবাস করেন এবং সেখানে একটি খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেন। খানকাহর মাধ্যমে পরিচালিত হত বিশাল লঙ্গরখানা। এর পেছনে তিনি এত বিপুল অর্থ ব্যয় করতেন যে, সুলতান সিকান্দর শাহ (১৩৫৮-১৩৮৯ খৃ.) তাঁর প্রভাবে ভীত হয়ে তাঁকে সোনারগাঁও নির্বাসিত করেন। সোনারগাঁও-এ তিনি ইসলাম প্রচার ও দ্বীনি শিক্ষা সম্প্রসারণে কাজ করতেন। শিকান্দর শাহ'র মৃত্যুর পর তিনি পুনরায় পান্ডুয়ায় চলে যান। ১৩৯৮ খৃ. তিনি ইন্তিকাল করেন। পান্ডুয়ার ছোট দরগাহ'য় তাঁর সমাধি রয়েছে।২

শাহ নূর কুতুবুল আলম

শাহ নূর কুতুবুল আলম র. এর জন্ম ১৩৫০ খৃ. পান্ডুয়ায়। সেখানেই তিনি লালিত পালিত হন। হামীদ উদ্দীন নাগরির নিকট হাদীস ও ফিক্‌হ'র জ্ঞানার্জন করেন। তিনি ছিলেন যুগের শ্রেষ্ঠ আলিম। তাঁর প্রতিষ্ঠিত খানকাহ ও মাদ্রাসার খ্যাতি বাংলাসহ সারা ভারতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং ইসলামী জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। মাদ্রাসাটি তদানীন্তন বাংলার মুসলমানদের জন্য ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবন গঠনে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। মাদ্রাসার অধীন একটি লঙ্গরখানা ও একটি চিকিৎসালয় পরিচালিত হত। পরবর্তীতে এসব প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহের জন্য সুলতান আলা উদ্দীন হোসেন শাহ (১৪৯৩ -১৫১৯ খৃ.) অনেক সম্পত্তি দান করেন। মানিকপুরে শায়খ হুসামুদ্দীন, লাহোরের শায়খ কাযু, আযমীরের শায়খ শামসুদ্দীন এবং তাঁর দুই পুত্র শায়খ বরকত উদ্দীন ও শায়খ আনোয়ার এবং পৌত্র শায়খ জাহিদ ইতিহাস প্রসিদ্ধ পান্ডুয়া মাদ্রাসার ছাত্র ছিলেন। নূর কুতুবুল আলম অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেন। 'রাসাইল' তাঁর প্রসিদ্ধ রচনা। ১৪১৬ খৃ. তিনি ইন্তিকাল করেন।৩

খান জাহান আলী খান

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার ও ইসলামী শিক্ষা প্রচারে যিনি অক্লান্ত ও নিঃস্বার্থ পরিশ্রমের মাধ্যমে একে শক্তিশালী ও অপ্রতিদ্বন্ধি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন, যিনি ফিক্‌হী বিধানকে রাষ্ট্র পরিচালনায় যাবতীয় আইনের অধীন করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি হলেন সূফী খান জাহান আলী খান। তিনি বাংলাদেশে এমনকি ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচার ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছেন। এমনকি অধঃপতিত, নির্যাতিত, নিপীড়িত ও হতাশাগ্রস্থ মানুষের মাথায় শান্তনার পরশ বুলিয়েছেন, তাদের সুখে-দুখে অংশীদার হয়েছেন ও সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। ফলে সমাজের বৃহত্তর মানুষের সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করেন। তাঁর আহবানে অসংখ্য অমুসলিম ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয়গ্রহণ করেন। বাংলায় মুসলিম শাসন সম্প্রসারণ, জনসেবা ও ফিক্‌হ চর্চায় অসাধারণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হন। বাগেরহাটে তাঁর ষাট গম্বুজ মসজিদটি তাঁর ইবাদতগাহ, দরবারহল, ইসলাম প্রচার ও ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হত।। সেখানে আরবী ও ফার্সী ভাষায় কুরআন, হাদীস ও ফিক্‌হ'র চর্চা হত।

১.এসহাক , মুহাম্মদ , ড. , প্রাগুক্ত , পৃ ৭৪।
২-৩. আব্দুল মান্নান তালিব , প্রাগুক্ত , পৃ ১৩৪-৩৫ , ১৫৩-৫৪ ; আব্দুল হাই , প্রাগুক্ত , পৃ ২৮ , ১২৬ ।
৪. আব্দুল জলিল , এম , এফ , এ , 'সুন্দর বনের ইতিহাস' , খুলনা , মেহেদী বিল্লাহ , ১৯৬৭ , ১ম সংস্করণ, খন্ড ১ম-২য় , পৃ ৩০২-০৩; রহিম , এ, এম , ড. , প্রাগুক্ত , পৃ ১১৫।

আমীর তাতার খান

আমীর তাতার খানের আমলে আলম ইব্‌ন 'আলিয়া আন্দরপাতি র.(মৃ- ৭৮৬ হি.) ছিলেন একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ। ভারতে মুসলিম শাসনের গোঁড়ার দিকে আমীর তাতার খানের নির্দেশে ও তাঁর সহায়তায় 'ফাতাওয়া-ই তাতারখানিয়া' গ্রন্থখানা রচনা করেন। উপমহাদেশে রচিত এটিই প্রথম ফিক্‌হী গ্রন্থ।১

মোঘল আমলে ফিক্‌হ চর্চা

মোঘল শাসনামলে (১৫২৬-১৮৫৭ খৃ.) ভারতবর্ষে ফিক্‌হ চর্চার নতুন ধারা জন্ম নিয়েছিল। মোঘল শাসন ভারতে শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সর্বাধিক অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। এ আমলে বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। মোঘল শাসকগণের অনেক অফিসার ফিক্‌হ বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। কাযী, মুফতী, সদরুস সুদুর, শায়খুল ইসলামগণ ফিক্‌হ বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তবে এসব ফকীহ লিখনী ধারন করেননি বলে তাদের পরিচয় উদ্ধার করা যায়নি।২

সুলতান ফিরোজ শাহ

সুলতান ফিরোজ শাহ ৭৫৩ হি. দিল্লীর ফিরোজাবাদে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। ঐতিহাসিক জিয়া উদ্দীন বার্ণীর মতে শান-শৌকত, সৌন্দর্য, সৌকর্য, ইমারত, সুব্যবস্থাপনা, শিক্ষার সুষ্ট পরিবেশ হিন্দুস্তানের সমস্ত মাদ্রাসার মধ্যে ছিল সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ।৩

শেরশাহ

মোঘল শাসক শেরশাহ (১৫৪০ -৪৫ খৃ.) প্রতিষ্ঠিত শেরশাহী মাদ্রাসা ছিল প্রসিদ্ধ। তিনি মসজিদ নির্মাণের পাশাপাশি মসজিদের পাশে আরবী ও ফার্সী ভাষায় ফিক্‌হ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। তিনি জৌনপুরে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। সেকালে জৌনপুরকে বলা হত'সিরাজে হিন্দ'। সম্রাট শেরশাহ শহরটি প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে বিবি রাজা বেগম নাম্নী জনৈকা মহিলা ৮৪৫ খৃ. জৌনপুরে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। ১৭৮৮ খৃ. শহরটি ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। সম্রাট শেরশাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ওয়াক্‌ফ প্রথা চালু ছিল। মসজিদ, মাদ্রাসার ব্যয় নির্বাহের জন্য ফান্ড গঠন করেছিলেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জন্য আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা ছিল।৪

সম্রাট শাহজাহান

সম্রাট শাহজাহানের শাসনামলে ইসলামী জ্ঞান চর্চা ছিল উল্লেখ করার মত। তাঁর সময়ে সায়্যিদ আহমদ সা'ঈদ 'ইলমে ফিকহে পারদর্শী ছিলেন। ফরিদপুরের বাসিন্দা মৌলবী সিরাজ উদ্দীন আহমদ মোঘল সম্রাট শাহ আলমের উস্তাদ ছিলেন।৫

সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর র.

মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর র. (১৬৫৮ -১৭০৭ খৃ.) ইতিহাসে জিন্দাপীর হিসেবে খ্যাত। ঐতিহাসিক বিচারে সম্রাট অশোকের পর তিনিই ভারতবর্ষের সর্বাধিক বড় শাসক। সকল সম্রাটের চেয়ে তাঁর রাজত্ব সর্বাধিক বিস্তৃত। 'ক্যামব্রীজ' হিস্টোরির রচয়িতা বলেন, 'তাঁর শাসন গজনী থেকে চট্টগ্রাম এবং কাশ্মীর থেকে কর্ণাটক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।'৬ সম্রাট আলমগীর বাদশাহ আকবর (১৫৫৬ -১৬০৫ খৃ.)-এর ইসলাম বিরোধী কর্মকান্ডগুলো বিলুপ্তির পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। আওরঙ্গজেব ছিলেন ফিক্‌হশাস্ত্রের সুপন্ডিত। তিনি টুপি সেলাই ও পবিত্র কুরআন নকল করে নিজের সংসার চালাতেন। প্রতিদিন দু' তিন বার প্রকাশ্য দরবার ডাকতেন এবং জনগণের অভিযোগ শুনে ইসলামী শরী'আ মতে ফয়সালা দিতেন। দেশের প্রাজ্ঞ আলিমগণকে দরবারে স্থান দিয়ে 'ফাতাওয়া-ই আলমগীরি' সংকলান করান। উক্ত ফাতাওয়া গ্রন্থ রচনায় সাতশ' আলিমের সমন্বয়ে একটি ফাতাওয়া বোর্ড গঠন করা হয়। উক্ত গ্রন্থ সংকলকগণের সবাই ছিলেন হানাফী মাযহাবের আলিম, তার্কিক, বাগ্মী ও ফিক্‌হ'র শিক্ষক। তাই হানাফী ফিক্'হর অর্ন্তগত মাসআলাসমূহ সংযোজন করা হয়েছে। এ দলের দিক নির্দেশক ও প্রধান ছিলেন শায়খ নিযাম উদ্দীন বুরহানপুরী। সম্রাট আওরঙ্গজেব এ প্রকল্পে দুলাখ রূপি খরচ করেন। ইসলামী শিক্ষাবিদ, মুহাদ্দিস, ফকীহ, কবি, সাহিত্যিক ও ইসলামী শিক্ষায় তিনি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে প্রণিত ফাতাওয়া আলমগীরি ফিক্‌হশাস্ত্রের অমর সৃষ্টি। যা বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়ে বাংলা ভাষায় ফিক্‌হ চর্চার রাস্তাকে সম্প্রসারিত করেছে। মুসলিম বিশ্ব তাঁর এ সংকলনের কাছে ঋণী। মিসর ও তুরস্কে এ গ্রন্থটি ফাতাওয়া হিন্দিয়া নামে পরিচিত। তাঁর যুগের বিচারক, কাযী, ও মুফতীগণ উক্ত গন্থের আলোকে মীমাংসা দিতেন। শাসনকার্য পরিচালনায় গ্রন্থটির অনুসরণ করা হত।৭

১.'ফাতাওয়া ও মাসাইল' , প্রাগুক্ত , পৃ ১৩৩ ; কে আলী , 'বাংলাদেশ ও পাকভারতের ইতিহাস' , ঢাকা , গ্লোব লাইব্রেরী ,১৯৭৯ , পৃ ২২৮-২৯ ; রামেশ মজুমদার , 'বাংলাদেশের ইতিহাস' , কলকাতা , ১৩৮০ বাং , পৃ ২৩৪-৩৫।
২.রাশিদ, মুহাম্মদ , 'বাংলাদেশে ফিক্‌হশাস্ত্রের উন্নতি ও অগ্রগতি' , অপ্রকাশিত পি এইচ-ডি, থিসিস , ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯০, পৃ ৮৮।
৩.' শিক্ষা দর্শন ও ইসলাম' , প্রাগুক্ত , পৃ ৪৫-৪৬।
৪-৫.প্রাগুক্ত , পৃ ৬২-৬৩ ,৬৫-৬৮ ; নেছার উদ্দীন , ম, ই, আ, ড., প্রাগুক্ত , পৃ ৭৪-৭৫।
৬-৭. ইসহাক ভাট্টি , 'বাররে সগীরে পাক ও হিন্দ মে 'ইলমে ফিক্‌হ' , লাহোর , ইদারাই ইসলামিয়া , ১৯৭৩ , পৃ ৮০-৮১ ; নেছার উদ্দীন , ম , ই , আ , ড. , প্রাগুক্ত , পৃ ৫০-৫১ , ৭৬, ৭৭ ; 'সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস' , প্রাগুক্ত , খন্ড ৫ম , পৃ ৩৫ , ৬৬ , ৭০।

অবিভক্ত বাংলার সুলতানী আমলের পরবর্তী যুগের খ্যাতিমান 'আলিম, ফকীহ ও মুফতীগণ যাঁরা তাফসীর, হাদীস ও ফিক্‌হ চর্চায় অসামান্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন তাঁদের বিখ্যাত কয়েকজন হলেন ঃ

মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী র.

মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী র. ১২১৫ হি./১৮০০ খৃ. উত্তর ভারতের জৌনপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলবী র. এর খলীফা এবং বাংলার অন্যতম হাদী ছিলেন। তাফসীর, হাদীস, ফিক্‌হ ও তাসাউফে ব্যুৎপত্তির অধিকারী ছিলেন। ১৮৭৩ খৃ. রংপুরে ইন্তিকাল করেন। রংপুর জজকোর্টের দক্ষিণ পাশের মসজিদের সামনে তাঁকে সমাহিত করা হয়েছে। তিনি আজীবন 'ইলম চর্চা, সমাজকর্ম ও জনকল্যাণে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে ফিক্‌হ বিষয়ক গ্রন্থসমূহ হলঃ ক. 'মিফতাহুল জান্নাত'। এ গ্রন্থে বেশ কিছু ফিক্‌হী মাসআলা চয়ন করা হয়েছে। বাংলা ভাষায় এর অনুবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। খ. কুওয়াতুল ঈমান'। এটি কারামত আলী জৌনপুরীর রচিত ৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত ফিক্‌হী গ্রন্থ। গ. মাকামিউল মুবতাদি'ঈন'। জৌনপুরী র. রচিত ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত একটি গ্রন্থ। এতে বিদ'আত ও বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।১

খান বাহাদুর আব্দুল গফূর নাসসাখ

খান বাহাদুর আব্দুল গফূর নাসসাখ র. এর জন্ম ফরিদপুর জেলার রাজাপুরে। তিনি ছিলেন একজন সরকারী কর্মকর্তা তথা জজ। তাঁর রচিত 'নুসরাতুল মুসলিমীন' ফী রাদ্দি 'আলা গায়রি মুকাল্লিদীন' ৪১ পৃষ্ঠা সম্বলিত একটি গ্রন্থ। এতে গায়রে মুকাল্লিদীনদের সমালোচনা করা হয়েছে এবং যে অপরিহার্য সে বিষয়ে প্রামানিক আলোচনা করা হয়েছে। ১৮৮৯ খৃ. নাসসাখ কলকাতায় ইন্তিকাল করেন। তালবাগারনে তাঁকে দাফন করা হয়েছে।২

সূফী মিয়া জানশাদ

আলহাজ সূফী মিয়া জানশাদ ছিলেন টাংগাইলের অধিবাসী। ১৯০০ খৃ. এ মনীষী ইন্তিকাল করেন। তাঁর রচিত ‘মীযান-ই মু‘ঈন’ ৫৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত টাংগাইলের করটিয়া থেকে মুদ্রিত হয়। এ গ্রন্থে ফিক্‌হী বিধিবিধানের রহস্য ও ফযীলত বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।৩

আব্দুল করীম খাকী

আব্দুল করীম খাকী রচিত ২৪ পৃষ্ঠার ‘রিসালাই চেরাগে ঈমান’ ১৮৮৮ খৃ. কলকাতার রিপন প্রেস হতে মুদ্রিত হয়। সুদকে যারা হালাল বলার অপচেষ্টায় লিপ্ত এবং যারা রাসূলুল্লাহ সা. এর মিরাজকে অস্বীকার করে গ্রন্থটি তাদের বক্তব্যের জবাবে রচিত।৪

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল হাই আখতার সিদ্দীকী

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল হাই আখতার সিদ্দীকী ১৮৪১ খৃ. কিশোরগঞ্জের বৌলাই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষার সুপণ্ডিত। এ তিন ভায়ায় তিনি ৫৫টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। ১৯২০ খৃ. এ মনীষী ইন্তিকাল করেন। একজন দ্বীনদার আলিম , লেখক, কবি ও সাহিত্যিক হিসেবে তিনি সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন। তাঁর রচিত ‘মাসলাকুল আহনাফ ফী মাসাইলিল ই‘তিকাফ’ একটি বিখ্যাত রচনা।৫

মৌলবী আবূ ইউসুফ মুহাম্মদ আলী

মৌলবী আবূ ইউসুফ মুহাম্মদ আলীর জন্ম ১৮৫২ খৃ. কুমিল্লার দাউদ কান্দিতে। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ পীর খান্দানের সেখানেই সমাহিত হন। এ মনীষী আজীবন সমাজ সেবা, জ্ঞান প্রচার ও ফিক্‌হ চর্চায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। দীর্ঘ তেত্রিশ বছর তিনি বাংলা ও আসামে ফিক্‌হ চর্চায় নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর রচিত ১২১ টি গ্রন্থের মধ্যে ফিক্‌হ বিষয়ক

), ২. আন-নাওয়াদিরিল মুনীফা ফী প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হলঃ ১.‘ আল-আযহার ফী তাসামুহি শারহিল মুখতাসার’ (

),), ৪. ‘ইযহারে হক’ ( ), ৩. ‘হিদায়াতুন নিসওয়ান’ (মানাকিবি আল-ইমাম আবী হানীফা’ (

) , ৭. ‘নি‘য়ামুত তাহকীক ফী মানইল গিনা-ই ওয়াররাকসি ওয়াত), ৬. ‘মুফীদুল মুফতী’ (৫.‘জাওয়ামিউল কিলাম’ (

), (এ গ্রন্থে যিকর করার তাসফীকিল ইযযি ওয়াল জাহি ফী হুরমাতিস সুজূদি লিগাইরিল্লাহি’ (

সময় ঢোল-বাজানো, গান গাওয়া, নর্তন, কুর্দন করা, হাত তালি দেয়া, নর-নারী একত্রে যিকির করা এবং গায়রুল্লাহকে

সিজদা করা হারাম সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।) ৮. ‘তাহসীনুল হুলইয়া ফী তাওফীরিল লিহইয়া’ (

) ইত্যাদি), ১০. ‘ইযানুল ওয়ারা বি সিহহাতিল জুমু‘আতি ফিল মুদুনি ওয়াল কুরা’( ), ৯. ‘রাহে নাজাত’ (

তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। মুফীদুল মুফতী গ্রন্থে ফাতাওয়া দিতে মুফতী সাহেবের যে যোগ্যতা, দক্ষতা ও জ্ঞানের দরকার সে বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটি ভারতবর্ষে ফিক্‌হশাস্ত্রের একটি মূল্যবান সম্পদ। তাঁর ‘রাহে নাজাত’ গ্রন্থটিতে ইসলামের বুনিয়াদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে । ঈমান, পবিত্রতা, নামায, রোযা ও যাকাতের আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ বাংলার ঘরে ঘরে সমাদৃত।১

মাওলানা আবূ বকর সিদ্দীক ফুরফুরাবী র.

মাওলানা আবূ বকর সিদ্দীক র. ১২৬৩ হি. পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলায় ফুরফুরা শরীফে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সাইয়্যিদ আহমদ বেরেলবী র. এর শিষ্য হাফিজ জামাল উদ্দীনের নিকট তাফসীর, হাদীস ও ফিক্‌হশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে পবিত্র মদীনা মুনাওওয়ারায় গমন করেন। ১৩৫৮ হি. তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় ফিক্‌হশাস্ত্র ও ফাতাওয়ার উপর বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল ‘আদিল্লাতুল মুহাম্মদিয়া’ (আরবী) , ‘কাওলুল হক’ (উর্দূ) ও ‘তা‘লীমুল ইসলাম’ (বাংলা) ।২

মাওলানা আশরাফ আলী থানবী র.

মাওলানা আশরাফ আলী থানবী র. ১২৮০ হি. ভারতের উত্তর প্রদেশের থানাবনে জন্মগ্রহণ করেন। দারুল উলূম দেওবন্দ হতে তাফসীর, হাদীস, ফিক্‌হসহ দ্বীনি ‘ইলমের প্রতিটি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেন। মাওলানা ইয়াকুব নানূতবী র., শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসান র.(১২৬৮/১৮৫১-১৯২০ খৃ.) তাঁর উস্তাদ ছিলেন। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি ওয়াজ নসীহত, অধ্যাপনা, খানকাহ পরিচালনা ও গ্রন্থ রচনায় ব্যয় করেন। তাঁর মূল্যবান বক্তৃতাসমূহ গ্রন্থাকারে প্রকাশ পেয়েছে। তারঁ রচিত গ্রন্থ সংখ্যা ৬২৮ টি বলে উল্লেখ রয়েছে। তাঁর ‘ইমদাদুল ফাতাওয়া’ ও ‘বেহেশতি জেওর’ ফিক্‌হ শাস্ত্রের অমর সৃষ্টি। দুটো গ্রন্থই বিশেষ করে বেহেশতি জেওর বাংলায় অনুবাদ হয়ে বাংলার ঘরে ঘরে প্রবেশ করেছে। তিনি পান্ডিত্য ও তাসাউফের একজন স্বার্থক মুর্শিদ ছিলেন। ‘হাকীমুল উম্মত’ খেতাবে ভূষিত। বাংলাসহ পাক ভারতের অসংখ্য ‘আলিমে দ্বীন তাঁর ভক্ত ও খলীফা। ১৩৬২ হি. ৮৩ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন।৩

মাওলানা রুহুল আমীন র.

মাওলানা রূহুল আমীন র. ১৮৮২ খৃ. পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণার বশীরহাট নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাফসীর, হাদীস, ফিক্‌হ ও ফাতাওয়া বিষয়ে অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন বাগ্মী আলিম ও

খ্যাতিমান সাহিত্যিক। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা **১৩৫** টি। **১৯৪৫** খৃ. তিনি ইন্তিকাল করেন। 'তাফসীরে আমানিয়া', ফাতাওয়া-ই আমানিয়া' ও 'তরীকত দর্পণ' তাঁর প্রসিদ্ধ রচনা।৪

মাওলানা নিসার উদ্দীন র.

মাওলানা নিসার উদ্দীন র. **১২৯৭** বাংলা সনে পিরোজপুর জেলার স্বরূপকাটি থানাধীন ছারছীনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মাদারিপুরে এক মাদ্রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত হুগলী মাদ্রাসা থেকে উচ্চ ডিগ্রি অর্জন করেন। হুগলী মাদ্রাসায় লেখা-পড়া কালীন মাওলানা আবূ বকর র. এর হাতে বায়'আত হন। লেখা-পড়া শেষে গ্রামের বাড়ীতে এসে 'ছারছীনা দারুস সুন্নাহ আলিয়া মাদ্রাসা' প্রতিষ্ঠা করেন। বৃটিশ আমলেই তিনি লক্ষাধিক টাকার কিতাব সংগ্রহ করে

১আব্দুল বাকী , মুহাম্মদ , ড. , প্রাগুক্ত , পৃ ১৪৩-৪৬ ; 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা', ৪৯ বর্ষ , ২য় সংখ্যা , প্রাগুক্ত, প্র ১৬০-৬১ ; 'ফাতাওয়া ও মাসাইল' , প্রাগুক্ত , পৃ ১৫২।
২. মুহাম্মদ আফাজ উদ্দীন, 'ফুরফুরা শরীফের দাওয়াতী আন্দোলনের গতি প্রকৃতি ও ধারা', ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ, ডিসেম্বর ১৯৯৯, পৃ ২১ ; 'ফাতাওয়া ও মাসাইল' প্রাগুক্ত , প্র ১৬০-৬১।
৩. জুলফিকার আহমদ কিসমতী, 'বাংলাদেশের পীর-মাশাইখ', ঢাকা, প্রগতী প্রকাশনী , ১৯৮৮ খৃ., পৃ ১৮৩ ; 'বহেশতি জেওর' ঢাকা, এমদাদিয়া লাইব্রেরী,১৯৯৮, ১ম খন্ড, পৃ ১-৯ ' হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস', প্রাহুক্ , পৃ ১৭৪-৭৫।
৪. আব্দল্লাহ , মুহাম্মদ , ড. , 'মাওলানা আব্দুল আউয়াল জৌনপুরী' , ঢাকা , ইফা বা , ১৯৯৫ , পৃ ১-২।

ব্যক্তিগত গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি 'দারুল ইফতা' নামক উলামা-ই কিরামের সমন্বয়ে একটি বোর্ড গঠন করে ফিক্‌হ চর্চার পথ সুগম করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে ফিক্‌হী কয়েকটি গ্রন্থ হল ঃ **১.** 'তরীকুল ইসলাম' ( ) ২. 'মাযহাব ও তাকলীদ' ( ) ৩. 'ফাতাওয়া-ই সিদ্দীকিয়া' ( ) উল্লেখ যোগ্য। এ মনীষী **১৯৫২** খৃ. ইন্তিকাল করেন।১

মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী র.

মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী র. তৎকালীন গোপালগঞ্জ মহকুমার গহরডাঙ্গা গ্রামে **১৮৯৫** খৃ. জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়, কলকাতা মাদ্রাসা-ই আলিয়া ও কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে শিক্ষার্জন করেন। অতঃপর সাহারনপুর মুজাহিরুল উলূম মাদ্রাসায় ভর্ত্তি হন। পরবর্তীতে দারুল উলূম দেওবন্দ হতে হাদীস ও ফিক্‌হশাস্ত্রে ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্রাম্মনবাড়িয়া ইউনুসিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবন আরম্ভ করেন। অতঃপর তাঁর প্রচেষ্টায় বড় কাটরা আশ্রাফুল উলূম মাদ্রাসা (**১৯৩৬** খৃ.) লালবাগ জামিয়া কুরআনিয়া আরাবিয়া (**১৯৫০** খৃ.) প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি আজীবন লালবাগ মাদ্রাসার সদর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কারণেই তাঁকে 'সদর সাহেব হুজুর' বলা হত। ঢাকার ফরিদাবাদ মাদ্রাসা, তাঁর জন্মস্থান গওহরডাঙ্গা মাদ্রাসা তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। তিনি ছিলেন হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী র. এর ঘনিষ্ঠ খলীফা। তাফসীর, হাদীস, ফিক্‌হ ও অন্যান্য বিষয়ে পান্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। সৃজনশীল লেখক হিসেবেও তিনি পরিচিত ছিলেন। বাংলা ভাষায় তিনি ইসলামী পুস্তক রচনার বিরাট উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। 'তিজারতের ফযীলত' ,'ফাযাইলে মু'আমালাত গ্রন্থ দুটো ফিক্‌হশাস্ত্রের অমূল্য সম্পদ। তিনি 'বয়ানুল কুরআন' , বেহেশতি জেওরসহ অসংখ্য কিতাবের বঙ্গানুবাদ করেছেন। এ দেশে তাঁর অসংখ্য ভক্ত, মুরীদ, হিতাকাংখী ও অনুসারী রয়েছেন। **১৯৬৯** খৃ. তিনি ইন্তিকাল করেছেন। গওহরডাঙ্গায় তাঁকে সমাহিত করা হয়েছে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত লালবাগ মাদ্রাসার শিক্ষগণের মধ্যে যাঁরা দেশ-বিদেশে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছেন তাঁরা হলেন ঃ জা'ফর আহমদ উসমানী র. (**১৮৯২-১৯৭৪** খৃ.), মাওলানা

মোহাম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর র.(১৮৯৩-১৯৮৭ খৃ.), মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খান র.(১৯০০-১৯৭৪ খৃ.), মাওলানা হিদায়াত উল্লাহ র. (১৯০৮-১৯৯৬ খৃ.), আব্দুল মজীদ ঢাকুবী হুজুর র. (১৯১৮-১৯৯৭ খৃ.), মাওলানা সালাহ উদ্দীন র. (১৯২২-১৯৯৭ খৃ.), মুফতী আব্দুল মু'ঈজ র. (১৯১৯-১৯৮৪ খৃ.) প্রমুখ।২

মাওলানা জা'ফর আহমদ উসমানী র.

মাওলানা জা'ফর আহমদ উসমানী র. ছিলেন একজন খ্যাতিমান ব্যুৎপত্তিশালী আলিম, ফকীহ ও গবেষক। তিনি ছিলেন হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী র. এর ভাগিনা এবং তাঁর যত্নে ও তত্ত্বাবধানে শিক্ষাপ্রাপ্ত। এ মনীষী মাদ্রাসাই আলিয়ায় বুখারী শরীফ পড়াতেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্ডাডিজ বিভাগে হাদীস পড়াতেন। ইমামগঞ্জ মসজিদে বাদ ফজর, বড় কাটরা মাদ্রাসা ও লালবাগ মাদ্রাসার ছাত্রদের বুখারী শরীফ পড়াতেন। ১৯৪৭ খৃ. পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে সর্বপ্রথম করাচীতে পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করেন আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানী র. আর পুর্বপাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় পতাকা উত্তোলন করেন আল্লামা জা'ফর আহমদ উসমানী র.। জা'ফর আহমদ র. ছিলেন সুন্দর চেহারার মানুষ এবং গম্ভীর প্রকৃতির। ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি করাচী চলে যান এবং সেখানে টেন্ডু আল্লাহ ইয়ারে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে বাকী জীবন সেখানেই কাটান। করাচীর নিউটাউনে একটি মসজিদের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়েছে। বাইশ খন্ডে রচিত 'ইলাউস সুনান' ( ) তাঁর অমর রচনা। এ গ্রন্থে ফিক্হকে একটি নতুন দিক দর্শনে বিন্যাস করা হয়েছে।৩

আব্দুর রহমান কাশগড়ী র.

মাওলানা আব্দুর রহমান কাশগড়ী র. ১৯১২ খৃ. তুর্কীস্তানের রাজধানী কাশগড়ে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২২ খৃ. দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামায় ভর্তি হন। ১৯৩১ খৃ. সর্বোচ্চ ডিগ্রি গ্রহণের পর সেখানেই অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯৪৮ খৃ. মাদ্রাসাই আলিয়া ঢাকায় যোগদান করেন। ১৯৬৯ খৃ. হেড মাওলানা পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৭১ খৃ. এ মনীষী ঢাকায় ইন্তিকাল করেন। তিনি ছিলেন জ্ঞানসাধক এবং আরবী ও ফার্সী ভাষার সুপন্ডিত। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে 'আল-হাদীকা' , 'আযযাহরাত' , 'আলমুফীদ' অভিধান উল্লেখযোগ্য।৪

মুফতী আমীমুল ইহসান র.

ভারতবর্ষের যে কয়জন 'আলিমে দ্বীনের মেধা, যোগ্যতা, সাধনা, অধ্যাবসা ভারতবর্ষসহ ইসলামের প্রাণকেন্দ্র আরব জগতকেও মুগ্ধ করেছে তাঁদের মধ্যে অন্যতম মুফতী সাইয়্যিদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান মুজাদ্দিদী আল-বরকতী র. (১৯১১-১৯৭৪ খৃ.)। তিনি ছিলেন ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক। তাঁর জীবন কেটেছে ঢাকাতে এবং ঢাকাতেই তিনি চির

-

১.'ফাতাওয়া ও মাসাইল' , প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৩-১৫৪।

২. লিয়াকত আলী , মাওলানা, সম্পাদিত,'হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী র.', ঢাকা, আল-কাওসার প্রকাশনী, ১৯৯৯, পৃ ১৯-২৭ ; 'ফাতাওয়া ও মাসাইল', প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৫।

৩. মুহি উদ্দীন খান, 'জীবনের খেলাঘরে', ঢাকা, মদীনা পাবলিকেশান্স, ২০০৩, ২য় সংস্করণ, পৃ ১৫৯ ; 'ফাতাওয়া ও মাসাইল,' প্রাগুক্ত , পৃ ১৫১।

৪. নেছার উদ্দীন, ম, ই, আ, ড., প্রাগুক্ত, পৃ ২৪৫-৪৬।

নিদ্রায় শায়িত। তিনি ছিলেন কিতাবের আশেক। কিতাব ছাড়া কিছুই বুঝতেননা। জীবনে নাকি তিনি হাট-বাজারেও যাননি। তাঁর পিতার নাম সাইয়্যিদ আব্দুল মান্নান, মাতার নাম সাইয়্যিদা সাজিদা। তিনি পিতা-মাতা উভয় সূত্রেই মহানবী সা. এর অধঃস্তন পুরুষ। তাঁর পূর্ব পুরুষগণ সিরিয়া ও হিজাজের মধ্যবর্তী স্থান জাজনীর হতে সুলতান তুঘলকের শাসনামলে (১২২৫-১২৫১ খৃ.) ভারতে আগমন করেন। ১৯১১ খৃ. পাঁচনা গ্রামে মামার বাড়ীতে মুফতী সাহেবের জন্ম। পাঁচ বছর বয়সে তিনি পিতা-মাতার সাথে কলকাতায় নীত হন। পিতা ও চাচার নিকট ধর্মীয় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। পরবর্তীতে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় লেখা-পড়া করেন। অতঃপর দেশ-বিদেশের বহু পন্ডিত, ফকীহ, মুহাদ্দিস ও সূফী সাধকের নিকট হতে বিভিন্ন বিষয়ে সনদ অর্জন করেন। তাঁর শিক্ষা জীবনের উল্লেখযোগ্য উস্তাদ হলেন ঃ আব্দুল হুফফায মুহাম্মদ ফাসীহ (১৯০১-১৯৭৪ খৃ.), আব্দুস সাত্তার ইসমাঈল বিহারী (১৮৭৮-১৯৩৭ খৃ.), উসমান গণী (জ.১৯০৬ খৃ.), ওয়াসী উদ্দীন (১৮৮২-১৯৪৮ খৃ.), জামিল আনসারী (১৮৯১-১৯৪১ খৃ.), নাযিরুদ্দীন (মৃ.১৯৫৩ খৃ.), মুমতাজ উদ্দীন আহমদ (১৮৮৯-১৯৭৪ খৃ.) প্রমুখ। তাঁর কর্মজীবনের ছয় বছর অতিবাহিত হয় কলকাতার নাখোদা মসজিদ, মাদ্রাসা ও দারুল ইফতায়। ঐ সময় উক্ত দারুল ইফতা ছিল সারা বাংলার ধর্মীয় যোগাযোগ কেন্দ্র। ১৯৪৩-১৯৭৪ খৃ. পর্যন্ত তাঁর কর্মস্থল ছিল কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায়। যা পরবর্তীতে 'মাদ্রাসা-ই আলিয়া ঢাকা' নামে খ্যাত। ১৯৬৪-১৯৭৪ খৃ. পর্যন্ত তিনি জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমের খতীব ছিলেন। একজন উঁচু মানের 'আলিম, মুহাদ্দিস, ফকীহ, মুফতী ও খ্যাতিমান লেখক, সংকলক হিসেবে দুনিয়াব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি একজন সুযোগ্য পীর এবং তরীকতের শায়খ হিসেবেও সমধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন নকশবন্দী ও মুজাদ্দিদী তরীকার অনুসারী। তাঁর গ্রন্থসমূহ বিশ্বের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ্যভুক্ত হওয়ায় তাঁর পান্ডিত্যের স্বীকৃতি লাভ করেছে। তিনি আরব আযম সর্বত্র পরিচিত। এ মনীষী ২৫০ টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত 'ফিক্হুস্ সুনান ওয়াল আসার' ( ), 'কাওয়াইদুল ফিক্হ' ( ), 'তারীকে 'ইলমে

হাদীস' ( ), 'তারীখে 'ইলমে ফিক্হ' ( ) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে পাঠ্যসূচীর অর্ন্তভুক্ত। করাচীর জামিয়া ফারুকিয়ায়ও পাঠ্যভুক্ত। 'তারীকে 'ইলমে ফিক্হ' গ্রন্থে ফিক্হশাস্ত্রের ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে। 'আত-তানবীর ফী উসূলিত তাফসীর' ( ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে পাঠ্যভুক্ত। 'তারীখে 'ইলমে ফিক্হ' ( ) আলিয়া মাদ্রাসাসমূহে পাঠ্যভুক্ত।'কাওয়াইদুল ফিক্হ' গ্রন্থটি দারুল উলূম মু'ঈনুল ইসলাম হাটহাজারিতে তাখাসসুস ফিলফিক্হ-এ পড়ানো হয়। 'ফিক্হুস সুনানি ওয়াল আসার' আল-আলআযহার বিশ্ববিদ্যালয় (মিসর) এবং দারুল উলূম দেওবন্দে পাঠ্যভুক্ত। মুসলিম পন্ডিতগণ গ্রন্থটিকে 'তাহাবী' শরীফের সাথে তুলনা করেছেন। 'তারীখে ইসলাম' লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যভুক্ত। ফিক্হ বিষয়ে তাঁর একটি গবেষণাকর্ম হল 'ফাতাওয়া বরকতিয়া' ( )। এ মহাগ্রন্থে ফিক্হ হানাফীর দশ হাজার ফাতাওয়া সংকলিত হয়েছে। 'আত-তামবীহু লিল ফকীহ' ( ) , 'আল-ইসতিহলাল বি মাসাইলিল হিলাল' ( ) তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা। তিনি গ্রন্থ রচনা ও ফাতাওয়া প্রদান দুভাবেই ফিক্হ চর্চায় অনন্য ভূমিকা রেখেছেন। নিত্য নতুন ধর্মীয় ও সামাজিক সমস্যার সমাধানে তিনি 'উসূল আল-ইমাম আল-কারখী' ( ) সংকলন করেন। তাঁর অপর একটি সংকলন হল 'উসূল আল-মাসাইলিল খিলাফিয়্যা' ( )। আর মাসআলা মাসাইল নিরূপনের ৪২৬ টি নিয়ম-নীতি, বিধি-বিধান বিবৃত করে রচনা করেছেন 'কাওয়াইদুল ফিকহিয়্যা'। 'আত-তারিফাত আল-ফিকহিয়্যা' ( ) (ফকীহগণের পরিভাষা) রচনা করে তিনি অমরত্ব লাভ করেছেন। ফিক্হ বিষয়ক নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ রচনা করেও তিনি অসামান্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন। ক. 'লুব্বুল উসূল' ( )। শীর্ষস্থানীয় হানাফী ফকীহগণের মূলনীতি এ গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। খ. 'মালাবুদ্দাহ লিলফকীহ' ( )। মাসআলা নিরূপনে জটিল সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ এ গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। গ. 'হাদিয়াতুন লিল-মুসাললীন' ( )। এ গ্রন্থে নামাযের মাসআলা এবং নামাযের স্থায়ী সময়সূচী আলোচনা করা হয়েছে। ঘ. 'আদাবুল মুফতী' ( )। এ গ্রন্থে ফিক্হ চর্চাকারীদের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ মনীষী ১৯৭৪ খৃ. ঢাকায় ইন্তিকাল করেন এবং নিজ বাসস্থানে সমাহিত হন।[১]

মুফতী দীন মুহাম্মদ খান র.

মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খান র. ১৯০০ খৃ. ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম নূরুল্লাহ খান। চক বাজার জামে মসজিদের তৎকালীন ইমাম মাওলানা ইবরাহীম পেশোওয়ারীর নিকট প্রাথমিক শিক্ষা থেকে সিহাহ সিত্তাহ পর্যন্ত অধ্যায়ন করেন। অতঃপর দারুল উলূম দেওবন্দ হতে হাদীস ও ফিক্হশাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন। দিল্লীর আমালিয়া মাদ্রাসায় যেয়ে মুফতী কিফায়াত উল্লাহর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। সরকারী আলিয়া

১. আমীমুল হক, এম, এফ, এ, ড. , 'মুফতী সাইয়্যিদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান জীবন ও অবদান', ঢাকা, ইফা বা, ২০০২, পৃ পাঁচ-ছয়, ২০-৬৮ ; সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত,' ইসলামী বিশ্বকোষ', ঢাকা, ইফা বা , ১৯৮২, খন্ড ২য়, পৃ ১৫৩ ; আবদুল্লাহ , মুহাম্মদ, ড., 'বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ, প্রাগুক্ত, পৃ ১০০-১০১ ; 'দৈনিক বাংলা' ১ম বর্ষ, ৩৫ সংখ্যা, তারিখ ২৮/১০/১৯৭৪, পৃ ৪ ; মুহিউদ্দীন খান, 'জীবনের খেলা ঘরে' প্রাগুক্ত, পৃ ১৬০।

মাদ্রাসা ঢাকায় স্থানান্তরিত হলে তিন বছরকাল সেখানে অধ্যাপনা করেন। ফাতাওয়া ও মাসাইলে ছিলেন তিনি অভিজ্ঞ 'আলিম। জনসাধারণের নিকট তিনি 'মুফতী সাহেব' হিসেবে সমধিক পরিচিত ছিলেন। ফিক্হশাস্ত্রের খিদমতের কারণে তিনি আজো অমর হয়ে আছেন। ১৯৭৪ খৃ. তিনি ইন্তিকাল করেন। লালবাগ শাহী মসজিদ প্রাঙ্গনে তিনি সমাহিত হন।[১]

মুফতী আব্দুল মু'ঈজ র.

মুফতী আব্দুল মু'ঈজ র. এর জন্ম **১৯১৯ খৃ.** নোয়াখালী জেলার বটতলী গ্রামে। গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর দারুল উলূম দেওবন্দ হতে হাদীস ও ফিক্হশাস্ত্রে সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৭৪-৮৪ খৃ. পর্যন্ত তিনি জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমের খতীব ছিলেন। তিনি একজন 'আলিম, ফকীহ ও সর্বজন বিদিত বুযুর্গ ছিলেন। ১৯৮৪ খৃ. তিনি ইন্তিকাল করেন। তাকেঁ গ্রামের বাড়ীতে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।[২]

মাওলানা মুফীদ উদ্দীন

মাওলানা মূফীদ উদ্দীন ওরফে আব্দুল গফূর কর্তৃক রচিত 'হুজ্জাতুল ইসলাম' নামক ৪৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত একটি ফিক্হী গ্রন্থ রয়েছে। বাংলাদেশের গ্রামগুলোতে যারা জুমু'আর নামায পড়েননা এবং অপরকেও বারণ করেন , তাদের জবাবে নির্ভরযোগ্য ফিক্হী গ্রন্থের বরাত দিয়ে এটি রচিত। তিনি ছিলেন হানাফী ফকীহ। তাই হানাফী ফিকহের আলোকে গ্রন্থটি রচিত। লেখক ফরিদপুরের অধিবাসী ছিলেন এতটুকু তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।[৩]

বাংলাদেশে ফিক্হ চর্চায় আলিয়া মাদ্রাসাসমূহের ভূমিকাঃ

বাংলাদেশে ফিক্হ চর্চায় আলিয়া মাদ্রাসাসমূহের বলিষ্ঠ ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশে মোট ৬৭৮২ টি এবতেদায়ী মাদ্রাসা, ৯২২১ টি দাখিল মাদ্রাসা, ২৬৮৮ টি আলিম মাদ্রাসা, ১২২১ টি ফাজিল মাদ্রাসা এবং ২৫৩ টি কামিল মাদ্রাসা রয়েছে।[৪] আলিয়া মাদ্রাসাসমূহে বর্তমান সিলেবাস অনুযায়ী ১ম-৫ম শ্রেণি পর্যন্ত অন্যান্য বিষয়ের সাথে আকাইদ ও ফিক্হ'র প্রাথমিক পর্যায়ের কিতাবসমূহ পড়ানো হয় । দাখিল ৬ষ্ঠ-৮স্টম শ্রেণি পর্যন্ত অন্যান্য বিষয়ের সাথে ফিক্হ ও আকাইদ পড়ানো হয়। দাখিল নবম ও দশম শ্রেণিতে ফিক্হ ও উসূল আল-ফিক্হ পড়ানো হয়। আলিম শ্রেণিতে ফিক্হ'র কিতাব 'শরহু বিকায়া' আর উসূল আল-ফিক্হ'র 'নূরুল আনওয়ার' পড়ানো হয়। ফাজিল শ্রেণিতে পড়ানো হয় 'হিদায়া'। আলিয়া

মাদ্রাসার কামিল শ্রেণি পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত। ১. কামিল হাদীস বিভাগ. ২. কামিল ফিক্‌হ বিভাগ, ৩. কামিল তাফসীর বিভাগ, ৪. কামিল আদব বিভাগ ও ৫. কামিল মুজাব্বিদ বিভাগ। কামিল ফিক্‌হ বিভাগে 'শরহু মা'আনিল আছার' ( ), 'আল-ইশবাহ ওয়ান-নাযাইর লি ইব্‌ন না'ঈম আল-মিসরী' ( ), 'উসূলুল বাযদবী' ( ) , উসূলুল কারখী' ( ), 'আদাবুল মুফতী' ( ) ইত্যাদি কিতাব পড়ানো হয়। কামিল তাফসীর বিভাগে 'ফিক্‌হুল কুরআন লিল যাসসাস' ( ) এবং 'আহকামুল কুরআন' ( ) পড়ানো হয়।৫

বাংলাদেশের আলিয়া মাদ্রাসাসমূহ কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ এসব আলিয়া মাদ্রাসাসমূহের মধ্যে যেগুলো পাচীন এবং ইসলামী জ্ঞান ও ফিক্‌হ চর্চায় অসাধারণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ হলঃ

মাদ্রাসা-ই আলিয়া ঢাকা

১৭৮০ খৃ. প্রতিষ্ঠিত কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার পরবর্তী নাম মাদ্রাসা-ই আলিয়া ঢাকা। ১৮৩৭ খৃ. উক্ত মাদ্রাসায় ইংরেজির পরিবর্তে ফার্সীর আদেশ চালু করা হয়। এ মাদ্রাসার মাধ্যমে সরকারী কর্মচারীতে পরিণত হওয়ার পরিবর্তে মুসলমানগণ ইসলামী শিক্ষার ধারাকে শক্তিশালী আন্দোলনে পরিণত করেন। ১৯৪৭ খৃ. মাদ্রাসাটি ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। ১৯৫৬ খৃ. বকশী বাজারে মাদ্রাসার জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি ক্রয় করা হয় এবং ১৯৬০ খৃ. এর নির্মাণ কাজ শেষ হলে বর্তমান স্থানে এর কার্যক্রম শুরু হয়।৬

এছাড়াও বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য আলিয়া মাদ্রাসাসমূহ হলঃ ২. নোয়াখালী রায়পুর আলিয়া মাদ্রাসা (১৮৭২ খৃ.) ৩. রাজশাহী আলিয়া মাদ্রাসা (১৮৭৪ খৃ.) ৪. চট্টগ্রাম আলিয়া মাদ্রাসা (১৮৭৪ খৃ.) ৫. কক্সবাজার আলিয়া মাদ্রাসা (১৮৭৪ খৃ.) ৬. কাতলাসেন আলিয়া মাদ্রাসা মোমেনশাহী (১৮৮০ খৃ.) ৭. ফেনী আলিয়া মাদ্রাসা (১৮৯৮ খৃ.) ৮. কুমিল্লা শাহতলী আলিয়া মাদ্রাসা (১৯০০ খৃ.) ৯. গাছবাড়ী জামিলুল উলূম মাদ্রাসা (কানাইঘাট) (১৯০১ খৃ.) ১০. চট্টগ্রাম দারুল উলূম আলিয়া মাদ্রাসা (১৯১৩ খৃ.) ১১. সরকারী আলিয়া মাদ্রাসা সিলেট (১৯১৩ খৃ.) ১২. শর্ষীনা দারুস্ সুন্নাহ আলিয়া মাদ্রাসা পিরোজপুর (১৯১৪ খৃ.) ১৩. নেছারিয়া আলিয়া মাদ্রাসা পিরোজপুর (১৯১৯ খৃ.) ১৪. সরকারী মোস্তাফিয়া আলিয়া মাদ্রাসা বগুড়া (১৯২৫ খৃ.) ১৫. কারামতিয়া আলিয়া মাদ্রাসা নোয়াখালী (১৯২৫ খৃ.) ১৬. সোনাকান্দা আলিয়া মাদ্রাসা (১৯৪০ খৃ.)

১-২. 'ফাতাওয়া ও মাসাইল' , প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৪-৫৬।
৩. আব্দুল বাকী , মুহাম্মদ, ড. , 'বাংলাদেশে আরবী, ফার্সী ও উর্দুতে ইসলামী সাহিত্য চর্চা' , প্রাগুক্ত , পৃ ৯৬।
৪. বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত ২০১২ সালের ক্যালেন্ডার
৫-৬. নেছার উদ্দীন, ম, ই, আ, ড. , প্রাগুক্ত , পৃ ১৬০-১৮৮, ১৪৫-৪৬।

১৭. তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা, মীরহাজির বাগ, ঢাকা (১৯৬৫ খৃ.)১

এসব আলিয়া মাদ্রাসা দেশে অসংখ্য আলিম, ফকীহ, মুফতী, মুহাদ্দিস, দ্বীনদার মনীষী ও রাজনীতিকের জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছে। বর্ষিয়ান রাজনীতিক মরহুম আব্দুস সামাদ, মরহুম সাইফুর রহমান, স্পিকার হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী সিলেট আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্র। মাওলানা নেছার উদ্দীন মরহুম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শর্ষীনা আলিয়া মাদ্রাসায় বিহার, তুরস্ক, চীনসহ অর্ধশতাধিক দেশবরেণ্য আলিম সেখানে অধ্যাপনা করেছেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানের খ্যাতিমান ছাত্রদের কয়েকজন হলেনঃ ১.মাওলানা ওয়ালী উল্লাহ র. (মাকরার পীর সাহেব), ২. মাওলানা হাতিম আলী র.(পীর সাহেব পাংগাসিয়া), ৩. মাওলানা তাজ উদ্দীন (পীর সাহেব পুকুরজানা), ৪. মাওলানা দেলোয়ার হুসাইন আনসারী (পীর সাহেব টেকেরহাট), ৫. কবি রূহুল আমীন খান, ৬. মুহাম্মদ আব্দুস সাত্তার, ৭. ড. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, ৮. ড. আ র ম আলী হায়দার মুর্শিদী, ৯. এ বি এম সিদ্দীকুর রহমান, ১০. ড. ইয়াহইয়া রহমান, ১১.ড. ফজলুর রহমান, ১২. প্রফেসর আব্দুল মালিক, প্রমুখ। কারামতিয়া আলিয়া মাদ্রাসা নোয়াখালী'র প্রতিষ্ঠাতা হলেন এদেশের খ্যাতিমান আলিম মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী র. এর সুযোগ্য পুত্র মাওলানা হামিদ র.। উপমহাদেশের খ্যাতিমান আলিমগণ এখানে অধ্যাপনা করেছেন। ঢাকার তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসাটি বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামী রাজনীতি বিকাশে ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য এসব আলিয়া মাদ্রাসা ছাড়াও বাংলাদেশের প্রতিটি আলিয়া মাদ্রাসা ফিক্‌হ চর্চা ও ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণে অসামান্য অবদান রেখে যাচ্ছে।২

বাংলাদেশে ফিক্‌হ চর্চায় কাওমী মাদ্রাসাসমূহের ভূমিকাঃ

বাংলাদেশে ফিক্‌হ চর্চায় বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে কাওমী মাদ্রাসাসমূহ। এসব মাদ্রাসাকে দরসে নিজামিয়া মাদ্রাসাও বলা হয়। ফাতাওয়া ও ফিক্‌হ চর্চায় শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে এসব মাদ্রাসা। আল্লামা শিবলী নো'মানী বলেন. 'ইসলামী জ্ঞান চর্চার ইতিহাসে কাওমী মাদ্রাসা সবচেয়ে গৌরবজনক অধ্যায়। দেশের সমগ্র ধর্মীয় জ্ঞান চর্চার প্রবাহমান ধারা এ উৎস থেকে উৎসারিত। সরকারী সাহায্য সহযোগিতা ছাড়াই প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয় এসব মাদ্রাসা। জনগণ স্বেচ্ছায় প্রণোদিত হয়ে জায়গা ও উপকরণ দিয়ে এসব প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন। কাওমী মাদ্রাসাসমূহ দারুল উলূম দেওবন্দের

শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচী, চিন্তা-চেতনা, মেধা-মনন ও দর্শনকে লালন করে। ইংরেজরা মাদ্রাসা শিক্ষা ধ্বংসের লক্ষ্যে ১৮৩৫ খৃ. অফিস-আদালতের ভাষা ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজি বাধ্যগত করে। ফলে আত্মপ্রত্যয়ী মুসলমানগণ ইসলামী শিক্ষার হারানো গৌরব উদ্ধারকল্পে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। সে উদ্দেশ্যে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে প্রতিষ্ঠিত হয় দারুল উলূম মাদ্রাসা (১৮৬৬ খৃ.)। মাওলানা কাসিম নানূতবী র. (১৮৩২-১৮৮০ খৃ.) আমৃত্যু উক্ত মাদ্রাসার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। তাঁকে সহযোগিতা করেন রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী র. (১৮২৯-১৯০৮ খৃ.)। এ প্রতিষ্ঠানের খ্যাতি বিশ্বব্যাপী। দারুল উলূমের শিক্ষকবৃন্দ উত্তম আদর্শসহ সর্ব বিষয়ে ছিলেন যোগ্যতম ব্যাক্তি। ১৮৬৬-১৯৬২ খৃ. পর্যন্ত দারুল উলূম দেওবন্দ এমন সব যোগ্য মনীষীর জন্ম দিতে পেরেছে যাঁরা ছিলেন দেশ-বিদেশের আশির্বাদ স্বরূপ।এতটুকু সময়ের মধ্যে এ মাদ্রাসাটি ১৭৮৪ জন ফকীহ, ১৬৫ জন মুফতীর জন্ম দিতেপেরেছে। প্রতিষ্ঠানটি আরবদের দৃষ্টিতেও কষ্টি পাথর তুল্য।৩

মাওলানা কাসিম নানূতবী র. এর জীবদ্দশাতেই প্রতিষ্ঠিত হয় সাহারণপুর মুজাহিরুল উলূম মাদ্রাসা (১৮৬৬ খৃ.)। অতঃপর লাখনৌ দারুল উলূম মাদ্রাসা (১৮৯৮ খৃ.)। অপরদিকে ১৯৬৪ খৃ. মধ্যে বাংলাদেশে ৪৪৩ টি কাওমী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে ৫১ টি দাওরা-ই হাদীস তথা টাইটেল স্তরে উন্নীত হয়। বাংলাদেশে কাওমী মাদ্রাসাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মাদ্রাসা হলঃ ১. দারুল উলূম মু'ঈনুল ইসলাম হাটহাজারী (১৯০১ খৃ.) ২. জিরি ইসলামিয়া মাদ্রাসা চট্টগ্রাম (১৯২০ খৃ.) ৩. ইসলামিয়া মাদ্রাসা ঢাকা (১৯২০ খৃ.) ৪. ব্রাম্মনবাড়ীয়া ইউনুসিয়া মাদ্রাসা (১৯২৫ খৃ.) ৫. বাবুনগর আজিজুল উলূম মাদ্রাসা (১৯২৬ খৃ.) ৬. গজালিয়া মাদ্রাসা, কচুয়া, বাগেরহাট (১৯৩৫ খৃ.) ৭. আশ্রাফুল উলূম মাদ্রাসা বড় কাটরা ঢাকা (১৯৩৬ খৃ.) ৮. মিফতাহুল উলূম মাদ্রাসা নেত্রকোনা (১৯৪২ খৃ.) ৯. চকরিয়া কাসিমুল উলূম মাদ্রাসা (১৯৪৪ খৃ.) ১০. জমিরিয়া কাসিমূল উলূম মাদ্রাসা পটিয়া (১৯৪৫ খৃ.) ১১. জামিয়া এমদাদিয়া কিশোরগঞ্জ (১৯৪৫ খৃ.) ১২. হুসাইনিয়া আরাবিয়া মাদ্রাসা সিলেট (১৯৪৮ খৃ.) ১৩. নোয়াখালী দারুল উলূম মাদ্রাসা (১৯৪৯ খৃ.) ১৪. দারুল উলূম খাদিমুল উলূম মাদ্রাসা ফরিদপুর (গোপারগঞ্জ) (১৯৪৯ খৃ.) ১৫. দারুল উলূম মাদ্রাসা বড়ুরা কুমিল্লা (১৯৪৯ খৃ.) ১৬. লালবাগ জামিয়া কুরআনিয়া (১৯৫০ খৃ.)১৭. আশ্রাফুল উলূম মাদ্রাসা মোমেনশাহী (১৯৫১ খৃ.) ১৮. সোহাগী দারুস সালাম মাদ্রাসা মোমেনশাহী (১৯৫১ খৃ.) ১৯.সিলেট কানাইঘাট দারুল উলূম কাওমী মাদ্রাসা (১৯৫১ খৃ.) ২০. জামিয়া আরাবিয়া এমদাদুল উলূম ফরিদাবাদ (১৯৫৬ খৃ.) ২১. ওলামা বাজার হুসাইনিয়া দারুল উলূম মাদ্রাসা নোয়াখালী (১৯৫৮ খৃ.) ২২.দারুল উলূম এজাজিয়া যশোর (১৯৬০ খৃ.) ২৪. মোমেনশাহী দারুল উলূম মাদ্রাসা (জামিয়া ইসলামিয়া) (১৯৬২ খ.)

১-২.প্রাগুক্ত, পৃ ২৬৮-৭২।

৩. তায়্যিব, মুহাম্মদ, মাওলানা, 'তারীখে দারুল উলূম দেওবন্দ', করাচী, তা বি. পৃ ৫১-৫২ ; 'মাসিক আর-রশীদ', লাহোর, দারুল উলূম দেওবন্দ সংখ্যা, তা বি, পৃ ৪৮৮।

ইত্যাদি অসংখ্য কাওমী মাদ্রাসা। এসব উল্লেখ যোগ্য মাদ্রাসা ছাড়াও বর্তমানে বাংলাদেশে অন্তত বিশ হাজার কাওমী মাদ্রাসা রয়েছে।১

বাংলাদেশে কাওমী মাদ্রাসাসমূহে নিম্নোক্ত বিভাগসমূহ চালু রয়েছেঃ ক.হাদীস বিভাগ, খ. তাফসীর বিভাগ, গ. ফিক্হ বিভাগ, ঘ. আদাব বিভাগ, ঙ. কিরাআত বিভাগ, ৬. তাহফীজুল কুরআন বিভাগ। ফিক্হ বিভাগে ফিক্হ'র উচ্চতর কিতাবসমূহ পাঠদান করা হয়। এ বিভাগ থেকে উত্তীর্ণ ছাত্রদের মুফতী সনদ প্রদান করা হয়।২ কাওমী মাদ্রাসাসমূহে ফিক্হ'র কিতাব 'তা'লীমুল ইসলাম' দিয়ে আরম্ব হয় এবং দাওরা-ই হাদীস পর্যন্তই ফিক্হ'র চর্চা হয়। 'রাহে নাজাত', 'বেহেশতি জেওর', 'মালাবুদ্দাহ মিনহু', 'নূরুল ইযাহ', কুদূরী', 'কানযুদ দাকাইক', 'শারহুল বিকায়া', 'হিদায়া' ইত্যাদি কিতাব পড়ানো হয়। মিশকাত ও দাওরা-ই হাদীস জামা'আতে হাদীসের আলোকে ফিক্হ'র চর্চা হয়। হাদীসের 'সুনান' কিতাবসমূহ (যে সব হাদীস গ্রন্থে হাদীস সমূহকে ফিক্হশাস্ত্রের ন্যায় সাজানো হয়েছে এবং কেবল মাত্র তাহারাত, নামায, রোযা প্রভৃতি আহকামের হাদীসসমূহের দিকে বেশী নজর দেয়া হয়েছে তাকে 'সুনান' বলে। যেমন-সুনানে আবূদাউদ, সুনানে নাসাই, সুনানে ইব্ন মাযাহ, সুনানে দারিমী ইত্যাদি।) অধিকতর ফিক্হী বিশ্লেষণের মাধ্যমে পড়ানো হয়। প্রতিটি হাদীস সামনে রেখে ইমামগণের ফিক্হী অভিমতসমূহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। অধিকতর জ্ঞানার্জন এবং প্রয়োজন পূরণের নিমিত্ত এসবের বাইরেও অসংখ্য ফিক্হ ও ফাতাওয়ার কিতাবের চর্চা হয়। ফাতাওয়া বিভাগে শুধুই ফিক্হ ও ফাতাওয়ার কিতাব পড়ানো হয়। সংগে ফাতাওয়ার প্রায়োগিক বিষয় নিয়েও গবেষণামূলক আলোচনা পর্যালোচনা হয়।৩

প্রাচীন বাংলার বেশ কিছু মাদ্রাসার নাম উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। যেমনঃ মুর্শিদাবাদ মাদ্রাসা, মাদ্রাসা-ই রংপুর, মাদ্রাসা-ই গিয়াস উদ্দীন, মাদ্রাসা-ই উসমানপুর, মাদ্রাসা-ই টিলা, মাদ্রাসা-ই হোসেনশাহ, মাদ্রাসা-ই শায়েস্তা খান, মাদ্রাসা-ই মসজিদে ফয়জুল্লাহ, মাদ্রাসা-ই কটিয়া, মাদ্রাসা-ই শিলাপুর, মাদ্রাসা-ই সদর উদ্দীন, জৌনপুর মাদ্রাসা ইত্যাদি।৪

ফিক্হ চর্চায় বিভিন্ন গ্রন্থ

বাংলাদেশে ধর্মীয় অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় ফিক্হ বিষয়ক গ্রন্থ সবচেয়ে বেশী রচিত হয়েছে। যা বাংলাদেশে ফিক্হ চর্চাকে আরো সহজ করে দিয়েছে এবং ফিক্হ চর্চাকে সার্বজনীন করার উদ্দেশ্যে বাংলা ভাষায় ফিক্হ চর্চার রাস্তাকে উন্মুক্ত

করা হয়েছে। বাংলা ভাষায় সংখ্য মৌলিক গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছে 'বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন' ১ম-৩য় খন্ড। 'ফাতাওয়া ও মাসাইল' ১-৫ম খন্ড। এছাড়াও বেশ কয়েকটি ফিক্হী কিতাব। মৌলিক গ্রন্থ রচনার পাশাপাশি প্রাচীন ফিক্হী গ্রন্থসমূহ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। যেমন- 'ফাতাওয়া-ই শামী', 'ফাতাওয়া-ই আলমগীরি', 'ফাতাওয়া-ই দারুল উলূম' ইত্যাদি। এছাড়াও ফিক্হ'র প্রসিদ্ধ কিতাব 'হিদায়া', 'শরহুল বিকায়া', 'কুদূরী', 'নূরুল ইযাহ' ইত্যাদি কিতাব বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে বাংলাদেশে ফিক্হ চর্চাকে ব্যাপক ভাবে সম্প্রসারিত করা হয়েছে।

উপসংহারঃ ফিক্হ চর্চা তথা শরী'আতের বিধি-বিধান অনুশীলন এদেশের মুসলমানদের গভীরে প্রোথিত। কুরআন-হাদীসের শিক্ষা এ জাতি মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছে। দেশের শতকরা নব্বই ভাগ মুসলমান ইসলামী বিধানকে নিত্য দিনের সাথী বানিয়ে নিয়েছে সৎকর্মের পেরণার উৎস হিসেবে। কারণেই এ শিক্ষার পথে যত বাধা, প্রতিবন্ধকতা এসেছে সব কিছুর মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছে। ইংরেজরা এদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে মুসলিম শাসনামলে প্রদত্ত মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ ইত্যাদির লাখেরাজ সম্পত্তি ও ওয়াক্ফ স্টেটসমূহ কেড়ে নিয়ে হিন্দুদের হাতে অর্পণ করে। ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহকে অপ্রয়োজনীয় শিক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে, নানা অপবাদ দিয়েছে এবং এর উপর কালিমা লেপনের অপচেষ্টা করেছে। মাদ্রাসার শিক্ষার পরিবর্তে সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছে। অফিস-আদালতের ভাষা ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজি চালু করে। ভারতবর্ষে কয়েক লাখ মাদ্রাসা এমনকি বাংলা মুলুকের তৎকালীন আশি হাজার মাদ্রাসা বন্ধ করে দিলেও মুসলমানগণ হিম্মত হারাননি। তারা ইসলামী শিক্ষার হারানো গৌরব উদ্ধারকল্পে প্রতিষ্ঠা করেন হাজার হাজার মাদ্রাসা। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার তৌফিক আল্লাহ পাক দান করেছেন। ফলে সমাজে লাখ লাখ আলোকিত মানুষ উপহার দেয়া সম্ভব হয়েছে। বিশ্বের যে কোন মুসলিম রাষ্ট্রের তুলনায় বাংলাদেশে ফিক্হ চর্চার ধারা অব্যাহত রাখা সম্ভব হচ্ছে।

১-২.'পরিচিতি', দারুল উলূম মু'ঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, ১৯৭৭ ; 'মাসিক রহমত', বর্ষ ২য়, সংখ্যা ২৩৭, (সেপ্টেম্বর ২০১২), পৃ ৫।

নেক সাহাবা তাঁর মতামতকে অগ্রাধিকার দিয়ে সে মোতাবিক আমল শুরু করলেন।৭ শাহ ওয়ালী উল্লাহ র. 'ইকদুল জীদ' গ্রন্থে বলেন, 'যিনি ইজতিহাদের শর্তাবলী ভাল করে আয়ত্ব করতে পারেননি তার উপর সর্ব বিষয়ে মুজতাহিদের তাকলীদ করা ওয়াজিব।৮

মাযহাবের ইমামগণের অসাধারন প্রতিভা,অতুলনীয় গুনাবলীর প্রতি অনুরক্ত হয়ে খ্যাতিমান মুজতাহিদগণ ইজতিহাদের পন্থা ত্যাগ করে তাঁদের আশ্রয়কে নিরাপদ মনে করেছেন। ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম যুফার রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ তাকলীদ করাকে নিরাপদ ও গৌরবজনক মনে করেছেন। ফিক্হশাস্ত্র প্রণিত হবার পূর্বে মুসলিম বিচারকগণ ইজতিহাদ করে ফয়সালা করে অনেক সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন। কিন্তু মুজতাহিদ ইমামগণ কর্তৃক ফিক্হশাস্ত্র লিপিবদ্ধ হবার পর বিচারকগণ ইমামগণের বরাত দিয়ে বিচার করতে নিরাপদ মনে করতেন। ফলে ইজতিহাদের ধারা রুদ্ধ হয়ে যায়। তাকলীদ তার স্থান দখল করে।৯

কাজটি আলিমদের জিম্মায় ছেড়ে দেবে। ধর্মীয় সুক্ষ্ম বিষয়ে অনধিকার চর্চায় লিপ্ত হবেনা। এমনটি করা যিনা ব্যাভিচারের চেয়ে জঘন্য ও ধ্বংসাত্মক। যে ব্যক্তি দ্বীন বিষয়ে পাকাপোক্ত জ্ঞান রাখেনা তিনি যদি আল্লাহ ও তাঁর দ্বীন নিয়ে বাহাস বিতর্কে লিপ্ত হন তাহলে কুফুরীতে জড়িয়ে পড়ার আশংকা আছে। অথচ সে আঁচই করতে পারবেনা। তার উদাহরণ এমন- যেন কোন ব্যক্তি সাঁতার জানেনা অথচ উত্থাল সমুদ্রে লাফিয়ে পড়ল।১ পবিত্র কুরআনে এসেছে-

'তাদের নিকট যখন কোন শান্তি ও আশংকার খবর এসে পৌঁছে, তখন তারা তার প্রচারে লেগে যায়। অথচ বিষয়টি যদি তারা রাসূলের এবং উলিল আমরগণের নিকট পেশ করতো তাহলে তাদের মধ্য থেকে উদ্ভাবনী শক্তি সম্পন্ন ও সুক্ষ্ণ বিচার শক্তির অধিকারী ব্যক্তিগণ বিষয়টি উদঘাটন করতে পারতেন।'২ এ আয়াত প্রমান করে তত্ত্ব ও রহস্য উদঘাটনে সক্ষম মুজতাহিদ ইমামগণের শরণাপন্ন হতে।৩ আয়াতটির ব্যাখ্যা প্রসংগে ইমাম রাযী র. বলেন, 'এ আয়াতটি প্রমান করছে, নিত্য-নতুন এমন অনেক সমস্যার উদ্ভব হয় যার সমাধান সরাসরি নস তথা আয়াত দ্বারা বুঝা যায়না। সুতরাং তার জন্য ইজতিহাদের প্রয়োজন হয়। সাধারণ মানুষের কর্তব্য হল নিত্য নৈমিত্তিক মাসাইল ও সমস্যার ক্ষেত্রে আলিমগণের তাকলীদ করা'।৪ তাকলীদের বিষয়টি সম্পূর্ণ বাস্তবধর্মী। এটি হচ্ছে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করার একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। কারণ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যেমন চিকিৎসা বিজ্ঞান, জ্যোর্তিবিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র, হস্তশিল্প ও কারিগরী বিদ্যা বিষয়ে আমরা জানা ব্যক্তিগণের উপর নির্ভর করি। তেমনি ধর্মীয় বিষয়ে তাকলীদ বা অনসরণের বিকল্প নেই।৫

এ আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, তাকলীদ করা তথা মাযহাবের অনুসরণ করা ওয়াজিব। পক্ষান্তরে গাইরে মুকাল্লিদ থাকা, মাযহাবের ইমামগণকে অনুপযুক্ত মনে করা, চার মাযহাবকে নাহক বলা সন্দেহাতীত দৃষ্টতা ও ভ্রষ্টতা। মুজতাহিদ হওয়া অথবা মুকাল্লিদ হওয়া ছাড়া তৃতীয় কোন পথ নেই। সকল মানুষের যেমন মেডিসিন বিশেষজ্ঞ হওয়া সম্ভব নয় তেমনি সকল মানুষ মুজতাহিদ হওয়া সম্ভব নয়।৬

রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী র. (মৃ-১৯০৫ খৃ.) বলেন, তাকলীদ ফরয। আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে বলেছেন-

'তোমরা জ্ঞানীদের নিকট জিজ্ঞেস কর যা তোমরা জাননা'৭। এ আয়াত দ্বারা তাকলীদ ফরয করা হয়েছে। আয়াতে মৌলিক নিদের্শনা রয়েছে যে,অনভিজ্ঞ, অপরিপক্ককে পরিপক্কগণের শরণাপন্ন হতে হবে, তাঁদের নির্দেশ মতে আমল করতে

হবে। ইমাম সুয়ূতীর মতে, তাকলীদের মাধ্যমে যে পরিমান আত্নরক্ষা , ঈমান ও ধর্ম রক্ষা করা সম্ভব হয় গায়রে তাকলীদের মাধ্যমে এর এক দশমাংশ সম্ভব নয়।[৮]

মাওলানা মুহাম্মদ আলী বাটলাভী র. বলেন, 'পঁচিশ বছরের অভিজ্ঞতায় বুঝে এসেছে যে, যারা দ্বীনি 'ইলম ছাড়াই কামিল গবেষক হয়ে যায় এবং তাকলীদ ছেড়ে দেয় তারা শেষ পর্যন্ত ইসলামকেই প্রত্যাখ্যান করে বসে। ধার্মিক লোকদের অধার্মিক হওয়ার বড় কারণ হল পর্যাপ্ত দ্বীনি 'ইলম ছাড়াই তাকলীদ ছেড়ে দেয়া'।[৯]

রাসূলুল্লাহ সা. ইরাশাদ করেন , ' তোমরা মুসলমানদের বুহত্তর জামা'আতের আনুগত্য কর'।[১০] তিনি আরো বলেন, 'তোমরা মুসলিম উম্মাহার সংগে থাক।'[১১] এর কারণ বর্ণনায় হাদীসে এসেছে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার উম্মতকে গুমরাহির বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ করবেননা।'[১২]অন্য হাদীসে এসেছে,' 'আল্লাহর সাহায্য দলবদ্ধদের উপর থাকে, যে ব্যক্তি দল ছেড়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।'[১৩] অন্য হাদীসে এসেছে,

' যে ব্যক্তি আনুগত্য ত্যাগ করল এবং জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সে জাহালিয়্যাতের মৃত্যুবরণ করল।'[১৪] রাসূলুল্লাহ সা. আরো বলেছেন. ' বৃহত্তর মুসলিম উম্মাহ যে বিষয়টিকে ভাল হিসেবে জানবে আল্লাহ তা'আলার কাছেও ভাল হিসেবে স্বীকৃতি পাবে।'[১৫]

স্মরণযোগ্য যে, যে জামা'আতবদ্ধতার গুরুত্ব ও ফযীলতের কথা বলা হয়েছে এগুলো খায়রুল কুরুনি তথা উত্তম যুগের প্রতি লক্ষ করে বলা হয়েছে। কারণ , সে যুগে মুসলমান প্রবৃত্তির দাসত্ব করতনা। বর্তমান সময়ে মুসলিমরা প্রবৃত্তির দাসত্বে আবদ্ধ। বর্তমানে মুত্তাকী, দ্বীনদার , শরয়ী 'ইলমের অধিকারীগণের আনুগত্য প্রযোজ্য।[১৬] মোট কথা কুরআন, সুন্নাহসহ ইসলামী শরী'আতে যাঁরা ব্যুৎপত্তি অর্জন করে সরাসরি বিধান উদ্ভাবনে সক্ষম তাঁরা মুজতাহিদ। মুজতাহিদগণের নির্দেশিত নীতিমালা, সিদ্ধান্ত এবং উদ্ভাবিত বিধানের তাকলীদ করা ফরয। মুজতাহিদ চার ইমামের কোন একজনের অনুসরণের নাম তাকলীদ। এর মধ্যেই নিহিত আছে দ্বীন ধর্মের নিরাপত্তা ও সফলতা।

১. আব্দুল্লাহ , মুহাম্মদ, মুফী, প্রাগুক্ত, পৃ ১০৯।
২.আল-কুরআন , ৪ঃ ৮৩।
৩. ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন', প্রাগুক্ত , পৃ ৫১৫।
৪.ইসলামী আইন ও বিচার', বর্ষ ৭ম , সংখ্যা ২৫, প্রাগুক্ত,পৃ ১৪২।
৫. আব্দুল্লাহ, মো., মৃফতী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬-৩৭।
৬. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা', প্রাগুক্ত, পৃ১২৫।
৭. আল-কুরআন , ঃ ৪৩।
৮. আব্দুল্লাহ , মো. , মুফতী, প্রাগুক্ত , পৃ ৩৪-৩৫ ,২১ , ২৫।
৯. তকী উসমানী , মাওলানা , 'মাযহাব কি ও কেন', (আবু তাহের মিসবাহ অনূ) , ঢাকা, মোহাম্মদী বুক হাউজ , ১৩৯৬ হি. , পৃ ১৫-১৬।
১০-১৩. ওয়ালী উদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ, আল-খতীব আত-তাবরীজ, 'মিশকাতুল মাসাবীহ', ঢাকা, আল-মাকতবা আল-ইসলামিয়্যা , তা বি. , পৃ ৩০-৩১।
১৪. আবু আব্দুর রহমান ইব্ন শুয়াইব আন-নাসায়ী , 'নাসায়ী শরীফ', করাচী , নূর মুহাম্মদ প্রকাশনী , তা বি. , পৃ ৫০।
১৫-১৬. সাখাবী , ইমাম, 'আল-মাকাসিদুর হাসানা', বৈরূত , দারুল কুতুব আল-ইসলামিয়্যা, তা বি. পৃ ৩৬৮।

চতুর্থ অধ্যায় :
জীবন চরিত

নামঃ মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ, উপাধীঃ মুফতী আযম, পূর্ণনামঃ মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ। পিতার নামঃ মুন্সী হিদায়াত আলী চৌধুরী, মাতার নামঃ রহীমুন্নিছা। চট্টগ্রাম মহানগরী থেকে উত্তর দিকে হাটহাজারী থানার মেখল গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৩১০ হিজরী / ১৮৯২ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩৯৬ হি. / ১৯৭৬ খৃ. মৃত্যুবরণ করেন।

ক. জন্ম ও বংশ পরিচয়ঃ মোগল শাসনামলে বাংলার রাজধানী ছিল গৌড়। মুফতী ফয়যুল্লাহর পূর্ব পুরুষগণ গৌড়ে বসবাস করতেন। তাঁর অষ্টম পূর্ব পুরুষ জনাব গফূর খান একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় গৌড়ের আশপাশে মহামারী ব্যাপকারে ছড়িয়ে পড়ে। মানুষ ভীত-ত্রস্ত হয়ে এলাকা ছেড়ে দূর দূরান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস আরম্ভ করে। গফূর খানের পরিবার চট্টগ্রামের দিকে রওয়ানা হয় এবং শহরতলী চকবোশালা অথবা চাষখোলায় বসবাস আরম্ভ করেন। চাষখোলায় তাদের বংশের উপাধি ছিল সর্দার। এই বংশের প্রতিটি সিঁড়িতে একজন বা একাধিক খ্যাতিমান মনীষীর আবির্ভাব হয়েছে। যেমন মুফতী সাহেবের তৃতীয় পূর্বপুরুষ/ পরদাদা মুন্সী দেওয়ান আলীর বড় ভাই মুন্সী আমানুল্লাহ বৃটিশ গভর্ণর জেনারেলের পক্ষ হতে সনদপ্রাপ্ত খ্যাতিমান উকিল ছিলেন। তাঁর ওকালতির সনদের প্রারম্ভিককাল ১৮১৪ খৃ.। যা এখন পর্যন্ত সংরক্ষিত আছে। ১৭৫৭ খৃ. নবাব সিরাজ উদ্দৌলার

পতনের প্রেক্ষাপটে ১১৮৬ হি. / ১৭৬৯ খৃ. ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্রাট শাহ আলমের (১৭৫৭-১৮৬০ খৃ.) সময় বাংলা ও বিহারের গভর্ণরের পক্ষ হতে মুফতী সাহেবের পঞ্চম উর্ধ্বতন পুরুষ জনাব কাসিম মুনাওয়ার ছিলেন ইসলামাবাদ জেলার (চট্টগ্রাম) সনদপ্রাপ্ত চৌধুরী। মূলতঃ মুফতী ফয়যুল্লাহর পূর্বপুরুষগণের প্রতিটি শাখায় শিক্ষা ও সংস্কৃতির ব্যাপক চর্চা ছিল।[১] মুফতী সাহেবের পরদাদার তিন স্ত্রীর মধ্য হতে কোন একজনের সন্তানগণ মেখলের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দেখাশোনার জন্য মেখল গমন করেন এবং বসতি আরম্ভ করেন। মুফতী ফয়যুল্লাহর পরদাদার (পিতার দাদা) জনাব মুন্সী দেওয়ান আলী এলাকায় বিয়ে শাদী করেন এবং এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। তাঁর বংশধরগণ এখানে বিস্তৃতি লাভ করেন।[২] মুন্সী দেওয়ান আলী চৌধুরী অল্প বয়সে মৃত্যু মুখে পতিত হন। তাঁর সন্তানের মধ্যে একমাত্র ছেলে মুন্সী আব্দুল আলী চৌধুরী জীবিত ছিলেন। মুন্সী আব্দুল আলী চৌধুরী পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা মেখলে বংশ বিস্তার করেছে। মুন্সী আব্দুল আলী চৌধুরীর পাঁচ পুত্র-কন্যা হলেনঃ ১. মুন্সী কুরবান আলী চৌধুরী, ২. মুন্সী ইউসুফ আলী চৌধুরী। যিনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রবিদ ছিলেন। ৩. পরাণজান ৪. নূর আলী চৌধুরী (মুফতী ফয়যুল্লাহর স্ত্রী রহীমুন্নিসার পিতা) ৫. মুন্সী হিদায়াত আলী চৌধুরী (মুফতী ফয়যুল্লাহর পিতা) ৬. আহমদ আলী চৌধুরী ৭. পিয়ারজান ৮. কাদিরজান।

মুন্সী হিদায়াত আলী চৌধুরীর চার স্ত্রীর মধ্যে প্রথম স্ত্রী ছিলেন নি:সন্তান, দ্বিতীয় স্ত্রীর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ ও মাস্টার নজব আলী। তৃতীয় স্ত্রী অল্প বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর ঘরে এক কন্যা সন্তানের জন্ম হয়েছিল। চতুর্থ স্ত্রীর ঘরে হাকীম ইউনুস, সেরেস্তদার তাজাম্মুল আলী ও মাহমুদা খাতুনের জন্ম হয়।[৩]

১-৩. ইজহারুল ইসলাম চৌধুরী, মুহাম্মদ, মুফতী, *হায়াতে মুফতী আযম*, চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, ১৩৯৭ হি., পৃ ১৩-১৫; নোমান, মুহাম্মদ, মাওলানা, *মুফতী আযম আকাবিরে উম্মত কী নযর মে*, কক্সবাজার, ফয়যিয়া ইসলামিক রিচার্স ফাউণ্ডেশন, মহেষখালী, ১৪১৮ হি., পৃ ৮৭-৮৮।

মুফতী ফয়যুল্লাহ তাঁর আত্ম-জীবনীতে লিখেন, 'আমার জন্ম হয়েছে মেখলের পৈত্রিক বাড়ীতে, জন্মের তারিখ ইত্যাদি ঘরে সংরক্ষিত ছিল, কিন্তু আমার বয়স যখন ৪/৫ বছর তখন পুরো বাড়ী আগুনে ভস্মীভূত হয়। ফলে সন তারিখ ইত্যাদির কাগজপত্র ধ্বংস হয়ে যায়। তবে বিভিন্ন ঘটনা পর্যালোচনার পর এ সিদ্ধান্তে স্থির উপনীত হয়েছি যে, আমার জন্ম সন ১৩১০ হি.।'[১]

মুফতী সাহেবের নসবনামাঃ

১. নোমান, পৃ. ৮৮।
২. *হায়াতে মুফতী আযম*, পৃ. ১৭।

মুফতী ফয়যুল্লাহর ভাষ্যমতে তাঁর পিতার নাম মুন্সী হিদায়াত আলী চৌধুরী। তিনি একজন দ্বীনদার, আমানতদার, সহজ সরল সাদামাটা বৈশিষ্ট্যের মানুষ ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কোন প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া ছিল না। তাঁর বড়ভাই মুন্সী ইউসুফ আলী চৌধুরীর নিকট ঘরোয়াভাবে লেখাপড়ায় অংশগ্রহণ করেছেন। বাড়ীতে ভাইয়ের নিকট লিখাপড়া শিখে পর্যায়ক্রমে একজন লেখক ও মুন্সীর খেতাব লাভ করেন। বাংলা ও ফার্সী ভাষায় তাঁর প্রচুর দখল ছিল। তিনি ছিলেন দানশীল, দ্বীনদার, আমানতদার, আখলাকৃওয়ালা এবং মুত্তাক্বী চরিত্রের অধিকারী, সবার প্রিয় মানুষ। সামাজিক কাজকর্ম ও বিচার শালিসের দায়িত্ব তিনি পালন করতেন। বিচক্ষণ জ্ঞানী হিসেবেও তাঁর সমাদর ছিল। মাওলানা আব্দুল হামীদ র.[১] সর্বদা তাঁর জ্ঞান বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার প্রশংসা করতেন। তিনি ছিলেন মাওলানা আব্দুল হামীদের একজন ভক্ত, অনুরক্ত। মাওলানা আব্দুল হামীদের সংস্কার কর্মে যখন নানা বাধা-বিপত্তি আসত তখন তিনি ছায়ার মতো কাজ করতেন। মাওলানা আব্দুল হামীদের সংসার, বিষয় সম্পত্তি ও পরিবারের সাথে মুন্সী হিদায়াত আলীর ছিল ঘনিষ্ট সম্পর্ক। মুফতী সাহেব বলেন, ‘আমার পিতা একদিন আমাদের বাড়ীর সামনে দ্বীনি মাহফিলের ব্যবস্থা করে মাওলানা আব্দুল হামিদের মাধ্যমে ওয়াজ নসীহতের ব্যবস্থা করেন। তখন আমাকে তাঁর দরবারে নিয়ে যেয়ে আমার জন্য দু'আ করালেন যেন আলিমে দ্বীন হতে পারি। মাওলানা আব্দুল হামীদের উসীলায় মাওলানা হাবীবুল্লাহ র.[২] সহ অপরাপর আকাবিরে উলামার সাথে আমার আব্বার ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল’। মুফতী ফয়যুল্লাহর পিতা মুন্সী হিদায়াত আলী চৌধুরী ষাট বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।[৩]

১. **মাওলানা আব্দুল হামীদ র.:** এ মনীষীর জন্ম আনুমানিক ১২৮৭ হি. / ১৮৬৯ খৃ. হাটহাজারী থানার মার্দাশা গ্রামে। তাঁর পিতার নাম রুস্তম আলী মুন্সী। তাঁর পূর্ব পুরুষদের মধ্যে শেখ হাফিজ আরব থেকে ব্যবসা, দাওয়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রামে আগমন করেন। সেই হিসাবে তিনি আরব বংশোদ্ভব। চার বছর চার মাস চারদিন বয়স হতে তাঁর লেখাপড়ার হাতেখড়ি। গ্রামে ফুরকানিয়া মাদরাসায় কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত ও দ্বীনি প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেন। পরবর্তীতে চট্টগ্রাম মুহসিনিয়া মাদ্রাসায় (বর্তমানে মহসিন কলেজ) ভর্তি হন। আনুষ্ঠানিক লেখাপড়া সমাপ্তির পর তিনি দ্বীনি শিক্ষা এবং সমাজ সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেন। শুক্রবার জুমু'আর নামাযের পর হাটহাজারী মাদরাসা মসজিদসহ এলাকার বিভিন্ন মসজিদে, মহল্লায়, বাড়িতে নিজ খরচে যাতায়াত করে ওয়াজ-নসীহতের মাধ্যমে সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার, রুসুম-রেওয়াজ ও বিদ'আতের অনিষ্টতা এবং সুন্নতের উপকারিতা, মহিলাদের পর্দা সম্বন্ধে সমাজকে সচেতন করতে, শিশু ও বয়স্কদেরকে বিশুদ্ধ কুরআন শিক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে পাঞ্জেগানা মসজিদ, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার কর্মপ্রচেষ্ঠা আজীবন চালিয়ে গেছেন। নিজ গ্রাম মার্দাশায় ঈদগাহ'র নিকট একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে দ্বীনি খেদমতের পথ উন্মুক্ত করেন। বিভিন্ন দ্বীনি সংস্থা, প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন। পরবর্তীতে দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন এবং সেখানে অধ্যাপনা করেন। তিনি ছিলেন একজন অভিজ্ঞ তার্কিক। সুন্নতের স্বপক্ষে এবং বিদ'আতের বিপক্ষে ছিলেন আজীবন সংগ্রামী। অনাড়ম্বর, সহজ- সরল জীবন যাপন, তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ ছিল তাঁর জীবনের ভূষণ। এ মনীষী ৫১ বছর বয়সে ৩১ মার্চ ১৯২০ খৃ বুধবার ইন্তিকাল করেন। (জসীম উদ্দীন, মুফতী, *দারুল উলূম হাটহাজারীর ইতিহাস*, চট্টগ্রাম, বুখারী একাডেমী হাটহাজারী, ২০০২, পৃ. ১৮৭।)

২. **মাওলানা হাবীবুল্লাহ র.:** মাওলানা হাবীবুল্লাহ ১২৮৩ হি./১৮৬৫ খৃ. হাটহাজারী থানার চারিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মতিউল্লাহ মিয়াজী। মৌলভী ইমাম উদ্দিন মিয়াজীর নিকট পবিত্র কুরআন শিক্ষালাভ করেন। মাওলানা মাসীহ উল্লাহর নিকট উর্দূ, ফার্সী এবং আরবীর প্রাথমিক কিতাবসমূহ পাঠ করেন। চট্টগ্রামের মুহসিনিয়া মাদ্রাসায় জামাতে সুওম পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। ১৩০১ হি. দারুল উলূম দেওবন্দ গমন করেন এবং দীর্ঘ সাত বছর সেখানে অধ্যয়ন করেন। মাওলানা আশরাফ আলী থানবী র. (মৃত্যু-১৯৪৩ খৃ)- এর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হন। শিক্ষা সমাপ্তির পর দেশে ফিরে বিদ'আত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কর্মসূচী গ্রহণ করেন। তিনি অপরাপর সাথীদের নিয়ে প্রতি চন্দ্র মাসের ১৩ তারিখ দেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতেন। তিনি দারুল উলূম হাটহাজারী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং দীর্ঘ ৪৪ বছর সেখানে পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। সততা, ন্যায়, আমানতদারী ছিল তাঁর জীবনের ভূষণ। ১৩৬১ হি./১৯৪৩ খৃ. মঙ্গলবার বাদ আসর এই মনীষী ইন্তিকাল করেন। (জসীম উদ্দীন, মুফতী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭২-১৭৯।)

৩. আহমদ হাসান, শাহ, মাওলানা; আহমদ উল্লাহ, হাফেজ, মুফতী, আল্লামা সম্পাদিত, *মাশায়েখে চাটগাম*, চট্টগ্রাম, ওয়াদুদী দারূল মুতালা'আ, ২০১১ পৃ. ৩৪১-৩৪২।

মাতা: মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ'র মাতার নাম রহীমুন্নিসা। মুফতী সাহেবের পিতার প্রথম স্ত্রী ছিলেন নি:সন্তান। ফলে তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন। তাঁর ঔরসে মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ ও মাস্টার নজব আলী জন্মগ্রহণ করেন। তবে মুফতী সাহেব মা'র সান্নিধ্য বেশিদিন লাভ করতে পারেননি। তাঁর বয়স যখন মাত্র আড়াই বছর তখন তাঁর মাতা ইন্তিকাল করেন। তাঁর মাতা ছিলেন একজন পর্দানশীল, পরহেযগার ও অনুপম আখলাকের অধিকারিনী। আমানতদারী ও দ্বীনদারী ছিল তাঁর ভূষণ। তিনি সর্বদা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করতেন। মৃত্যুকালে তিনি ফয়যুল্লাহকে দ্বীনি ইল্‌ম শিক্ষা দিয়ে আমলদার আলিম বানানোর জন্য ওসীয়ত করে যান। প্রকৃত মুফতী সাহেবের পিতা হিদায়াত আলী চৌধুরী যেমন সহীহ্ নিয়তের অধিকারী ছিলেন তদ্রুপ তাঁর মাতা রহীমুন্নিসাও ছিলেন নেক নিয়তের অধিকারিনী। মুফতী সাহেবের জীবনে পিতা- মাতার দ্বীনদারী, তাক্বওয়া-পরহেযগারী ও ইখলাসের ব্যাপক প্রভাব সর্বদা লক্ষ্য করা গেছে।[১]

জন্ম: মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানাধীন মেখল গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে নিজ বাড়ীতে ১৩১০ হি. জন্মগ্রহণ করেন। মুফতী সাহেবের বয়স যখন ৪/৫ বছর তখন তাঁর জন্মের সুনির্দিষ্ট তারিখ ও সনের লিখিত কাগজপত্রসমূহ বাড়ীতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ভস্মীভূত হয়। তবে মুফতী সাহেব তাঁর আত্মজীবনীতে তাঁর জন্ম সন ১৩১০ হি. বলে উল্লেখ করেছেন। মুফতী সাহেব বলেন, 'আমার এক চাচাত বোন আফিউন্নিছা আমাকে প্রায়ই বলতেন, তোমার জন্মের পর তোমার বড় চাচা মুন্সী ইউসুফ আলী তোমার ঘরে গিয়ে তোমাকে দেখে বলেছিলেন, এ বাচ্চা আমাদের বংশের নামীদামী ব্যক্তিত্বের অধিকারী হবেন।'[২]

বাল্যকাল: জন্মের পর মুফতী সাহেব পরম মমতায় মাতৃস্নেহে, মাতৃকোলে লালিত-পালিত হচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর বয়স যখন মাত্র আড়াই বছর তখন তাঁর মাতা রহীমুন্নিছা ইন্তিকাল করেন। ন্যূনতম জ্ঞান বুদ্ধি

হওয়ার আগেই তিনি মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হন। তাঁর মাতার ইন্তিকালের পর পিতা হিদায়াত আলী চৌধুরী পুনরায় বিয়ে করেন। ফলে তিনি সৎ মা'র তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হন।[৩]

খ. শিক্ষাজীবন: মাত্র চার বছর চার মাস বয়সে মুফতী ফয়যুল্লাহ'র শিক্ষা জীবনের প্রারম্ভ। বাড়ীতে মক্তবের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়মিত ছিলনা। তবে তাঁর চাচা আহমদ আলী বাচ্চাদের পড়ানোর প্রতি যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন। তাই তাঁর নিকট প্রাথমিক অক্ষর জ্ঞানের সবক আরম্ভ হয়। এছাড়া তাঁর ফুফু পিয়ারজান যিনি পবিত্র কুরআন শরীফ, দ্বীনি ইল্‌মের প্রাথমিক স্তরের কিতাবসমূহ পাঠ করেছিলেন, তাঁর নিকটও লেখাপড়া শিখতে থাকেন। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে তাঁর পিতা বাড়ীতে বাচ্চাদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। খন্দকার হুসনুজ্জামানকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন। মুফতী সাহেব কিছুদিন তাঁর নিকটও প্রাথমিক কিতাবাদি পাঠ করেন। এছাড়া দারোগা হানিফ সাহেবের নিকটও শিক্ষাগ্রহণ করেন।[৪]

খতনা ও বিসমিল্লাহ: সাত বছর বয়সে মুফতী সাহেবের খতনা সম্পন্ন হয়। এ উদ্দেশ্যে তাঁর বাড়ীতে এক বিরাট ভোজ উৎসবের আয়োজন করা হয়। চারটি গরু জবাই করে আশপাশের কয়েক গ্রামের সর্বস্তরের মানুষকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মাওলানা রশীদ আহম্মদ গাঙ্গূহী র.[৫] -এর

১-২. *হায়াতে মুফতী আযম*, পৃ ১৯-২০; মাহবুবে এলাহী, মাওলানা, *হায়াতুল মুসান্নিফীন*, ঢাকা, আনোয়ার লাইব্রেরী, ২০১৩, পৃ. ১৩৭।

৩-৪. হায়াতে মুফতী 'আযম, পৃ. ২১-২২; *মাশায়েখে চাটগাম*, পৃ. ৩৪৩।

৫. **মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গূহী র.:** মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গূহী র. ১২৪৪ হি. সাহারানপুর জেলায় গাঙ্গূহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম হিদায়াত উল্লাহ আনসারী। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে আরবী, ফার্সী, মানতিক ও ফিক্‌হ তৎকালীন দিল্লী কলেজের অধ্যাপক মাওলানা মামলূক আলী নানূতবীর (মৃ- ১৮৪৪ খৃ.) নিকট অধ্যয়ন করেন এবং শাহ আব্দুল গনী মুজাদ্দিদী র. (১৮১৯-১৮৭৮ খৃ.) ও শাহ্ আহমদ সাঈদ মুজাদ্দিদীর নিকট হাদীসের কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করেন। হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী র. (১৮১৭-১৮৯৯ খৃ.)-এর নিকট হতে আধ্যাত্মিক সবক লাভ করেন। ১৮৫৭ স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং সে অপরাধে ৬ মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন।

ছাত্র খ্যাতিমান আলিমে দ্বীন সর্বজন শ্রদ্ধেয় মাওলানা আব্দুল কাদির র. মেখলী উপস্থিত ছিলেন। এ অনুষ্ঠান উপলক্ষে তিনি ওয়াজ নসীহত করেন। মুফতী ফয়যুল্লাহকে উত্তম পোশাকে সজ্জিত করে তাঁর পিতা উক্ত বুযুর্গের নিকট নিয়ে যান এবং আলিফ, বা, তা, ছা'র ছবক গ্রহণ করান ও তাঁর জন্য দু'আ প্রার্থনা করেন। এখান থেকেই তাঁর আনুষ্ঠানিক লেখাপড়া আরম্ভ। মৌলবী আমীর আলী রাউজানীকেও তাঁর গৃহ শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। পরবর্তীতে মুফতী ফয়যুল্লাহ তাঁর খতনাকালীন মেহমানীর আয়োজন বিষয়ে ধর্মীয় অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, তা শরীয়তসিদ্ধ নয়। এসব অনুষ্ঠান থেকে বেঁচে থাকাই কর্তব্য। সাহাবী যুগে এ ধরণের মেহমানদারী ও দাওয়াতকরণের প্রথা ছিলনা। হযরত উসমান বিন আবুল আস রা. বলেন, আমাদের সাহাবী যুগে খতনা অনুষ্ঠানে মানুষকে দাওয়াত দেওয়া ও খাওয়ানোর প্রচলন ছিলনা'[১]

দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্রাসায়[২] ভর্তি: দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ২য় বছরে অর্থাৎ ১৩২০ হি. মুফতী ফয়যুল্লাহ সেখানে ভর্তি হয়ে কুরআন শরীফ নাজেরা ও উর্দূ কিতাবাদি পড়তে আরম্ভ করেন। ভর্তির পর অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে বাধ্য হন। ঘরে একের পর এক সৎমার আগমন, ঘর সংসারের টুকিটাকি কাজ, বাসন-কোসন ঘষা-মাজা ও পরিস্কারের কাজ তাঁকেই করতে হত। ঘরের বাতি ও নিজের পড়ার আলোর ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হত। এসব থেকে অবসর হয়ে পড়তে বসতেন। হাটহাজারী মাদ্রাসায় ভর্তির পর ৭-৮বছর পর্যন্ত বাড়ী থেকে যেয়েই লেখাপড়া করতে হয়েছে। হাটহাজারী মাদ্রাসায় লেখাপড়ার ১০ বছরের মধ্যে শেষ দুবছর তিনি মাওলানা আব্দুল হামীদ র. এর পরামর্শক্রমে রাঙ্গিপাড়ায় জায়গীর থাকতে শুরু করেন। সপ্তাহের শেষ দিন বৃহস্পতিবার বাড়ী যেতেন। শনিবার সকালে আবার মাদ্রাসায় আসতেন। জায়গীর থাকাকালে তাঁর চারিত্রিক আদর্শের কারণে আশপাশের লোকজনের শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালোবাসা অর্জন করতে সক্ষম হন। শনিবার সকালে প্রায়শই পান্তাভাত খেয়ে তাকে মাদ্রাসায় যেতে হত। এমন অবস্থা তাঁর শিক্ষকতার জীবনেও বহুবার ঘটেছে। তারপরও তিনি জীবনে কোনদিন কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপন

করেননি। সাপ্তাহিক ছুটির দিনে বাড়ীতে আসলেও তাঁর লেখাপড়া অব্যাহতভাবেই চলত।[৩] কাফিয়া ইত্যাদি কিতাব পাঠ করার সময়

প্রায় অর্ধ শতাব্দী ব্যাপী গাঙ্গুহতে তাঁর খানকায় হাদীস ও তাছাউফের শিক্ষা প্রদান করেন। হযরত মাওলানা কাসেম নানূতবীর র. ইন্তিকালের (মৃ. ১৮৮০ খৃ.) পর তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন উঁচু মানের ফকীহ ও মুজতাহিদ। তাঁর রচিত *ফাতাওয়া রশীদিয়া* একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তিনি আশি বছর বয়সে ১৯০৮ খৃ. ১২ আগস্ট গাঙ্গুহতে ইন্তিকাল করেন। (নূর মোহাম্মাদ আ'জমী র., *হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস*, ঢাকা, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯২, চতুর্থ সংস্করণ, পৃ ১৬৯।)

১. *হায়াতে মুফতী আযম*, পৃ ২২-২৪; নোমান, পৃ ৮৮; শরীফুল ইসলাম ফুয়াদ, মুহাম্মদ সম্পাদিত *আল্লামা হাফেজ জুনায়েদ বাবুনগরীর রচনাসমগ্র*, ঢাকা মাকতাবাতুল আতীক, ২০১৩, পৃ.৩৯৩।

২. **দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্রাসা :** এটি মূলত দারুল উলূম দেওবন্দ (ভারত) এর ধারা, নীতি, আদর্শ, কর্মসূচী ও পাঠ্যসূচীর উপর প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের সর্ব প্রাচীন একটি বিশাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। দাওয়াত, তাবলীগ, তা'লীম, তা'আল্লুম, মুজাহাদা, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ এবং ইলাই কালিমাতিল্লাহর উদ্দেশ্যে ১৩১৯ হি./১৯০১ খৃ. বর্তমান স্থানে মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এরপূর্বে হাটহাজারী থানা সদর হতে তিন কিলোমিটার দূরে চারিয়া গ্রামে ১৮৯৭ খৃ. এর শিক্ষা কার্যক্রম আরম্ভ হয়। অত:পর চারিয়া হতে হাটহাজারী বাজারের পার্শ্বে মিঠাহাটায় এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। পরবর্তীতে অনিবার্য কারণবশতঃ বর্তমান স্থানে স্থানান্তরিত হয়। জনৈক গুলবদন জমাদ্দারের স্ত্রী, পুত্র -কন্যাগণের বদান্যতায় মাদ্রাসায় স্থায়ী গৃহ নির্মাণের স্থান বরাদ্দ পেয়ে ১০×৬০ হাত দৈর্ঘ্য প্রস্থের একটি ঘর নির্মিত হয়। মাওলানা আব্দুল ওয়াহিদ র. সূফী আযীযুর রহমান র., মাওলানা আব্দুল হামীদ, মাওলানা হাবীবুল্লাহসহ এলাকার দ্বীনদার, সমাজসেবক ও জনগণের আর্থিক ও সার্বিক সাহায্য, সহযোগিতায় ১৯০৩ খৃ. ২৩ এপ্রিল মাদ্রাসায় শিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম চালু হয়। বর্তমানে এটি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। অত্র অভিসন্দর্ভের মূল প্রতিপাদ্য মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ র. হাটহাজারী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ২য় বছরে ভর্তি হন। ২০০২ খৃ. পরিসংখ্যান অনুযায়ী এ মাদ্রাসা হতে দেশে শীর্ষস্থানীয় প্রায় ১০ হাজার আলিম, মুফতী, মুহাদ্দিস, মুহতামিম, পীর মাশায়িখ, লেখক, সাংবাদিক ও রাজনীতিকের আবির্ভাব হয়েছে। প্রতি বছর হাটহাজারী মাদ্রাসা হতে প্রায় ১ হাজার ছাত্র হাদীসের সর্বোচ্চ ডিগ্রী (তাকমীল) অর্জন করে থাকেন। বর্তমানে মাদরাসার ছাত্র সংখ্যা ১০ হাজারের মধ্যে ওঠা-নামা করে। (জসীম উদ্দীন, মুফতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২-৫৮, *হায়াতে মুফতী আযম*, পৃ. ২৭-৩৭; আল্লামা হাফেজ জুনায়েদ বাবুনগরীর রচনাসমগ্র, পৃ. ৩৯২।)

৩. *হায়াতে মুফতী আযম*, পৃ. ৩৭-৩৯, ৬৩-৬৫; নোমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮; মাহবুবে এলাহী মাওলানা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭।

তাঁর মধ্যে দরসী কিতাবাদির বাইরে অন্যান্য কিতাবাদি অধ্যয়ন ও ইল্‌মী শুগ্‌ল অতিমাত্রায় বেড়ে যায়। হাটহাজারী মাদ্রাসায় পরীক্ষায় তিনি সর্বদা প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি আত্মজীবনীতে বলেন, 'পরীক্ষাসমূহে অধিকাংশ সময় আমি প্রথম স্থান অধিকার করতাম।'[১] সকল উস্তাদই তাঁর যেহেন, যাকাওয়াত, অনুভব, অনুভূতি, বোধশক্তি, ধীর-স্থির, শান্ত মেজাজ, নিখুঁত আখলাক, তাকওয়ার প্রশংসা করেছেন। অতি অল্প বয়সেই ইখলাস, দুনিয়া বিমূখতা তাঁর স্বভাবে পরিণত হয়েছিল বলে তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন। শিক্ষকগণ ক্লাসে কিতাবের দরস দেওয়ার পর ছাত্রদের মধ্যে তাকরার (পারস্পরিক পুনরাবৃত্তি) করাকালে মুফতী ফয়যুল্লাহ অবাক করার মতো তাকরার করতেন। ছবকের সব কিতাব অত্যন্ত উৎসাহ, উদ্দীপনার সাথে পাঠ করতেন। লেখক কিতাবে কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন তা উদ্ধারে গভীর মনোযোগ দিতেন, গবেষণা করতেন।[২] হাটহাজারী মাদ্রাসায় পড়ালেখার সময়ে তাঁর অসাধারণ মেধা, প্রতিভা, যোগ্যতা দেখে শিক্ষক, ছাত্র মুগ্ধ হয়েছেন। সেই সময়েই তাঁর শিক্ষকগণ কোন কোন বিষয়ে তাঁর সাথে পরামর্শ করেছেন। তাঁর মাধ্যমে সহপাঠী ও অন্যান্য ছাত্ররাও উপকৃত হয়েছেন। কঠিন ও দূর্বোধ্য স্থান আয়ত্ব করতে তাঁর শরনাপন্ন হয়েছেন। মাওলানা আবুল হাসান র.[৩] যখন হিদায় চতুর্থ খন্ড পড়াতেন তখন তিনি দূর্বোধ্য স্থানগুলো আয়ত্ব করতে মুফতী ফয়যুল্লাহর পরামর্শ নিতেন। কারণেই মুফতী সাহেবও হিদায়া চতুর্থ খন্ড পাঠদানকালে অত্যন্ত মনোযোগের সাথে মুতালা'আ করতেন। মুফতী সাহেব লিখেছেন, 'ছাত্র জীবনে হাটহাজারী এমনকি দেওবন্দ মাদ্রাসায়ও উস্তাদ ও মুরুব্বীগণের ভালোবাসা ও নেক নজরে ছিলাম। কারো সাথে ঝগড়া, বিবাদ, ফাসাদ, মনোমালিন্য কোনটিই জীবনে ঘটেনি। সকল ছাত্রই আমাকে অধিক সম্মান করত। পরীক্ষাসমূহে আমি অধিকাংশ সময় প্রথম স্থান অধিকার করতাম।'[৪]

দারুল উলূম দেওবন্দ [৫] যাত্রা: মুফতী সাহেব দীর্ঘ ১০ বছর অর্থাৎ মিশকাত-জালালাইন পর্যন্ত হাটহাজারী মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করেন। হাটহাজারী মাদ্রাসা তখন পর্যন্ত এতটা পূর্ণতা লাভ করেনি।

১. নোমান, পৃ. ৮৮,৮৯।

২. *হায়াতে মুফতী আযম*, পৃ. ৬৭; নোমান, পৃ. ৮৮-৮৯; আল্লামা হাফেজ জুনায়েদ বাবুনগরীর রচনাসমগ্র, পৃ. ৩৯৩।)

৩. **মাওলানা আবুল হাসান:** মাওলানা আবুল হাসান র. হাটহাজারী থানার অন্তর্গত খন্দকিয়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষগণ আরব হতে ইসলামী সংস্কৃতি বহন করে চট্টগ্রামে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষগণ কর্তৃক হস্তনির্মিত কাগজে হাতে লিখা কুরআন শরীফ, আরবী, ফার্সী, উর্দূসহ কিতাবাদির পাণ্ডুলিপি তাঁর বংশধরগণের নিকট এখনও সংরক্ষিত আছে। তিনি চট্টগ্রামের মুহসিনিয়া মাদ্রাসা হতে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে বৃত্তিসহ জামা'আতে উলা পাশ করেন। অত:পর ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়ীয়া উপজেলার একটি আলিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। এর কিছুদিন পর তিনি দারুল উলুম দেওবন্দ গমন করেন। সেখানে শিক্ষা সমাপ্তির পর দেশে ফিরেন এবং হাটহাজারী মাদ্রাসায় অধ্যাপনার কাজে যোগদান করেন। তৎকালে তাঁকে হাটহাজারী মাদ্রাসায় মুদাররিসে সুওম বলা হতো। অত্যন্ত ধর্মভীরু, সহজ-সরল এ মনীষীর জন্ম ও মৃত্যুর সন তারিখ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। (জসীম উদ্দীন, মুফতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪)

৪. *হায়াতে মুফতী আযম*, পৃ. ৭০; আল্লামা হাফেজ জুনায়েদ বাবুনগরীর রচনাসমগ্র, পৃ. ৩৯৩।)

৫. **দারুল উলূম দেওবন্দ:** ১৭৫৭ খৃ নবাব সিরাজের পতনের পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারত বর্ষের ক্ষমতা কুক্ষিগত করে। ১৮০৩ খৃ সম্রাট শাহ্ আলমের (১৭৫৯-১৮০৬ খৃ) নিকট হতে শাসন ক্ষমতা জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিলে শাহ আব্দুল আযীয র. (১৭৪৬-১৮২৩ খৃ) প্রত্যক্ষ মুক্তি সংগ্রামের ঘোষণা দেন এবং ভারতবর্ষকে 'দারুল হরব' আখ্যায়িত করেন। বেনিয়া ইংরেজদের তাড়িয়ে এদেশে আবারো ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুক্তি সংগ্রামীদের সর্বাত্মক জিহাদ অব্যাহত থাকে। তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সংঘটিত হয় ১৮৫৭ এর স্বাধীনতা আন্দোলন। ১৮৬৩ খৃ সীমান্তে ইংরেজ বাহিনীর সাথে মুক্তি সংগ্রামীদের আরো একটি যুদ্ধ পরিচালিত হয়। ১৮৫০-৬৩ খৃ পর্যন্ত মুক্তি সংগ্রামীরা ৩৬টি যুদ্ধ পরিচালনা করেন। কিন্তু দেশী-বিদেশী মুনাফিকদের বিশ্বাস ঘাতকতার কারণে তাদের মুক্তিসংগ্রাম ব্যর্থ হলে বৃটিশ সরকার ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতা নিজেদের হাতে নিয়ে সংগ্রামী আলিমদের নির্বিচারে হত্যা, ফাঁসি, আন্দামানে নির্বাসন দেয় এবং অসংখ্য মানুষ হত্যা করে। ভারতবর্ষে উলূমে নবুওয়্যত চর্চার সব পথ রুদ্ধ করে দেয়; এহেন সংকটজনক পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষের মুসলমানদের ঈমান-আকীদা, ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন বজায় রাখার লক্ষ্যে, ইসলামী শিক্ষাকে বৃটিশ চক্রান্তের হাত থেকে রক্ষাকল্পে মাওলানা কাসিম নানূতবীর (১৮৩২-১৮৮০খৃ.) নেতৃত্বে মোল্লা মাহমূদ (মৃ. ১৮৮৬ খৃ.) প্রমুখের সহায়তায় বৃটিশের নজর নিয়ন্ত্রণের বাইরে এবং সম্পূর্ণ

তাই তিনি শিক্ষকগণের পরামর্শক্রমে ২১ বছর বয়সে দারুল উলূম দেওবন্দ গমন করেন এবং সেখানে ২ বছর ৩ মাস অধ্যয়ন করেন। দেওবন্দ যাত্রার পূর্বে রমজানের শেষ দশ দিন হাটহাজারীর নিকট এলাকা রঙ্গিপাড়া জামে মসজিদে ই'তিকাফ করেন। ই'তিকাফ শেষে বাড়ীতে ফিরেন। এতে বাড়ীর সবাই এমনকি বৃদ্ধ পিতাও বেজায় খুশি হন। এরপর হাটহাজারী মাদ্রাসায় যেয়ে উস্তাদগণের সাক্ষাত, উপদেশ ও হিদায়াত গ্রহণ করেন। মাওলানা আব্দুল হামীদ র. তাঁকে সুন্নতের অনুসরণের জন্য এভাবে আদেশ করলেন যে,'যেখানেই যাও এমনকি আরশের উপর গেলেও সুন্নতের অনুসরণ এবং দ্বীনদারী না থাকলে আত্মা শান্তি পাবে না, খুশি হবে না।' প্রস্তুতি শেষে তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। মেখল থেকে চট্টগ্রাম শহর পর্যন্ত পায়ে হেঁটে পৌঁছতে হল। তাঁর পিতা এবং সাথী-সঙ্গীরা তাঁকে চট্টগ্রাম শহর পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন। রেলপথে যাত্রা শুরু করে একদিন সন্ধ্যায় দেওবন্দ পৌঁছতে সক্ষম হন। দেওবন্দ বাজার এলাকার জামে মসজিদে পৌঁছার পর একজন ছাত্রের মাধ্যমে মাওলানা জাকির হুসাইন চাটগাঁমীর কামরা পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হন। তাঁর কামরার কিছু অংশ ছিল মাদ্রাসার বাইরে। সেটি ছিল একটি সুন্দর থাকার ঘর। যার মধ্যে দারুল ইক্বামার অনেক ছাত্র অবস্থান করতেন। পৃথক কামরা বরাদ্দ না হওয়া পর্যন্ত তিনি মাওলানা জাকির হুসাইন সাহেবের কামরায় অবস্থান করেন। এতে তিনি মানসিক স্বস্তি লাভ করলেন। অত:পর দেওবন্দের অন্যান্য শিক্ষকগণের সাথে সাক্ষাত ও যোগাযোগ স্থাপন করেন। অপরিচিত জায়গায়,পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিলেন। দেওবন্দে ভর্তি হওয়ার আগেই উস্তাদগণের সুদৃষ্টি অর্জন করতে এবং তাঁদের মুখ থেকে সুন্দর ভবিষ্যত বাণী লাভ করতে সক্ষম হন। দেওবন্দে ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ার পূর্বে *মুখতাসারুল মা'আনী* এর কিছু অংশের পড়া শুনে আল্লামা গোলাম রাসূল বললেন, 'তুমি দেওবন্দেই লেখাপড়া করবে, এর বাইরে কোথাও যাবে না, তুমি বাঙালির মুখ উজ্জ্বল করবে, একজন খ্যাতিমান আলিমে দ্বীন হিসেবে বাংলার সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হবে ইনশা আল্লাহ'।[১] ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি হওয়ার পর মোল্লা হাসান, মায়াবুজী, মাক্বামাতে হারীরি, মুখতাসারুল মা'আনী ইত্যাদি কিতাব পড়তে আরম্ভ করেন। মাক্বামাতে হারীরি পড়ার সময় মুফতী মুহাম্মাদ শফী র.[২] কে (১৮৯৭-১৯৭৬খৃ.) সহপাঠী হিসেবে পাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। যিনি পরবর্তীতে মুফতী আযম পাকিস্তান এর

খেতাব লাভ করতে সক্ষম হন। দেওবন্দে তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব ও মনোযোগের সাথে সবকে অংশগ্রহণ,মুতালা'আ এবং আগামী দিনের সবক আয়ত্ব করতেন। দেওবন্দে অল্প দিনেই দেশী-বিদেশী অসংখ্য বন্ধু তাঁর জ্ঞান গরীমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন। মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী র.[৩] (১৮৭২-১৯৪৪ খৃ.)

গোপনে ১২৮৩ হি. ১৫ মহররম/ ১৮৬৭ খৃ. ৩০ মে প্রতিষ্ঠা করেন দারুল উলূম দেওবন্দ। একজন শিক্ষক মোল্লা মাহমূদ এবং একজন ছাত্র মাহমূদ হাসান- এর মাধ্যমে ডালিম গাছের নিচে এর শুভ সূচনা হয়। পরবর্তীতে এ প্রতিষ্ঠানের ইখলাস ও নেক কর্মের বদৌলতে অতি অল্প সময়ে সারা ভারতে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। ইসলামী ইলমীর দুনিয়ায় দারুল উলূম দেওবন্দ একটি শ্রদ্ধাভাজন নাম, শ্রদ্ধাভাজন প্রতিষ্ঠান। ইতিহাসে একে বলা হয় 'দেওবন্দ আন্দোলন' (আবদুর রশীদ আরশাদ, *বীস বড়ে মুসলমান* লাহোর, মাকতাবা-ই রশীদিয়া, ১৯৯৯ খৃ, নবম সংস্করণ, পৃ ২৬,১২৪; আব্দুল জলীল, *দেওবন্দ আন্দোলন একটি জিহাদ*, ঢাকা, ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৮৩ খৃ, পৃ ৯৮।

১. *হায়াতে মুফতী আযম*, পৃ. ৮০-৮২; নোমান, পৃ. ২৬; রহীম উদ্দীন, মুফতী, মাওলানা, *ফাতাওয়া ফয়যিয়া*, চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, ১৪৩১ হি. / ২০১০ খৃ., খন্ড ১ম, পৃ. ১৮।

২. **মুফতী মুহাম্মদ শফী র.** : তিনি দেওবন্দ মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে সেখানেই মুদাররিস ও মুফতী পদে নিয়োজিত হন। ১৯৪৭ খৃ. ভারত বিভাগ কালে পাকিস্তানে হিজরত করেন। করাচীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। করাচীতে তিনি একটি বিরাট দারুল উলূম কায়েম করেন; যা বর্তমানে এশিয়া মহাদেশের মধ্যে অন্যতম দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছে। এ কাজের পাশাপাশি তিনি অসংখ্য গ্রন্থ রচনা ও ফাতাওয়া প্রদানের কাজেও আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর রচিত *মা'আরিফুল কুরআন* তাফসীর গ্রন্থখানা এক অবিস্মরণীয় অবদান। *জাওয়াহিরুল ফিক্হ, মাসাইলে আহলে হাদীস* এবং *ইসলাম কা নিযামে আরাদি*, তাঁর অমর সৃষ্টি ১৯৭৬ খৃ. এ মনীষী ইন্তিকাল করেন। (*ফাতাওয়া ও মাসাইল*, প্রাগুক্ত, খন্ড ১ম, পৃ. ১৪৯, ১৫০ ; রফী উসমানী, মুহাম্মদ, মুফতী, *মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ. জীবন ও কর্ম* , ঢাকা, মাকতাবাতুল হেরা, ২০১৪ পৃ. ৩০, ২১৮।

৩. **মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী র. :** ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামী মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী ১০ মার্চ ১৮৭২ খৃ. পূর্ব পাঞ্জাবে শিয়ালকোট জেলার অন্তর্গত মিয়াওয়ালী গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত শিখ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম রামসিং, পিতামহের নাম যশপথ রায়, রামসিং ছিলেন হিন্দু ধর্মান্তরিত শিখ। মাওলানা সিন্ধী ছয় বছর বয়সে উর্দূ মডেল স্কুলে লেখাপড়া আরম্ভ করেন। ১২ বছর বয়সে *তোহফাতুল হিন্দ, তাকবিয়াতুল ঈমান, আহওয়ালুল আখিরাত*, ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৮৮৭ খৃ. ১৫ আগস্ট তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। মাওলানা আব্দুল কাদির ও মাওলানা খোদা বক্সের নিকট ইসলামের প্রাথমিক কিতাবাদি পাঠ করার পর ১৮৮৮ খৃ. দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হন। ১৮৮৯ খৃ. তিনি শাইখুল হিন্দের (১৮৫১-১৯২০ খৃ.) নিকট তিরমিযী শরীফ পাঠ করেন। মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গূহীর নিকট পাঠ করেন আবূ দাউদ শরীফ। সিন্ধী ছিলেন শায়খুল হিন্দের দু:সাহসিক রাজনৈতিক কর্মী। দীর্ঘ ২৩ বছর কাবুল, মস্কো, আঙ্কারা ও মক্কায় অবস্থান করার পর ১৯৩৯ খৃ. করাচী ফিরে আসেন। অত:পর তিনি শাহ ওয়ালী উল্লাহ'র দর্শন চর্চার জন্য দিল্লীতে জামিয়া

তাঁর একজন ভক্ত অনুরক্তে পরিণত হন। তিনি সব কিতাব মুফতী সাহেবের নিকট তাকরার করতেন। পাঞ্জাবে অন্যান্য ছেলেরা এ নিয়ে তাঁকে ঠাট্টা করলে সিন্ধী উত্তর করতেন, 'সে তো এমন এক বাঙালি যে তোমাদের সব পাঞ্জাবীদের পড়াতে সক্ষম।' মুফতী সাহেব দেওবন্দে অত্যন্ত মনোযোগের সাথে লেখপড়া করেন। সারা বছর একই নিয়মে লেখাপড়া চালিয়ে গেলেন। আগামী দিনের সবকগুলো বারবার পাঠ করতেন। পেছনের সবকগুলো ইয়াদ করতেন। ফলে পরীক্ষার সময় আসলে অন্যান্য ছাত্ররা যেমন গলদঘর্ম হয়ে ওঠত তাঁকে এই অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়নি। দরসী কিতাবসমূহ ছাড়াও হাটহাজারীতে ছাত্র জীবনে যেমনভাবে হিদায়া অধ্যয়নকে বাধ্যগত করে নিয়েছিলেন, দেওবন্দেও তিনি এই নিয়ম অব্যাহত রাখেন। পরীক্ষায় তিনি চূড়ান্ত সফলতা অর্জন করবেন এমন সুসংবাদ বিভিন্ন জনের সুস্বপ্নের মাধ্যমে অবগত হয়েছিলেন। দেওবন্দে পরীক্ষায় তিনি অসামান্য সফলতা অর্জন করেন। প্রতিটি পরীক্ষার উত্তরপত্র দেখে শিক্ষকগণ অভিভূত হতেন। বিশেষ করে *মুখতাসারুল মা'আনী* এর শিক্ষক মাওলানা আব্দুস সামী' র. উত্তরপত্র বিতরণের সময় উত্তরপত্রের মান পর্যালোচনা করছিলেন আর পরীক্ষার্থীর হাতে অর্পণ করছিলেন। ফয়যুল্লাহ চাটগাঁমীর উত্তরপত্রটি হাতে নিয়ে তিনি বললেন, 'এ ছাত্র কে? আমি তাকে দেখতে চাই,' সহপাঠীরা তখন মুফতী সাহেবকে জোর করে উস্তাদের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। তিনি বললেন, 'মনে হয় এই ছাত্র লেখকের চেয়ে বেশি বুঝতে পেরেছে'।[১] তাঁর *মোল্লা হাসান* কিতাবের পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন করেন মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী র.[২]। খাতা মূল্যায়নের পর বললেন, 'মনে হয় এ ছাত্র কিতাব লেখকের চেয়ে বেশি বুঝতে সক্ষম হয়েছে। আমার আগ্রহ যে, ছেলেটিকে আমি দেখব'।[৩] সে সময়ে দারুল উলূম দেওবন্দে ছাত্রদের মধ্যে ভাল ছাত্র হিসেবে মাহমূদ নানূতবী এবং অপরাপর কিছু ছাত্র'র ব্যাপক পরিচিতি ছিল। মুফতী ফয়যুল্লাহ তাদেরকেও পেছনে ফেলে ঈর্ষনীয় ভাবে শীর্ষস্থান দখল করেন। এভাবেই তিনি উস্তাদগণের শুভ দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হন। মাওলানা আব্দুস সামী ২য় সাময়িক পরীক্ষার ফলাফল দেখে বললেন, 'মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী তোমার বিষয়ে খুব খুশি।'[৪]

পিতার ইন্তিকাল: মুফতী ফয়যুল্লাহ দেওবন্দ গমনের ছয়মাস পর একদিন সকালের ছবক শেষ করে নাস্তা সেরে দুপুরের বিশ্রাম নিচ্ছিলেন । এমন সময় পিয়নের ডাক আসল। তিনি আতংকিত ও উৎকণ্ঠার মধ্যে

দিয়ে চিঠি গ্রহণ করলেন। দেখলেন, জিরি মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আব্দুল জাব্বার র.[৫] সাহেবের হাতের লিখা শান্তনামূলক চিঠি। ঐ চিঠিতে তাঁর পিতার মৃত্যু সংবাদ উল্লেখ

নিযামিয়া বাইতুল হিকমাহ প্রতিষ্ঠা করেন। লাহোরে সিন্ধ সাগর একাডেমী, সিন্ধুতে মুহাম্মাদ কাসিম ওয়ালী উল্লাহ থিওলজিক্যাল কলেজ স্থাপন করেন। তাঁর রচিত *শাহ ওয়ালী উল্লাহ আওর উনকী সিয়াসি তাহরীক, শাহ ওয়ালী উল্লাহ আওর উনকী ফালসাফা* গ্রন্থদ্বয় সুপ্রসিদ্ধ। ১৯৪৪ খৃ. ২১ আগস্ট তিনি ইন্তিকাল করেন। (মাহবুব রিজভী, সাইয়্যিদ, *তারীখে দারুল উলূম দেওবন্দ*, দেওবন্দ, ইদারায়ে ইহতিমামে দারুল উলূম, ১৯৯২, খন্ড ২য়, পৃ ৬৫)

১. *হায়াতে মুফতী আযম*, পৃ ৮২-৮৭, *মাশায়েখে চাটগাম*, পৃ. ৩৫৩।

২. **মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী র.:** শাইখুল ইসলাম মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী র. ১৩০৫ হি. এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। দেওবন্দের প্রধান মুফতী মাওলানা আযীযুর রহমান উসমানী এবং সদরে মুহতামিম মাওলানা হাবীবুর রহমান উসমানী ছিলেন তাঁর বড় ভাই। তাঁর পিতা ছিলেন স্কুল ইনস্পেক্টর। তিনি দারুল উলূম দেওবন্দ মাদ্রাসায় শিক্ষা গ্রহণ করেন। শাইখুল হিন্দ মাহমূদ হাসান দেওবন্দী র. (১৮৫১-১৯২০ খৃ) ছিলেন তাঁর বিশিষ্ট উস্তাদ। তিনি দিল্লীর ফতেহপুর মাদ্রাসা ও দেওবন্দ মাদ্রাসায় ৪৫ বছর ব্যাপী অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছিলেন আনওয়ার শাহ্ কাশ্মিরী র. সমপর্যায়ের শিক্ষক। ছাত্ররা কাশ্মীরির নিকট বুখারী শরীফ আর উসমানীর নিকট মুসলিম শরীফ পাঠ করেছেন। তাঁর রচিত মুসলিম শরীফের ভাষ্যগ্রন্থ *ফাতহুল মুলহিম* তাঁকে অমরত্ব দান করেছে। ১৯৪৭-এ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি পাকিস্তানের করাচীতে চলে যান এবং সেখানে বসতি স্থাপন করেন। ১৩৬৯ হি তিনি ভাওয়ালপুরে ইন্তিকাল করেন। করাচীতে সমাহিত হয়েছেন। (নূর মোহাম্মদ আ'জমী র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮।)

৩. নোমান, প্রাগুক্ত, পৃ ২৭; *হায়াতে মুফতী আযম*, পৃ ৮৭

৪. *হায়াতে মুফতী আযম*, পৃ ৮৭-৯০; *মাশায়েখে চাটগাম*, পৃ. ৩৫৩ ।

৫. **মাওলানা আব্দুল জাব্বার** : পটিয়া উপজেলাধীন জিরি নামক এলাকায় ১৮৮৮ খৃ. জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্তির পর হাটহাজারী মাদ্রাসায় ভর্তি হন। ১৯১১ খৃ. দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত করেন। ১৯১২ খৃ. হাটহাজারী মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। জিরি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় অনন্য ভূমিকা রাখেন। জীবনের শেষ দশটি বৎসর তিনি অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী ছিলেন। ১৯৫১ খৃ. তিনি ইন্তিকাল করেন। (জসীম উদ্দীন, মুফতী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯২।

ছিল। মৃত্যুকালে তাঁর পিতার বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। পিতার মৃত্যু সংবাদ তাঁকে বিচলিত ও বিমর্ষ করে তুলল। কারণ তখন তাঁর এক বোনের বয়স মাত্র ৩ মাস, এক ভাইয়ের বয়স ৩ বছর, অপর ভাইয়ের বয়স ৯-১০ বছর। তাই তিনি অধিক চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হলেন। এ কারণে তিনি কয়েকটি ক্লাসে উপস্থিত হতে পারেননি। জীবনে আর কখনো তিনি এমন সংকটের সম্মুখীন হননি। কঠিন রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হলেও ক্লাসে অনুপস্থিত থাকেননি। তবে তাঁর এ চরম সংকটকালে তাঁর পিতার বড় ভাই মাস্টার নজব আলী বাড়ীতে ছোট ভাই বোনদের দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করেন।[১] পিতার মৃত্যুতে তিনি দ্বিধাগ্রস্থ হন। তখনো তাঁর মানতিক ও হিকমতের দুয়েকটি কিতাব উস্তাদের নিকট পড়া বাকি। সাথী-সঙ্গীরা লেখাপড়া সংক্ষেপ করতে বললেন। তাই বিশেষ বিশেষ বিষয়গুলো পড়ার মনস্থ করলেন। মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানীর নিকট দাওরায়ে হাদীসের বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, তিরমিযী শরীফ, মুয়াত্তা ইমাম মালিক ও মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ অধ্যয়ন করেন। সেই সময়ে ভারতের সর্বত্র আনওয়ার শাহ কাশ্মীরির[২] দরসে হাদীসের সুখ্যাতি ছিল। শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসান র.[৩] তখনো জীবিত। তবে খুবই দূর্বল হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর নিকট বরকত স্বরূপ তিরমিযী শরীফের কিছু অংশ পাঠ করে হাদীসের ইজাযত লাভ করেন। ইতোমধ্যে শায়খুল হিন্দ হিজাযের সফরে গিয়ে বৃটিশের হাতে বন্দি হয়ে মাল্টায় নীত হন। তাই পুরো বছরই শাহ আনওয়ার কাশ্মীরির তিরমিযী ও বুখারী শরীফের দরসে শরীক হতে থাকেন। তিনি মুসলিম শরীফ পাঠ করেন শাব্বীর আহমদ উসমানী র. এবং মুয়াত্তা ইমাম মালিক মুফতী আযীযুর রহমান র. দেওবন্দীর[৪] নিকট। দেওবন্দ থাকাকালে তৃতীয় বছর দাওরায়ে হাদীসের অন্যান্য কিতাবসমূহ বিভিন্ন উস্তাদের নিকট পাঠ করতে থাকেন। কিন্তু বছরের মাঝখানে তাঁকে বাড়ী ফিরতে হল। এ প্রসঙ্গে মুফতী সাহেব বলেন, 'বাড়ীতে তখন অভিভাবক

১. নোমান, পৃ. ৯১-৯২; *ফাতাওয়া ফয়যিয়া*, খ. ১ম, পৃ. ১৯-২০; *মাশায়েখে চাটগাম*, পৃ. ৩৫৬।

২. **আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি র.:** আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি র. ১২৯২ হি. / ১৮৭৫ খৃ. কাশ্মীরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক কিতাবসমূহ সাইয়্যিদ মুয়াজ্জম আলী কাশ্মীরি ও মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ কাশ্মীরির নিকট পাঠ করার পর ১৩১০ হি. দেওবন্দে ভর্তি হন। শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসান র., মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরীর নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন। হাদীসের ইজাযত ও ইলমে বাতেন মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গূহীর নিকট অর্জন করেন। প্রায় ১৩ বছর দিল্লীর আমীরিয়া মাদ্রাসায় হাদীস, তাফসীর শিক্ষা দান করেন।

১৩২৭ হি. দারুল উলূম দেওবন্দে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। শায়খুল হিন্দের হিজায সফরের সময় শায়খুল হাদীসের পদ গ্রহণ করেন এবং ১৩৪৫ হি. পর্যন্ত দরস দেন। পরবর্তীতে তিনি বোম্বাই প্রদেশের ডাবিলে জামিয়া ইসলামিয়া নামে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে ১৩৫১ হি. পর্যন্ত হাদীসের দরস দেন। এ মনীষী ৬০ বছর বয়সে ১৩৫২ হি. / ১৯৩৩ খৃ. দেওবন্দে ইন্তেকাল করেন। তাঁর মতো অসাধারণ স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন প্রতিভাবান আলিম পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া ভার। বুখারী শরীফের ভাষ্যগ্রন্থ *ফয়যুল বারী* তাঁকে দুনিয়াব্যাপী খ্যাতি এনে দিয়েছে। (হাবীবুর রহমান, মুহাম্মদ, মাওলানা, *আমরা যাদের উত্তরসূরী*, ঢাকা, আলকাউসার প্রকাশনী, ১৯৯৮, পৃ.৭৭-৮০)

৩. **শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসান:** শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসান র. (১৮৫১-১৯২০ খৃ) ছিলেন বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের সংগ্রামী নেতা, বৃটিশের আতংক। একজন জগৎ বিখ্যাত আলিম, পণ্ডিত, বাগ্মী, গবেষক, লেখক, কূটনীতিক ও আধ্যাত্মিক মনীষী। ভারত বর্ষের শ্রেষ্ঠ আলিমে দ্বীন শাহ ওয়ালী উল্লাহ র. (১৭০৩-১৭৬২ খৃ.) সংস্কার আন্দোলনের সফল কর্মী ও যোগ্য উত্তরসূরী। তাঁর কূটনৈতিক তৎপরতা, সাহসী রাজনৈতিক কর্মসূচী সাম্রাজ্যবাদ ইংরেজ মসনদের ভীত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। ১৮৫১ খৃ. যুক্তপ্রদেশের বেরেলি শহরে তাঁর জন্ম। পিতা মাওলানা জুলফিকার আলী ছিলেন বেরেলি শিক্ষা বিভাগের সরকারী ডেপুটি ইন্সপেক্টর এবং দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। শায়খুল হিন্দ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হন। তিনি ছিলেন দারুল উলূম দেওবন্দের প্রথম সৌভাগ্যবান ছাত্র। ১২৮৬ হি. তিনি মাওলানা কাসিম নানুতবীর নিকট সিহাহ সিত্তাহ অধ্যয়ন করেন। এছাড়া মোল্লা মাহমূদ দেওবন্দী (মৃ. ১৮৮৬ খৃ.) মাওলানা ইয়াকুব নানুতবীর নিকট শিক্ষাগ্রহণ করেন। ১২৮৯ হি. তিনি দেওবন্দে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। মাওলানা কাসিম নানূতবীর (১৮৩২-১৮৮০ খৃ.) মৃত্যুর পর তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে শায়খুল হাদীস নিযুক্ত হন। মৃত্যু অবধি দীর্ঘ ৪০ বছর এই পদে বহাল থাকেন। বৃটিশ শাসন উৎখাতকল্পে ‘জমী'আতুল আনসার’ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রকাশ্যে রাজনীতিতে আবির্ভূত হন। বৃটিশ ভারতে আক্রমণের লক্ষ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯১৪-১৯১৮ খৃ.) হিজায সফর করেন। হিজাযে তিনি ‘রেশমী রুমাল’ আন্দোলনের অপরাধে বৃটিশের হাতে গ্রেফতার হয়ে ৩ বছর ৭ মাস মাল্টায় বন্দি জীবন কাটান। ১৯২০ খৃ. ৮ জুন তিনি মুক্তি লাভ করে ভারতে ফিরে আসেন এবং ৩০ নভেম্বর (১৯২০ খৃ.) ইন্তিকাল করেন। (আব্দুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮-২৩২।)

৪. **মুফতী আযীযুর রহমান দেওবন্দী র.:** তিনি ছিলেন দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান মুফতী ও ফকীহ। আজীবন ফাতাওয়া প্রদান ও রচনার কাজে লিপ্ত ছিলেন। ৭ খন্ডে প্রকাশিত *ফাতওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ* তাঁর অমর অবদান। ১৩৪৮ হি. তিনি ইন্তিকাল করেছেন। (*ফাতাওয়া ও মাসাইল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪।)

বলতে কেউ ছিলনা, যারা ছিলেন তারা ছিলেন ছোট, ইয়াতিম, বিধবা। আমি ছিলাম ভাইদের মধ্যে বড়, তাই দেওবন্দে বেশিদিন অবস্থান করা সম্ভব হল না। অন্যথায় ইচ্ছা ছিল আরো দুবছর দেওবন্দে থাকার। অগত্যা বাধ্য হয়ে ১৩৩৪ হি. মহররম মাসে বাড়ীতে ফিরে আসি। তখন আমার বয়স ২৪ বছর। অপরদিকে বড় চাচা নজব আলী বাড়ীতে চলে আসার জন্য বারবার চিঠি লিখছিলেন। বড় চাচা এবং ভাইয়ের ঘন ঘন পত্র পাওয়ার পর উস্তাদগণের সাথে পরামর্শ করলাম। বাড়ীর পরিস্থিতি বিস্তারিতভাবে তাঁদেরকে জানালাম। তখন সব শিক্ষকই সন্তুষ্ট হয়ে বললেন- যেহেতু আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাতেই এমন কঠিন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছ তাই তোমার চলে যাওয়াই উচিত হবে। যে পর্যন্ত লেখাপড়া করেছ সে অনুযায়ী কাজ করলে আশা করি তুমি সফল হবে।’[১] দেওবন্দ হতে চলে আসার মধ্য দিয়ে মুফতী সাহেবের প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার সমাপ্তি ঘটল।

গ.মুফতী ফয়যুল্লাহর উল্লেখযোগ্য উস্তাদগণ: মুফতী সাহেব অভিজ্ঞ, দায়িত্বশীল, কর্তব্যপরায়ন, স্বনামধন্য, আলিমেদ্বীন উস্তাদগণের নিকট লেখাপড়া করেছেন, তাঁদের শিষ্যত্ব লাভে ধন্য হয়েছেন। তাঁর উস্তাদগণ সবাই ছিলেন চারিত্রিক দৃঢ়তা, স্নেহ বাৎসল্য, নিয়মানুবর্তিতা আদর্শের প্রতীক। যারাই তাঁদের সান্নিধ্য লাভ করেছে তারাই সফল হয়েছে। মুফতী সাহেব তাঁর উস্তাদগণের কথা আজীবন শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের ভূমিকা মহান উস্তাদগণের মাধ্যমে লিখিয়ে ধন্য হয়েছেন। উস্তাদগণও নিজেদের গুণমুগ্ধ ছাত্রের প্রশংসার্হ বাক্য উচ্চারণ করেছেন। মুফতী সাহেব যেহেতু হাটহাজারী ও দেওবন্দ এ দুটো মাদরাসায় লেখাপড়া করেছেন তাই তাঁর উস্তাদগণের সংখ্যা ততবেশি নয়। তবেও তাঁরা ছিলেন দেশ-বিদেশে পরিচিত স্বনামধন্য আলেমেদ্বীন। নিম্নে তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকজন উস্তাদের নাম, পরিচিতি তুলে ধরা হলো:-

১. **মাওলানা আব্দুল হামীদ র.** (১৮৬৯-১৯২০ খৃ.)।
২. **মাওলানা হাবীবুল্লাহ র.** (১৮৬৫-১৯৪৩ খৃ.)।
৩. **মাওলানা আব্দুল জাব্বার র.** পটিয়া (১৮৮৮-১৯৫১ খৃ.)।

৪. মাওলানা সূফী আযীযুর রহমান র.: আনুমানিক ১২৮০ হি. /১৮৬২ খৃ. চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার বাবুনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পবিত্র কুরআন শরীফ ও প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে চট্টগ্রামের মুহসিনিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং জামা'আতে উলা পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। তিনি ছিলেন খুব মেধাবী। হাটহাজারী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় অনন্য ভূমিকা পালন করেন এবং ১৩২০ খৃ. সেখানে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৩-১৫ বছর সেখানে শিক্ষকতা করেন। এরপর নাজিরহাটে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী বাবুনগর মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। ছাত্র জীবন থেকেই তিনি সূফী চরিত্রের অধিকারী ছিলেন বিধায় সূফী সাহেব হিসেবে সমধিক পরিচিত। ১৩৪০ হি. ১৯২২ খৃ. তিনি ইন্তিকাল করেন।[২]

৫. মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ হাওলাপুরী: ইনি ছিলেন হাটহাজারী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠাতাদের একজন এবং উক্ত মাদ্রাসার স্বার্থক শিক্ষক।

৬. মাওলানা জমীর উদ্দীন র. : ১২৯৬ হি. / ১৮৭৮ খৃ. হাটহাজারী থানার শোয়াবিল গ্রামে এ মনীষীর জন্ম। বাল্যকালেই তিনি পিতাকে হারান। অভাব ঘুচাতে রেঙ্গুনে একটি কোম্পানীতে চাকরী নিতে বাধ্য হন। একদিন একটি শুভ স্বপ্নে আবেগ আপ্লুত হয়ে রশীদ আহমদ গাঙ্গূহীর দরবারে উপস্থিত হন এবং তাঁর আদেশান্তে দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হয়ে ইলমে শরীআতের চূড়ান্ত যোগ্যতা অর্জন করেন। দেশে ফিরে প্রথমে ফটিকছড়িতে একটি মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। পরবর্তীতে হাটহাজারী মাদ্রাসায় শিক্ষকতায় যোগ দেন। মুফতী ফয়যুল্লাহ তাঁর নিকট হিদায়া ৩য় ও ৪র্থ খন্ড পাঠ করেছেন। তিনি সর্বদা সুন্নতের অনুসরণ করতেন। তিনি ১৩৫৯ হি. ইন্তিকাল করেন।[৩]

১. *হায়াতে মুফতী আযম*, পৃ.৯৯-১০০; *আল্লামা হাফেজ জুনায়েদ বাবুনগরীর রচনাসমগ্র*, পৃ. ৩৯৩; *ফাতাওয়া ফয়যিয়া*, খ. ১ম, পৃ. ২০।

২-৩ জসীম উদ্দীন, মুফতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬-১৮৭, ১৯১-১৯২, *মাশায়েখে চাটগাম*, পৃ. ১৪২।

৬. আল্লামা সাঈদ আহমদ সন্দীপী র. (বড় মুহাদ্দিস হুজুর) : তিনি ছিলেন দেশবরেণ্য হাদীসশাস্ত্রবিদ এবং হাটহাজারী মাদ্রাসার প্রথম শায়খুল হাদীস। চট্টগ্রামের সন্দীপে ১৩০০ হি. তাঁর জন্ম। পিতার নাম মাওলানা নূর বখ্স র.। পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর মাত্র ১১ বছর বয়সে দারুল উলূম দেওবন্দ গমন করে শায়খুল হিন্দের নিকট নিজেকে সোপর্দ করেন। ১৩২৩ হি. হাদীস ও তাফসীরের উচ্চতর সনদ লাভ করেন। দেশে ফিরে ১৩২৬ হি. হাটহাজারী মাদ্রাসায় শায়খুল হাদীসের পদ অলংকৃত করেন। দীর্ঘ ৩৫ বছর হাদীসের খেদমত করেছেন। ১৩৭৫ হি. তিনি ইন্তিকাল করেন। শেষ জীবনে নিজের প্রতিষ্ঠিত চারিয়া মাদ্রাসার দক্ষিণ পাশে তিনি সমাহিত হন।[১]

৭. হাফেজ মাওলানা আফাজ উদ্দীন রহ.: এ মনীষীর জন্ম আনুমানিক ১২৮০ হি.। ৭ বছর বয়সে তাঁর পিতা মাওলানা সালিম উদ্দিন ইন্তিকাল করেন। প্রথম জীবনে চট্টগ্রামের মুহসিনিয়া মাদ্রাসায়, পরবর্তীতে দারুল উলূম দেওবন্দে লেখাপড়া করেন। তিনি মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গূহীর ইজাযত প্রাপ্ত ছিলেন এবং আজীবন হাটহাজারী মাদ্রাসার খেদমত করে গেছেন। তাঁর মত দুনিয়া ত্যাগী মনীষীর উদাহরণ খুবই বিরল। ১৩৬৩ হি. ২৯ রমযান তিনি ইন্তিকাল করেন।[২]

৮. মাওলানা গোলাম রসূল র.।

৯. মাওলানা ইবরাহীম আলমপুরী র.।

১০. মাওলানা আলীম উদ্দিন র.।

১১. মাওলানা আফী উদ্দীন র. মাদার্শা ।

১২. মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গূহী র. (জ.১২৪৪ হি. মৃ. ১৯০৮ খৃ.)।

১৩. মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী র. (১৮৮৭-১৯৪৯ খৃ.)। মুফতী সাহেব তাঁর নিকট মুসলিম শরীফ পাঠ করেছেন।

১৪. শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসান দেওবন্দী র. (১৮৫১-১৯২০ খৃ.)। মুফতী সাহেব তাঁর নিকট তিরমিযীর কিছু অংশ পাঠ করেছেন ও হাদীসের ইজাযত লাভ করেছেন।

১৫. আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি র. (১৮৭৫-১৯৩৩ খৃ.)

মুফতী সাহেব তাঁর নিকট বুখারী ও তিরমিযী শরীফ পাঠ করেছেন।

১৬. মুফতী আযীযুর রহমান দেওবন্দী র.: ।

১৭. আল্লামা মুহাম্মাদ ইবরাহীম বলিয়াভী র.: উত্তর প্রদেশের বলি এলাকায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে তাঁর জন্ম। প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করার পর ১৩৩৫ হি. দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হন। শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসান, মুফতী আযীযূর রহমান, হাফিজ মুহাম্মাদ হাসান র. প্রমূখের নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন। দারুল উলূম দেওবন্দ, ডাবিল, দিল্লীর ফতেহপুর, চট্টগ্রাম হাটহাজারী মাদ্রাসা এবং শেষ জীবনে দারুল উলূম দেওবন্দে হাদীসের দরস দিয়েছেন। শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমাদ মাদানী (১৮৭৮-১৯৫৭ খৃ.) ইন্তিকালের পর তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের সদরুল মুদাররিসের পদ অলংকৃত করেন। তাঁর শিক্ষকতার জীবন প্রায় ৫০ বছর। ১৩৮৭ হি. ২২ রমযান ৮৪ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। দেওবন্দের মাকবারাই কাসিমীতে সমাহিত হন।[৩]

১৮. মাওলানা ইজায আলী: মুরাদাবাদ উপকণ্ঠে আমরোহা গ্রামে ১৩০০ হি. তাঁর জন্ম। পিতার নিকট উর্দূ, ফার্সী কিতাবসমূহ পাঠ করার পর দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হন। সেখানে সিহাহ্ সিত্তাহ্সহ ফনূনাতের কিতাবসমূহ পাঠ করেন। লেখাপড়ার পর ভাগলপুরে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। ১৩৩০ হি. দারুল উলূম দেওবন্দের শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং ১৩৪০হি. মুফতী হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। ১৩৭৪ হি. এ মনীষী ইন্তিকাল করেন এবং মাকবারায়ে কাসিমীতে সমাহিত হন।[৪]

১৯. মাওলানা আব্দুস সামী দেওবন্দী:

২০. প্রমুখ।[৫]

---

১. *আল্লামা হাফেজ জুনায়েদ বাবুনগরীর রচনাসমগ্র*, পৃ. ৪১৫-৪১৬।

২-৩. জসিম উদ্দীন, মুফতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩-১৯৪; *মাশায়েখে চাটগাম*, পৃ. ১৭৯-১৮২।

৪. হাবীবুর রহমান, মুহাম্মদ, মাওলানা, *হায়াতুল মুসান্নিফীন*, ঢাকা, আলকাউসার প্রকাশনী, ২০১২, পৃ.১৫৫-১৫৬।

৫. নোমান, পৃ. ৯৩-৯৪; *ফাতাওয়া ফয়যিয়া*, খ. ১ম, পৃ. ২৩-২৪; মাহবুবে এলাহী, মাওলানা, *হায়াতুল মুসান্নিফীন*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৭।

ঘ. হাটহাজারী মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান: ১৩৩৪ হি. মুফতী সাহেব দেওবন্দ হতে ফিরে হাটহাজারী মাদ্রাসায় শিক্ষকতায় যোগদান করে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। দেওবন্দ থাকাকালেই জীরি মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আহমদ হাসান র. তাঁকে বারবার চিঠি লিখতেন যে, আমি একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছি, এখানে তোমাকে চাই। বাড়ীতে পৌঁছার পর হাটহাজারী মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদানের জন্য প্রস্তাব দেয়া হলে তিনি মাওলানা আহমদ হাসানকে জানিয়ে দিলেন যে, হাটহাজারী মাদ্রাসায় আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণ মওজুদ আছেন, তাই তাঁদের সুনজর ও ছায়ার নিচে থাকতে আমার পছন্দ।[১] যোগদানের কিছুদিন পরই ফাতাওয়া বিভাগের দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়ে এর উন্নয়নে বলিষ্ঠ প্রতিভা, যোগ্যতা ও দক্ষতার পরিচয় দেন। মাদ্রাসার ফাতাওয়া বিভাগকে একটি সুসজ্জিত, নির্ভরযোগ্য ফিকহ ও ফাতাওয়ার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হন এবং বাংলাদেশে একমাত্র তিনিই *মুফতী 'আযম* উপাধিতে ভূষিত হন। মাত্র ১৫ টাকা ওযীফা (বেতন) ধার্য করা হয়। তাতেই তুষ্ট হয়ে যোগদান করেন। বড় মুহাদ্দিস হুজুর (মাওলানা সাঈদ আহমদ সন্দ্বীপী র.) বুখারী শরীফের দরস দিতেন আর মুফতী সাহেব তিরমিযী ও মুসলিম শরীফ পড়াতেন। ছাত্রজীবন থেকেই মুফতী সাহেবের *হিদায়া* গ্রন্থের সাথে আত্মিক সম্পর্ক ছিল। তাই প্রতি বছর *হিদায়া* কিতাব পাঠদানের দায়িত্ব নিজের নিকট রাখতেন। হিদায়া অধ্যয়ন বিষয়ে তিনি বলেন, 'ফজর নামাযের পর আমি প্রতিনিয়ত হিদায়া পাঠ করতাম। নামাযের পর বিভিন্ন ওযীফা পাঠ করা যেমন আবশ্যিক করে নিয়েছিলাম তেমনি হিদায়া পাঠ করাকেও আবশ্যিক করে নিয়েছিলাম, কখনোই এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেনি'।[২] একবার তিনি মেখলে জনৈক হামযাহ খাঁর বাড়ীতে রাতের বেলায় দাওয়াত খেতে গেলেন। তখন এত বৃষ্টি হচ্ছিল যে, রাতে ঘরে ফেরা সম্ভব হয়নি। মাদ্রাসার কাছেই ছিল হামযাহ খাঁর বাড়ী। ফজর নামাযের পর মুফতী সাহেব কাদা মাড়িয়ে বাড়ীতে গেলেন শুধুই হিদায়া মুতালা'আ করার জন্য। জনৈক মাওলানা আব্দুল গণী বলেন, 'হিদায়ার চারটি খন্ড প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি আমার সামনেই সতের বার পাঠ করেছেন। বাকি আরো কতবার পাঠ করেছেন জানা নেই।'[৩] কারণেই তাঁর ফিক্হী যোগ্যতা দক্ষতার কথা অল্প সময়ে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি সিহাহ্ সিত্তাহ, তাফসীর, মানতিক, হিকমত, আদব, সরফ, নাহু ইত্যাদি সব বিষয়েই কিতাব পড়িয়েছেন। যে কিতাবই পড়াতেন ছাত্ররা আগ্রহের সাথে তাঁর দরসে আছড়ে পড়ত। তাঁর নিকট তৃপ্তির

সাথে পাঠোদ্ধার সম্ভব হত। হাদীস পড়ালে মনে হত তিনি এ যুগের ইমাম বুখারী, ফিক্‌হ পড়ালে মনে হত তিনি এ যুগের ইমাম আবূ হানীফা, মানতিক ও হিকমত পড়ালে মনে হত তিনি যুগের সেরা তার্কিক ও দার্শনিক। একজন যোগ্য, দক্ষ, শাস্ত্রের ইমামের মত কিতাবের পাঠদান করতেন এবং ছাত্রদের জ্ঞান পিপাসা নিবারণ করতেন। অত্যন্ত সাদাসিধে ভাষায় বক্তব্য দিতেন। প্রথমে ছাত্রদের দিয়ে কিতাবের মতন (মূল বাক্য) পড়াতেন, কিছু অংশের মতন নিজে পাঠ করতেন। সহজ সরল ভাষায় এর সারমর্ম ছাত্রদের শুনাতেন। অত:পর ধীরে-স্থিরে অনুবাদ শুনাতেন। লম্বা বক্তব্য দিতেন না। ফলে দূর্বল মেধাবীরা তাঁর পাঠ আয়ত্ব করতে সক্ষম হত। তিনি যে কিতাব ছাত্র জীবনে পড়েননি এমন কিতাবও সমান দক্ষতা ও সুখ্যাতির সাথে পড়িয়েছেন। এতটুকু পরিমাণ সবক পড়াতেন যতটুকু ছাত্রদের জন্য বোঝা না হতো। সবক পরিমাণ মত পড়াতেন। নিরবিচ্ছিন্নভাবে পড়াতেন। ফলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই নিসাব (সিলেবাস) যথারীতি শেষ হত। দাওরায়ে হাদীসসহ যে কোন জামা'আতের কিতাব নিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্লাসে পড়িয়ে শেষ করতেন। অতিরিক্ত সময়ে পড়াতে হতনা। ঘন্টা বাজার সাথে সাথে দরসে বসতেন এবং বাড়তি কোন কথা না বলে পুরো সময় দরসে ব্যয় করতেন। এভাবে ছোট বড় যে কোন কিতাব পড়াতে ছাত্রদের অবস্থার প্রতি নজর রাখতেন। কারীমা থেকে শুরু করে বুখারী শরীফ পর্যন্ত প্রায় সব কিতাবই তাঁর পড়ানোর সুযোগ হয়েছে। তাঁর পাঠদানে একটি নির্দিষ্ট শান ছিল,

১. *হায়াতে মুফতী আযম*, পৃ. ১০০; নোমান, পৃ. ৯০-৯১; *মাশায়েখে চাটগাম*, পৃ. ৩৫৬।
২-৩. *হায়াতে মুফতী আযম*, পৃ. ১১৫-১১৬; আব্দুল বাকী, মুহাম্মদ, ড., প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।

নতুন পদ্ধতি ছিল। কিতাবের কোন কঠিন জায়গা বুঝতে সক্ষম হলে তিনি খুশি হতেন, আনন্দ প্রকাশ করতেন, আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করতেন, তাঁর চেহারায় নূরের দ্যুতি ছড়াত। ছুটির দিনেও ছাত্ররা তাঁর কাছে কিতাব পড়ার জন্য ভীড় করত। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ছুটির দিনসমূহে কোন কোন ছাত্র আমার কাছে কোন কোন কিতাব পড়ে নিত। প্রতিটি ছুটিতে আমি একটি রিসালাহ (পুস্তিকা) রচনা করেছি, কোন ছুটিতেই এর ব্যতিক্রম হয়নি'।[১]

পবিত্র রমযানের এক ছুটিতে তিনি ব্যারিস্টার সানাউল্লাহ র.[২] কে জালালাইন শরীফ সম্পূর্ণ কিতাবটি পড়িয়েছিলেন। ঐ মাসটি ছিল প্রচণ্ড গরমের। শেষ রমযানে মুফতী সাহেব ছিলেন ই'তিকাফে। মসজিদের চাল ছিল টিনের। ঐ প্রচণ্ড গরমেই জালালাইন শরীফ পড়িয়ে শেষ করেছেন। অপরদিকে ব্যারিস্টার সানাউল্লাহও সবক আয়ত্ব করতে সক্ষম হন। মূলত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ছিল তাঁর মজ্জাগত বিষয়। শিক্ষার্থী যে কোন সময়, যে কোন কিতাব নিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হলে তিনি বিষয়টি পরিস্কারভাবে বুঝাতে চেষ্টা করেছেন। তিনি ছিলেন শিক্ষকগণের শিক্ষক। হাটহাজারী মাদ্রাসায় যাঁরা শিক্ষকতা করতেন তাঁদের যাবতীয় ইলমী সমস্যার সমাধানের নির্ভরযোগ্য পাত্র ছিলেন। বিশেষ করে ফিক্‌হী বিষয়ের। এ বিষয়ে তিনি অদ্বিতীয় এবং নির্ভরতার প্রতীক ছিলেন।[৩] খতীবে আযম মাওলানা সিদ্দীক আহমদ র.[৪] এর মতে তিনি হিকমত, মানতিক ও ফালসাফা বিষয়েও ছিলেন দক্ষ, অভিজ্ঞ, সিদ্ধহস্ত। হাদীস, ফিক্‌হ'র বিষয়েরও ইমাম ছিলেন। খতীবে আযম বলেন, 'অনবসরতার কারণে মুফতী সাহেব আমাকে *মায়াবুযী* কিতাব হাটহাজারী থেকে মেখল (বাড়ীতে) ফেরার পথে হাঁটতে হাঁটতে পড়াতেন। পুরোটাই তাঁর স্মৃতি শক্তি থেকে পড়াতেন। অবাক হওয়ার বিষয় যে, পরে যখন কিতাব দেখতাম লক্ষ্য করতাম যে, কোন বাক্য বাদ পড়েনি'।[৫] যদিও মনে করা হয় মুফতী ফয়যুল্লাহ শুধু মাত্র ফিক্‌হশাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন, এক্ষেত্রে তাঁর উদ্ভাবনী শক্তি ছিল; প্রকৃত তিনি সব বিষয়ের ইমাম ছিলেন। ভারতবর্ষের খ্যাতিমান আলিমে দ্বীন মুফতী মুহাম্মদ শফী র. -এর চেয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য কোন অংশে কম ছিলনা। তিনি আরবী সাহিত্যেরও একজন পণ্ডিত ছিলেন।[৬]

১. *হায়াতে মুফতী আযম*, পৃ. ১১৮-১১৯; *ফাতাওয়া ফয়যিয়া*, খ. ১ম, পৃ. ২৩; *আল্লামা হাফেজ জুনায়েদ বাবুনগরীর রচনাসমগ্র*, পৃ. ৩৯৩।

২. **ব্যারিস্টার মাওলানা সানাউল্লাহঃ** হাটহাজারীর মার্দাশা এলাকায় জন্ম। মাদ্রাসা শিক্ষার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মুফতী ফয়যুল্লাহর নিকট পাঠ করেন। অপরাপর উস্তাদগণের নিকট হতেও শিক্ষা গ্রহণ করেন। দারুল উলূম দেওবন্দ হতে ফারাগত হাসিলের পর আধুনিক শিক্ষায় মনোযোগী হন এবং লন্ডন থেকে পি-এইচ.ডি. ও ব্যারিস্টারি ডিগ্রী অর্জন করেন। কিছুদিন কলকাতা সুপ্রীম কোর্টে ব্যারিস্টারি করার পর এ পেশা ছেড়ে দেন। অবিভক্ত ভারতের বাংলা প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। কিছুদিন চট্টগ্রাম জেলা বোর্ডের সদস্য ছিলেন। দাওয়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষসহ আমেরিকা, লন্ডন, ফ্রান্স, আরব আমিরাত, মিশর, সিরিয়া, সৌদিআরবসহ বিভিন্ন দেশ সফর করেন। মাতৃভাষা বাংলার ন্যায় ২২টি ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারতেন। ১৩৮২ হি. ১৮ই রমযান মুফতী ফয়যুল্লাহর জীবদ্দশাতেই তিনি ইন্তিকাল করেন। লালদিঘীর ময়দানে মুফতী সাহেবের ইমামতিতে তাঁর নামাজে জানাযা সম্পন্ন হয়। (*হায়াতে মুফতী আযম পৃ.* ২২১-২২২)

৩. *হায়াতে মুফতী আযম*, পৃ. ১২৪-১২৫; *আল্লামা হাফেজ জুনায়েদ বাবুনগরীর রচনাসমগ্র*, পৃ. ৩৯৩; *মাশায়েখে চাটগাম*, পৃ. ৩৬৪।

৪. **মাওলানা সিদ্দীক আহমদ র.** : খতীবে আযম মাওলানা সিদ্দীকে আহমদ র. ছিলেন পটিয়া মাদ্রাসার পৃষ্ঠপোষক, শায়খুল হাদীস ও চেয়ারম্যান ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ বাংলাদেশ। ভারতবর্ষের একজন খ্যাতিমান আলেমেদ্বীন ইসলামী চিন্তাবিদ ও বাগ্মী। কক্সবাজার জেলার চকোরিয়ার বড়ইতলী গ্রামে ১৯০৫ খৃ. তাঁর জন্ম। হাটহাজারী মাদ্রাসায় লেখাপড়ার পর ১৯২৬ খৃ. মুজাহিরে উলূম সাহারানপুর মাদ্রাসা থেকে দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত করেন। ১৯২৯ খৃ. দারুল উলূম দেওবন্দ থেকেও ফারাগাত হাসিল করেন। ১৯৩২ খৃ. হাটহাজারী মাদ্রাসায় শিক্ষকতায় যোগদান করেন। ১৯৬৬ খৃ. পটিয়া মাদ্রাসায় যোগদান করেন দীর্ঘ ২২ বছর শায়খুল হাদীসের পদ অলংকৃত করেন। তিনি ইসলামী আন্দোলন নিয়ে সারাদেশ চষে বেড়াতেন। ১৯৫৪ খৃ. পাকিস্তান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন একজন খ্যাতিমান বক্তা খতীবে আযম উপাধি প্রাপ্ত। ১৯৮৭ খৃ. ৮৫ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। বড়ইতলীতে সমাহিত হয়েছেন। (*হায়াতে মুফতী আযম*, পৃ. ২১৯-২২১)।

৫-৬. *হায়াতে মুফতী আযম*, পৃ. ১২৭-১২৯, ১৩৪-১৩৬; *আল্লামা হাফেজ জুনায়েদ বাবুনগরীর রচনাসমগ্র*, পৃ. ৩৯৩; আব্দুল বাকী, মুহাম্মদ, ড., প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯ ।

মুফতী ফয়যুল্লাহ যখন হাটহাজারী মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন, তখন তাঁর উস্তাদগণের প্রায় সবাই জীবিত। মাওলানা হাবীবুল্লাহ র., মাওলানা আব্দুল হামীদ র., মাওলানা জমীর উদ্দীন র., মাওলানা সাঈদ আহমদ র., হাফেজ মাওলানা আফাজ উদ্দীন র., মাওলানা সূফী আযীযুর রহমান র. প্রমুখ সকলেই জীবিত। তারপরও ছাত্ররা মুফতী সাহেবের দর্‌সে আছড়ে পড়ত। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি ছাত্রদের নির্ভরতা, আস্থার প্রতীকে পরিণত হন। সারা মাদ্রাসার দৃষ্টি তাঁর প্রতি নিবদ্ধ ছিল। হাটহাজারী মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে দ্বিতল প্রাচীন ইমারতের উপর তলায় লাইব্রেরী, নিচতলায় দারুল হাদীস। তার দক্ষিণের পাশের কামরায় দরস দিতেন মাওলানা সাঈদ আহমদ র., উত্তর পাশের কামরায় দরস দিতেন মুফতী সাহেব। তাঁর দরসের বৈশিষ্ট্য ও আকর্ষণের কারণ-

১. মুফতী সাহেবের সদাচরণ, নেক আমল, উন্নত আখলাক।

২. সবকের হক পূর্ণভাবে আদায় করা।

৩.তাঁর বক্তব্য ও উপস্থাপনা ছিল আকর্ষণীয়। মেধাবী, কম মেধাবী সকলেই সবক বুঝতে সক্ষম হতো।

৪. দরসের নিয়ম ও সময়ানুবর্তিতা ।

৫. একমাত্র দরসকেই সামনে রেখে মনোযোগের সাথে পাঠদান।

৬. ছাত্রদেরকে যাদু, মন্ত্রের ন্যায় আকৃষ্ট করার সম্মোহনী ক্ষমতা।

৭. ইত্যাদি। বিষয়টিকে তিনি আল্লাহতাআলার মেহেরবানী মনে করতেন।[১]

মুফতী সাহেব নিজেকে একজন শিক্ষক হিসেবে দেখতেই ভালবাসতেন। শিক্ষার্থীকে পড়ানো, বুঝানো, জ্ঞানদান ও জ্ঞান বিষয়ক আলোচনা ছিল তাঁর জীবনের অভিপ্রায়। ছাত্রজীবনেও তিনি বাড়ীতে বাচ্চাদের পড়াতেন। সাথীদের কিতাব বুঝাতেন। নিচের ক্লাসের ছাত্রদের কিতাব বুঝতে সাহায্য করতেন। খতীবে আযম সিদ্দীক আহমদ র. দেওবন্দ মাদ্রাসায় ভর্তি হতে গেলে *মায়াবুযী* কিতাবের উপর পরীক্ষা দিতে হল। কিতাব বিষয়ে তাঁর উপলদ্ধি সম্বন্ধে দেওবন্দের শিক্ষকগণ অবাক হলেন এবং জিজ্ঞেস করতে অনুপ্রাণিত হলেন যে, 'তুমি এ কিতাব কার নিকট পাঠ করেছ?' তিনি বললেন, 'মুফতী আযম ফয়যুল্লাহর নিকট'। তাঁরা বললেন, 'সত্যিই উনি মুফতী আযম'।[২] অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। সর্বদা তাঁর হাতে কিতাব থাকত। দস্তরখানে খাবার আসতে দেরী হলে কিতাব দেখা শুরু করতেন। খাবার শেষে কিতাব হাতে নিয়ে পড়তে বসতেন। মুফতী সাহেব শিক্ষকতার এক পর্যায়ে হাটহাজারী মাদ্রাসায় দারুল ইকামায় অবস্থান শুরু করেন। হাটহাজারী মাদ্রাসার পুরাতন দ্বিতল বিশিষ্ট লাইব্রেরীর উপর তলার বারান্দার

পার্শ্বস্থ কক্ষে তিনি অবস্থান করতেন এবং গবেষণা ও নিয়মিত অধ্যাপনার কাজ করতেন। সপ্তাহের শেষ দিন বৃহস্পতিবার বাড়ী যেতেন। যতক্ষণ বাড়ীতে থাকতেন সংসারের কাজকর্ম করতেন। নিজের কাপড়-চোপড় নিজ হাতেই গুছিয়ে রাখতেন। সংসারের কাজে স্ত্রীকে সাহায্য করতেন। শনিবার মাদ্রাসায় যেয়ে শিক্ষকতার দায়িত্ব শুরু করতেন। মাদ্রাসা বা বাড়ীতে যেখানেই থাকতেন আযান হওয়ার সাথে সাথে মসজিদে চলে যেতেন। তিনি বলতেন, হাসরের ময়দানে আল্লাহর তাআলার আরশের নিচে স্থান পেতে হলে মসজিদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। অযূ -গোসলে অল্প পানি ব্যবহার করতেন। গোসলখানায় গোসল করতেন। শিক্ষকতার জীবনে তিনি হাদীস,ফিক্হ ইত্যাদি বিষয়ে যে ব্যুৎপত্তির পরিচয় দিয়েছেন তা তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছে। তিনি ছিলেন হাটহাজারী মাদ্রাসার যোগ্য ছাত্র এবং পরবর্তীকালে যোগ্য শিক্ষক, মুহতামিম, সদর বরং হাটহাজারী মাদ্রাসার ইল্মে দ্বীনের নিদর্শন। তিনি ইসলামী সাহিত্যকে প্রোজ্জ্বল করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি যখন দরস দিতেন তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর উপর পবিত্র কুরআন ও হাদীসের প্রমাণপঞ্জী ও ইল্মের রহস্য, সূক্ষ্ম তত্ত্ব, জ্ঞানী, গুণীদের কবিতা, স্বাক্ষ্য, প্রমাণ, উপমা-উদাহরণের উৎসমুখ খুলে দিতেন। শিক্ষকতার দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। কোন ত্রুটি করেননি। প্রাপ্ত বেতন ভাতা হালালভাবে গ্রহণ করতে চেষ্টা করেছেন। কারণেই এমন অনেকবার ঘটেছে যে, বেতন, ভাতা মাদ্রাসার তহবিলে ফেরত দিয়েছেন। তদ্রুপ সুন্নতে নববীকে আঁকড়ে ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। এমন একজন সুন্নতের অনুসারী ও

১-২. *হায়াতে মুফতী আযম*, পৃ. ১৩৭-১৩৮; *মাশায়েখে চাটগাম*, পৃ. ৩৬৫, *ফাতাওয়া ফয়যিয়া*, খ. ১ম, পৃ. ২৫।

সুন্নত পুনরুজ্জীবন দানকারী বর্ষীয়ান শিক্ষকের আবির্ভাব শতাব্দীর ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া ভার। মুফতী সাহেব হাদীস বিষয়ে যতটুকু গভীরে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলেন সমসাময়িক আলিমদের মধ্যে তা খুব কমই দেখা যায়। তাঁর হাদীসের দর্স, গবেষণা ও রচনার ফসল *ফয়যুল কালাম* । তিনি স্বীয় ইলম, বিশুদ্ধ চিন্তা ও কর্মের মাধ্যমে এদেশের মানুষের জন্য ইলমে দ্বীনের পথ সুগম করেছেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি ইসলামের বিশুদ্ধ আকীদা, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের দৃষ্টিভঙ্গী ও নীতিমালা তুলে ধরেছেন। সর্বক্ষেত্রে তাঁর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ গ্রহণযোগ্যতার দাবী রাখে। এমন একজন শিক্ষক বাংলাদেশের জন্য গর্বের বিষয়।[১]

ঙ. মেখল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা: মাদ্রাসা হামিউস সুন্নাহ মেখল প্রতিষ্ঠা (১৯৩১ খৃ.) মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ জীবনের অনন্য অবদান। এর মাধ্যমে তিনি ইলমে নববী সা. চর্চার রাজপথ খুলে দিয়েছেন। দীর্ঘ বিশ বছরাধিক হাটহাজারী মাদ্রাসায় তাদরিসের সাথে যুক্ত থাকার পরও প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষা ধারার প্রতি ছিল তাঁর অনীহা। যখন থেকে তিনি হাটহাজারী মাদ্রাসায় অবস্থান করা ছেড়ে দিয়ে বাড়ী থেকে যাতায়াত শুরু করলেন তখন থেকে তাঁর চিন্তাধারায় পরিবর্তন ঘটল, নতুন চিন্তা, পরিকল্পনার উন্মেষ ঘটল। তাঁর মতে মাদ্রাসা শিক্ষার বর্তমান পদ্ধতি সলফে সালেহীনের নিয়ম পরিপন্থী। সে যুগের ছাত্ররা শিক্ষকের বাড়ীতে যেয়ে ইল্ম অর্জন করতেন। সুতরাং আমরা যেভাবে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠান বানিয়ে নিয়েছি তা পূর্বের নিয়মের ব্যতিক্রম। অপরদিকে মুফতী সাহেব একাকীত্ব, নীরবতা, একাগ্রচিত্তে ইল্মী গবেষণায় লিপ্ত থাকাকে পছন্দ করতেন। তাই হাটহাজারী মাদ্রাসার শিক্ষকতা থেকে অব্যাহতি নিয়ে বাড়ীতে অবস্থান করছিলেন। সেখানে যাতায়াতের শারীরিক শক্তি, সাহস হারিয়ে ফেললেন। সাধারণ মানুষকে ইসলাম, সুন্নত অনুসরণে দাওয়াত দিচ্ছিলেন। কিন্তু ছাত্র শিক্ষকরা নিজেদের ইল্মী চাহিদা, জ্ঞানের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য তাঁর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখে। অবশেষে মুফতী সাহেব উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম সা. ও আসহাবে সুফ্ফাহ'র আদলে **১৯৫১** খৃ. হতে আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নিজ বাড়ীর মসজিদে ছাত্রদের পড়াতে আরম্ভ করেন। এ সংবাদ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লে ছাত্ররা তাঁর বাড়ীতে আছড়ে পড়ল। দিন, মাস, বছর যেতে না যেতেই তাঁর বাড়ী, আঙিনা, মসজিদ একটি শিক্ষায়তনের রূপ নিল। তিনিও খুশি হলেন যে, আসহাবে সুফ্ফার আদলে, পূর্বসূরীদের নিয়মে ছাত্ররা তাঁর বাড়ীতে জমায়েত হয়েছে। অল্প দিনেই তা দারুল উলূমে পরিণত হল। তিনি তাঁর মাদ্রাসার নাম রাখলেন মাদ্রাসা হামিউস সুন্নাহ মেখল। যা বর্তমানে মেখল মাদ্রাসা হিসেবে সমধিক পরিচিত। মাদ্রাসাটিতে বর্তমানে প্রতিবছর কয়েক হাজার ছাত্রের সমাগম হয়। এর প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রমসহ পরিচালনা নীতির সবকিছু বর্তমানে প্রচলিত মাদ্রাসা সমূহের নিয়ম-নীতি হতে ভিন্ন। এখন পর্যন্ত মেখল মাদ্রাসায় শিক্ষকদের নির্দিষ্ট কোন বেতন-ভাতা ও অজীফা নেই। খরচের কোন ভাউচার, রশিদ বই, আয়-ব্যয় হিসাবের খাতা নেই। ছাত্রদের জন্য বোর্ডিংয়ে রান্নার ব্যবস্থা নেই। চাঁদা, কালেকশান, দান, সদকা, ইত্যাদি উসূলের কোন এন্তেজাম নেই। মুফতী সাহেবের জীবদ্দশায় এর ছাত্র সংখ্যা ছিল ছয়শ। বর্তমানে প্রতি বছর নিম্নে ২ হাজার ছাত্র শিক্ষাগ্রহণ করে। পূর্বে মুফতী সাহেবের বাড়ী, কাচারী, মসজিদ, পুকুর পাড়ে, গাছের

নিচে দরস তাদরীস চলত। বর্তমানে সেখানে মুফতী সাহেবের সুহৃদ, মুরীদ, মুহিব্বিনদের সহায়তায় কয়েকটি ইমারত নির্মিত হয়েছে। বর্তমান বিশ্বের ইসলামী পন্ডিত মুফতী তকী উসমানী একবার বাংলাদেশের মাদ্রাসাসমূহ পরিদর্শনে এসে মেখল মাদ্রাসায় ইসলামী জলসায় বলেছিলেন, এ মাদ্রাসায় না আসলে আমার সফর অপূর্ণ থাকতো। এখানকার গাছ, পাথর এবং গাছের প্রতিটি পাতায় আমি মুফতী ফয়যুল্লাহর ফয়েয, বরকত দেখতে পাচ্ছি। এখানকার প্রতিটি মানুষকে সুন্নতের নূরে আলোকিত দেখছি। এটিকে আমি পৃথিবীতে অতুলনীয় দরসগাহ দেখতে পাচ্ছি। এ মাদ্রাসার কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো:

১. এটি একটি উদাহরণযোগ্য মাদ্রাসা। এ বৈশিষ্ট্যের দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই। ২. সমুদয় ছাত্র শিক্ষকের আমল, আদব, আখলাক্, ঢিলা-কুলুখ, মিসওয়াক, সুন্নত মোতাবেক লেবাস-পোশাক, নিয়্যতের ইখলাসের প্রতি সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়।

৩. বিদ'আত, রুসুম- রেওয়াজ ইত্যাদিকে ঘৃন্য বিষয় বিবেচনা করা হয়।

৪. ইত্তিবায়ে সুন্নত, এর ফযীলত, সওয়াবের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ এবং বিদআত ও রুসুম রেওয়াজ ইত্যাদির প্রতি ঘৃণা জানাতে সপ্তাহে একদিন ছাত্রদেরকে নসীহত করা হয়।

বর্তমানে মাদ্রাসাটি মুফতী সাহেবের নিকটাত্মীয়গণের মাধ্যমে যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে।[২]

১-২. *হায়াতে মুফতী আযম*, পৃ. ১২৬-১২৭; ; নোমান, পৃ. ৯৪-৯৬, *মাশায়েখে চাটগাম*, পৃ. ৩৬৬-৩৬৭, আল্লামা হাফেজ জুনায়েদ বাবুনগরীর রচনাসমগ্র, পৃ. ৩৯৩-৩৯৪।

চ. মুফতী ফয়যুল্লাহর উল্লেখযোগ্য ছাত্রগণ

মুফতী ফয়যুল্লাহর ছাত্র সংখ্যা কত তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই বলতে পারেন। বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চল, বার্মা ও আসামে তাঁর অসংখ্য ছাত্র ও শিষ্য রয়েছে। যাদের পরিসংখ্যান করা অসম্ভব। প্রথমে হাটহাজারী মাদ্রাসা, পরবর্তীতে নিজের প্রতিষ্ঠিত (১৯৫১ খৃ.) মেখল মাদ্রাসায় তিনি দর্স দিয়েছেন। স্বীয় ইলম, বিশুদ্ধ চিন্তা ও কর্মের মাধ্যমে এদেশের মানুষের জন্য দ্বীনী ইলমের রাজপথ খুলে দিয়েছেন। শিক্ষা আন্দোলনে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছেন। দ্বীনি শিক্ষার ধারা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য অব্যাহত রেখেছেন। সর্বক্ষেত্রে তাঁর ইলমী ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি অসংখ্য শিক্ষক সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। হাদীস, ফিকহশাস্ত্রে এমন অসংখ্য যোগ্য আলিম, মুহাদ্দিস, মুফতী, মুদাররিস সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন; যারা ছিলেন ভারত উপমহাদেশে গর্ব করার মত মনীষী। তাঁর অসংখ্য ছাত্র এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, লন্ডন, আমেরিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তিনি ছিলেন অসংখ্য শাগরেদ, সুযোগ্য ছাত্র, মুফতী, মুহাদ্দিস, মুফাসসির আলিমের মুকুট শিরোমনি।[১] তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকজন ছাত্র হলেন-

১. ব্যারিস্টার মাওলানা সানাউল্লাহ: র. (মৃ. ১৩৮২ হি.)

২. খতীবে আযম মাওলানা সিদ্দীক আহম্মদ র. (১৯০৫-১৯৮৭ খৃ.)

৩. মাওলানা ইয়াকুব র.: চট্টগ্রামের পটিয়া থানাধীন জিরি গ্রামে **১৩১৫** হি. তাঁর জন্ম । হাটহাজারী মাদ্রাসায় শিক্ষা সমাপ্তির পর দারুল উলূম দেওবন্দ গমন করেন। আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি র. সহ প্রমূখ উস্তাদগণের ছাত্রত্ব লাভে ধন্য হন। প্রথমে জিরি মাদ্রাসায়, পরবর্তীতে হাটহাজারী মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। ১৯৫৮ খৃ. তিনি ইন্তিকাল করেন। জিরি মাদ্রাসায় সমাহিত হয়েছেন।[২]

৪. মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাব র. (১৩১৪-১৪০২ হি.) : চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানার রুহুল্লাহ গ্রামে জন্ম। হাটহাজারী মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভের পর দারুল উলূম দেওবন্দ গমন করেন। হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী র.-এর নিকট আধ্যাত্মিক সবক অর্জন করেন। হাটহাজারী মাদ্রাসায় শিক্ষকতা ও মুহতামিমের দায়িত্ব পালন করেন। ১৪০২ হি. ইন্তিকাল করেছেন।[৩]

৫. মাওলানা আব্দুল জলীল র. তিনি ছিলেন হাটহাজারী থানাধীন চারিয়া গ্রামের অধিবাসী। পিতা মুন্সী কারামত আলী। হাটহাজারী মাদ্রাসা ও দারুল উলূম দেওবন্দে লেখাপড়া করেছেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর হাটহাজারী মাদ্রাসায় ও পরবর্তীতে চারিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। **১৩৮৭** হি. তিনি ইন্তিকাল করেছেন।[৪]

৬. মাওলানা নাযির আহমদ আনওয়ারী র.: হাটহাজারী থানার মুরাদপুর গ্রামে জন্ম। হাটহাজারী মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভের পর দিল্লীর ডাবেল গমন করেন এবং আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি ও শাব্বীর আহমদ উসমানী প্রমূখের

নিকট হাদীসের সনদ অর্জন করেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর হাটহাজারী মাদ্রাসায় শিক্ষকতায় যোগদান করেন। ৬০ বছর বয়সে ১৩৯৩ হি. ইন্তিকাল করেছেন। মুরাদপুরে সমাহিত হন।[৫]

৭। মুফতী মাওলানা নূর আহম্মদ র.: তিনি ছিলেন নাজিরহাট নাসিরুল উলূম মাদ্রাসার পৃষ্ঠপোষক ও মুহতামিম। পরবর্তীতে হাটহাজারী মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। তিনি হাদীস, ফিক্‌হ, ফাযায়িল ও মাসাইল সংক্রান্ত প্রায় ৩০ টি পুস্তক রচনা করেছেন।[৬]

৮। মুফতী আহমদুল হক র.: চট্টগ্রাম জেলার ফটিক ছড়ির শোয়াবিল গ্রামে ১৩৩৬ হি. তাঁর জন্ম। পিতা মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল। মাতা জামীলা খাতুন। হাটহাজারী মাদ্রাসায় ও দারুল উলূম দেওবন্দ হতে শিক্ষা লাভ করেন। শায়খুল ইসলাম মাদানী র., শায়খুল আদব ইজায আলী র, প্রমূখের শিষ্যত্ব, ছাত্রত্ব লাভে ধন্য হন। পটিয়া ও হাটহাজারী মাদ্রাসায় শিক্ষকতা ও ফাতাওয়া বিভাগের দায়িত্ব পালন করেছেন। একজন খ্যাতিমান মুফতী, মুহাদ্দিস, আশেকে নববী সা. দুনিয়াত্যাগী, সুকণ্ঠী কারী ছিলেন।[৭]

১- ২. জসীম উদ্দীন, মুফতী, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৩, ১৯৭,

৩-৪. ঐ, পৃ. ২১৯, ২৩০, *আল্লামা হাফেজ জুনায়েদ বাবুনগরীর রচনাসমগ্র*, পৃ. ৪১৮।

৫. *হায়াতে মুফতী আযম*, পৃ. ১৪৯; *আল্লামা হাফেজ জুনায়েদ বাবুনগরীর রচনাসমগ্র*, পৃ. ৪১৪।

৬. ঐ, পৃ. ১৬৫, পৃ. ৪১৪।

৭. জসীম উদ্দীন,মুফতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬-২২৮।

৯. মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস র.: তিনি হাজী সাহেব হুজুর হিসেবে সমধিক পরিচিত ছিলেন। ১৩২৭ হি. হাটহাজারী থানার উত্তর মেখলে রহিমপুরে তাঁর জন্ম। পিতার নাম আব্দুল জব্বার। হাটহাজারী মাদ্রাসায় লেখাপড়া করার পর ১৩৫১ হি. দারুল উলূম দেওবন্দ গমন করেন এবং হাদীসের উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৪৫ খৃ. পটিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৩৭৭ হি. হতে মাদ্রাসা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে এটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করেন। পান্ডিত্য ও কর্মদক্ষতার কারণে শায়খুল আরব ও আযম উপাধীতে ভূষিত ছিলেন। সমাজসেবামূলক কার্যক্রম, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা, পার্বত্য অঞ্চলসমূহে অসংখ্য মসজিদ, মাদ্রাসা ও হাসপাতাল নির্মাণ করেছেন। ১৯৯২ খৃ. ১৪ মে তিনি ইন্তিকাল করেন।[১]

১০. মাওলানা আবুল হাসান র.: চট্টগ্রামের বাঁশখালী থানাধীন পশ্চিম জলদি গ্রামে তাঁর জন্ম। চট্টগ্রামের মুহসিনিয়া মাদ্রাসা ও ভারতের সাহারানপুর মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেন। হাটহাজারী মাদ্রাসা ও ঢাকা কাটরা মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেছেন। ১৯৮১ খৃ. ৩০ জুন ইন্তিকাল করেন।[২]

১১. মাওলানা নুরুল্লাহ নোয়াখালী র. : হাটহাজারী মাদ্রাসা ও দারুল উলূম মাদ্রাসার প্রাক্তন ছাত্র।

১২. মাওলানা মুহাম্মদ র. : হাজীপুর নোয়াখালীর অধিবাসী। ফেনী ইসলামিয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন মুহাদ্দিস।

১৩. মাওলানা হাফিজুর রহমান র. : ১৯০৪ খৃ. হাটহাজারীতে জন্ম। হাটহাজারী ও সাহারানপুর মাদ্রাসা হতে হাদীসের সনদপ্রাপ্ত । শায়খুল হাদীস যাকারিয়া র. -এর সান্নিধ্য লাভে ধন্য। ১৩৫৩ হি. হাটহাজারী মাদ্রাসায় শিক্ষকতায় যোগদেন। দীর্ঘ ৬৭ বছর দর্‌সদানের পর ১৯৯৯ খৃ. ৬ জুন ইন্তিকাল করেন।[৩]

১৪. মাওলানা হাফেজ উবায়দুর রহমান র. : ১৯২৩ খৃ. আলীপুরে জন্ম। অল্প বয়সে মাতা, পিতাকে হারান। হাটহাজারী ও দারুল উলূম দেওবন্দ হতে ফারাগাত অর্জন করেন। শায়খুল ইসলাম মাদানী ও শায়খুল আদব ইজায আলী র.- এর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছেন। পর্দা করা, নরম ভাষায় কথা বলা, আগে সালাম দেয়া ছিল তাঁর চারিত্রিক সৌন্দর্য। ১৯৮৪ খৃ. তিনি ইন্তিকাল করেছেন।[৪]

১৫. মাওলানা হাফিজুর রহমান র. : পটিয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন উস্তাদ।

১৬. মাওলানা আবুল ফারূহ র. : তিনি ছিলেন হাটহাজারী উপজেলাধীন মেখলের অধিবাসী। হাটহাজারী মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভের পর দারুল উলূম দেওবন্দ হতে ফারাগাত অর্জন করেন। যুগের শ্রেষ্ঠ আলিম, কামিল ওয়ালী, ইতিহাস বেত্তা, বাগ্মী ছিলেন। চট্টগ্রাম হতে *ইসলাম প্রচার* নামে একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করতেন।[৫]

১৭. কারী মুহাম্মদ ইবরাহীম র. : কুমিল্লার চাঁদপুরে আলীপুর গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতা সূফী আশরাফ আলী র.। হাটহাজারী মাদ্রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর দারুল উলূম দেওবন্দ গমন করেন এবং হাদীসের উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি দীর্ঘ ৪৬ বছর হাটহাজারী মাদ্রাসায় শিক্ষকতা এবং মাদ্রাসা মসজিদে ইমামতির দায়িত্ব পালন করেন। অত্যন্ত পরহেযগার, ধর্মানুরাগী, বিদ্যুৎসাহী এবং পবিত্র কুরআনের বিশুদ্ধ তিলাওয়াত ও তাজবীদের খ্যাতিমান কারী ছিলেন। **১৯৬২** খৃ. **১৪** অক্টোবর শুক্রবার জুমার নামাযের সময় সিজদারত অবস্থায় তিনি ইন্তিকাল করেছেন।[৬]

১-২. ঐ, পৃ. ২৪১-২৪২; *আল্লামা হাফেজ জুনায়েদ বাবুনগরীর রচনাসমগ্র*, পৃ. ৪২৯-৪৩৫।
৩-৪. ঐ, পৃ. ২২১-২২২, ২৪০-২৪১।
৫. *হায়াতে মুফতী আযম*, পৃ. ১৪৭-১৪৮।
৬. জসীম উদ্দীন, মুফতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩।

১৮. মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম র. : শায়খুল হাদীস আব্দুল কাইয়ুম র. (১৯১১-১৯৮১ খৃ.) ছিলেন রাউজানের অধিবাসী। প্রথম জীবনে হাটহাজারী মাদ্রাসায় পরবর্তীতে দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করেন। কিছুদিন নাজিরহাট মাদ্রাসার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর হাটহাজারী মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। **১৩৭৭** হি. থেকে **১৪০১** হি. পর্যন্ত শায়খুল হাদীস, সদরুল মুদাররিসের পদ অলংকৃত করেন।[১]

১৯. মাওলানা আব্দুল আযীয র. : **১৯১৩** খৃ. এ মনীষীর জন্ম। হাটহাজারী মাদ্রাসা ও দারুল উলূম দেওবন্দ হতে শিক্ষা লাভ করেন। শায়খুল ইসলাম মাদানীর সাহচর্য লাভে ধন্য হন। প্রথমে নাজিরহাট মাদ্রাসায়, পরে হাটহাজারী মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। **১৪০১** হি. শায়খুল হাদীসের পদ অলংকৃত করেন। ২০০০ খৃ. তিনি ইন্তিকাল করেছেন।[২]

২০. মাওলানা আযীযুল্লাহ র.: মাওলানা আযীযুল্লাহ র.-এর জন্ম নোয়াখালীতে। বাড়ীতে প্রাথমিক শিক্ষার্জনের পর হাটহাজারী মাদ্রাসায় ভর্তি হন। মুফতী সাহেবের নিকট বিশেষ কিছু কিতাব পাঠ করেন এবং তাঁর নিকট হতে বায়'আত লাভ করেন। শেষ জীবনে মেখলে বসবাস করেছেন এবং মেখল মাদ্রাসার পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন।[৩]

২১.মাওলানা নাদিরুজ্জামান র.: **১৮৯৮** খৃ. এ মনীষীর জন্ম। হাটহাজারী মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভের পর দারুল উলুম দেওবন্দ গমন করেন। শায়খুল হিন্দ ও শায়খুল ইসলামের সান্নিধ্য লাভে ধন্য হন। ফটিকছড়ি, মীরসরাই দরগার হাট ও হাটহাজারী মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। **১৯৭১** খৃ, পবিত্র রমযানে ইন্তিকাল করেছেন।[৪]

২২. আল্লামা আহমদ শফী দা. বা. : এ মনীষীর জন্ম চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় **১৩৫১** হি.। পিতার নাম বরকত আলী র.। প্রাথমিক কিতাবাদি পাঠ করার পর **১৩৬১** হি. হাটহাজারী মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে দীর্ঘ **১০** বছর লেখাপড়া করেন। দারুল উলূম দেওবন্দ হতে হাদীস, তাফসীর ও ফনূনাতে উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করেন। **১৩৭৫** হি. হাটহাজারী মাদ্রাসায় শিক্ষকতায় যোগদান করে অল্প দিনেই নিজেকে যোগ্য শিক্ষক, কর্মঠ মানুষ হিসেবে পরিচিত করতে সক্ষম হন। কালক্রমে তিনি হাটহাজারী মাদ্রাসার নায়েবে মুহতামিম, **১৪০৭** হি. হতে হাটহাজারী মাদ্রাসার মুহতামিমের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তাঁর আমলে হাটহাজারী মাদ্রাসার উত্তরোত্তর উন্নতি তাঁকে ব্যাপক পরিচিতি এনে দিয়েছে। সাম্প্রতিক কালে তিনি রাজনৈতিক অঙ্গনেও ব্যাপক পরিচিত।[৫]

২৩. মাওলানা হাফিয হারুন শাহনগরী র.।

২৪. মুফতী আযীযুল হক র. : তিনি ছিলেন জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা।

২৫. মাওলানা ইসমাঈল র. : প্রাক্তন মুহতামিম ফতেহপুর মাদ্রাসা হাটহাজারী।

২৬. মাওলানা মুহাম্মদ হারুন র.: বাবুনগর ফটিকছড়ি মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা।

২৭. মুফতী ইউসুফ ইসলামাবাদী র. : তিনি ছিলেন বাংলার সমকালীন সময়ের প্রতিভা সম্পন্ন আলিম, পীর, ইসলামী চিন্তাবিদ ও বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ। হাটহাজারী থানার উত্তর মার্দাশায় **১৯১৫** খৃ. জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মাওলানা আব্দুল হামীদ র.। বরুড়া কুমিল্লা মাদ্রাসার প্রাক্তন শায়খুল হাদীস। তিনি বেশকিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন। **১৪০৯** হি. / **১৯৮৮** খৃ. তিনি ইন্তিকাল করেন।[৬]

২৮. মাওলানা মুহাম্মদ আমীন র. : বাবুনগর মাদ্রাসার প্রাক্তন শায়খুল হাদীস।

২৯. মাওলানা মুহাম্মদ মূসা র. : বাবুনগর মাদ্রাসার প্রাক্তন শায়খুল হাদীস। বুযুর্গ হুজুর হিসেবে সমধিক পরিচিত ছিলেন।

৩০. মাওলানা ইসকান্দার র. বোয়ালখালী।

৩১. মাওলানা মুফাজ্জল আহমদ র. : বাসারত নগর মাদ্রাসার সাবেক মুহতামিম।

১. *ঐ*, পৃ. ২২২-২২৩।

২. *আল্লামা হাফেজ জুনায়েদ বাবুনগরীর রচনাসমগ্র*, পৃ. ৪২২।

৩. *হায়াতে মুফতী আযম*, পৃ.২৬৫।

৪. *আল্লামা হাফেজ জুনায়েদ বাবুনগরীর রচনাসমগ্র*, পৃ. ৪১৩।

৫-৬. *হায়াতে মুফতী আযম*, পৃ. ২২৩. *ঠ; আল্লামা হাফেজ জুনায়েদ বাবুনগরীর রচনাসমগ্র*, পৃ. ৪১১,৪২৪।

৩২. মাওলানা আব্দুল গণি র. শেতাবগন্‌জী র. : যশোরের নোয়াপাড়া মাদ্রাসার প্রাক্তন শায়খুল হাদীস।

৩৩.মাওলানা মোহব্বুজ্জামান রাঙ্গুনুবী র.: রাঙ্গুনিয়ার অধিবাসী। সাবেক মুহতামিম মেহবিয়া মাদ্রাসা।

৩৪. মাওলানা মোস্তফা র.: উলামা বাজার ফেনী মাদ্রাসার প্রাক্তন শায়খুল হাদীস।

৩৫.মাওলানা আব্দুর রশীদ র.: মাদ্রাসা বড় কাটারা ঢাকার প্রাক্তন শায়খুল হাদীস।

৩৬. মাওলানা হাফিজ মুহাম্মদ হারূন র.: নানুপুর জামিয়া উবায়দিয়ার প্রাক্তন শায়খুল হাদীস।

৩৭. মাওলানা মুহাম্মদ হারূন র.: তিনি ছিলেন হাটহাজারী মাদ্রাসার প্রাক্তন শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা হাবীবুল্লাহার সন্তান। হাটহাজারী মাদ্রাসায় লেখাপড়া শেষ করার পর সেখানে শিক্ষকতায় যোগদান করেন। মাদ্রাসা পরিচালনায় সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি খুলনায় চলে যান এবং সেখানে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[১]

৩৮.মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস র.: বাবুনগর মাদ্রাসার প্রাক্তন শায়খুল হাদীস।

৩৯. মাওলানা মাকসুদুল্লাহ র.: ফেনী ওলামা বাজার মাদ্রাসার প্রাক্তন শায়খুল হাদীস।

৪০. মাওলানা আব্দুল হক ইসলামাদী র.: হাটহাজারী মাদ্রাসার প্রাক্তন শায়খুল হাদীস।

৪১.আল্লামা সাগীর আহমদ র.।

৪২. মাওলানা ইসমাঈল র. ।

৪৩. মাওলানা কাসেম নোয়াখালী র. ।

৪৪. মাওলানা মুহাম্মদ হামেদ র.।

৪৫. মাওলানা হাফিজুর রহমান, হাটহাজারী মাদ্রাসা।

৪৬. মাওলানা মাকসুদুল্লাহ।

৪৭. মুফতী ইযহারুল ইসলাম চৌধুরী, মুহতামিম ও প্রতিষ্ঠাতা জামি'আতুল উলূম আল- ইসলামিয়া লালখান বাজার মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম।

৪৮. প্রমূখ। [২]

১. *হায়াতে মুফতী আযম*, পৃ.২৩৭;

২. নোমান, পৃ. ১০৪-১০৫; *ফাতাওয়া ফয়যিয়া*, খ. ১ম, পৃ. ৩১-৩২; মাহবুবে এলাহী, মাওলানা, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৭।

ছ. পবিত্র হজ্ব পালন : মুফতী সাহেব ৬০ বছর বয়সে অর্থাৎ **১৩৭০** হি. পবিত্র হজ্ব আদায় করেন। রাউজান নিবাসী আলহাজ্ব মীর হুসাইন সওদাগরের সৌজন্যে বিমান পথে হজ্বের সফর সম্পন্ন করেন। তাঁর হজ্ব সফরের জন্য সংগৃহীত পাসপোর্ট বিষয়ে বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছিল। ফটো ব্যতীত পাসপোর্ট সংগ্রহ, সরবরাহের কোন নিয়ম, আইন সংবিধানে নেই, এমনটি কল্পনা করা যায় না। কিন্তু মুফতী সাহেব হজ্বের সফরের জন্য ফটো তুলতে আপত্তি জানালেন। তিনি বললেন, শরীআতের দৃষ্টিতে ফটো উঠানো অবৈধ। হজ্বের মতো পবিত্র সফরের জন্য অবৈধ কাজ করা কিছুতেই সমীচিন নয়। অবশেষে তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ফটো ছাড়াই তাঁকে পাসপোর্ট সরবরাহের অনুমতি দিলেন। ফটোর স্থানে মুফতী সাহেবের চেহারা, মুখ অবয়বের বিবরণ লিখে দিলেন। ফটোবিহীন পাসপোর্ট প্রাপ্তির ঘটনা বাংলাদেশের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত একমাত্র তাঁর জীবনে ঘটেছে। আর কারো জীবনে ঘটেনি।[১]

ওয়ায-নসীহত : মুফতী সাহেব শিক্ষকতার পাশাপাশি ওয়াজ নসীহত করতেন। এর মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর দ্বীনের প্রতি আহ্বান করেছেন। বিভিন্ন রুসুম -রেওয়াজ, কুসংস্কার, বিদ'আতের বিরুদ্ধে এবং সুন্নতে নববী সা. উজ্জীবনে আজীবন সাধনা করেছেন। ওয়াজ নসীহতের মাধ্যমে মানুষকে দ্বীনের সহীহ্ মেজাজ, সহীহ্ সমঝ, সহীহ্ জ্ঞান ও সহীহ্ আমলের পথ দেখিয়েছেন।

জ. মৃত্যু ও শোকবাণী, শোকগাঁথা: ১৩৯৬ হি. পবিত্র রমযান মাসে শুক্রবার মুফতী সাহেব বার্ধক্যকালীন রোগে আক্রান্ত হন। প্রতিদিনের অভ্যাস মত কাচারীতে যাতায়াত করতে অপারগ হলেন। নামায ইশারা ইঙ্গিতে আদায় করতে থাকেন। ২৪ রমযান বাড়ীর সবাইকে ডেকে সাধারণ ও বিশেষ কিছু উপদেশ, নসীহত করলেন; তাঁর মৃত্যুতে সবাই যেন সব্‌রে জামীল অবলম্বন করে। এ বিষয়ে সবাইকে তাকিদ দিলেন। মৃত্যুর পর সুন্নত অনুযায়ী দাফন, কাফন করা এবং দাফনে বিলম্ব না করার অসীয়ত করলেন। মাইকের মাধ্যমে মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা দিতে নিষেধ করলেন। প্রতিটি কাজে সুন্নত অনুসরণের আদেশ দিলেন। তার রেখে যাওয়া স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তির বিষয়ে কিছু বিশেষ অসীয়ত করলেন। ইতোমধ্যে তাঁর শরীরের আরো অবনতি ঘটল। ডা. গোলাম মোস্তফা চৌধুরী, ডা. নুরুল ইসলামসহ একদল চিকিৎসক তাঁর প্রতিটি মুহূর্ত পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। এক পর্যায়ে তিনি শারীরিক চেতনা হারিয়ে ফেললেন। শুধুমাত্র নামাযের সময় হলেই চেতনা ফিরে আসত তখন নামায আদায় করতেন। ফলে তাঁর কোন নামায কাযা হয়নি। এ অবস্থায় ডাক্তারগণ তাঁর শরীরের রোগ নির্ণয়ে চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু কোন রোগ আবিস্কার করতে পারেননি। বরং তাঁরা মুফতী সাহেবের শরীরে যেখানেই স্টোথোস্কোপ স্থাপন করতেন সেখান থেকেই আল্লাহ আল্লাহ যিকিরের আওয়াজ বেরিয়ে আসছিল। ডাক্তারগণ অনুভব করলেন ইনি আল্লাহ তাআলার অনেক বড় ওয়ালী। অপরদিকে হাজার হাজার মানুষ মুফতী সাহেবকে একনজর দেখার

জন্য তাঁর বাড়ীতে ভিড় করতে লাগল। পর্যবেক্ষকদের ধারণা, আগন্তুকরা সবাই মানুষ ছিলেন এমন নয় বরং জিনদের মধ্যে যারা তাঁর ভক্ত অনুরক্ত ছাত্র ছিলেন তাঁরাও আসছিল বলে মনে হচ্ছিল। শাওয়াল মাসের ১২ তারিখ বৃহস্পতিবার ফজর নামায তিনি ইশারা ইঙ্গিতে আদায় করলেন। তাঁর চেহারাকে অধিকতর উজ্জ্বল প্রফুল্ল মনে হচ্ছিল। নিজ হাতে বিছানার চাদর গোছানোর চেষ্টা করছিলেন। পাগুলো নিজেই সোজা করলেন। এ দৃশ্য অবলোকনে নিকটাত্মীয়সহ বাড়ীর সবাই আনন্দিত হলেন। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই অবস্থার অবনতি ঘটল। তাঁর নিকট কালিমায়ে তায়্যিবা, কালিমায়ে শাহাদাতের তালকীন, সূরা ইয়াসীন পাঠ ইত্যাদির আমল চলছিল। এরই মধ্যে দুপুর ১১.৫৫ মিনিটের সময় আল্লাহর যিকির করতে করতে প্রভূর সান্নিধ্যে চলে গেলেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাযিউন)। ইল্‌মে নববীর যে সূর্য ১৩১০ হি. উদয় হয়েছিল ১৩৯৬ হি. ১২ শাওয়াল / ১৯৭৬ খৃ. ৭ অক্টোবর বৃহস্পতিবার ঠিক দুপুর সময় অস্তমিত হল। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে শোকের কালো ছায়া নেমে আসে। তাঁর অগণিত শিষ্য, মুরীদ, ছাত্র, গুণমুগ্ধরা শোকাভিভূত হয়ে পড়েন। হাজার হাজার মানুষ কান্নায় ভেঙে পড়লেন। চট্টগ্রামসহ সারাদেশ থেকে হাজারো মানুষের ঢল নামলো মেখলে তাঁর বাড়ীতে। তাঁকে

১. নোমান, পৃ. ১০০, *ফাতাওয়া ফয়যিয়া*, খ. ১ম, পৃ. ২৯।

একনজর দেখার জন্য সবাই উদ্বিগ্ন হল। ইছাপুর রোড (বর্তমান ফয়যিয়া বাজার) থেকে মুফতী সাহেবের বাড়ী পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য হল। শুধু মানুষ আর মানুষ। মুষলধারে বৃষ্টি ঝরছিল। তাঁর মরদেহ দর্শনার্থীদের জন্য বাড়ীর মসজিদের সামনে পুকুর পাড়ে রাখা হল। মানুষ সারিবদ্ধ হয়ে শেষবারের মত তাঁর মরদেহ দর্শন করল। তাঁর জানাযার নামাযের জন্য বড় সড়কের উপর এক কিলোমিটার দীর্ঘ কাতার দাঁড়াল। অবশেষে বিকাল সাড়ে চারটায় মাওলানা আযীযুল্লাহ'র ইমামতিতে তাঁর জানাযা নামাজ সম্পন্ন হয়। তাঁর মরদেহ বাড়ীর মসজিদের উত্তরদিকে (বর্তমানে মুফতী ফয়যুল্লাহ র. সড়ক) তাঁর অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী স্ত্রীর কবরের ডানপাশে পৈত্রিক মাটিতে লাহাদ কবরে সমাহিত করা হয়।[১]

শোকবাণী ও শোকগাঁথা :

তাঁর মৃত্যুতে জাতি শোকে কাতর ও পাথর হল। দেশ বিদেশের অসংখ্য মানুষ শোকবার্তা, শোকবাণী পাঠালেন। তৎকালীন পত্র পত্রিকা এবং উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি শোকবাণী পাঠিয়েছিলেন। যেগুলো সংরক্ষণের অভাবে হারিয়ে গেছে। এ শোক চলছিল দীর্ঘদিন পর্যন্ত। তাঁর ভক্ত, অনুরক্তদের অনেকেই শোকগাঁথা রচনা করলেন। উল্লেখযোগ্য কিছু শোকগাঁথা মাওলানা মুহাম্মদ নোমান '*মুফতী আযম আকাবিরে উম্মত কী নযর মে*' গ্রন্থে পত্রস্থ করেছেন। তন্মধ্যে একটি শোকগাঁথা রচনা করেছিলেন মুফতী সাহেবের বিশিষ্ট খলীফা হাটহাজারী মাদ্রাসার প্রাক্তন মুহতামিম ও উস্তাদুল হাদীস হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ হামীদ র.। ফার্সী ভাষায় রচিত বিশ মিসরা'র (শ্লোক) এ শোকগাঁথার বিষয়বস্তু হলো : সবাইকে মৃত্যুর স্বাদ নিতে হবে, পৃথিবীতে কেউ স্থায়ী নন, স্থায়ী হননি আমাদের প্রিয়নবী সা., স্থায়ী হননি মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ। তিনি ছিলেন আম্বিয়া আউলিয়াদের ওয়ারিশ। তাঁর আলোয় দুনিয়া ছিল আলোকিত। তাঁর মৃত্যুতে ইলমী দুনিয়া অন্ধকারে নিমজ্জিত হল। কাব্যের কয়েকটি লাইনের বঙ্গানুবাদ:

চিরঞ্জীব প্রভূর নামে শুরু যার নেই মৃত্যু	ابتدا بر نام حي لا يموت
জিন, ইনসান মৃত্যুর স্বাদ নিবে এটাই সত্য	جن و انسان هر يكي لا شك يموت
নশ্বর পৃথিবীতে যদি হত কেউ স্থায়ী	اگر كسے بودے سزاوار بقا
সায়্যিদুল কাওনাইন হতেন চিরস্থায়ী।	سيد الكونين گشتے دائما
ওয়ারিশে আম্বিয়া আউলিয়া	وارثان انبياء و اولياء
নশ্বর দুনিয়া থেকে হলেন বিদায়	رهروان گشتند زين دير فنا
ফায়েযের সূর্যালোয় হলে তুমি গাওহার	ز آفتاب فيض تو گوهر شده
তোমার শুভ দৃষ্টিতে বিদূরিত হল ঘোর অন্ধকার।[২]	وز نگاه تو صدف پر در شده

অপর একটি শোকগাঁথা ফার্সী ভাষায় রচনা করেছিলেন হাটহাজারী মাদ্রাসার হাদীস, ফিক্‌হ, তাফসীরের প্রাক্তন শিক্ষক, হুসাইন আহমদ মাদানী র.-এর বিশেষ খলীফা মুফতী আহমদুল হক র.। তাঁর শোকগাঁথায়

ব্যক্ত হয়েছে; মুফতী সাহেবের অন্তর্ধানে প্রাপ্ত আঘাত, ব্যাথা-দু:খ, সুন্নতের অনুসরণকারী এবং বিদআতের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদকারী মনীষী বিদায়ের কথা। তাঁর শোককাব্যের চৌত্রিশটি মিসরা'র কয়েকটি হলো:

আফসোস! হাজারো আফসোস যুগের পন্ডিতের বিদায়ে তাঁর পবিত্র রূহ উড়ে গেল আসমানে তাঁর মাধ্যমে মোহিত ছিল সুন্নতের কানন ফুল ও ঘ্রাণে মহামানবের সুন্নত করেছেন জারী মানব প্রাণে ছিলেন বিদ'আত, বাতিল নিশ্চিহ্নকারী, ছিলেন সুন্নাহর যুগ শ্রেষ্ঠ রক্ষাকারী ইলম, সুন্নাহর সম্প্রসারণ ছিল জীবন সাধনা।	حسرتا صد حسرتا بر رحلت شيخ زمان كرد جاري سنت خير الوري در مرد مان ما حي بدعات و جمله رسم ها باطله

১. নোমান, পৃ. ১০০-১০৩; মাহবুবে এলাহী, মাওলানা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭, আব্দুল বাকী, মুহাম্মদ, ড., প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯।
২. নোমান, পৃ. ১০৬, ১০৭;

তালিবে ইল্মের নিশানে কা'বা ইল্মে শরী'আতের সর্বকামিল তরীকতে মাহির, প্রধান চালক, পেশওয়া সালেকীন আম-খাস সবার মধ্যে ছিল ফয়েয নামটি কর্ম লভিয়েছে ফয়যুল্লাহ সুনামটি। সিংহাসন শূন্য করে আহ্বান জানাল পরকাল শাওয়ালের চাঁদ হল কর্মবীরের বিদায়কাল।[১]	كعبه مقصود بود او از برا جامع جمله كمالات شريعت بود او ماهر راه طريقت بد فيوضش عام در جمله خواص و هم عوام چونكه نامش فيض الله شد چنين كارش روان

জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া মাদ্রাসার তৎকালীন প্রথম সারির শিক্ষক মাওলানা আহমদ র. আরবী ভাষায় ৪০মিসরা'র একটি শোকগাঁথা রচনা করেছিলেন। যার মধ্যে মুফতী সাহেবের ইলমী, দ্বীনি মানব সেবার বিষয়গুলো ফুটে ওঠেছে যে, তিনি ছিলেন যুগের সেরা আলিম, ফকীহদের ফকীহ, উস্তাদগণের উস্তাদ, ইল্ম, মা'রিফাতের, নির্ভরতার প্রতীক। তাঁর কাব্যের কয়েকটি লাইনের মমার্থ হলো-

দাঁড়াও ক্রন্দন করি এক মহান ফকীহ'র স্বরণে জ্ঞানীদের জ্ঞানী যুগের সেরা ওয়ালীর স্বরণে মুসলিম উম্মাহর চোখে জলের ঝরণা ধারা প্রাণের শিক্ষকের প্রয়াণে বইছে অশ্রু ধারা মঈনুল ইসলামে ছড়িয়েছে তাঁর ফয়েয অবিরত ছিলেন মহান শিক্ষক রয়েছে মুমিন যত সৃষ্টির সেবায় কাটিয়েছে জীবন সদা সর্বদা উলুমে দ্বীনের মুখপাত্র, মহা ঠিকানা শ্রেষ্ঠ, বিচক্ষণ, ন্যায় সমুন্নতকারী তাঁর রচনাজগত নক্ষত্রতুল্য উজ্জলমতি[২]।	قفا نبك من ذكري فقيه مكرم وجيه لدي الا قران حبر معظم جفون جميع المسلمين مريقت دماع حشاهم بانقراض معلم معين الاسلام جري فيه فيضه هو المدرس الاعلي لدي كل مسلم بتعليم علم الدين مأوي الترجم نبيل شهيم فاقد العدل رفعة تصانيفة در منير كانجم

বাংলাদেশের খ্যাতিমান আরবী ভাষাবিদ, পন্ডিত, সাহিত্যিক, দারুল মা'আরিফ ইসলামিয়ার প্রধান আল্লামা সুলতান যওক, উর্দূ ভাষায় ***ফরিয়াদ*** নামক ৩২ মিসরা'র একটি শোকগাঁথা রচনা করেছিলেন। তাতে মুফতী সাহেবের মৃত্যুতে নিজেদের অসহায়ত্ব, হৃদয়ের ব্যাথা-বেদনা, বিষন্নতা, বিয়োগ ব্যাথা, ইল্মী দুনিয়ায় তাঁর ন্যায় যোগ্য মানুষের শূন্যতা ইত্যাদি বক্তব্য ভারাক্রান্ত ভাষায় ফুটে ওঠেছে :

আমরা বিষন্ন, হৃদয়সমূহ নিরানন্দ আমরা ব্যাথাহত কেউ এর বাইরে নয় মনের আকুতি যে, সব দু:খ ,ব্যাথা, বেদনার কথা বলব আমার এক দুঃখ, সব মনে নেই যে কইব	هم شته غم هيں كوئي دل شاد نهيں هے اك درد هے جس سے كوي ازاد نهيں هے دل ميں هے كه افسانه غم سارا سنادوں ليكن مجهے اك قصه غم ياد نهيں هے

বুলবলির কণ্ঠ আরুদ্ধ তাওহীদের গানে সুগন্ধি ফুল নেই ,নেই পদ্মফুল, তরুলতা বাগানে জাতির ক্রান্তিকালে কৃপা কর হে প্রভূ। জাতি এরচেয়ে দূর্ভাগ্যে পতিত হয়নি কভু হে উম্মতের শফী আলমের মুফতী, ফকীহ তোমার মত ফিকহ, ফাতাওয়ার পন্ডিত রইলনা বাকী।[৩]	توحيد كے نغمون سے هے بلبل كي زباں بند سنبل نهيں سوسن نهيں شمشاد نهيں هے اس قوم تبه حال په يا رب تو كرم كر اد هے جس سے بري افتاد نهيں هے همنام شفيع الامم اے مفتي عالم اب فقه و فتاوي كا وه استاد نهيں هے

১. ঐ, পৃ. ১০৯।
২-৩. ঐ, পৃ. ১১১।

হাটহাজারী মাদ্রাসার বর্তমান মহাপরিচালক এবং সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে ইসলামী রাজনৈতিক অঙ্গনে পরিচিত বিদগ্ধ আলিম আল্লামা আহমদ শফী ফার্সী ভাষায় একটি শোকগাঁথা রচনা করেন। তাঁর শোকগাঁথায় মুফতী সাহেবের ইলমী, ফিকহী যোগ্যতা, বিভিন্ন কামালাত ব্যক্ত হয়েছে। তাঁর দু:খ যে, হাটহাজারী মাদ্রাসা তাঁর মতো একজন উচ্চাঙ্গের শিক্ষক থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল। তাঁর শোককাব্যের কয়েকটি মিসরা' হলো-

ওহে মুফতী আযম, দ্বীনের রাহবার নি:সন্দেহে ফিরিশতাতুল্য ছিল জীবন তোমার ফিক্হ, সুন্নতের খাজাঞ্চি, দর্স ইফ্তার ইমাম সলফের ইল্ম, হিকমতের পৃষ্ঠপোষক তামাম ছিল জীবন নম্রতা ভদ্রতা গাম্ভীর্যের প্রতীক যার অন্তিম শয়ন হাজারো বেদনার প্রতীক তোমার প্রাণের ছোঁয়ায় জমীরের ফুল বাগিচা ছিল শ্যামল তোমার প্রতি বাক্য ছিল হিকমতের রাজতোরণ ওহে মুহাদ্দিস, মুফাসসির ফকীহ বেমিসাল উম্মত জ্ঞনের তৃষ্ণায় কোথায় যাবে বল দু:খ দূর্দশা তোমার ললাটে জুটল হে দারুল উলূম! যখন চলে গেলেন রেহনুমা তোমার হে দারুল উলূম! আমার উস্তাদের কবর নূরে ভরপুর কর গো হে খোদা জান্নাতুল ফিরদাউসে কর হে প্রভু! তার ঠিকানা[১]	مفتي اعظم حامل دين متي كي تهي باليقي فقه و سنت كا تها خازن درس و افتا كا امام اور محافظ تها سلف كے علم و حكمت كا تمام يكر حلم و وقار جنكي فرقت هو اپ كے دم سے تها يه شاداب گلزار ضمير اپ كا هر لفظ تها بس باب حكمت بے نكير اي محدث اي مفسر اي فقيه بے مثال ا پ كهاں جاءيں گے يه امت كے ارباب سوال رنج و غم تيرا مقدر هو گيا دار العلوم جب هوا رخصت وه تيرا رهنما دار العلوم مرقد استاد كو كر اي خدا تو مستنير جنت الفردوس هو ان كا ٹهكانه اي قدير

অনুরূপ একটি শোকগাঁথা রচনা করেছিলেন মাওলানা ইসহাক গাজী র.। তাঁর মুরসিয়ার ভাষা ছিল আরবী। মিসরা' সংখ্যা ৪২। তাঁর কাব্যেও ব্যক্ত হয়েছে মুফতী সাহেবের মৃত্যুতে অনেক দুঃখ, ব্যথা। মুফতী সাহেবের ইলমী কামালাত, আধ্যাত্মিক সাধনা, সংস্কার আন্দোলের কথা।[২]

১-২. নোমান, পৃ. ১০৮, ১১০।

ঝ. মুফতী ফয়যুল্লাহ'র পারিবারিক জীবন

মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ র. হাটহাজারী মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদানের এক বছর পর মেখল গ্রাম নিবাসী জনাব নূর আলী চৌধুরীর এক মাত্র কন্যার সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিয়ের এক বছর পর তাঁর শ্বশুর রোগাক্রান্ত হলে মুফতী সাহেব শ্বশুর বাড়ীতে অবস্থান করতে থাকেন। বলা যায় বিয়ের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি শ্বশুর বাড়ীতে অবস্থান করেন। যা পরবর্তীতে তাঁর নিজ বাড়ী এবং অধঃস্তন বংশধরদের বাড়ী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। মুফতী সাহেবর স্ত্রী ছিলেন অত্যন্ত সাদাসিধে চরিত্র, মেজাজের অধিকারিণী। যুহদ, তাকওয়া সম্পন্না নারী। মুফতী সাহেবের জীবনাচারও তাঁর মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছিল। মুফতী সাহেব বাড়ীর বাচ্চাদের পড়ানোর সময় নিজের স্ত্রীকেও পড়াতেন। স্ত্রীকে তিনি রাহেনাজাত, জীনাতুন্নিছা, হুকুকুল ইসলাম, মিফতাহুল জান্নাত, ইত্যাদি কিতাব পড়িয়েছেন। তবে নানা প্রতিবনধকতার কারণে বিশেষ করে কয়েকজন সন্তান মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার কারণে স্ত্রী মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। ফলে তাঁর স্ত্রীর লেখা-পড়া বেশী দূর অগ্রসর হয়নি। মুফতী সাহেব স্ত্রীর মাত্রাতিরিক্ত অসুস্থতায় ব্যথিত হয়ে রোগমুক্তি কামনায় প্রার্থনামূলক কবিতা রচনা করেন। দাম্পত্য জীবনে তিনি রাসুলুল্লাহ সা. এর হাদীস 'তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে তার পরিবারের নিকট উত্তম। আমি (দুজাহানের সরদার) আমার পরিবারের সাথে উত্তম আচরণ করে থাকি'।[১] মুফতী সাহেব দাম্পত্য জীবনে এ হাদীসের উপর আমল করেছেন। একবার তিনি রাত্রে ১০/১২বার দাস্ত বমিতে আক্রান্ত হয়ে প্রচণ্ড কষ্টের সময়ও স্ত্রীর ঘুম ভাঙাননি। অন্ধকারে হাতড়াতে গিয়ে অনিচ্ছাকৃত স্ত্রীর ঘুম ভাঙলে তিনি দু:খ প্রকাশ করেন।[২] ১৩৯১ হি. ২৬ রবিউল আউয়াল শনিবার বেলা ১১.০০ টায় মুফতী সাহেবের প্রিয়তমা স্ত্রী ইন্তিকাল করেন। চোখের সামনে প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃত্যুতে তিনি বিমর্ষ, বিচলিত হলেন, মূর্ছা গেলেন। স্ত্রীর বিয়োগে মর্সিয়া রচনা করলেন:

তাঁর রূহ রূহের জগতে চলে গেছে তাঁর প্রাণ নেককারদের সাথে মিশে গেছে হে ভাই! আমি তাঁর শিয়রে গিয়েছিলাম গোরে হযরত আলীর রা. কবিতাসমূহ এলো স্মরণে তুমি দেখ তাঁর কত সৌভাগ্য হে জান্নাতীদের নিদর্শন তাঁর মধ্যে ছিল নি:সন্দেহে হে দুজাহানের প্রভু! তাঁর ঠিকানা বানাও জান্নাতুল ফিরদাওসে, শত ইজ্জত সম্মান দাও।[৩]	جان او باجان نیکان گشت خفت بر سر گورش رسیدم اے اخي یاد امد شعر هاے مرعلي مرورا این هم سعادت هست هين نيز اثر جنتي بودن يقيني جاۓ او کن اۓ خداۓ دو جهان

সন্তানসমূহ: মুফতী সাহেব তিন পুত্র ও পাঁচ কন্যা সন্তানের জনক ছিলেন। তন্মধ্যে এক ছেলে আনওয়ার, দুই মেয়ে রহিমা খাতুন ও জয়নব খাতুন দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত ছিলেন। বাকিরা অপরিণত বয়সে মৃত্যু মুখে পতিত হন।

১. প্রথম সন্তান আযীযুল্লাহ মাত্র আড়াই বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

২. ১৩৪২ হি. ৫ শাওয়াল রবিবার মুফতী সাহেবের দ্বিতীয় সন্তান আনওয়ার জন্মগ্রহণ করেন। মুফতী সাহেবের বয়স তখন বত্রিশ বছর। আনওয়ার দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত ছিলেন।

৩. ১৩৪৭ হি. ওমর নামক অপর এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়েছিল। তিনি মাত্র চৌদ্দ দিন হায়াত প্রাপ্ত ছিলেন।

৪.৫. মুফতী সাহেবের ঔরসে আরও দুইজন কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন। একজন বিয়ের পূর্বেই ষোল বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। মারইয়াম নামক অপর কন্যা সন্তান ৩-৪ দিন জীবিত ছিলেন।

---

১. হায়াতে মুফতী আযম, পৃ. ১৬২-১৬৩; নোমান, পৃ. ৯৮; *ফাতাওয়া ফয়যিয়া*, খ. ১ম, পৃ. ২৫-২৬; মাশায়েখে চাটগাম, পৃ. ৩৬৯-৩৭০

২-৩. *ঐ*, পৃ. ১৫৫-১৫৬, ২৬, ৩৩৭।

৬. ১৩৪৯ হি. ১০ জিলক্বদ সোমবার ভোরে জন্মগ্রহণ করেন রহীমা খাতুন। তিনি ছিলেন দীর্ঘজীবী এবং পরিণত বয়সে ইন্তিকাল করেছেন।

৭. ১৩৫২ হি. **১৯** জিলহজ সোমবার সকাল **১১** টায় কন্যা যয়নব খাতুনের জন্ম। তিনিও দীর্ঘায়ু লাভ করে পরিণত বয়সে ইন্তিকাল করেছেন। রহীমা খাতুন ও যয়নব খাতুনের সন্তান ও পরবর্তী প্রজন্মরাই মুফতী ফয়যুল্লাহ'র বংশধর হিসাবে পরিচিত।

৮. ১৩৫৬ হি. ২৯ জিলকদ মঙ্গলবার দুপুর দেড়টায় জন্মগ্রহণ করেন কন্যা ফাতেমা। জন্মের দশদিন পর তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হন।[১]

আনওয়ার : ১৩৪২ হি. ৫ শাওয়াল তাঁর জন্ম। তাঁর জন্মের সময় মুফতী সাহেবের বয়স ছিল বত্রিশ বছর। তাঁর জন্মের পরদিন মুফতী সাহেবের শ্বশুর / তাঁর বড় চাচা নূর আলী চৌধুরী ইন্তিকাল করেন। মুফতী সাহেবের উস্তাদ ভারতবর্ষের খ্যাতিমান আলিমে দ্বীন শাহ আনওয়ার কাশ্মীরির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্থে ছেলের নাম রাখেন আনওয়ার। এলাকায় তিনি শাহ সাহেব হিসেবে পরিচিত ছিলেন। জন্মের পর থেকেই রোগ-ব্যাধি তাঁর পিছু ছাড়েনি। কারণে মুফতী সাহেব হাটহাজারী মাদ্রাসায় রাতযাপন ত্যাগ করে বাড়ীতে থাকতে বাধ্য হন। আনওয়ার শাহ ছিলেন জন্মগত ভাবে প্রতিবন্ধী। তাঁর মধ্যে জ্ঞান বুদ্ধির স্বল্পতা, এলোমেলো কথা বলার অভ্যাস ছিল। কাজকর্ম করার যোগ্যতা, শক্তি, মেধা তাঁর মধ্যে ছিল না। মুফতী সাহেব মাঝে মধ্যে বলতেন, তাঁর বিখ্যাত উস্তাদ আনওয়ার শাহ কাশ্মীরির নামে নামকরণ হয়ত বেয়াদবী হয়েছে বিধায় সন্তান প্রতিবন্ধী হয়েছে। কখনও বলতেন, উস্তাদের নামের অক্ষরসমূহের ভার বহন করার ক্ষমতা তাঁর সন্তানের মধ্যে নেই বিধায় এমন হয়েছে। প্রকৃত তিনি ছিলেন মানসিক ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী। মুফতী সাহেবের বড় মেয়ে রহীমা খাতুনের স্বামী মাওলানা কাসিম বলেন, মুফতী সাহেবের বাড়ীতে জায়গীর হিসেবে আমার আগমন। আমার দায়িত্ব ছিল আনওয়ার সাহেবকে পড়ানো। কিন্তু তাঁর কথাবার্তা, চালচলন, অবস্থান, বাসস্থান কোনটারই ঠিকানা ছিল না। তাঁকে সামাল দেওয়া ছিল কষ্টকর। শুধুমাত্র আলিফ, বা, তা শিখাতে পেরেছি। বহু কষ্টে নামাজের কয়েকটি ছোট ছোট সূরা মুখস্থ করাতে পেরেছি। নামায পড়ার নিয়মও শেখানো সম্ভব হয়েছিল। তিনি নামায পড়তেন তবে নিয়মিত নয়। ওয়াজিব, সুন্নত এসবের অনুসরণ করতেন না। মুফতী ফয়যুল্লাহর দৃষ্টিতে তাঁর ছেলে শরী'আতের মুখাল্লাফ ছিলেননা। বিয়ে শাদী সংসার জীবনের সাথে তিনি জড়িত হননি। সারাদিন বাড়ীতেই সময় কাটিয়েছেন।[২]

মুফতী সাহেব তাঁর এ সন্তানকে উপলক্ষ করে শিশু বয়সেই দু'আমূলক কবিতা রচনা করেছিলেন:

মুহাম্মদ আনওয়ার আমার সন্তান	
আমার কলিজা আমার দিল	ه
হে প্রভু! তাকে রাখ বিপদমুক্ত	با سلامت یا رب از افات دار
আমার উত্তরসূরী হিসেবে কর যুক্ত	هم همان اورا س من یاد
তাঁর চরিত্র কর সৌন্দর্যমান	حسن خلقش کن عنایت یا ربم
হে রব! বানাও তাকে সৌভাগ্যবান	بخش اورا هم سعادت یارب
তার আখলাক কর সুন্দর দীপ্ত	نیك کن اخلاق و هم اطوار او
চলন বলনে কর উদ্দীপ্ত	خوب کن رفتار و هم گفتار او

বানাও জগতের কামেল ওলী শরীআতের বাহক, ওয়ারিশে নবী দীর্ঘায়ু দাও মোর চোখের পুতুলিরে হে প্রভূ! তোমার হাতে সপিলাম তারে।[৩]	در جهان اورا بكن كامل و لي هم ورا كن عالم شرع طول عمر قرة العين مرا

১. *হায়াতে মুফতী আযম*, পৃ. ১৬৯-১৬৪; নোমান পৃ. ৯৭।
২-৩. *হায়াতে মুফতী আযম*, পৃ. ১৬৫-১৬৯; *ফাতাওয়া ফয়যিয়া*, খ. ১ম, পৃ. ২৭-২৮।

রহীমা খাতুন : ১৩৪৯ হি. ১০ জিলক্বদ সোমবার ভোরে রহীমা খাতুনের জন্ম। তিনি ছিলেন যুগের অন্যতমা রমণী। চলনে, বলনে, স্বভাবে, চরিত্রে, অভ্যাসে ছিলেন পিতার ন্যায়। তাঁর মত ধার্মিক রমণী খুব কমই জন্মে থাকেন। তাঁর সম্বন্ধে মুফতী সাহেব বলেন, আমার এ কলিজার টুকরা ছেলে হলে অনেক বড় আলিম হত। চৌদ্দ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হওয়াতে শিক্ষার সুযোগ তেমন হয়নি। বিয়ের পর সংসার জীবনের নানা ঘাত- প্রতিঘাত তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলে। তিনি ছিলেন একজন মেধাবী, বিদূষী রমণী। ছোট বেলায় যে কোন কিতাব পড়লে পুরোটাই আয়ত্ব করতে পারতেন। তাঁর হাতের লিখাও ছিল সুন্দর। নিজের ভাব প্রকাশে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। যে কোন বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করার যোগ্যতা ছিল। তিনি মুফতী সাহেবের ফাতাওয়া ফারায়িয নকল করে দিতেন। বাড়ীতে উস্তাদ রেখে নাহু, সরফ, উর্দূ, ফার্সী কিতাবসমূহ তাঁকে পড়ানো হয়। সঙ্গে তাঁর ছোট বোন যয়নবও লেখাপড়া করতেন। উস্তাদের সামনে যাওয়ার মত বয়স পার হয়ে গেলে মুফতী সাহেব নিজেই মেয়েদের পড়াতেন। ফজর নামাযের পর এবং রাতে নিয়মিত পড়াতেন। হিদায়া কিতাব তিনি পিতার নিকট পাঠ করেছেন। হারিকেনের আলো জ্বালিয়ে দীর্ঘ রাত পর্যন্ত তিনি কিতাব পাঠ করতেন। মিশকাত শরীফও পিতার নিকট পাঠ করেছেন। শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভীর **আশআতুল লুমাআত** চারখন্ড পাঠ করেছেন। বিয়ের পর তাঁর স্বামী মাওলানা কাসিম র. এর নিকট কিছু কিতাবাদি পাঠ করেছেন। ১৩৬৩ হি. ঈদুল আযহার দিনে ঈদের মাঠে অত্যন্ত সাধাসিধেভাবে মোহরে ফাতেমীর বিনিময়ে তাঁদের বিয়ে হয়। তাঁদের বিয়ে উপলক্ষে মুফতী সাহেব ফার্সী ভাষায় বিশ মিসরার’ কাব্যে দু'আ জানিয়েছিলেন :

হে কর্ম কুশলী! আমার কন্যা রহীমা দীর্ঘায়ু দাও তাঁকে এ জাঁহায় আমার সুকন্যা কলিজার টুকরা উভয় জগতে ভাগ্যবতী কর হে খোদা আপদ বালা হতে রাখ নিরাপদ দূরে রাখ কালের বিবর্তন মুসীবত বানাও পূন্যবান রাখ পবিত্র তাকে উত্তম চরিত্র দাওগো হে খোদা ওকে অকল্যাণ অশুভ থেকে রাখ নিরাপদ দাও দীর্ঘায়ু, রাখ আরো নিরাপদ।[১]	ان رحيمه دخترم ا در جهان كن عمر اورا بس دراز دختر نيك اختر دلبند را هم مصونش دار از افاتها وز بليات زمان دارش خدا حسن خلقش كن عطا هم ا از شرور و فتنه شان محفوظ دار نيز باطول بقا محفوظ

যয়নব খাতুন : ১৩৫৩ হি. ৯ জিলহজ সোমবার বেলা ১১.০০ টার সময় জন্মগ্রহণ করেন যয়নব। তিনি সর্ফ ও নাহুর কিতাবসমূহ মুহতারাম উস্তাদ আযীযুল্লাহর নিকট পাঠ করেন। পিতার নিকট ফয়যুল কালাম, হিদয়াতুল ইবাদসহ প্রয়োজনীয় কিতাবসমূহ পাঠ করেন। বড় বোনের সাথে কুরআন তরজমা পিতার নিকট পাঠ করেন। আদব, আখলাক, অভ্যাস, আচরণে পিতার মত ছিলেন। দ্বীনদার ও তাকওয়া সম্পন্না ছিলেন। তাঁর প্রকৃতিতে লজ্জা এতটা শক্তিশালী ছিল যে, তল্লার বেড়ার পার্শ্বের রূমে থেকেও বড় ভগ্নীপতি দীর্ঘ ১১ বছরের মধ্যেও কখনও তাঁর আওয়াজ শুনতে পাননি। অত্যধিক নাম, যশ, খ্যাতির অধিকারী ফয়েয আহম্মদ চৌধুরীর ছেলে মাওলানা মুযাফ্ফর আহম্মদ চৌধুরীর সাথে যয়নবের বিয়ে হয়। মুযাফ্ফর আহমদ চৌধুরী প্রথম জীবনে মেখল মাদ্রাসায়, পরবর্তীতে হাটহাজারী মাদ্রাসা হতে ফারাগাত অর্জন করেন। ছাত্র জীবনেই তিনি বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হন। সম্পূর্ণ সুন্নত মোতাবিক এ বিয়ে সম্পন্ন

হয়েছিল। বিয়ের আকদ সম্পন্ন হওয়ার প্রাক্কালে বিয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিধি বিধান ও মোহরে ফাতেমী বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিয়ের পর যয়নব এক বছর শ্বশুরবাড়ীতে ছিলেন। পরবর্তীতে পিতার বাড়ীতে অবস্থান করেন। তাঁর স্বামী মুযাফ্ফর আহমদ

১. *হায়াতে মুফতী আযম*, পৃ. ১৮৫-১৮৬; *ফাতাওয়া ফয়যিয়া*, খ. ১ম, পৃ. ২৭-২৮।

চৌধুরী মুফতী সাহেবের বাড়ী দেখাশুনার দায়িত্ব পালন করতেন। এ ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। সাথে মেখল মাদ্রাসায় দর্স দিতেন। মেখল মাদ্রাসাকে একটি মজবুত ভীতের উপর দাঁড় করাতে সক্ষম হন। মুফতী সাহেব কন্যা যয়নবের বিয়ে উপলক্ষ্যে দু'আ জানিয়ে ফার্সীতে একটি বিশ মিসরা'র কবিতা রচনা করেন :

যয়নব খাতুনকে হে আল্লাহ! রাখ দুজাহানে বালা মুসীবত হতে দূরে, শান্তিতে সৌভাগ্যের পরশমনি দাও ছড়িয়ে যুগ যুগ ধরে থাকে যেন স্মরণে তোমার প্রশংসাকারী মুখ, দিল দাও তাকে উভয় জাহানে খোশনসীব করগো তাকে আমার কলিজার টুকরাকে নিরাপদ রাখ বিপদ আপদ মুসীবত হতে দূরে রাখ।[১]	دختر خاتون زينب را خداے دو جهان از بليات و حوادث دار دائم در امان با سعادت هم قرين و كن در اقبال مند تا زمان دير يادش دار باقي در زمان هم لسان ذاكر و هم قلب شاكر ده ورا اين همه لخت جگر را يا الهي از بلا

কন্যা যয়নবের বিয়ে উপলক্ষে মুফতী সাহেবের প্রদত্ত ভাষনের সার কথা ছিল:

হে আল্লাহ! তুমি আমার ভাই ফয়েয আহমদ চৌধুরীকে দীর্ঘায়ু দান কর, সকল অনিষ্ট ও বিপদ হতে রক্ষা কর। হে আমার ভ্রাতা! আপনি আমাদের সর্দার আমাদের বয়োজ্যেষ্ট বরং সর্বদিক দিয়ে এলাকার সবার বড়। কী বয়সে, কী মর্যাদায়, কী সম্মানে, কী প্রভাব প্রতিপত্তিতে, সব দিক দিয়ে আপনি বড়। আমি আপনার ছোট ভাই, আপনাকে উদ্দেশ্য করে আমি কয়েকটি কথা বলেছি, আশা করি আপনারা এ কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনবেন ও ইখলাসের সাথে গ্রহণ করবেন। মুফতী সাহেব তখন কয়েকটি হাদীস উদ্বৃত করেন:

(১) لا يؤمن احدكم حتي اكون احب اليه من والده و ولده والناس اجمعين (متفق عليه)
(২) لا يومن احدكم حتي يكون هواه تبعا لما جئت به –   -
(৩)   –   -
(৪) من تمسك بسنتي عند فساد امتي فله اجر مأة شهيد – بيهقي -
(৫) اعظم النكاح بركة ايسره مؤنة - بيهقي -

আমরা, তোমরা সবাই অধিক বৃদ্ধ এবং দূর্বল হয়ে গেছি, মৃত্যুর কাছাকাছি চলে এসেছি। অচিরেই আমাদেরকে কবরে স্থাপন করা হবে। সুতরাং আমরা কি সে দিন সে অবস্থার জন্য প্রস্তুত আছি? হাশরের দিনে আমাদেরকে যে পাকড়াও করা হবে তার জন্য কি প্রস্তুতি নিয়েছি? শরীআতের দৃষ্টিতে বিয়ে -শাদী অত্যন্ত সহজ একটি কাজ। কিন্তু বর্তমানে আমরা সব দিক মিলিয়ে এটিকে অত্যন্ত কঠিন করে দিয়েছি। এর সঙ্গে আনুষাঙ্গিক অবার্চীন বিষয়গুলো যুক্ত করে অর্থ, বিত্ত ব্যয়ের মহড়া সাজিয়েছি। এসবই কৃত্রিম, শরীআত অস্বীকৃত। অনুসঙ্গ হিসেবে যুক্ত বিলাসিতা , এসব প্রাপ্ত হয়েছে দুনিয়াদারদের নিকট হতে। সল্ফে সালিহীনদের পক্ষ হতে নয়। এসব কৃত্রিমতার ভিত্তি ও উৎস হল লোক দেখানো, যশ, খ্যাতি, সুনাম, প্রশংসা, আত্মগৌরব অর্জন। বদনাম, অপবাদ থেকে বাঁচার অপচেষ্টা। এসবের মধ্যে বিন্দুমাত্র ইখলাস নেই, সওয়াব নেই; শুধুই অর্থের অপচয়। এসবে লিপ্ত

১. *হায়াতে মুফতী আযম*, পৃ. ১৮৬-১৯২; ফাতাওয়া ফয়যিয়া, খ. ১ম, পৃ. ২৮,

২. ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মদ, মুফতী, *ফয়যুল কালাম*, চট্টগ্রাম, ফয়যিয়া কুতুবখানা, হাটহাজারী ১৩৯৯ হি. পৃ.১২; নূর মোহাম্মদ আ'জমী (অনূ:), প্রাগুক্ত, খ. ১ম, পৃ. ৩৩, হাদীস নং-৬।
৩. *ঐ*, খ. ১ম, পৃ. ১৭৮, হাদীস নং-১৬০, ১৫,৬৭,৬৮,৩৪৩।
৪. *ফয়যুল কালাম*, পৃ. ৬৬, হাদীস নং-১০২।
৫. ঐ, পৃ. ৬৮, হাদীস নং-১০৪।
৬. ঐ, পৃ. ৩৪৩, হাদীস নং- ৬৩৭।

হবার ফলে দ্বীন, দুনিয়া দুটোই ধ্বংস হয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং অসম্ভব নয় যে, এসব কৃত্রিমতা, প্রথা, প্রচলন, খারাপ পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। মুসলমানদের এসব পরিত্যাগ করা কর্তব্য। বিশেষ করে সুন্নত প্রেমিকদের উপর অবশ্যই কর্তব্য। আলিমদের এসবের সাথে জড়িয়ে যাওয়া অধিক গুমরাহীর কারণ। এতে গুমরাহীর নেতৃত্ব দেওয়া হবে। আল্লাহর কসম ! যদি এসব কৃত্রিম বিষয় সওয়াবের কাজ হত, ভাল কোন পরিণতি বয়ে নিয়ে আসত তাহলে আমরাই আগে এগুলোতে লিপ্ত হতাম এবং জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতাম। তাই আমি তোমাদেরকে এসব পরিত্যাগ করতে বলছি ও সতর্ক করছি। হে আমার বড় ভাই! এর পূর্বে আপনি দুই ছেলে ও তিন মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। নিজের ইচ্ছামত অনুষ্ঠান করেছেন। সুতরাং এ বিয়েটাকে গণীমত, উত্তম সুযোগ মনে করুন। এ বিয়েটাকে সব ধরণের বিলাসিতা, অপচয়, অপ্রয়োজনীয় কার্যাদি থেকে মুক্ত রাখুন। তাহলে উভয় জাহানে কামিয়াব হবেন। আল্লাহ আমাদের রব, আমরা তাঁর বান্দা, অধীনস্থ গোলাম। কিন্তু আজ আমরা রুসুম-রেওয়াজ, প্রবৃত্তিকে প্রভূ বানিয়ে নিয়েছি। আল্লাহ তাআলা ও মহানবী সা. এর বিরুদ্ধাচরণ করতে কোন পরোয়া করছি না। আফসোস! কীভাবে সব ওলট পালট হয়ে গেল। আমার মেয়ে সুন্দরের অধিকারী নয় তবে ইল্‌ম কামালতের অধিকারিনী আলহামদুলিল্লাহ। সে কিতাব পাঠ করেছে,আরবী শিখেছে এবং কুরআন হাদীসের অর্থ বুঝেছে। প্রকৃত সৌন্দর্য মনের শুচি, শুদ্ধি অভ্যন্তরীণ পূর্ণতা ও যোগ্যতা । আল্লাহতাআলা তাঁকে হায়াত দারাজ করুন এবং নেক ও দ্বীনদার কন্যায় পরিণত করুন। আপনার ছেলে আমার ছেলে, আমার মেয়ে আপনার মেয়ে। তাদের দ্বীন দুনিয়ার কল্যাণের জন্য আমরা সবার নিকট দু'আ প্রার্থনা করব। আপনার ছেলে ইল্‌মে দ্বীন শিখবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকেও হায়াত দারাজ করুন। নেক, দ্বীনদার, সুন্নতের অনুসারী, সুসন্তান হিসেবে গড়ে তুলুন এবং বিদ'আত থেকে বাঁচিয়ে রাখুন। আল্লাহ তা'আলা এ বিয়েকে সাইয়্যিদুল কায়িনাতের পবিত্র স্ত্রী এবং তার কন্যাগণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বিয়ে হিসেবে কবূল করুন। আমার স্থাবর ,অস্থাবর সব সম্পদ এ দুই বর-কনের জন্য। আনওয়ার ব্যতীত আমার কোন ছেলে সন্তান নেই। তদুপরি আনওয়ার মানসিক ও বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী। তাঁর দ্বারা দুনিয়ার কাজকর্ম ও লেনদেন আশা করা যায় না। দুনিয়া হাসি আনন্দের স্থান নয়। নিজের প্রবৃত্তি কামনা পূরণের স্থান নয়। আমাদের সামনের রয়েছে মওত, কবর, মুনকির-নাকিরের সওয়াল, পুনরুত্থান এবং হাশর নশরের বিভীষিকা। [১]

পরিবার ও সংসার জীবনে মুফতী সাহেব দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন। মাদ্রাসা থেকে প্রাপ্ত ১৫ টাকা ওযীফা দিয়ে বিরাট সংসারের ব্যয়ভার বহন করেছেন। শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনী, নাতিন জামাই সহ বিরাট এক পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করেছেন। এগুলো তিনি সওয়াবের উদ্দেশ্যেই করতেন। অন্যথায় তাঁর অর্থনৈতিক সামর্থ ছিল একেবারেই সীমিত। দুই মেয়ের জামাতাকে নিজ বাড়ীতে থাকার ব্যবস্থা করেছেন এবং তাদের সংসারের যাবতীয় খরচাদি, চাউল, লাকড়ি, তরি-তরকারি, মসলাপাতি, সাবান ইত্যাদি যুগিয়েছেন। তাঁর বড় মেয়ের জামাতা মাওলানা কাসেম সাহেব অর্থাভাবে মাদ্রাসায় যাওয়া আসার পথে শাক পাত টুকিয়ে আনতেন। এমন অর্থ সংকট তাঁর সংসারে অতিবাহিত হয়েছে। তবে মুফতী সাহেব শেষ জীবনে অর্থ ও প্রাচুর্যের দেখা পেয়েছিলেন। নিজের পরিবার, আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশী, দোস্ত আহবারের খরচ মিটিয়েছেন।[২]

১. *হায়াতে মুফতী আযম*, পৃ. ১০৭-১০৮; *ফাতাওয়া ফয়যিয়া*, খ. ১ম, পৃ. ২৭-২৮।
২. ঐ, পৃ. ১১২-১১৩; নোমান, পৃ. ৯০-১০০; *মাশায়েখে চাটগাম*, পৃ. ৩৭৮-৩৮২।

পঞ্চম অধ্যায় :
রচনা সমগ্র

মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ র. ছিলেন অদম্য জ্ঞান স্পৃহার অধিকারী। বাল্যকাল থেকেই তিনি অসাধারণ মেধার পরিচয় দিয়েছেন। জ্ঞান অর্জনে ছিল তাঁর প্রবল ঐকান্তিক আগ্রহ। বিংশ শতাব্দীর এ স্বনাম ধন্য মনীষীকে আল্লাহ তা'আলা আরবী, ফার্সী, উর্দূ তিনটি ভাষার উপর এক মহান সাহিত্যিক মর্যাদা দান করেছিলেন যে, কোন কিছুই তাঁকে লক্ষ্যচ্যুত করতে পারেনি । ছোট বেলাতেই তাঁর মধ্যে সাহিত্যের স্ফূরণ ঘটে। তিনি যখন হাটহাজারী মাদ্রাসার ছাত্র তখন থেকে সাহিত্য সাধনা আরম্ভ করেন। ছাত্র অবস্থাতেই অভিজ্ঞদের ন্যায় সিদ্ধহস্তে রচনা আরম্ভ করেন। অধ্যয়ন, ইসলামী জ্ঞানের অধ্যাপনা, গ্রন্থ রচনা ছিল তাঁর জীবনব্রত। তিনি মাদ্রাসা খোলা থাকার দিনসমূহের চেয়ে ছুটির দিনগুলোতে মুতালা'আ, তাকরার এবং লিখনীর কাজ বেশি পরিচালনা করেছেন । মাদ্রাসার যে কোন ছুটিতে একটি করে পুস্তক / পুস্তিকা রচনা করেছেন। জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি জ্ঞান বিতরণের লক্ষ্যে জ্ঞান- বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় লিখনী শক্তি প্রয়োগ করেছেন। বিভিন্ন বিষয়ের উপর রচিত তাঁর গ্রন্থাবলী তাঁর উচ্চ জ্ঞান, গরীমার নিদর্শন বহন করে। প্রকাশ্য জ্ঞানের এমন কোন শাখা নেই যার সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল না। তাঁর রচনাসমগ্র অত্যন্ত দূর্লভ ও বিরল; যা যুগের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে এবং আগামী দিনের পথ নির্দেশক হয়ে রয়েছে। তাঁর রচনাসমগ্র ইসলামী জ্ঞান ভান্ডারে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। জ্ঞানের গভীরতা,

বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণের অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় রাখে। প্রতিটি ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রপথিকগণ যে সীমারেখা অংকন করেছেন, মুফতী সাহেবের রচনাসমগ্র তাঁদের রচনার চেয়ে মানে, গুণে, ভাষা শৈলীতে কোন অংশেই কম নয়। সমস্যা, সংকট মোচন, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, যথার্থ উপলদ্ধি, মুজতাহিদসুলভ জ্ঞান, কুরআন সুন্নাহর গভীরে বোধশক্তির মাধ্যমে প্রবেশ করা, মাকামে নবুওয়্যতের সম্মান ও মর্যাদার স্বার্থক বর্ণনা, শরী'আতের সুক্ষাতিসুক্ষ বিষয়ের বিশ্লেষণে তাঁর সমতুল্য কাউকে দেখা যায়নি। বরং তাঁর লিখনী সমসাময়িক যুগে হাজারো অন্তরকে প্রভাবিত করেছে। যুগ যুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পরও তার রচনা ভান্ডারে সজীবতা, প্রাণস্পন্দন, অভিভূত করার শক্তি অক্ষত রয়েছে। তাঁর বিশাল রচনা ভান্ডারে কোন কৃত্রিমতা নেই বরং জীবন ও আত্মাকে একীভূত করেছে, মানব জীবনে প্রভাব সৃষ্টি করেছে। তাঁর বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী রচনা, তাঁর ধ্যান- ধারণা, মানবীয় অনুভূতি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও হৃদয়গ্রাহী। তিনি গ্রন্থ রচনা ও সাহিত্য সাধনাকে নিজের পেশা অথবা যোগ্যতা অথবা প্রতিভা বিকাশের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেননি। অর্থ উপার্জন, সুখ্যাতি, সুনাম, কোনটাই তাঁর লক্ষ্য ছিল না। দীনের সেবা ও জ্ঞানের চর্চা করা ছিল তাঁর লক্ষ্য। হাটহাজারী মাদ্রাসায় ছাত্র অবস্থায় রচনা করেন *ফান্দে ফয়েয* ند فيض মিশকাতুল মাসাবীহ গ্রন্থ অধ্যয়নকালে মাওলানা আব্দুল হামীদ র.-এর আদেশক্রমে বিখ্যাত গ্রন্থ কাসীদা-ই বানাত সু'আদ قصيدئ গ্রন্থের একটি আরবী ব্যাখ্যগ্রন্থ (আল ইকতিসাদু ফি শারহি বানাতি সু'আদ) রচনা করেন। সুল্লামুল উলূম গ্রন্থ পাঠকালে এ গ্রন্থের কঠিনতম অধ্যায় তানাকুস ও আকসে মুসতাবী এর ব্যাখ্যা আকসে নকীয عكس نقيض ফার্সী ভাষায় রচনা করেন। ছাত্র জীবনে রচিত বেশকিছু পুস্তিকা হারানো গেছে বলে তিনি আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন। দেওবন্দে লেখাপড়া করার সময় রমযানের ছুটিতে তিনি লিখনীর কাজ করেছেন। দাওরায়ে হাদীসের বছর রমযানে (দেওবন্দে) উমদাতুল আকওয়াল ফিরাদ্দি মাফি আহসানিল মাকাল
রচনা করেছেন। দেওবন্দের আলিমগণ গ্রন্থটি খুব পছন্দ করেছেন। এর স্বপক্ষে কিছু মন্তব্য ও প্রশংসাবাক্য সংযোজিত করেছেন। যা মূল গ্রন্থে সংযোজিত রয়েছে। দেওবন্দের উস্তাদগণও তাঁর রচনার দক্ষতার প্রতি সুধারণা রাখতেন।[১] তাঁর রচনাসমূহ পাঠক সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।[২]

১-২. দৈনিক আমারদেশ, ৩১ জুলাই, ২০০৯ খৃ. ; জসীম উদ্দীন, মুফতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫-২২৬ ; *হায়াতে মুফতী আযম*, পৃ. ৫-৭; *আল্লামা হাফেয জুনায়েদ বাবুনগরীর রচনাসমগ্র*, পৃ. ৩৯৪।

দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ের মূলনীতি উন্মোচিত হয়েছে। প্রতিটি বিষয়ের আলোচনা, সমালোচনা, নীতিগত সিদ্ধান্ত ও নিশ্চিত বিশ্বাসের উপাদান রয়েছে। তিনি আকাঈদ ও ফিক্হী মাসআলার উপর বেশি আলোচনা করেছেন। তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্যি হলো সেগুলোতে জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায়। মনে হয় যে, গ্রন্থসমূহ জনজীবনের মাঠে, ময়দানে রচনা করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাদি খুব সহজেই তাঁর অনুভব, অনুভূতিকে চিহ্নিত করে। সমকালীন সমাজ, সভ্যতা, মনমানসিকতা, চরিত্র, দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে ওঠেছে। তাঁর গ্রন্থসমূহ পাঠের মাধ্যমে তাঁর চিন্তা, চেতনা ,আবেগ, অনুভূতি পছন্দ, অপছন্দ পরিমাপ করা যায়। বুঝা যায়, তিনি মানবীয় আবেগ অনুভূতি সম্পন্ন ছিলেন। তাঁর পুস্তকসমূহ তার উদ্ভাবনী শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব এবং ইল্ম শরীআতে তাঁর পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর বহন করে। প্রতিটি গ্রন্থে তাঁর স্বকীয় প্রতিভা বিদ্যমান। লেখার রীতি, শব্দ ও বাক্য চয়ন, বাক্যের গঠন অনন্য বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। তাঁর গ্রন্থসমূহ সামাজিক খতিয়ানের উপর সমালোচনা , বিদ'আত ও গর্হিত কর্মকাণ্ডের রদ ও বাতিলের বিবরণী রয়েছে। তাঁর গ্রন্থসমূহ তথ্য, উপাত্তে ভরপুর এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অদ্বিতীয়। যে বিষয়ে তাঁর পূর্বে কেউ লিখেন নি। গ্রন্থসমূহে বিষয়বস্তুর বিবরণ বিস্ময়কর, ভাষা শৈলী উচ্চাঙ্গের; তবে সহজলভ্য ও বোধগম্য। গ্রন্থসমূহ আত্মার প্রদীপকে আলোকিত করতে সক্ষম। অল্প শব্দে অনেক বক্তব্য তিনি প্রকাশ করতে পেরেছেন। তাঁর পাণ্ডুলিপি রচনার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল- একটি লিখা প্রথমবারেই চূড়ান্ত করতে সক্ষম ছিলেন। তন্মধ্যে কোন কাটা ছেড়া করেননি, দ্বিতীয়বার লিখেননি। এটা তাঁর জীবনের অসাধারণ কৃতিত্ব, পাণ্ডিত্য, ভাষা জ্ঞানের দক্ষতার পরিচয় বহন করে। এ বিষয়ে মুফতী সাহেব অত্যন্ত সফল পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতকারক ছিলেন

বলতে হবে। এতে প্রমাণ হয় যে, তিনি আল্লাহতাআলার সন্তুষ্টিকল্পে লিখতেন। এ কৃতিত্ব পৃথিবীর নামীদামী লেখকদের ক্ষেত্রেও দেখা যায়নি। তিনি গদ্যই লিখেন আর পদ্যই লিখেন শব্দ চয়ন ছিল অত্যন্ত সহজ সরল। তবে বিষয়বস্তু ছিল উচ্চাঙ্গের ও বিস্তৃত। তাঁর অগণিত গবেষণাধর্মী রচনা রয়েছে। আরবী, ফার্সী ও উর্দূ ভাষায় প্রায় একশ' গ্রন্থ রচনা করেছেন। শরীআতের এমন কোন দিক নেই যেখানে তিনি কলম ধরেননি। বাংলাদেশী আলিমদের মধ্যে সম্ভবত তিনিই সবচেয়ে বেশী গ্রন্থের রচয়িতা। ইসলামী সাহিত্যের এমন বিশাল ভান্ডার আর কেউ রেখে যেতে সক্ষম হননি। তাঁর ক্ষুরধার লিখনি ছিল উম্মাহর জন্য পথহারা মুসাফিরের জন্য জাগানিয়া পয়গাম।[১] তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ কিছু মৌলিক, কিছু সংকলন, কিছু অনুবাদ ও ব্যাখ্যা গ্রন্থ। তাঁর রচিত প্রতিটি গ্রন্থ পৃথকভাবে ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, আলোচনা, সমালোচনা ও মূল্যায়নের দাবী রাখে। তাঁর গ্রন্থসমূহকে ক. আকীদা বিষয়ক রচনা, খ. হাদীস বিষয়ক রচনা, গ. ফিক্হ বিষয়ক রচনা, ঘ. তাসাউফ বিষয়ক রচনা, ঙ. কাব্য রচনা, চ. পত্র রচনা ছ. বিবিধ রচনায় ভাগ করা হয়েছে। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে এ পর্যন্ত যেসব গ্রন্থের অনুসন্ধান পাওয়া গেছে সেগুলো হলো-

الفيصل الجلية لاحكام السماع و سجدة التحية
الكلام الفاصل بين اهل الحق والباطل
في الرد علي الفرقة النيچرية
حفظ الايمان عن مكائد دجال ديانه
ارشاد الامة الي التفرقة بين البدعة و السنة
وهابي كون هے
فيض الكلام لسيد الانام
هداية العباد الي سبيل الرشاد
چهل حديث
فتاوي فيضيه

১. *আল্লামা হাফেজ জুনায়েদ বাবুনগরীর রচনাসমগ্র*, পৃ. ৩৯৩; আব্দুল বাকী, মুহাম্মদ, ড. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯ ; মাহবুবে এলাহী, মাওলানা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭।

هاتهزاري
الادعية المأثورة عن النبيﷺ
ترغيب الامة الي تحسين النية
رسالة التنبيه

حرمة الاستيجار علي الطاعات
الفلاح في ما يتعلق بالنكاح
هدية رمضان

حقوق الوالدين

اظهار الا
اظهار الخيال

توضيح البيان في حكم طلاق الغضبان

درود و قيام

كراهة تكرار الجماعات
اظهار المنكرات الشائعة
حكم التكلم بالنية باللسان العربية
القول السديد في حكم الاحوال و المواجيد
ذم الاكثار في انشاد الاشعار و الاعراض عن بيان الاحكام و الاثار

تعليم الاسلام

ازالة الخبط والهيمان في روية هلا عيد و رمضان
سراج التبليغ
ابن نامه نكاح
سامان بهشت
چشتيه خواندان كي سابريه شجاره
ترغيب ا (پيروي سنة)
اصلاح النفوس والحق الصريح
فضائل درود الشريف

الحق الصريح في المسلك الصحيح
وصيت نامة
ارشاد الطالبين الي حق المبين
حب ايماني و حب عشقي

حق كي رهنمائ

فيض بے بها شرح كريما
فيض ستار حاشيه عطار
فيض
فيض بے پا ياں شرح

پند فیض
پند نامه خاکي
مثنوي دل پزیر
مثنوي دلاویز

سرار المؤمنین
فوائد نافعه غریبیه
تحفة المؤمنین
هادیة المؤمنین
اصحاب صفه
زیارت نامه

شرح تعلیم المتعلم

تعلیم المبتدي علي السان العربي

---

১. সম্পাদনা পরিষদ, *ফাতাওয়া মাসাইল*, ঢাকা, ই.ফা.বা. ১৯৯৬, খ. ১ম, পৃ. ১৫৪; নূর মুহাম্মদ আ'জমী, *হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯; জসীম উদ্দীন, মুফতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১-১৬২; সীরাজুত তাবলীগ কুতুবখানা ফয়যিয়া, তা. বি. পৃ. ১০; *আল্লামা হাফেজ জুনায়েদ বাবুনগরীর রচনাসমগ্র*, পৃ. ৩৯৩; আব্দুল বাকী, মুহাম্মদ, ড. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯ ; মাহবুবে এলাহী, মাওলানা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭; *দোয়া মাছুরা* ; চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, ২০০৪; পৃ. ৮২।

ঈমান- আকীদা বিষয়ক রচনা

১.আল- ফায়সালাতুল জালিয়্যাতু লি আহকামিস সিমা’ ওয়া সিজদাতিত তাহিয়্যাতি

الفیصلة الجلیة لاحکام السماع و سجدة التحیة

মুফতী সাহেবের রচিত ৩২ পৃষ্ঠার এ ফার্সী পুস্তিকাটি ১৩৫২ হি. মোতাবেক ১৯৩৩ খৃ. রচিত এবং দিল্লীর আলিমী প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়। এতে প্রকাশের সন তারিখ উল্লেখ নেই। পরবর্তীতে গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী । এতেও সন তারিখের উল্লেখ নেই। গ্রন্থটির উর্দূ অনুবাদ করেছেন মুফতী ইযহারুল ইসলাম চৌধুরী। উর্দ্ অনুবাদ মূল গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠার নিম্নাংশে মুদ্রিত হয়েছে। বইটি প্রশ্নোত্তর আকারে রচিত। এতে তিনটি প্রশ্ন রয়েছে। ১. প্রচলিত ছামা ২. সিজদা-ই তাহিয়্যা ৩. পীরের নামে ওরশ উপলক্ষ্যে মান্নত করা; এসব বৈধ কি না? মুফতী সাহেব কুরআন, হাদীস, মুজতাহিদ ইমামগণের বক্তব্য, ফিক্হর কিতাবের উদ্বৃতির মাধ্যমে উপরোক্ত তিনটি বিষয়কে অবৈধ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। সিজদা তাহিয়্যা প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্যের সার কথা হলো- সিজদা তিন প্রকার: ১. সিজদা-ই ইবাদত, ২. সিজদা-ই তা’যীম, ৩. সিজদা-ই তাহিয়্যাহ। সিজদা-ই ইবাদত আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়। সিজদা-ই তা’যীমী তা’যীমের উদ্দেশ্যে হয়। আর সিজদা-ই তাহিয়্যাহ সালাম কালাম বিনিময়ের ন্যায় হয়। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে সিজদা-ই ইবাদত বৈধ নয়, সর্বসম্মত ভাবে শির্ক ও কুফ্র ।

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে অপর দুই প্রকার সিজদাও হারাম এবং কবীরা গুনাহ। তিনি আরো বলেন, গায়রুল্লাহকে সিজদা করা, কবরে হোক বা অন্যত্র, তা হারাম। ইবাদত হিসেবে গায়রুল্লাহকে সিজদা করা শির্ক। তাঁর বক্তব্যের স্বপক্ষে তিনি ফাতাওয়া হাম্মাদিয়ার উদ্বৃতি পেশ করেছেন যে, 'অধিকাংশ সময় অজ্ঞ, মূর্খ মানুষ পীর-মাশায়েখের সামনে সিজদা করে। তা সর্বাবস্থায় সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। রাজা বাদশাদের সামনে মাটিতে চুমু দেয়া, সিজদা করা, তাহিয়্যাহ স্বরূপ হলে কুফর নয় তবে হারাম ও কবীরা গুনাহ'। মুফতী সাহেব তাফসীরে দুররে মানসুর, শারহুল মানাসী, রদ্দুল মুহতার এবং তাতারখানিয়া ইত্যাদি গ্রন্থের উদ্বৃতির মাধ্যমে নিজের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন। হযরত আদম আ. ও হযরত ইউসুফ আ. কে সিজদা করার ঘটনার দ্বারা যারা সিজদা-ই তাহিয়্যাহ বৈধ বলার চেষ্টা করেছেন তাদের উত্তরে তিনি বলেন, ঐ দুটো ঘটনা দ্বারা সিজদা-ই তাহিয়্যাকে বৈধ বলার কোন সুযোগ নেই। যদি ধরে নেওয়া হয় ঐ গুলো সিজদা-ই তাহিয়্যাহ ছিল তবে এ উম্মতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হল সিজদা-ই তাহিয়্যা পূর্বেকার শরীআতে বৈধ ছিল বটে কিন্তু বর্তমান শরীআতে বৈধ নয়, বরং কুরআন-হাদীস পূর্বেকার বিধানসমূহকে রহিত করেছে।[১] আজকাল একদল তাসাউফপন্থী যারা গান, বাজনা, নাচ ইত্যাদিকে তাসাউফের অংশ বলে দাবী করছেন; শরীআতের দৃষ্টিতে এগুলো সম্পূর্ণ হারাম। ইসলামের প্রাথমিক তিন যুগে (সাহাবা, তাবিঈন, তাবে' তাবিঈন) এসবের অস্তিত্ব ছিল না। জাওহারা গ্রন্থে এসেছে আজকাল এক শ্রেণীর সূফী যারা গান-বাজনা করে; এগুলো হারাম। প্রকৃত সূফীগণ কখনো এগুলো করেন না। তাফসীরে কুরতুবীতে এসেছে- গান,বাজনা, নাচ, হারাম হওয়ার বিষয়ে ইমামগণের ইজমা সংঘটিত হয়েছে। শায়খুল ইসলাম কারমানীর মতে এগুলোকে যারা হালাল মনে করে তারা কাফির।[২] ছামা প্রসঙ্গে মুফতী সাহেবের বক্তব্যের সারকথা হলো- ছামা দ্বারা যদি কুরআন, ও ওয়াজ শ্রবণ করা উদ্দেশ্য হয় তবে বৈধ। যদি গান বাজনা উদ্দেশ্য হয় তাহলে বৈধ নয়, বরং হারাম। বিষয়টি ইজমা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। জুনাঈদ বাগদাদী র. ছামা না করার বিষয়ে তাওবা করেছিলেন। ছামার ন্যায় রক্স ও সুরূদ হারাম। হায়াতুল হায়ওয়ান গ্রন্থে এসেছে রক্স ও সুরূদ ইয়াহুদী জাতির বাছুর পূজারই অংশ। পৃথিবীতে এটা সর্ব প্রথম আবিস্কার করেছিল সামেরী।[২] পীরের নামে নযর, মান্নত করা হারাম। পীর জীবিত থাকুক বা মৃত। পীরের কবরে টাকা পয়সা প্রদান করা, তেল বাতি, ধূপ ইত্যাদি জ্বালানো সর্বসম্মতভাবে বাতিল ও হারাম।[৩]

১. আব্দুল বাকী, মুহাম্মদ. ড., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১; ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মদ, মুফতী, আল ফায়সালাতুল জালিয়্যাতু লি আহকামিস সিমা' ওয়া সিজদাতিত তাহিয়্যাতি, চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, তা. বি. পৃ. ৩-৪, ৭-৮।
২-৩ ঐ, পৃ. ১৬১-১৬২, ১৯-২০, ২৭।

২.আল- কালামুল ফাসিলু বায়না আহলিল হাক্কি ওয়াল বাতিলি
الكلام الفاصل بين اهل الحق والباطل

মুফতী ফয়যুল্লাহ ছাত্র জীবনে ফার্সী কাব্যে বিভিন্ন বিদআত প্রতিরোধকল্পে এ পুস্তিকা রচনা করেছেন। বিশেষ করে ধর্মের নামে, পুণ্যের নামে মাজারে, কবরে, যেসব শরীআত বিরোধী কার্যক্রম হয়; নারী-পুরুষের অবাধ যাতায়াত, নর্তন, কূর্দন, এগুলোর বিরুদ্ধে একটি বলিষ্ট কাব্যিক রচনা। নামধারী পীর যারা শরীআতকে ধ্বংসের চক্রান্তে লিপ্ত তাদের অবস্থা, আহলে হক ও আহলে বাতিলের পরিচয় তিনি তুলে ধরেছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, দীনের সাথে এদের এবং এদের কার্যক্রমের কোন সম্পর্ক নেই; বরং এগুলো সম্পূর্ণ শরীআত পরিপন্থী কাজ, এ পুস্তিকা মনজুমাতে খাকীর অন্তর্গত। এটি প্রকাশ করেছে কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী চট্টগ্রাম। প্রকাশকাল অজ্ঞাত। এ পুস্তিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯ এবং কবিতার লাইনের সংখ্যা ১৬০।[১]

৩. আর রিসালাতুল মুখতাসারাতু ফি রদ্দি আলাল ফিরকাতিল ন্যাছারিয়্যাহ
الرسالة المختصرة في الرد علي الفرقة النيچرية

এটি মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ র. ছাত্র জীবনে রচিত ফার্সী কাব্য। এটি প্রকাশ করেছে কুতুবখানা ফয়যিয়া। প্রকাশকাল অজ্ঞাত। এ মসনবী কাব্যটি প্রথম প্রকাশ করেছিল আনজুমানে ইশায়াতে ইসলাম।

এ পুস্তিকায় মুফতী সাহেব ফিরকা-ই নেছারিয়া বা প্রকৃতি পূজারীদের বিশ্বাস, আচরণ, কর্মকাণ্ডকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। যারা নিজেদের মেধা, যোগ্যতাকে যথেষ্ট মনে করে, পশ্চিমা সংস্কৃতিকে ভাল মন্দ বিচারের মাপকাঠি মনে করে তাদের প্রতিবাদ করেছেন। যারা স্রষ্টা আছে বলে মনে করে না। দুনিয়া প্রকৃতি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বলে বিশ্বাস করে। ওরা ইসলামী বিধিবিধানকে কটাক্ষ করে এবং মুজতাহিদ ইমামগণসহ আলিমদের মতামতকে ভুল আখ্যায়িত করে। ইংরেজ শাসনামলে এ ফিরকার উৎপাত ছিল লক্ষ্যনীয়। বর্তমানে এর উৎপাত ততটা চোখে পড়ে না। [২]

৪. হিফযুল ঈমান আন মাকায়িদে দাজ্জাল কাদিয়ানী

حفظ الايمان عن مكائد دجال قادياني

মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ র. ছাত্র জীবনে রচিত এ কাব্য পুস্তিকার ভাষা ফার্সী। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮। পুস্তিকাটি মুনজুমাতে খাকীর অন্তর্ভূক্ত। পুস্তিকাটি প্রকাশ করেছে কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী চট্টগ্রাম। প্রকাশকাল অজ্ঞাত। পুস্তিকাটি কাদিয়ানী দাজ্জালদের প্রতিরোধে লিখা। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা. এর খতমে নবুওয়্যতের বিষয়টিকে মির্জা গোলাম আহম্মদ কাদিয়ানী অস্বীকার করে ছিল। নানা প্রোপাগান্ডা, তথ্য বিভ্রাট, ভ্রান্ত বাখ্যার মাধ্যমে মহানবীর নবুয়্যতকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চেয়েছিল; এসবের বিরুদ্ধে এ কাব্য পুস্তিকা রচিত হয়েছে। মুসলিম বিশ্বে বিশেষ করে ভারতবর্ষে মুসলমানদের ঈমান-আকীদা ধ্বংসের চক্রান্ত নস্যাৎ করতে এবং মির্জা গোলাম কাদিয়ানী ভ্রান্ত মতবাদ সম্বন্ধে সতর্ক করতে ভারতবর্ষের প্রায় সব আলিম কলম ধরেছেন, বক্তৃতা, বিবৃতি দিয়েছেন; সাম্রাজ্যবাদীদের সৃষ্ট এ ফেতনা সম্বন্ধে মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় মুফতী সাহেব ছাত্র জীবনে এ মসনবী গ্রন্থ রচনা করেন। মির্জা গোলাম ঈসা আ. সম্বন্ধে যেসব অশোভন উক্তি করেছে, গালমন্দ দিয়েছে, এর ফলে তাকে আর মুসলমান বলা যায় না। ঈসা আ. সম্বন্ধেও সে বিভ্রান্তিকর তথ্য অপপ্রচার করেছে। এ কাব্য গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি মুসলিম বিশ্বকে আহ্বান জানিয়েছেন এ ফেতনাকে মোকাবেলা করার জন্য। ওদের ফেতনা মোকাবেলা করার দায়িত্বকে তিনি ফরয আখ্যায়িত করেছেন। তিনি কাদিয়ানীদেরকে কাফির, মুরতাদ, ইসলাম বহির্ভূত সম্প্রদায় বলে আখ্যায়িত করেছেন। মির্জা গোলামের বইগুলো পাঠ করলে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। [৩]

১. ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মদ, মুফতী, *আল কালামুল ফাসিলু বায়না আহলিল হাক্কি ওয়াল বাতিলি* , চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, তা. বি. পৃ. ১২-২০।

২. ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মদ, মুফতী, *আর রিসালাতু আল মুখতাসারাতু আলাল ফিরকাতিল ন্যাছারিয়্যাহ*, চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, তা. বি. পৃ. ১-৯; আব্দুল বাকী, মুহাম্মদ, ড., প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০।

৩. ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মদ, মুফতী, *হিফযুল ঈমান আন মাকায়িদে দাজ্জাল কাদিয়ানী*, চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, তা. বি. পৃ. ২১-২৮।

৫. আল ইরশাদুল উম্মাতি ইলাত তাফাররূকাতি বায়নাল বিদআতি ওয়াস সুন্নাতি

الارشاد الامة الي التفرقة بين البدعة والسنة

এ পুস্তিকাটি মনজুমাতে খাকী রাসাইলের অন্তর্ভূক্ত। মুফতী সাহেব এ পুস্তিকা ফার্সী কাব্যে ছাত্র জীবনে রচনা করেছেন। পুস্তিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০। প্রকাশ করেছে কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী চট্টগ্রাম। প্রকাশকাল অজ্ঞাত। এর ছন্দ সংখ্যা ১৬৩ টি। এ পুস্তিকার বাংলা সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্গানুবাদ করেছেন মুফতী মুহাম্মদ ইউসুফ ইসলামাবাদী। প্রকাশ করেছে কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী চট্টগ্রাম। প্রকাশকাল অজ্ঞাত। মুফতী সাহেব এ গ্রন্থে সুন্নত ও বিদআতের পরিচয়, সুন্নত ও বিদআতের মধ্যকার পার্থক্য আলোচনা করেছেন। বিদআতের প্রতি মানুষের মনে ঘৃণা এবং সুন্নতের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাইলে সুন্নতের উপর স্থায়ী ভাবে আমল করার আহ্বান জানিয়েছেন। পূর্ব পুরুষদের রুসুম রেওয়াজের অনুসরণ করাকে সরাসরি গুমরাহী ও অন্ধকার আখ্যায়িত করেছেন। সুন্নতের অনুসরণ করা পয়গাম্বরগণের বৈশিষ্ট্য। যিনি একটি সুন্নতের অনুসরণ করবেন। তিনি একশ' শহীদের নেকী অর্জন করবেন। [১] যিনি মনে প্রাণে নবীর সুন্নতকে ভালবাসবেন, তিনি নবী আকরাম সা. এর সাথে জান্নাতে অবস্থান করবেন। [২] এ কাব্যের মাধ্যমে তিনি বিদ'আতের প্রতি ঘৃণা জন্মানোর চেষ্টা

করেছেন। বান্দা ও প্রভুর মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে বিদআত। ফাতিহা, ওরশ, মীলাদ, এগুলো বিদআত এবং শরীআত অসমর্থিত কাজ।[৩]

৬. ওয়াহাবী কারা?

وهابي كون هے

মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ র. রচিত ওয়াহাবী কারা? এ পুস্তিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০। এর রচনাকাল অজ্ঞাত। এ পুস্তিকার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্গানুবাদ করেছেন মুফতী মুহাম্মদ ইউসুফ ইসলামাবাদী। বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেছে কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী চট্টগ্রাম। প্রকাশকাল ২০০৪ খৃ.। প্রকাশক মুহাম্মদ জোবাইর ফয়যী। বর্তমানে পুস্তিকা বাংলা রাসাইলে ফয়যিয়া প্রথম খন্ডের অন্তর্ভূক্ত। এ পুস্তিকা হক্কানী উলামা-ই কিরাম এবং দেওবন্দ অনুসারীদেরকে বৃটিশ ও তাদের দোসর বিদআতী সম্প্রদায় যে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাকে তাদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে, সমাজে তাদেরকে হেয়-প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা করে; তারই প্রতিবাদ করা হয়েছে এ পুস্তিকায়। মুফতী সাহেব ঐতিহাসিকভাবে দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন যে, হক্কানী উলামা-ই কিরাম ওয়াহাবী বদনামের উপযুক্ত নন এবং শায়েখ আব্দুল ওয়াহ্হাব নজদী যিনি শির্ক, বিদআতের বিরুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্যসহ সারা বিশ্বে আন্দোলন করে সফল হয়েছেন তিনিও বদনামের উপযুক্ত নন। মুফতী সাহেব এ পুস্তিকার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করেছেন এবং অপপ্রচারকারীদের বিরুদ্ধে সাবধান করেছেন। ওয়াহাবীরা মূলত প্রকৃত দীন, সুন্নতে নববী সা. -এর অনুসারী।[৪]

১. *মেশকাত শরীফ*, নূর মোহাম্মদ আজমী, (অনূ:), প্রাগুক্ত, খ. ১ম, পৃ. ১৮৪, হাদীস নং- ১৬৭।
২. ঐ, পৃ. ১৮৪, হাদীস নং-১৬৬।
৩. ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মদ, মুফতী, *আল ইরশাদুল উম্মাতি ইলা তাফাররূকাতি বায়নাল বিদআতি ওয়া সুন্নাতি*, চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, তা. বি. পৃ. ২,৫,৭।
৪. ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মদ, মুফতী, *ওয়াহাবী কারা?*, চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, ২০০৪, পৃ. ১-১২।

খ. হাদীস বিষয়ক রচনা

হাদীসে নববী সা. এমন একটি যথোপযুক্ত মানদন্ড যার মাধ্যমে প্রত্যেক যুগের সৎকর্মশীল সংস্কারক ও মুহাদ্দিসগণ উম্মতের ঈমান, আক্বীদা-বিশ্বাস, চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গী ও আমলের পরিমাপ করতে পেরেছেন। উম্মতের বিশ্বময় সংঘটিত দীর্ঘ ঐতিহাসিক বিপ্লব ও পরিবর্তন সম্বন্ধেও পরিমাপ করতে পেরেছেন। আখলাক, চরিত্র, ও আমলে ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণতা, ভারসাম্যতা ও সামঞ্জস্য আসবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না কুরআন-হাদীসকে একই সাথে সামনে রাখা হবে। যদি হাদীসে নববীর ভান্ডার না থাকতো যা সংযত, ভারসাম্যপূর্ণ, পূর্ণাঙ্গ, জীবনের সঠিক পথ প্রদর্শন করে; যদি রাসূলুল্লাহর শিক্ষা ও বিধান না থাকতো যা তিনি উম্মতকে দিয়েছেন তাহলে এ উম্মত ইফরাত,তাফরীতের (অতি বাড়াবাড়ি, অতি শিথিলতা), শিকারে পরিণত হত, ভারসাম্য নষ্ট হত। তাইতো আল্লাহ পাক রাসূলুল্লাহ সা. এর আনুগত্যের আহ্বান জানিয়েছেন- بون الله فاتبعوني يحببكم الله و يغفرلكم ذنوبكم 'আপনি বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহর ভালবাসা পেতে চাও, তবে আমার অনুসরণ কর। আল্লাহতাআলা তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দিবেন।'[১] তিনি আরো বলেছেন-

নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর স্বত্তায় রয়েছে উত্তম আদর্শ।[২] প্রতিটি যুগ ও প্রতিটি দেশে এমন মনীষী আবির্ভূত হয়েছেন যারা কুরআন-হাদীসের মাধ্যমে বিদআত, কুসংস্কার, গুমরাহী, বর্বরতার

বিরুদ্ধে সংস্কার, সংশোধনের ঝান্ডা সমুন্নত রেখেছেন। কাফন পরে রণাঙ্গনে অবস্থান করেছেন। প্রকাশ্যে যুদ্ধ করেছেন, দাওয়াত দিয়েছেন খাঁটি দ্বীন ও সঠিক ইসলামের। সুতরাং মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্বের স্বার্থে হাদীসে নববী সা. একটি অকাট্য অবিচ্ছেদ্য ও অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। এর সংরক্ষণ, বিন্যাস, সংকলন, প্রচার-প্রসার ব্যতীত উম্মতের ধর্মীয় ও চারিত্রিক স্থায়ীত্ব এবং ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখা সম্ভব হতো না। হাদীস ও সুন্নতে নববী মুসলিম উম্মাহর সংশোধন, সংস্কার এবং সঠিক ইসলামী চিন্তা ধারার উৎস। সংস্কারকগণ যুগে যুগে হাদীস থেকে বিশুদ্ধ ধর্মীয় জ্ঞান, সঠিক ইসলামী চিন্তাধারা সংগ্রহ করেছেন, দলীল-প্রমাণ পেশ করেছেন। ইসলামের দাওয়াতে এটাই ছিল তাদের সনদ, হাতিয়ার ও ঢাল স্বরূপ। ফেতনা ফাসাদ, বিপর্যয়, বিপদ, দাঙ্গা-হাঙ্গামার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে হাদীস ছিল প্রতিরোধ শক্তি।[৩] সমাজে যখন নিত্য নতুন বিদআত, কুসংস্কার, শরীআত পরিপন্থী রুসুম-রেওয়াজ, আদিপত্য বিস্তার করে, যার ভবিষ্যত বাণী রাসূলুল্লাহ সা. করেছিলেন-

'তোমরা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ববর্তী উম্মতদের পদাংক অনুসরণ করে চলবে'।[৪] তখন সংস্কারের স্লোগান স্তব্ধ এবং জ্ঞানের প্রদীপ নিস্প্রভ হতে থাকে। শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী র. *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা* গ্রন্থে প্রথম পৃষ্ঠাতেই লিখেছেন- তাওহীদ ও ঈমানের নির্ভরযোগ্য মূলধন ও শিরোমনি, ধর্মীয় শাস্ত্রের মূল ভিত্তি হলো ইল্‌ম হাদীস। হাদীসের ভান্ডারই হলো অন্ধকারে আলোর প্রদীপ, রুশদ ও হিদায়াতের মাইলফলক এবং পূর্ণিমার চাঁদের মতো দীপ্তিময়। যিনি হাদীসের উপর আমল করবেন, সংরক্ষণ করবেন তিনি হিদায়াত প্রাপ্ত এবং অফুরন্ত কল্যাণের অধিকারী। আর যারা হাদীস থেকে বিমূখ ও ঔদ্বত্য প্রদর্শন করে তারা পথভ্রষ্ট ও ধ্বংস। কেননা রাসূলুল্লাহ সা. এর জীবন আদেশ- নিষেধ, ভীতি প্রদর্শন, সুসংবাদ প্রদান, ওয়ায- নসীহত ও উপদেশে পরিপূর্ণ। তাঁর হাদীসসমূহে এসব বিষয়ের বর্ণনা কুরআনের মতোই কিংবা তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে রয়েছে। [৫] মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ এ উৎসমূলকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। তাঁর সময়ে চট্টগ্রামসহ সারাদেশে এমনকি পুরো ভারতবর্ষে সুন্নতে নববীর সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, প্রকাশ্যে দেখা যাচ্ছিল বিদআতীদের দৌরাত্ম, অপকর্ম, ইবাদত ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের নতুন নতুন রূপরেখা ও পথ-পন্থা আবিস্কার করে নিয়েছিল;

১. আল কুরআন, ৩ : ৩১।
২. আল কুরআন, ৩৩: ২১।
৩-৫. *সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস*, আব্দুল হালীম হুসাইনী, শাহ, (অনূ:) প্রাগুক্ত, খ. ৫ম, পৃ. ১২০-১২১, ১৩০।

তখন তিনি বিদআত, কূসংস্কারের বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য দলীল প্রমাণ ও উৎস হিসেবে রাসূলের সুন্নত ও হাদীসসমূহকে সামনে নিয়ে আসেন। এর মাধ্যমে জীবনের কর্মপদ্ধতি উম্মতের সামনে পেশ করেন। তিনি হাদীস বিষয়ক যেসব রচনা জাতিকে উপহার দিয়েছেন তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ হলো- ফয়যুল কালাম লি সাইয়্যিদিল আনাম فيض الكلام لسيد الانام গ্রন্থটি হাদীসের একটি সংক্ষিপ্ত সংকলন। উলামা-ই কিরাম এ হাদীসগুলোর উপর আমল করে থাকেন। গ্রন্থে সংকলিত হাদীসসমূহ শব্দে খুব সংক্ষিপ্ত অর্থে ব্যাপক। গ্রন্থটি সর্বদা কাছে রাখা এবং মুখস্থ করার খুবই উপযোগী। বিশেষ করে যারা ওয়াইজ বা বক্তা তাদের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় বলে লেখক নিজেই উল্লেখ করেছেন।[১]

১. ফয়যুল কালাম লি সাইয়্যিদিল আনাম فيض الكلام لسيد الانام

এটি মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ র. রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । হাদীস বিষয়ক রচনা। এ গ্রন্থে সিহাস সিত্তাহ, মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ইমাম মালিকের মুয়াত্তা, বায়হাকী, দারামী, ইত্যাদি হাদীসগ্রন্থ থেকে নয়শত চৌদ্দটি হাদীস সংকলন করেছেন। ফাতহুল মুরাম ফী হাল্লি ফয়যিল কালাম নামে এর উর্দূ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা রচনা করেছেন মুফতী ইজহারুল ইসলাম চৌধুরী । এর বঙ্গানুবাদ করেছেন মূসা বিন ইযহার। গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৪৪। প্রকাশ করেছে কুতুবখানা ফয়যিয়া। হাটহাজারী চট্টগ্রাম। ১৩৬৮ হি. জিলহজ্ব মাসের প্রথম শুক্রবার কিতাবটির রচনা সমাপ্ত হয়েছিল বলে লেখক উল্লেখ করেছেন। এর উর্দূ অনুবাদ ও

ব্যাখ্যা রচনা হয়েছে ১৩৯৪ হি. ২৮ রমযান আসরের সময়। গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশ হয়েছিল ১৩৯৯ হি. রজব মাসে। প্রকাশ করেছিলেন কাসেম ফয়যী। এর বাংলা সংস্করণ প্রকাশ করেছে মাওলানা জুবাইর হুসাইন ফয়যী। প্রকাশকাল ২০০৫ খৃ. অক্টোবর। মুফতী সাহেব গ্রন্থের শুরুতে ছোট্ট একটি ভূমিকা রচনা করে আল্লাহ পাকের প্রশংসা এবং রাসূল সা. এর উপর দরূদ ও সালাম পাঠের পর গ্রন্থ পরিচিতি এভাবে তুলে ধরেছেন-

اما بعد فهذه رسالة عجيبة و درة فريدة غريبة مشتملة علي انواع كثيرة من احاديث خير الانام و
يهٔ علي جمل مفيدة من كلمات سيد الانبياء الكرام و اقتبستها من كتب الاحا يث التي صنفها
العلماء العظام من المحدثين الفخام المعروفين بين الخواص والعوام تربتها بترتيب حسن معجب
وذكرت بعد كل حديث منها مأخذه من تلك الكتب فجاءت بحمد الله تعالي بحيث تسر الناظرين و
تروق قلوب الطالبين تفيد كل احد من الطلبة والعلماء العملين سيما تشتد اليها حاجة المذكرين
والواعظين سميتها بفيض الكلام لسيد الانام عليه الصلوة والسلام

এটি রাসূলুল্লাহ সা.- এর গুরুত্বপূর্ণ বাণী সমৃদ্ধ এবং বিভিন্ন বিষয় সম্বলিত এক দূর্লভ মতি ও মনোমুগ্ধকর কিতাব । এ কিতাবে বর্ণিত হাদীসমূহ সর্বমহলে ব্যাপক পরিচিত, বড় বড় আলিমে দীন ও মুহাদ্দিসগণের রচিত বিখ্যাত হাদীসগ্রন্থসমূহ হতে চয়ন করেছি। গ্রন্থটিকে আমি সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে বিন্যাস করেছি। প্রতিটি হাদীসের শেষে এর সূত্র উল্লেখ করেছি। আল্লাহ তাআলার প্রশংসা যে কিতাবটি পাঠক সমাজে বিপুল সমাদৃত হয়েছে এবং ছাত্র সমাজের হৃদয় আকৃষ্ট করেছে। সকল ছাত্র এবং আমলদার আলিমগণের জন্য গ্রন্থটি খুবই উপকারী। বিশেষ করে উপদেশ দাতা ওয়াইজগণের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। এর নাম রেখেছি ফয়যুল কালাম লি সাইয়্যিদিল আনাম।[২]

তাঁর এ ভূমিকার দ্বারা বুঝা যায়, নিম্ন লিখিত উদ্দেশ্যে তিনি গ্রন্থটি রচনা করেছেন; ১. রাসূলুল্লাহ সা.- এর গুরুত্বপূর্ণ কিছু হাদীসের উপর যেন সবাই আমল করতে পারে; সে উদ্দেশ্যে এ সংকলন। ২. তালিবে ইলমগণ উপকৃত হতে পারবেন। ৩. সমাজের দীনদার, দায়িত্বশীল মানুষগণ-যারা মানুষের মধ্যে ওয়ায-নসীহত করে থাকেন, তাঁরা এ গ্রন্থে সংকলিত হাদীসসমূহের অর্থ ও মর্ম মানুষের সামনে তুলে ধরে হিদায়াতের পথে আনতে পারবেন। ৪. গ্রন্থটি সংক্ষিপ্ত ও ছোট আকারে সংকলন করেছে যাতে সকলেই আয়ত্ব করতে পারেন এবং সর্বদা সঙ্গে রাখতে পারেন। ৫. এ গ্রন্থ রচনা দ্বারা তিনি পরকালীন মুক্তি

১-২. *ফয়যুল কালাম*, পৃ. ১-২।

আশা করেছেন। আল্লাহ তাআলা যেন তাঁর গ্রন্থটি কবূল করেন সে আশা ব্যক্ত করেছেন এবং পাঠকদের নিকটও দু'আর আকুতি জানিয়েছেন।

ফয়যুল কালাম গ্রন্থটি পাঠক সমাজে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। বর্তমান সময় হতে প্রায় ৬০ বছর পূর্বে গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। যুগ যুগ ধরে এর মাধ্যমে ধর্মপ্রাণ মুসলমান, আলিম ও ওয়াইজগণ উপকৃত হয়ে আসছেন। একসময় এ গ্রন্থটি ভারতবর্ষে মাদ্রাসাসমূহে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত ছিল। গ্রন্থটিকে তিনি একটি ভূমিকা ও তিনটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছেন- প্রথম অধ্যায় ঈমান প্রসঙ্গে , দ্বিতীয় অধ্যায় ইল্ম প্রসঙ্গে, তৃতীয় অধ্যায় পবিত্রতা প্রসঙ্গে।

প্রথম অধ্যায় : ঈমান প্রসঙ্গ كتاب الايمان - এ অধ্যায়ের অধীন পরিচ্ছেদ সমূহ-

১ম পরিচ্ছেদ :	ঈমান, ইসলাম, ইহসানের পরিচয়	الايمان والاسلام والاحسان
২য় পরিচ্ছেদ :	ঈমানের নিদর্শনাবলী	اثار الايمان
৩য় পরিচ্ছেদ :	তকদীরে বিশ্বাস	الايمان بالقدر
৪র্থ পরিচ্ছেদ :	তকদীর বিষয়ে অতিরিক্ত চিন্তা গবেষণা করার নিষেধাজ্ঞা	التشديد في الخو
৫ম পরিচ্ছেদ :	কাদরিয়া ও মুরজিয়া সম্প্রদায় সম্বন্ধে সতর্কতা	وعيد القدرية والمرجية
৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ :	মু'মিন মারা গেলে আসমান জমীন	اذا مات المؤمن يبكي عليه السماء

	তাতে হাত ওঠানো চরম বিদ'আত	تخصيص الذكر بمحل لم يريد به
৩৬তম পরিচ্ছেদ :	যেখানে যে দুআ পড়ার শরঈ প্রমাণ নেই সেখানে উক্ত দুআ পাঠ করা বিদআতে সাইয়্যিাহ	
৩৭তম পরিচ্ছেদ :	উচ্চস্বরে যিক্‌র করা অপছন্দনীয়-	كراهة الذكر بالجهر المفرط
৩৮তম পরিচ্ছেদ :	রাসূলের জন্য দাঁড়ানো অসন্তুষ্টিমূলক-	كراهة القيام له صلي الله غليه وسلم
৩৯তম পরিচ্ছেদ :	বিদআত, প্রবৃত্তির দাসত্ব প্রকাশ পাবে এবং মানুষের অবস্থার পরিবর্ত হবে	ظهور البدع و الاهواء و تغير
৪০তম পরিচ্ছেদ :	অন্তরসমূহে বিভিন্ন ফেতনা অনুপ্রবেশ করবে	
৪১তম পরিচ্ছেদ :	শেষ যুগে আমলের ফযীলত-	وعيد اهل البدع والشرور و
৪২তম পরিচ্ছেদ :	বিদআতী, অসৎ, ফাসিক, পাপী, জালিমের প্রতি হুশিয়ারী।	
৪৩তম পরিচ্ছেদ :	বিভিন্ন পাপের কারণে বালা-মসীবত ও ফেতনায় আপতিত হওয়া	تظهر انواع البلايا والفتن وفساد العالم بشيوع المعاصي
৪৪তম পরিচ্ছেদ :	খেলার সরঞ্জামাদি, বাদ্যযন্ত্র ও গান শোনার নিষেধাজ্ঞা	النهي عن المعازف والمزامير و
৪৫তম পরিচ্ছেদ :	যে বিষয়ের মধ্যে মানুষের উন্নতি ও অবনতি	ما فيه الترقي للناس والتنزل لهم
৪৬তম পরিচ্ছেদ :	সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা	الامر بالمعروف والنهي عن
৪৭ তম পরিচ্ছেদ:	নিশ্চয়ই এ কল্যাণসমূহ বিভিন্ন প্রকার খাযানা স্বরূপ[১]	ان هذا الخير خزاءن

১. *ফয়যুল কালাম,* পৃ. ১-১৪৩।

দ্বিতীয় অধ্যায় : ইল্‌ম

১ম পরিচ্ছেদ :	ইলম কি?	العلم ما هو
২য় পরিচ্ছেদ :	তালিবে ইলম এর সাথে ভাল আচরণ করা	الاستيصاء بمن يطلب العلم
৩য় পরিচ্ছেদ :	ইল্‌ম অন্বেষণ অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীর ফযীলত	
৪র্থ পরিচ্ছেদ :	ইল্‌ম এর প্রচার	تبليغ العلم
৫ম পরিচ্ছেদ :	ইল্‌ম শিক্ষা দেয়া ও প্রচারের ফযীলত	فضل تعليم العلم و نشر
৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ :	প্রকৃত আলিম	العالم الحقيقي
৭ম পরিচ্ছেদ :	উম্মতের সংস্কারক	
৮ম পরিচ্ছেদ :	ইল্‌ম গোপন করা	
৯ম পরিচ্ছেদ :	ইল্‌ম ওঠে যাওয়া	
১০ম পরিচ্ছেদ :	অসৎ উদ্দেশ্যে ইল্‌ম শিক্ষা করার পরিণতি	وعيد من طلب العلم بفساد النية
১১শ পরিচ্ছেদ :	রাসূলের নামে মিথ্যা হাদীস রচনা করা	
১২শ পরিচ্ছেদ :	আলিমগণের শাসকদের নিকট যাওয়া	اتيان العلماء الامراء
১৩শ পরিচ্ছেদ :	যে আলিম নিজে ইল্‌ম দ্বারা উপকৃত হয় না	العالم الذي لا ينتفع بعلمه

৪৫তম পরিচ্ছেদ :	রাসূলুল্লাহ সা.-এর বিছানা	فراشه صلي الله عليه وسلم
৪৬তম পরিচ্ছেদ :	রাসূলুল্লাহ সা.-এর রোদন করা	اء رسول الله صلي الله عليه وسلم
৪৭তম পরিচ্ছেদ :	রাসূলুল্লাহ সা.-এর নামায	صلوة رسول الله صلي الله عليه
৪৮তম পরিচ্ছেদ :	রাসূলুল্লাহ সা.-এর রোযা	صيامه صلي الله عليه وسلم
৪৯তম পরিচ্ছেদ :	রাসূলুল্লাহ সা.-এর মহিলাদের নিকট হতে বায়'আত গ্রহণ করা[১]	اخذه البيع

তৃতীয় অধ্যায় : পবিত্রতা

১ম পরিচ্ছেদ :	প্রস্রাব-পায়খানার আদব	
২য় পরিচ্ছেদ :	যেসব স্থানে প্রস্রাব-পায়খানা করা নিষিদ্ধ	المواضع التي ينهي فيها التخلي
৩য় পরিচ্ছেদ :	মিসওয়াকের ফযীলত	
৪র্থ পরিচ্ছেদ :	প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য	
৫ম পরিচ্ছেদ :	অযূর ফযীলত	
৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ :	নামাযের ফযীলতসমূহ	
৭ম পরিচ্ছেদ :	নামাযে এদিক সেদিক তাকানো	
৮ম পরিচ্ছেদ :	সিজদার ফযীলত	
৯ম পরিচ্ছেদ :	ঘুমের কারণে রাতের আমল ছুটে গেলে দিনে আদায় করার ফযীলত	فضل من نام عن حزبه بالليل فقرأه في النهار
১০ম পরিচ্ছেদ :	আযান দিয়ে নামায আদায়কারী রাখালের মর্যাদা	فضل راعي غنم يوذن ويصلي
১১শ পরিচ্ছেদ :	আপতকালীন নামায	
১২শ পরিচ্ছেদ :	নামাযের মাধ্যমে ঘরে বরকত আসে	بيت بالصلوة فيه
১৩শ পরিচ্ছেদ :	আযানের ফযীলত	
১৪শ পরিচ্ছেদ :	মসজিদের ফযীলত	
১৫শ পরিচ্ছেদ :	মসজিদ নির্মাণের ফযীলত	فضل تعمير المساجد
১৬শ পরিচ্ছেদ :	মহল্লায় মহল্লায় মসজিদ নির্মাণ করা	
১৭শ পরিচ্ছেদ :	হুরমতে মসজিদ	
১৮শ পরিচ্ছেদ :	হাসরের ময়দানে যারা আল্লাহর আরশের নিচে ছায়াপ্রাপ্ত হবেন	حديث من يظلهم
১৯শ পরিচ্ছেদ :	জামা'আতের ফযীলত	
২০তম পরিচ্ছেদ :	জামা'আত তরকের হুসিয়ারী	الوعيد علي ترك الجماعة
২১তম পরিচ্ছেদ :	কাতার সোজা করা	تسوية الـ
২২তম পরিচ্ছেদ :	প্রসঙ্গ ইমামত	
২৩তম পরিচ্ছেদ :	ফযর নামায জামাআতের সাথে আদায়ের পর নফল নামায আদায় ও যিক্‌র করা	يذكر الله
২৪তম পরিচ্ছেদ :	মাগরিবের পর নফল আদায় করা	

২৫তম পরিচ্ছেদ :	কিয়ামুল লায়লের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ	التحريض علي قيام اليال
২৬তম পরিচ্ছেদ :	জুমুআর দিনের ফযীলত	فضل يوم الجمعة
২৭তম পরিচ্ছেদ :	জুমুআর নামায তরক করার পরিণতি	الوعيد علي ترك الجمعة
২৮তম পরিচ্ছেদ :	পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা	التنظيف و التبكير
২৯তম পরিচ্ছেদ :	রোযার ফযীলত	فضيلة الصوم
৩০তম পরিচ্ছেদ :	সাহরী	
৩১তম পরিচ্ছেদ :	জলদি জলদি ইফতার করা	تعجيل الفطر
৩২তম পরিচ্ছেদ :	ইফতারের সময় যা বলবে	ما يقول عند الفطر
৩৩তম পরিচ্ছেদ :	রোযার পবিত্রতা	تنزيه الصوم
৩৪তম পরিচ্ছেদ :	নফল রোযা	صيام التطوع
৩৫তম পরিচ্ছেদ :	লাইলাতুল কদর	ليلة القدر
৩৬তম পরিচ্ছেদ :	কুরবানীর ফযীলত	فضل الاضحية
৩৭তম পরিচ্ছেদ :	হজ্বের ফযীলত	فضيلة الحج
৩৮তম পরিচ্ছেদ :	যাকাত আদায় না করার পরিণতি	الوعيد علي ترك الزكوة
৩৯তম পরিচ্ছেদ :	সদকাতুল ফিতর	
৪০তম পরিচ্ছেদ :	সদকার ফযীলত	
৪১তম পরিচ্ছেদ :	বিভিন্ন নেক আমল	
৪২তম পরিচ্ছেদ :	মৃত্যুর পূর্বে দান করতে উৎসাহ প্রদান	الترغيب الي الصدقة قبله الموت
৪৩তম পরিচ্ছেদ :	আত্মীয় স্বজনের জন্য ব্যয় করার ফযীলত	فضل الصدقة علي الاهل
৪৪তম পরিচ্ছেদ :	ভিক্ষাবৃত্তির নিন্দা	
৪৫তম পরিচ্ছেদ :	রোগীর সেবা করা	عيادة المريض
৪৬তম পরিচ্ছেদ :	অসুস্থতার প্রতিদান	
৪৭তম পরিচ্ছেদ :	মৃত্যু কামনা করার নিষেধাজ্ঞা	النهي عن تمني الموت
৪৮তম পরিচ্ছেদ :	প্রিয়জনের মৃত্যুতে ব্যাথা সহ্য করার ফযীলত	فضيلة الاحتساب في موت الحبيب
৪৯ তম পরিচ্ছেদ :	বিলাপ করার নিন্দা	مذمة النياحة
৫০তম পরিচ্ছেদ :	মৃতের জন্য যতটুকু কাঁদা ও দু:খ করা বৈধ	ما يجوز من البكاء والحزن علي المية
৫১তম পরিচ্ছেদ :	শান্তনা দানের ফযীলত	فضيلة التعزية
৫২তম পরিচ্ছেদ :	মাইয়্যেতকে গোসল দেয়া ও দাফন কাফনের ফযীলত	فضيلة غسل الموتي وتكفينهم
৫৩তম পরিচ্ছেদ :	সন্তানের মৃত্যুতে সওয়াবের আশা করার ফযীলত	فضيلة الاحتساب في موت الولد
৫৪তম পরিচ্ছেদ :	কবর যিয়ারত করা	زيارة القبور
৫৫তম পরিচ্ছেদ :	কবরসমূহ মসজিদে পরিণত করা, প্রদীপ জ্বালানো ও অন্যান্য শরী'আত বিরোধী কর্মসমূহ	النهي عن اتخاذ الـ القبور و اتخاذ السرج عليها و غير ذلك من المنهيات
৫৬তম পরিচ্ছেদ :	দাফনের পর কবরস্থানে যতক্ষণ অবস্থান করা মোস্তাহাব	قدر ما يستحب القيام بعد الدفن

৫৭তম পরিচ্ছেদ :	বিয়ের ফযীলত এবং কোন নিয়তে বিয়ে করবে	فضل النكاح و باية نية يتزوج
৫৮তম পরিচ্ছেদ :	কোন ধরণের নারীকে বিয়ে করবে	باي نوع من النساء ينكح
৫৯তম পরিচ্ছেদ :	নেককার নারীর পরিচয়	
৬০তম পরিচ্ছেদ :	কোন বিয়েতে বরকত নিহিত	
৬১তম পরিচ্ছেদ :	নারীদের ফেতনা বিষয়ে সতর্ক করা	التحذير من فتنة النساء
৬২তম পরিচ্ছেদ :	মহিলাদের নিকট গমনের নিষেধাজ্ঞা, নারীদের পুরুষের সাথে পর্দা করা এবং অপরিচিত মহিলা থেকে দৃষ্টি হেফাজত করা	النهي عن الدخول علي النساء واحتجابهن عن الرجال وغض البصر عن الاجنبية
৬৩তম পরিচ্ছেদ :	উরু ছতরের অন্তর্ভূক্ত	
৬৪তম পরিচ্ছেদ :	বিনা প্রয়োজনে উলঙ্গ হওয়ার নিষেধাজ্ঞা	النهي عن التعري بغير حاجة
৬৫তম পরিচ্ছেদ :	যেসব শর্ত পূরণ হওয়া বেশি দরকার	
৬৬তম পরিচ্ছেদ :	কোন নারী তার বোনের তালাক চাবে না।	لا تسأل المرأة طلاق اختها
৬৭তম পরিচ্ছেদ :	শাওয়াল মাসে বিয়ে করা	
৬৮তম পরিচ্ছেদ :	একজনের বিয়ের প্রস্তাবের উপর অপরজনের প্রস্তাবে নিষেধাজ্ঞা	النهي عن الخطبة علي خطبة الغير
৬৯তম পরিচ্ছেদ :	স্ত্রীর গোপন বিষয় প্রকাশের নিষেধাজ্ঞা	النهي عن نشر سر الزوج
৭০তম পরিচ্ছেদ :	অতিরিক্ত মোহর ধার্য্য করা	المغالات في المهر
৭১তম পরিচ্ছেদ :	ওলীমা	الوليمة
৭২তম পরিচ্ছেদ :	আগন্তুকের জন্য মেহমানদারী করা	الضيافة لمن قدم
৭৩তম পরিচ্ছেদ :	ওলীমার দাওয়াত গ্রহণ করা	اجابة دعوة الوليمة
৭৪তম পরিচ্ছেদ :	লোক দেখানো দাওয়াত কবূলের নিষেধাজ্ঞা	النهي عن اجابة دعوة الرياء
৭৫তম পরিচ্ছেদ :	স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণ করা	
৭৬তম পরিচ্ছেদ :	স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা	القسمة بين النساء
৭৭তম পরিচ্ছেদ :	স্বামী- স্ত্রীর অধিকারসমূহ	حقوق الزوجين
৭৮তম পরিচ্ছেদ :	স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর অবাধ্যতার তিরষ্কার	الوعيد علي عصيان الزوجة
৭৯তম পরিচ্ছেদ :	স্ত্রীকে প্রহার করা	
৮০তম পরিচ্ছেদ :	স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টির সাবধানতা	الوعيد علي الافساد بين الزوجين
৮১তম পরিচ্ছেদ :	স্ত্রীর তালাক চাওয়ার ভয়াবহ পরিণতি	الوعيد علي سوال المرأة الطلاق
৮২তম পরিচ্ছেদ :	অধীনস্থদের অধিকার	
৮৩তম পরিচ্ছেদ :	উটের অধিকার	حق البعير
৮৪তম পরিচ্ছেদ :	দুই শ্রেণীর মানুষ জাহান্নামী হবে	صنفان من اهل النار
৮৫তম পরিচ্ছেদ :	তিন শ্রেণীর মানুষ জান্নাতে প্রবেশ	

	সতর্কতা	والوعيد عليه
১২১তম পরিচ্ছেদ :	ওসীয়তে ক্ষতি করা	المضارة في الوصية
১২২তম পরিচ্ছেদ :	সাম্প্রদায়িকতার নিষেধাজ্ঞা	النهي عن العصبية
১২৩তম পরিচ্ছেদ :	দুমুখো মানুষের নিন্দা	مذمة ذي الوجهين
১২৪তম পরিচ্ছেদ :	শ্রমিকের পাওনা আদায় না করার পরিণতি	الوعيد علي من لم يعط اجر الاجير
১২৫তম পরিচ্ছেদ :	ফেতনা সম্পর্কে সতর্ক করা	التحذير عن الفتن
১২৬তম পরিচ্ছেদ :	এ উম্মতের উপর ভূমি ধ্বস হবে	الخسف في هذه الامة
১২৭তম পরিচ্ছেদ :	গীবত	الغيبة
১২৮তম পরিচ্ছেদ :	বাপ দাদার উল্লেখ করে গৌরব করার নিন্দা	
১২৯তম পরিচ্ছেদ :	ফিরিশতা ও শয়তানের ছোঁয়া	لمة الملك و الشيطان
১৩০তম পরিচ্ছেদ :	ইবলিস পানির উপর তার সিংহাসন স্থাপন করে	ان ابليس يضع عرشه علي الماء
১৩১তম পরিচ্ছেদ :	আল্লাহ যখন বান্দাকে ভালবাসেন বা ক্ষুব্ধ হন	
১৩২তম পরিচ্ছেদ :	টাখনুর নীচে লুঙ্গী পড়ার নিন্দা	
১৩৩তম পরিচ্ছেদ :	আমানতদারী ও ঈমানের নূর ওঠে যাওয়া	رفع الامانة والايمان
১৩৪তম পরিচ্ছেদ :	আরাফার দিনের ফযীলত ও তাতে দুআ করার গুরুত্ব	فضائل يوم عرفة و فضل الدعاء فييه
১৩৫তম পরিচ্ছেদ :	দুনিয়াতে অল্পে তুষ্ট থাকা	القناعة عن الدنيا بالقليل
১৩৬তম পরিচ্ছেদ :	ধনসম্পদ প্রিয় হওয়া	
১৩৭তম পরিচ্ছেদ :	শরাব পানের সাবধানতা	وعيد شرب الخمر
১৩৮তম পরিচ্ছেদ :	ইসলামে জিহাদ প্রসঙ্গ	الجهاد
১৩৯তম পরিচ্ছেদ :	উপকারী উপদেশসমূহ	
১৪০তম পরিচ্ছেদ :	গুরুত্বপূর্ণ অসীয়তসমূহ	الوصايا النافعة
১৪১তম পরিচ্ছেদ :	আলিমগণের সুপারিশ	
১৪২তম পরিচ্ছেদ :	হাউজে কাউসারের বর্ণনা	بيان الحوض
১৪৩তম পরিচ্ছেদ :	সৃষ্টির প্রতি দয়া করার ফযীলত	
১৪৪তম পরিচ্ছেদ :	বিনয়ের ফযীলত	
১৪৫তম পরিচ্ছেদ :	উম্মতে মুহাম্মদী সা.-এর ফযীলত	فضيلة هذه الامة

ইত্যাদি বিষয়ের হাদীসসমূহ এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। মোট ৯১৪টি হাদীস এ গ্রন্থে সংকলন করা হয়েছে।[১] গ্রন্থে সংকলিত হাদীসসমূহ পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে নিম্ন লিখিত ইমাম, মুহাদ্দিসগণের হাদীসগ্রন্থসমূহ হতে নেয়া হয়েছে-

১. ইমাম বুখারী র. ও ইমাম মুসলিমের ১৩৯টি হাদীস।
২. শুধুমাত্র ইমাম বুখারীর ৪৮টি হাদীস।
৩. শুধুমাত্র ইমাম মুসলিমের ১৩৯টি হাদীস।
৪. ইমাম আবূ দাউদের ৯২টি হাদীস।
৫. ইমাম নাসাইর ৯টি হাদীস।
৬. ইমাম তিরমিযীর ২০৭ টি হাদীস।

৭. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলের ৯২টি হাদীস।
৮. ইমাম বায়হাকীর ৫৯ টি হাদীস।
৯. ইমাম ইব্‌ন মাজাহর ৪৫টি হাদীস।
১০. ইমাম মালিকের ৮টি হাদীস।
১১. শরহুস সুন্নাহ গ্রন্থ হতে ১৪টি হাদীস।
১২. ইমাম শাফিঈর২টি হাদীস।
১৩. মিসকাতুল মাসাবীহ গ্রন্থের ২টি হাদীস।
১৪. ইমাম আবূ নাঈমের ২টি হাদীস ।
১৫. লাওকিহুল আনওয়ার গ্রন্থ হতে ৬টি হাদীস।
১৬. ই'তিসাম লি শা'তি হতে ১টি হাদীস।
১৭. ইমাম রাজীনের ৪টি হাদীস।
১৮. মাজালিসুল আবরার হতে ১টি হাদীস।
১৯. ইমাম দারামীর ২০ টি হাদীস।
২০. তাবরানী হতে ২টি হাদীস।
২১. ফাতাওয়া লাখনবী হতে ২টি হাদীস।
২২. মাদারীজ গ্রন্থ হতে ২টি হাদীস।
২৩. তরীকা-ই মুহাম্মদিয়া গ্রন্থ হতে ১টি হাদীস।
২৪. ইবন হাব্বান হতে একটি হাদীস।

এছাড়াও বিভিন্ন গ্রন্থ হতে তিনি হাদীস চয়ন করেছেন। তবে একটি হাদীসের সূত্র উল্লেখ নেই। লেখক সমকালীন সময়ে অথবা তাঁর দৃষ্টিতে যেসব বিষয়ের গুরুত্ব বেশি অনুভব করেছেন সে প্রসঙ্গে হাদীসের সংখ্যা বেশি চয়ন করেছেন বলে মনে হচ্ছে।

গ্রন্থটির বিন্যাস ফিক্‌হী গ্রন্থ অনুসারে হয়নি, বিষয়ভিত্তিক বিন্যাসও হয়নি বরং লেখকের দৃষ্টিতে যেভাবে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে সেভাবে সাজিয়েছেন, বিন্যাস করেছেন। ঈমান অধ্যায়ে সংযোজিত হাদীস সমূহের বিন্যাস কিছুটা প্রসিদ্ধ হাদীসের কিতাবসমূহের ন্যায় হয়েছে। ইলম অধ্যায়ে সংকলিত হাদীসসমূহ কয়েকটি পরিচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছে: তা **বাব আল-ফাদলুল কুরআন** বলা যেত। তাওবার বিষয়ের জন্য পৃথক একটি বাব বা পর্ব দাঁড় করানো যেত। রাসূলুল্লাহ সা. -এর

১. ফয়যুল কালাম, পৃ. ১৪৩-৪৪৪।

সুন্নাত তথা জীবন ধারণ, চরিত্র মাধুর্য্য, উত্তম অভ্যাসসমূহ ইত্যাদি পৃথক একটি পর্বে উল্লেখ করা যেত। পবিত্রতা অধ্যায়ে যতগুলো হাদীস চয়ন করা হয়েছে সেগুলোকে বিভিন্ন অধ্যায়ে, পর্বে ভাগ করা যেত। কিতাবুস সালাত বলে পৃথক অধ্যায় বা পর্ব করা যেত। কিতাবুস সাওম বা বাবুস সাওম নামে পূর্ণ একটি অধ্যায় বা পর্ব-পরিচ্ছেদ দেয়া যেত। রাসূলুল্লাহ সা.-এর রোযা রাখা পর্বের পরক্ষণেই আনা হয়েছে মহিলাদের থেকে রাসূলের বায়আত গ্রহণ করা পর্ব। বিষয়টিকে সালাম পর্বের সাথে যুক্ত করলে বিন্যাসের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পেত। অনুরূপ হজ্ব ও যাকাতের জন্য পৃথক অধ্যায় বা পর্ব দাঁড় করানো যেত। বিয়ে-শাদীর বিষয় নিয়ে পৃথক পরিচ্ছেদ প্রয়োজন ছিল। সালাম পর্ব শিরোনাম দিয়ে যেভাবে সাজানো হয়েছে অনুরূপভাবে ক্রয় বিক্রয় ও সূদের বিষয়ে পৃথক পর্ব সাজানো যেত। পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনদের অধিকার বিষয়েও পৃথক পরিচ্ছেদ দাঁড় করানো যেত। যেখানে হজ্ব প্রসংগটি উল্লেখ করা হয়েছে তার সাথেই আরাফার দিন ও আরাফার দিনের ফযীলত প্রসঙ্গের হাদীস সমূহ উল্লেখ করা হলে বিষয়টি আষ্টে-পৃষ্টে লেগে থাকত। এ দুয়ের মাঝখানে বিস্তর বিলম্ব হয়েছে। মাঝখানে বিভিন্ন বিষয়ের হাদীস সংকলন করা হয়েছে। লেখক বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থ, ফিক্‌হ গ্রন্থ (সুনান) অনুপাতে হাদীস সমূহ সাজালে, অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে বিন্যাস করলে গ্রন্থটির মান সৌন্দর্য্য আরো অনেক বেশি বৃদ্ধি পেত। পাঠকদের জন্য বিষয়ভিত্তিক হাদীস সমূহ খুঁজে বের করা সহজ হত। তবেও সমকালীন প্রেক্ষিতে এমন একটি হাদীসের

সংকলন রচনা করে মুফতী সাহেব জ্ঞানের ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এ জন্য তিনি পাঠকদের নিকট হতে দুআ প্রাপ্ত হবেন আশা করা যায়।

হিদায়াতুল 'ইবাদ ইলা সাবীলিররাশাদ هداية العباد الي سبيل الرشاد

হিদায়াতুল 'ইবাদ ইলা সাবীলিররাশাদ মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ র. রচিত ২২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত হাদীসের সংকলন। বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থ হতে এ গ্রন্থের হাদীসসমূহ চয়ন করা হয়েছে। গ্রন্থটির রচনাকাল ১৩৭০ হি.। প্রকাশ করেছে আলমাকতাবাতুল ফয়যিয়া, হাটহাজারী চট্টগ্রাম। প্রকাশক মৌলবী মুহাম্মদ কাসিম ফয়যী। প্রকাশকাল ১৩৮০ হি.। গ্রন্থটির টীকা লিখেছেন মুফতী ইযহারুল ইসলাম চৌধুরী। গ্রন্থটিতে ৬১২টি হাদীস এবং ১৮৩টি শিরোনাম রয়েছে। গ্রন্থের শুরুতে আল্লাহতাআলার প্রশংসা এবং রাসূলে উম্মী সা.-এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা হয়েছে। অতপর লেখক সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি কথা বলেছেন-

وبعد فان هذا الكتاب المستطاب درة فريدة بل جوهرة نيرة مشتمل ي
محتو علي مطالب نادرة رائقة يعجب ان شاء الله تعالي قلوب ناظرين ويجلو خواطر المستفدين

হামদ ও সালাতের পর এ উচ্চাঙ্গের গ্রন্থটি মূল্যবান মুক্তার ন্যায়। বরং দেদীপ্যমান মণি-মানিক্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয় সম্বলিত স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন দূর্লভ বিষয়ের সমষ্টি; যা পাঠকদেরকে আকৃষ্ট করবে। যারা এর দ্বারা উপকৃত হতে চান তাদের হৃদয়কে আলোকিত করবে।[১] অতপর লেখক গ্রন্থের পাঠকদের কাছে দুআর আবেদন জানিয়েছেন। এ গ্রন্থে যেসব শিরোনাম রয়েছে সেগুলো হলো-

১.	মানুষের মধ্যে কে উত্তম কে অধম	خير الناس و شرهم
২.	রাসূলুল্লাহ সা. উম্মতের বিষয়ে যা আশংকা করেছেন	ما خافه النبي صلي الله عليه وسلم علي امته
৩.	নেক কাজে বিলম্ব করা মানে জান্নাত ও রহমত থেকে পেছনে থাকা	التأخر عن امور الخيرتأخر عن الجنة و رحمة
৪.	ইব্‌ন মাজাহ গ্রন্থের বিভিন্ন বিষয়ের হাদীসসমূহ	احاديث
৫.	বিভিন্ন উপকারী বিষয়	
৬.	মৃত্যুকে স্মরণ করা	
৭.	ঈদুল আযহা দিনের ফযীলত	فضل يوم الاضحي
৮.	আরাফা দিনের দুআ	الدعاء يوم عرفة
৯.	সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে	سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب

১. ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মদ, মুফতী, হিদায়াতুল 'ইবাদ ইলা সাবীলিররাশাদ, চট্টগ্রাম, আলমাকতাবাতুল ফয়যিয়া, হাটহাজারী, ১৩৮০ হি. পৃ. ২।

১০.	রাসূলের আনুগত্যের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ	الترغيب الي اتباع النبي صلي الله عليه وسلم
১১.	নবীগণের পর এমন কিছু লোকের প্রাদুর্ভাব ঘটে যারা এমন সব কথা বলে যা তারা করেনা	تخلف من بعد الانبياء خلوف يقولون ما لا يفعلون
১২.	যা বিদ'আত হিসেবে গণ্য	ما يتعلق بالبدعة
১৩.	উলামা-ই সূ এর নিন্দা এ শিরোনামটি ফার্সীতে অনূদিত বিভিন্ন মনীষীর উক্তি এবং উলামা-ই সূ (দুনিয়াদার অপকর্মধারী আলিম) ৫ প্রকার বলে মুফতী সাহেব উল্লেখ করেছেন, অবশেষে একটি দলীল এর স্বপক্ষে পেশ করেছেন	
১৪.	মানুষের মধ্যে বিকৃতি ঘটবে	باب تغير الناس
১৫.	হজ্বের ফযীলত পর্ব	
১৬.	হজ্বে নিষিদ্ধ কর্মসমূহ	ما يتعلق بمنكرات الحج

এ শিরোনামের অধীন একটি হাদীস এবং বিভিন্ন ফিক্‌হী গ্রন্থের বক্তব্য ও মুজতাহিদ মনীষীগণের উদ্বৃতি পেশ করেছেন

১৭. ওয়ায নসীহতের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়সমূহ — باب ما يتعلق بالوعظ
এ শিরোনামে লেখক প্রথমে ফাতাওয়া আলমগীরীর বরাত দিয়ে সৎকাজের ব্যাখ্যা পেশ করেছেন, অতপর একটি হাদীস ও বিভিন্ন গ্রন্থের বক্তব্য এর স্বপক্ষে উপস্থাপন করেছেন।

১৮. আবেগ প্রবণ হবার পর্ব

১৯. বিভিন্ন বিষয়ের হাদীসসমূহ — باب احاديث شتي

২০. ইযার (লুঙ্গী,পায়জামা) টাখনার নিচে ঝুলিয়ে পরিধানের নিন্দা

২১. পাগড়ী সম্বন্ধীয় — ما يتعلق بالعمامة

২২. কুপ্রবৃত্তির দৃষ্টিতে তাকানোর নিন্দা — ذم النظر بشهوة

২৩. ফাসিকের প্রশংসা করার নিন্দা

২৪. কুরআন তিলাওয়াতকারীর নিন্দা

২৫. গান গাওয়ার নিন্দা

২৬. গায়রুল্লাহর সন্তুষ্টিকল্পে যবাই করা — غير الله

২৭. নিয়মিত নামায আদায় করা জিহাদের চেয়ে উত্তম — افضل من الجهاد

২৮. নামাযের পর প্রচলিত দুআ সম্বন্ধে আল ই'তিসাম কিতাবের উদ্বৃতিসমূহ

২৯. দুআয় সীমালঙ্ঘন করার পর্ব

৩০. রাতে নামায পড়া পর্ব — باب ما يتعلق بصلوةالليل

৩১. জামাআতে নামায আদায় করা — ما يتعلق بالجماعة

৩২. ঘোড়ার কারণে নামায ছেড়ে দেওয়া

৩৩. হালাল রিয্‌ক অন্বেষণ করা

৩৪. বিভিন্ন প্রকার দান খায়রাত

৩৫. স্ত্রী, সন্তানদের জন্য খরচ করা — باب النفقة علي الاهل

৩৬. সন্তানদের স্বচ্ছল অবস্থায় রেখে যাওয়া উত্তম — باب ترك الاولاد اغنياء خير

৩৭. ভিক্ষা করা পর্ব — باب ما يتعلق بالسوال

৩৮. বান্দার সওয়াল আল্লাহ তাআলার কাছে করা পর্ব — باب سوال العبد ربه

৩৯. আমানতের খিয়ানত করা পর্ব

৪০. কবীরাহ গুনাহসমূহ

৪১. যে আমল মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে রাখবে — باب ما يدخل الجنة ويباعد من

৪২. মসজিদ নির্মাণ পর্ব — باب تشئيد المساجد

৪৩. মসজিদকে সম্মান করা

৪৪. রাসূলুলুল্লাহ সা. এর নিকট জনৈক ইয়াহুদী অনেক বিষয়ে প্রশ্ন করেছিল — يهودي سأل النبي عن اشياء

৪৫. সর্বপ্রথম দীলের খুশু ওঠে যাবে — باب اول علم يرفع الخشوع

৪৬. মর্যে মওতের হালতে রাসূলুল্লাহ সা. -এর সাহাবীগণের নামাযের জন্য কাতারবন্দী হওয়ার দৃশ্য দেখে খুশি হওয়া	باب فرح النبي ﷺ في مرض موته بروية الصحابة وهم صفوف
৪৭. স্বর্ণের পাত্রে পান করার নিষেধাজ্ঞা	النهي عن الشرب في انية الذهب
৪৮. চিত্রাংকন পর্ব	باب التصاوير
৪৯. সমস্যা ব্যতীত উচ্চস্বরে চিৎকার করবে না	باب لا يكبر جهرا الا في مسائل
৫০. একদল ইয়াহুদি রাসূলুল্লাহ সা. -এর নিকট প্রবেশ করেছিল	دخل رهط من اليهود
৫১. জনৈক ব্যক্তি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রা. কে গালি দিয়েছিল	
৫২. যারা শহীদের মর্যাদা পাবেন	بعض من الشهداء
৫৩. বাহাদুরী বীরত্ব পর্ব	باب من الشديد
৫৪. উপদেশ- নসীহত করা পর্ব	باب حكم التذكير
৫৫. কোন মুসলমানকে কাফির বলা	تكفير مسلم
৫৬. দন্ডায়মান হওয়া পর্ব	باب القيام
৫৭. নেককার হলেই মুহাদ্দিস নন	الصلحاء ليسوا باهل الحديث
৫৮. শরাব হারাম হওয়া পর্ব	
৫৯. এমন বিষয় বর্ণনা করা যা আক্ল অনুধাবন করতে অক্ষম	تحديث مالا تبلغه العقول
৬০. দুনিয়ার ফিতনা পর্ব	باب فتنة الدنيا
৬১. জাহান্নাম থেকে বেঁচে থাক	
৬২. শেষ যুগে যে সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব হবে	ياتي في اخر الزمان قوم
৬৩. দুশমনের আঘাতে সবর করা পর্ব	باب الصبر علي ايذاء الاعداء
৬৪. উপকারী উপদেশ	الوصايا النافعة
৬৫. আল্লাহর ভয়ে রোদন করা	باب البكاء من خشية الله
৬৬. আলিমগণের ফযীলত	
৬৭. ইল্মের ফযীলত	
৬৮. হাউযে কাওসার কী?	
৬৯. রাসূলুল্লাহ সা. -এর উম্মত চাঁদ কপালী হয়ে উপস্থিত হবেন	يحشر هذه الامة غرا محجلين
৭০. এ উম্মতের ফযীলত	باب فضل هذه الامة
৭১. উত্তম কালাম ও উত্তম হিদায়াত পর্ব	باب احسن الكلام و احسن الهدي
৭২. ভীতি প্রদর্শন করা পর্ব	باب الانذار و التحذير
৭৩. ইমাম শা'রানী রচিত তাম্বীহুল মুগতাররীন কিতাবের নির্বাচিত বাক্যসমূহ	عبارات منتخبة من كتاب تنبيه المغترين للامام
৭৪. গুনাহর ক্ষতিসমূহ	

৭৫. কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও রাগের মাথায় তালাক দেয়া	باب ما يتعلق بطلاق المدهوش وا
৭৬. কথা বলার সময় কৃত্রিমতার আশ্রয় নেয়ার নিন্দা	
৭৭. আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসার ফযীলত	
৭৮. পছন্দনীয় অসীয়তসমূহ	باب الوصايا الرائقة
৭৯. অপচয়ের নিষেধাজ্ঞা পর্ব	باب النهي عن الاسراف و التبذير
৮০. যেখানে অন্যায়, অশ্লীল, শরী'আত বিরুদ্ধ কর্মকাণ্ড হয় সেখানে উপস্থিত হওয়া পর্ব	باب حكم الحضور في مواضع يوجد بعض المنكرات فيها
৮১. আলিম, তালিবে ইলম, ইল্‌মের ফযীলত	
৮২. সওয়াল করা ও চাঁদা ওঠানো পর্ব	باب ما يتعلق با لسوال وتحصيل
৮৩. পবিত্র কুরআনের ফযীলত সমূহ	
৮৪. কুরআন তিলাওয়াত প্রসঙ্গ	ما يتعلق بتلاوة القران
৮৫. দুনিয়াদারদের প্রতি ধাবিত আলিম	باب عالم يرغب الي اهل الدنيا
৮৬. কিয়ামতের আলামতসমূহ	
৮৭. শাবানের পনের তারিখের রাতে আল্লাহতাআলা যার দিকে দয়ার দৃষ্টিতে তাকাবেন না এবং ক্ষমা করবেন না	ينظر الله اليه ولا يغفر له ليلة النصف
৮৮. স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধির জন্য কী পাঠ করবেন	باب ما يقرأ للحفظ
৮৯. শায়খ মুহি উদ্দীন জিলানী র. রচিত ফাতহুর রব্বানী গ্রন্থের কিছু উদ্বৃতি	اقوال الشيخ محي الدين الجيلاني من الفتح
৯০. আমলদার আলিমের মর্যাদা সম্বন্ধে শায়খ আব্দুল কাদির জিলানীর র. বক্তব্যসমূহ	مقولات الشيخ عبد القادر الجيلاني في فضل العلماء العاملين
৯১. অলীমা অনুষ্ঠানে মেয়েদের গমনের নিষেধাজ্ঞা পর্ব	باب تمنع المرأة من الخروج الي الوليمة
৯২. তাহিয়্যাতুল অযু পর্ব	باب تحية الوضوء
৯৩. পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করা	باب بر الوالدين
৯৪. সৃষ্টির প্রতি দয়া, ভালবাসা প্রদর্শন করা	
৯৫. বৃক্ষরোপণ ও ফসল বুননের ফযীলত	
৯৬. অভাবগ্রস্থকে এড়িয়ে যাওয়া পর্ব	باب انظار المعسر و التجاوز عنه
৯৭. জিম্মী, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারীর উপর জুলুম করার নিষেধাজ্ঞা	باب النهي عن ظلم المعاهد والذمي
৯৮. কোন উসীলা অবলম্বন করা কি তাওয়াক্কুল পরিপন্থী?	اختيار الاسباب هل ينافي التوكل
৯৯. ইসলামে বৃদ্ধদের মর্যাদা	

১০০. কে মুফতী হওয়ার যোগ্য এবং যিনি ফাতাওয়া দানে উপযুক্ত নন তিনি ফাতাওয়া দিতে পারবেন কি?	باب من يصلح مفتيا و هل يجوز استفاء من لا يصلح مفتيا
১০১. আল-মালাউল আ'লা কোন বিষয় নিয়ে বিবাদ করবে?	فيم يختصم الملأ الاعلي
১০২. আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কোনটি?	ما القتال في سبيل الله
১০৩. নির্দিষ্ট শ্রমিকের বিধান	حكم الاجير الخاص
১০৪. ই'তিকাফের ফযীলত	
১০৫. আবূ রাজীনের হাদীস	حديث ابي رزين
১০৬. অসীয়তের ক্ষতি করা অথবা ওয়ারিশ থেকে বঞ্চিত করার পরিণতি	وعيد من ضار في الوصية او قطع ميراث
১০৭. স্বর্ণের অলংকার ব্যবহার করা	التحلي بالذهب
১০৮. পরিবারকে গান গাওয়া থেকে নিষেধ করা	منع الاهل عن التنعم
১০৯. হযরত ফাতিমা যাহ্‌রা রা.-এর বিয়ে	نكاح حضرت فاطمة الزهراء
১১০. শাবানের পনেরতম তারিখ রাতে কম খাওয়া প্রসঙ্গে	قلت الاكل في ليلة النصف من شعبان
১১১. ক্ষমা করা ও এড়িয়ে যাওয়ার ফযীলত	
১১২. নমনীয়তা অবলম্বন করা এবং অহংকার ও কৃত্রিমতার নিষেধাজ্ঞা	التواضع والتكبر والنهي عن التكلف
১১৩. স্বাক্ষ্য দেয়া প্রসঙ্গে	ما يتعلق بالشهادة
১১৪. ঈদ প্রসঙ্গে	ما يتعلق بالعيد
১১৫. ঈদের দিন বিশেষভাবে কবর যিয়ারত করা	زيارة القبور بتخصيص يوم العيد
১১৬. চাঁদ দেখা প্রসঙ্গে	ما يتعلق برؤية الهلال
১১৭. স্বামী- স্ত্রী পরস্পরের বিরুদ্ধে শপথের মাধ্যমে স্বাক্ষ্য দেওয়া	ما يتعلق بالتع ير
১১৮. রাসূল সা. যাকে ভালবাসতেন তাকে অনুপাতে কম দিতেন ঐ ব্যক্তির তুলনায় যাকে তিনি ভালবাসতেন না	يعطي النبي صلعم من لا يحبه اكثر ممن يحبه
১১৯. ইসলামে ইবাদত ও দীর্ঘায়ুর ফযীলত	فضل العبادة والتعمير في الاسلام
১২০. একের পর এক বের হবার নীতি প্রসঙ্গে	ما يتعلق بالخروج علي الولاة
১২১. ফাতাওয়া ইত্যাদি সাধারণ বিষয়ের জন্য যিনি নিজেকে অবসর করেছেন তাকে হিদায়াত করা	لاهداء الي من فرغ نفسه لامر العامة و غيره
১২২. কিতাবুল্লাহর তিলাওয়াত শোনার সময় থেমে যাওয়া	
১২৩. যাদেরকে সালাম দেওয়া নিষেধ	من يكره السلام عليه

১২৪.	খেলাধুলার বিধান	حكم اللهو وللعب
১২৫.	উপকারী বিষয়	
১২৬.	দশটি অভ্যাস অপছন্দনীয়	يكره عشر خلال
১২৭.	পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ	ايات قرانية
১২৮.	শাফা'য়াত সম্পর্কীয়	ما يتعلق بالشفاعة
১২৯.	জনৈক ইয়াহুদীর রাসূলের নিকট পাওনা ঋণের তাগাদা করা	يهودي تقاضي النبيﷺدينا له عليه
১৩০.	পরস্পর প্রশংসার নিষেধাজ্ঞা	النهي عن التمادح
১৩১.	প্রতিবেশির অধিকার আদায় করা	ي
১৩২.	প্রসঙ্গ নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব	ما يتعلق بالامارة والولاية
১৩৩.	তালিবে দীনকে সাহায্য করা, তাদের প্রতি সহমর্মিতা দেখানো	نصرة طابي الدين و مواساتهم
১৩৪.	আহলের জন্য স্বামীর দুশ্চিন্তা	هم المرأ للاهل
১৩৫.	বিদ'আত সম্পর্কীয়	ما يتعلق بالبدعة
১৩৬.	সাধারণের সাথে তাদের বোধগম্যের বাইরে কথা বলা	التحدث مع العوام بما لا تفهمه
১৩৭.	দীনদার মানুষের তাবাররুক গ্রহণ করা সম্পর্কে	ما يتعلق بالتبرك من اهل الفضل
১৩৮.	অন্যের মাল আত্মসাৎ নিষেধ	حكم اكل مال الغير
১৩৯.	মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী সম্পদ বিষয়ে অসীয়ত করা	الوصية وما يتعلق بالموت وما بعده
১৪০.	মাইয়্যিতের নিয়তে তার বাড়ীতে যিয়াফত খাওয়া	حكم اتخاذ الضيافة للميت
১৪১.	কোন কোন কবীরা গুনাহ সম্বন্ধে কঠোর সতর্কতা রয়েছে	ما ورد من الوعيد الشديد في بعض الكبائر
১৪২.	প্রসঙ্গ জুলুম	ما يتعلق بالظلم

১৪৩.	আবূ ইসহাক আল ইসপারাইনীর উক্তি	ي
১৪৪.	জুমুআর দিনে গোসল করা	ل يوم الجمعة
১৪৫.	বৃষ্টির প্রার্থনা করা	ما يتعلق بالاست
১৪৬.	লাইলাতুল বরাত প্রসঙ্গে	ما يتعلق بليلة البرات
১৪৭.	বাচ্চাদেরকে একই বিছানায় শুইতে দেয়া যাবে না	حكم مضاجعة الصبيان
১৪৮.	আমরদ (বালক) এর দিকে কুদৃষ্টি দেয়ার বিধান	
১৪৯.	চাষাবাদে বরকত লাভ করা এবং আপত থেকে নিরাপদ থাকা	ته هات

১৫০. ওজরবশত রাতের নামায (তাহাজ্জুদ) ছেড়ে দিলে তিরস্কার করবে না	لا يلام من ترك صلوة الليل عذرا لاكسلا
১৫১. উত্তম চরিত্র প্রসঙ্গে	ما يتعلق بحسن الخلق
১৫২. তাকওয়া, যুহ্‌দ ও সাধনা	التقوي و الورع والزهد
১৫৩. বোকাদের নিদর্শন	لسفهاء
১৫৪. অতিরিক্ত খাজনা ধার্য্য করার পরিণতি	الوعيد علي التعشير
১৫৫. আল্লাহর আরশের নিচে ছায়া প্রাপ্তিতে অগ্রগামীগণ	
১৫৬. উপকারী অসিয়তসমূহ	الوصايا النافعة
১৫৭. সফর সম্পর্কীয়	ما يتعلق بالسفر
১৫৮. প্রস্রাব সম্পর্কীয়	ما يتعلق بالبول
১৫৯. শিশুর আকীকা ও নাম রাখা	العقيقة والتسمية
১৬০. সাথীকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হাওলায় ছেড়ে দেওয়া	اطلاق الصاحب علي الله ورسوله
১৬১. বিচার সম্পর্কীয়	ما يتعلق بالقضاء
১৬২. রোযা সম্পর্কীয়	ما يتعلق بالصوم
১৬৩. আত্মীয়তা সম্পর্ক ধরে রাখা	ما يتعلق بصلة الرحم
১৬৪. মুজাদ্দিদে আলফে সানী র.-এর রচনাসমূহ হতে সংগৃহীত	
১৬৫. মওযু হাদীস সম্বন্ধে	ما يتعلق بالحديث الموضوع
১৬৬. গানের সুরে কুরআন পাঠ করার মর্ম	
১৬৭. সৌভাগ্য ও দূর্ভাগ্যের নিদর্শন	علامة سعادة المرأ وشقاوته
১৬৮. আল্লাহর রাস্তায় দান করা সম্পর্কে	ما يتعلق بالتصدق في سبيل الله
১৬৯. অভাবগ্রস্থ মানুষের অভাব পূরণ করা, দু:খে ভারাক্রান্তকে সাহায্য করা এবং মুসলমানকে সহায়তা করার ফযীলত	الملهوف واعانة المسلم
১৭০. আল্লাহর নিকট অনুতপ্ত হওয়া	الاستحياء من الله
১৭১. সদকা উসূলকারী ব্যক্তি প্রসঙ্গে	ما يتعلق بالعامل علي الصدقة
১৭২. প্রতিটি সৎকাজ সদকাতুল্য	
১৭৩. ইয়া ইবাদী কুল্লুকুম দাল্লিন, হাদীস প্রসঙ্গে	حديث يا عبادي كلكم ضال الخ
১৭৪. তকদীর প্রসঙ্গ	ما يتعلق بالقدر
১৭৫. অন্তরে নূর প্রবেশ করার নিদর্শন	
১৭৬. আল্লাহকে স্মরণ করার ফযীলত	
১৭৭. হাশর দিনের ভয়াবহতা	شدة امر يوم
১৭৮. সৎকাজের পুরস্কার	
১৭৯. যেসব আমল আমলকারীকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে	اعمال تدخل الجنة صاحبها
১৮০. চাঁদ দেখা প্রসঙ্গে	ما يتعلق برؤية الهلال

১৮১. সতর্ক বার্তা	التنبيه
১৮২. দীনদারী তিন প্রকার	الديانات علي ثلثة اقسام
১৮৩. প্রসঙ্গ কবিতা	
১৮৪. তালিবে ইল্‌ম এর ফযীলত	فضيلت طالب علم
১৮৫. উত্তম বিষয়াবলী	مضامين نفيسة

হিদায়াতুল 'ইবাদ ইলা সাবীলির রাশাদ গ্রন্থে মোট ৬১২টি হাদীসের আলোচনা বা উল্লেখ রয়েছে। আরো রয়েছে অসংখ্য ফিকহী গ্রন্থের উদ্ধৃতি, কখনো লেখকের নিজস্ব বক্তব্য। এ গ্রন্থে উদ্ধৃত হাদীসসমূহ নিম্ন লিখিত পরিসংখ্যাণের ভিত্তিতে নিন্ম লিখিত মুহাদ্দিসগণের গ্রন্থ হতে গ্রহণ করা হয়েছে-
১.মুত্তাফুন আলাইহি (ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম) বর্ণিত হাদীস ৫০ টি।
২. শুধুমাত্র ইমাম বুখারী বর্ণিত হাদীস ৫৭ টি।
৩.শুধুমাত্র ইমাম মুসলিম বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৬৬ টি।
৪. ইমাম তিরমিযী র. বর্ণিত হাদীস ৬২ টি।
৫. ইমাম আবূ দাউদ র. বর্ণিত হাদীস ৫৪ টি।
৬. ইমাম ইব্‌ন মাজাহ বর্ণিত হাদীস ১০০টি।
৭. বায়হাকী শরীফ হতে ৪২টি।
৮. ইমাম আহমদ র. হতে ২২টি ।
৯. দারামী হতে ২০টি।
১০. মিশকাতুল মাসাবীহ গ্রন্থ হতে ২৩টি।
১১. ইয়াহ্ইয়াউ উলূমিদ্দীন হতে ১৩টি।
১২. নাসাই শরীফ হতে ৭টি।

এছাড়া নিম্ন লিখিত মুহাদ্দিসগণের কিতাবসমূহ হতে এক বা একাধিক হাদীস গ্রহণ করা হয়েছে। ইমাম মালিক র., লাওয়াকিহুল আনওয়ার, ই'তিসাম, সগীরা, মিরকাত, শারহুস্ সুন্নাহ, মাজালিসুল আবরার, মুসনাদে ইমাম আযম র., শারহুল মা'আনী, আনওয়ারুল মাহমূদ, আলমাদখান, শারআতুল ইসলাম, আলজাওয়াবুল কাফি, রদ্দুল মুহতার, জামউল ওয়াসিল, তাবরানী, মাবসূত, শারহুস্ সদর, শারহুস্ সুন্নাহ, তাহাবী, দুররুল মুখতার, বাদা'য়ে সানা'য়ে। এসব গ্রন্থের হাদীস সংকলন ছাড়াও বিভিন্ন ফিকহী কিতাবের ফিকহী মাসআলা আলোচনায় স্থান পেয়েছে। কোথাও শিরোনাম দিয়ে কোথাও

শিরোনাম ছাড়া। এছাড়া অপরাপর বিষয়ে আলোচনাও স্থান পেয়েছে। মুফতী সাহেবের রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য রচনা হলো ***হিদায়াতুল ইবাদ*** নামক গ্রন্থটি। এ গ্রন্থে তিনি মানব জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহ সম্বন্ধে কুরআন-সুন্নাহ ও শরীআতের বিভিন্ন মৌলিক গ্রন্থ হতে অসংখ্যা উদ্বৃতি সংকলন করেছেন; যা সমকালীন বিভিন্ন বিষয়ে মানুষের আকীদা ও কর্মপন্থার জন্য সঠিক দিক নির্দেশনা হিসেবে ভূমিকা রাখছে। গ্রন্থটিতে সময়ের প্রয়োজনে উপযুক্ত বিষয়ের সন্নিবেশন করে লেখক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এ জন্য তিনি প্রশংসার যোগ্য। তবে হাদীসের কিতাবে ফিক্‌হী বিষয়গুলোর সংমিশ্রন না করে এ গুলোর জন্য পৃথক গ্রন্থ রচনা করতে পারতেন। অথবা উক্ত গ্রন্থে পৃথকভাবে ফিকহী বিষয়গুলো সমাগম ঘটাতে পারতেন। তাহলে পাঠকদের বেশি সুবিধা হতো। বিষয়গুলোকে তারা সহজেই নির্বাচন করতে পারতেন। একই বিষয়কে একাধিক স্থানে আলোচনা করায় কিতাবটির বিন্যাসের সৌন্দর্য্য যথেষ্ট নষ্ট হয়েছে বলা যায়। এছাড়া বেশকিছু বিষয় ছিল যেগুলোর জন্য পৃথক অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ রচনা করা যেত। তবেও গ্রন্থটি পাঠক সমাজে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে।

৩. ছেহেল হাদীস چهل حديث

মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ র. রচিত ছেহেল হাদীস একটি পাঁচ পৃষ্ঠার পুস্তিকা। এটি ***খত্‌তে ইমাম গায্‌যালী*** পুস্তিকার সাথে যুক্ত। প্রকাশ করেছে কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী চট্টগ্রাম। প্রকাশকাল অজ্ঞাত। মানব জীবনে চলার জন্য পাথেয় হিসাবে এ পুস্তিকায় উল্লিখিত চল্লিশটি হাদীস সামনে রাখলে শক্তিশালী ভূমিকা রাখবে, দীনের উপর চলা সম্ভব হবে। যেমন- প্রকৃত মুসলমান সে যার মুখ ও হাতের আক্রমণ হতে অপর ব্যক্তি নিরাপদ, আল্লাহকে প্রভু ইসলামকে জীবন বিধান মুহাম্মদ সা.কে রাসূল হিসেবে গ্রহণ করলে ঈমানের স্বাদ অনুভব করা যাবে, শয়তান মানুষের রগ-রিশায় বিচরণ করে, রাসূলুল্লাহ সা. যখন কথা বলতেন তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন। এতে শ্রোতা বুঝতে সক্ষম হতো, অন্যায়ভাবে মানব হত্যা করবে না ইত্যাদি চল্লিশটি হাদীস এ পুস্তিকায় সংযোজন করে দীনের উপর জীবন ধারণ করাকে সহজ করে দিয়েছেন।[১] পুস্তিকার জন্য মুফতী সাহেব প্রশংসার যোগ্য।

১.ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মদ, মুফতী, *ছেহেল হাদীস*, চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, তা. বি. পৃ. ২৭-৩২।

গ. ফিক্‌হ বিষয়ক রচনা

বিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে যে কয়জন খ্যাতিমান আলিম, মাশাইখ, সংস্কারক, ফকীহ, মুফতীর আবির্ভাব হয়েছে তাঁদের মধ্যে স্বনামধন্য ছিলেন মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ র.। বিভিন্ন শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের অধিকারী প্রতিভাবান আলিম, ফকীহ, মুফতী হিসেবে তিনি খ্যাতি লাভ করেছেন। শিক্ষকতার মাধ্যমে হাটহাজারী মাদ্রাসায় তাঁর কর্মজীবন আরম্ভ। অতপর ঐ মাদ্রাসায় ফাতাওয়া বিভাগে প্রধান মুফতী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ইল্‌ম ফিক্‌হ'র প্রতি তাঁর উৎসাহ, উদ্দীপনা, নিমগ্নতা ছিল অস্বাভাবিক। কালক্রমে তিনি ফিক্‌হ, ফাতাওয়ায় গবেষণা ও উদ্ভাবনী শক্তি অর্জন করেন। ইসলামী আইন বিদ্যায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং ইজতিহাদি যোগ্যতার ফলে ফিক্‌হশাস্ত্রে স্বতন্ত্র ভূমিকা রাখতে সক্ষম হন। অসংখ্য আলিম, মুফতী, ফকীহ সৃষ্টিতে অনন্য ভূমিকা রাখেন। বিংশ শতাব্দীর একজন পূর্ণাঙ্গ ফকীহ মুফতী ছিলেন তিনি। সমসাময়িক যুগের ফিক্‌হ চর্চায় তাঁর ন্যায় দ্বিতীয় কেউ ভূমিকা রাখতে পারেননি। ভারতবর্ষে উল্লেখযোগ্য মনীষীগণের প্রায় সবাই তাঁর দরবারে এসেছেন, সাক্ষাত করেছেন। তিনি হাটহাজারী মাদ্রাসার মজলিসে ইলমীর শিরোমনি ছিলেন। সর্বসম্মতিক্রমেই তিনি ছিলেন যুগের শ্রেষ্ঠ ফকীহ, মুফতী। তিনি মুজতাহিদ সুলভ জ্ঞান, প্রজ্ঞা দ্বারা দলীল প্রমাণের মাধ্যমে যুগের চাহিদা পূরণে গৌরবজনক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছেন। ফিক্‌হ ও ফাতাওয়া রচনায় পবিত্র কুরআনের উপর তাঁর দীর্ঘ গবেষণা, বিস্ময়কর সম্পৃক্ততা,

গভীর জ্ঞান, আয়াতসমূহের সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের সাথে আত্মিক আকর্ষণ এবং মেধার প্রখরতার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এর ফলে প্রজ্ঞাবান ও দূরদর্শীগণ বিবেচনা করতে পেরেছেন যে, মুফতী সাহেবের জ্ঞান, প্রজ্ঞা, পুথিগত অর্জন ছিল না। এর সম্পর্ক মহান আল্লাহ তাআলার অনুকম্পার সাথে। আল্লাহ প্রদত্ত রূহানী শক্তি, কাজের উপর দৃঢ়তা, কলম শক্তি ও ভাষা জ্ঞানকে তিনি মানব কল্যাণে ব্যয় করেছেন। ঈমান ও মা'রিফাতে ইলাহীর নূরের বদৌলতে ইসলামের সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম বিষয়গুলো অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন। ফিক্হ ইসলামীতে ইজতিহাদী যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। কুরআন সুন্নাহর নিকটতম মর্মস্থলে পৌঁছার চেষ্টা করেছেন। তিনি ইসলামের সঠিক বক্তব্য প্রকাশ করতে কখনো দ্বিধা করেননি। প্রচলিত প্রথা পদ্ধতি সম্বন্ধে একটি সঠিক, নির্ভুল, সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় পন্থা গ্রহণ করেছেন। দ্বীনের মৌলিক বিষয়, দ্বীনি ফিক্হ ও বিধি বিধান জানতে তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো আলিম সমাজের জন্য আবশ্যিক হয়ে গেছে। হিজরী প্রথম শতাব্দীতে ফিক্হ প্রণয়ন ও সংকলনের যে কাজ আরম্ভ হয়ে হিজরী দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে পূর্ণতা লাভ করেছিল; মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ ঐসব ফকীহ ও মুহাদ্দিসের খিদমত, চার মাযহাবের ইমামগণের বৈশিষ্ট্যসমূহ ও তাঁদের মর্যাদাকে পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়েছেন। চার মাযহাবের ইমামগণ যে অক্লান্ত পরিশ্রম সাধনার মাধ্যমে ইসলামী শরীআতের জন্য সুবিন্যস্ত আইন- কানুন, বিধি- বিধান রচনা করেছেন তাদের ফিক্হর ভান্ডারকে তিনি মূল্যবান ও কল্যাণকর সম্পদে পরিণত করেছেন। এ থেকে বিচ্যুতিকে ধ্বংস ও ক্ষতির কারণ মনে করেছেন। হানাফী ফিক্হ বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। বিশ্বের সব দেশেই ইসলামী মনীষীগণ ফিক্হ হানাফী নিয়ে গবেষণা ও সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। মুফতী ফয়যুল্লাহ ছিলেন হানাফী মাযহাবের বিশ্লেষক ও আন্ত মুজতাহিদ। তিনি হানাফী মাযহাব মতে ফিক্হ ও ফাতাওয়া চর্চা করেছেন। হানাফী মাযহাব একটি ফিকহী সংকলনের নাম। কুরআন হাদীসকে সামনে রেখে খুলাফা-ই রাশিদীন ও অন্যান্য সাহাবাগণের কর্মপন্থা অবলম্বন করে যুগশ্রেষ্ঠ চারশ' গবেষক, ফকীহ দ্বারা গঠিত বোর্ড দীর্ঘ চল্লিশ বছরের সাধনা ও অক্লান্ত গবেষণার ফসল ফিক্হ হানাফী। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে যুগের সেরা ফকীহ, মুহাদ্দিস, আরবী ভাষাবিদ ও ইতিহাস গবেষকদের নিয়ে কুরআন, হাদীস চয়ন করে ফিক্হর রাজত্বের এক বিশাল ভান্ডার গড়ে তোলার অনন্য নজীর স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফকীহ ইমাম আবূ হানীফা র.। দীর্ঘ চল্লিশ বছরের সাধনায় তিনি প্রায় সব বিষয়ে সব ধরণের সমাধান দিতে সক্ষম হয়েছেন। পরবর্তীকালে তাঁর অনুসারীগণ এর সাথে আরো বিভিন্ন বিষয় সংযোজন করে একে বৈশ্বিক এক ফিক্হী সংকলন হিসেবে দুনিয়ার সামনে তুলে ধরেন। যে কারণে হানাফী মাযহাবের অনুসারী এখন পর্যন্ত দুনিয়াতে বেশি। ভারতীয় উপমহাদেশে এ মাযহাব বেশি প্রসার লাভ করেছে। এ ফিক্হ'র উপর অধিকতর গবেষণা ও সুক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ হয়েছে।[১] মুফতী সাহেব হানাফী মাযহাবের গন্ডির ভেতর থেকে ফিক্হ চর্চা করেছেন। তিনি হানাফী ফিক্হর গবেষণালব্ধ উসূলের (মূলনীতি) অধিকতর ব্যাখ্যা করেছেন। এছাড়া নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, ভৌগোলিক পরিবেশ, পরিধির মধ্যে উপস্থিত সমস্যাবলী বিষয়ে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে আন্ত ইজতিহাদ করেছেন। তিনি ইসলামী ইলম্‌কে প্রচলিত ধারায় ব্যখ্যা না করে প্রচলিত প্রথা সংশোধন করে ইসলামী শিক্ষাকে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন। তিনি ছিলেন জ্ঞান তত্ত্ববিদ। তিনি মনে করতেন একজন আলিমের জন্য কুরআন, হাদীস সম্বন্ধে জ্ঞান রাখা, সেগুলো থেকে দলীল, প্রমাণ গ্রহণের যোগ্যতা থাকা, হাদীস ও তাফসীরের ব্যাখ্যা জানা, ফিক্হ ও উসূল আল- ফিক্হ'র জ্ঞান অর্জন করা, সাহাবা ও তাবিঈনগণের উক্তি জানা থাকা, বিভিন্ন মাসআলায় চার মাযহাবের অভিমত, আরবী ভাষা, ইল্‌ম নাহু, বালাগাত, ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা আবশ্যিক। হযরত হাসান বসরী র.-এর মতে যারা পরকালমূখী, ইহকাল বিমূখ, দ্বীনের প্রতি সতর্ক দ্রষ্টা, প্রভূর ইবাদতে সদালিপ্ত, মুসলমানের ইজ্জত বিনষ্টকরণ থেকে সদা বিরত ও সতর্ক; তারাই ফকীহ। এ সংজ্ঞার বাস্তব দৃষ্টান্ত ছিলেন মুফতী ফয়যুল্লাহ। তাঁর জীবনের প্রতিভা ঈর্ষনীয়। তিনি ফিক্হী জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি জ্ঞান বিতরণ করেছেন। কর্মজীবনের অনেক উজ্জল দৃষ্টান্তের পাশপাশি পুস্তক প্রণয়ন, গ্রন্থ রচনায় তাঁর অবদান অপরিসীম। বিশেষ করে ফিক্হ, ফাতাওয়া চর্চায় তাঁর অবদান অসামান্য। ফিক্হ চর্চায় তিনি নিজস্ব চিন্তাধারার স্ফূরণ ও স্বকীয় চেতনাবোধের স্বাক্ষর রেখেছেন। ফিক্হ, ফাতাওয়া রচনায় তিনি তাকওয়ার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিতেন। তিনি ছিলেন মুহতাত, মুহাক্কিক, মুদাক্কিক। তিনি আকাবিরের

ইজতিহাদী বয়ান, বক্তব্য যেগুলো দলীল-প্রমাণ দ্বারা সমৃদ্ধ নয় সেগুলো গ্রহণ করেননি এবং প্রমাণ হিসেবে পেশ করেননি। তাঁর মতে বুযুর্গদের কথা যদি কুরআন, হাদীস, ফিক্‌হর, অনুকূল না হয় সেগুলো গ্রহণযোগ্য নয়। অনেক বৈধ বিষয় যেগুলো প্রবীণ বুযুর্গগণ আদায় করতেন সেগুলো সন্দেহাতীত দলীল প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত না হওয়ার কারণে তিনি সেগুলো পালন করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বিংশ শতাব্দীতে ঈমান, আকীদা সম্পর্কিত নানা ফেতনা, বিদআত, কুসংস্কারসমূহের সন্তোষজনক জবাব দিতে সক্ষম হয়েছেন। বিরোধী মতবাদসমূহ যুক্তি, দলীল, প্রমাণের মাধ্যমে খন্ডন করতে সক্ষম হয়েছেন। কালপরিক্রমায় উদ্ভাবিত আধুনিক দর্শন, মতবাদ ও বিজ্ঞানের প্রভাবে যেসব জিজ্ঞাসার উদ্ভব হয়েছে সেগুলোর উপযুক্ত, সঠিক জবাবও সমাধান পেশ করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি কয়েক হাজার ফাতাওয়া এবং প্রায় একশত গ্রন্থ রচনা করেছেন। এসবের মধ্যে অধিকাংশই ফিক্‌হ সংক্রান্ত। তিনি শাহ আনওয়ার কাশ্মীরির ইলম ও অভ্যাস উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন। তাঁর ন্যায় পাঠদান, রচনা, মৌলিক বা শাখা প্রশাখায় মাসআলার আলোচনায় সাল্‌ফ ও খাল্‌ফ, আকাবিরে উম্মতের অভিমত ও দলীল, প্রমাণসমূহ সামনে রাখতেন এবং সেখান থেকে নিজস্ব অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে বিশদ বিবরণ পর মাসআলা বর্ণনা করতেন। বিষয়টিকে কেউ হিকমত পরিপন্থী মনে করলেও তিনি সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করতেন না। বাস্তবতা হলো মুফতী ফয়যুল্লাহর কঠোর অবস্থানের কারণেই আলিম সমাজের দৃষ্টি শক্তি ফুটে ওঠেছে। অন্যথায় দুর্বল ইলম সম্পন্নরা সে অন্ধকারেই থেকে যেতেন। শুধু সুযোগ সুবিধার বিষয়গুলো গ্রহণ করতেন। অপরদিকে শরীআত তার প্রাণ শক্তি হারিয়ে ফেলত। সত্য প্রকাশ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যেত।[২] তিনি নিজস্ব চিন্তা, গবেষণা, উদ্ভাবনী শক্তিকে অনবদ্য লিখনীর মাধ্যমে প্রচার করে গেছেন। কুরআন সুন্নাহর বিধানাবলিকে সহজবোধ্য করে জাতির সামনে পেশ করেছেন। ফিক্‌হ সংক্রান্ত তিনি অসংখ্য ফাতাওয়া ও গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। তাঁর ফাতাওয়ার সংখ্যা অনুমান পাঁচ হাজার বলে গবেষকদের অনুমান। কয়েক হাজার পৃষ্ঠার ফাতাওয়ার পাণ্ডুলিপি রেখে গেছেন; যা এখনো ছাপা হয়নি। ফিক্‌হ সংক্রান্ত প্রায় পঞ্চাশটি গ্রন্থ রচনা করেছেন।[৩]

---

১. মাসিক মদীনা, বর্ষ ৫০, সংখ্যা ৫ম, আগস্ট ২০১৪, পৃ. ৫৪-৫৫।

২. নোমান, পৃ. ৮১-৮৫।

৩. সম্পাদনা পরিষদ, ফাতাওয়া মাসাইল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪; নূর মুহাম্মদ আ'জমী হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯; জসীম উদ্দীন, মুফতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫-২২৬।

১. রাফিউল ইশকালাত আলা হুরমাতিল ইসতীজারি আলাত তা'আতি
رافع الاشكالات علي حرمة الاستيجار علي الطاعات

মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ র. কর্তৃক ফার্সী ভাষায় রচিত ৬৪ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটি ফিকহ বিষয় সম্বলিত। গ্রন্থটির রচনাকাল ১৩৪৮ হি. মোতাবেক ১৯২৬ খৃ.। গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী চট্টগ্রাম। প্রকাশকাল অজ্ঞাত। প্রকাশক মৌলভী মুহাম্মদ হুসাইন ফয়যী। এর বঙ্গানুবাদ করেছেন আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইউসুফ ইসলামাবাদী। এর বাংলা সংস্করণও সন তারিখ উল্লেখ ব্যতীত পৃথকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশ করেছে কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী চট্টগ্রাম। গ্রন্থে ইবাদতে মাকসূদা তথা- আযান, ইকামত, কুরআন শিক্ষাদান, জানাযা, যিয়ারত, তাহলীল, খতমে তারাবীহ ইত্যাদির বিধান প্রামাণিক ও দালীলিক ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থের শুরুতে একটি দীর্ঘ ভূমিকা লেখক কর্তৃক রচিত হয়েছে। যার সারকথা হলো : সত্যপন্থী ধর্মান্বেষী পাঠকগণের নিকট বিষয়টি স্পষ্ট যে, এ ফেতনা-ফাসাদের যুগে মানুষ প্রবৃত্তির অনুসরণে লিপ্ত হয়ে রাসূলের আদর্শকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করেছে। অবস্থাটি এমন যেমনটি রাসূলে কারীম সা. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের মধ্যে এসেছে- سيخرج عن امتي اقوام تتجاري بهم تلك الاهواء كما يتجاري الكلب لصاحبه لا يبقي منه عرق ولا مفصل الا دخله – 'আমার উম্মতের মধ্যে এমন সব লোক প্রকাশ পাবে যাদের সর্ব শরীরে সেই বিদআত ও কুপ্রবৃত্তি অনুপ্রবেশ করবে যেভাবে

জলাতংক রোগ রোগীর সর্বশরীরের প্রবেশ করে। ফলে তার কোন শিরা বা গ্রন্থি অবশিষ্ট থাকে না যাতে সে সঞ্চার করে না'। (আবু দাউদ)[১] মানুষ বিদআতী কর্মকাণ্ডে এমনভাবে জড়িয়ে পড়ছে যে, এটাকে সুন্নত মনে করছে। আর বাতিলকে হক মনে করছে। পক্ষান্তরে বাতিলরা হকপন্থীগণকে গুমরাহ, কাফির বলতে দ্বিধা করছে না। রাসূলুল্লাহ সা.-এর হাদীস মতে মুক্তি লাভকারী একমাত্র দল হল আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামা'আত। লেখকের বক্তব্য মতে বিদআতী এবং আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মধ্যে প্রথমে দুটি বিষয়ে দ্বিমত ছিল। ১. ইবাদতে মাকসুদাহর বিনিময়ে টাকা পয়সার লেনদেন শরীআত সম্মত কি না? ২. ইসালে সওয়াব তথা মৃত ব্যক্তিগণের রূহে সওয়াব পৌঁছানোর লক্ষ্যে রুসমী ফাতিহা, ওরশ, ইত্যাদি জায়েয আছে কি না? পরে আরো দুটো বিষয় এর সাথে যুক্ত হয়েছে। ৩. ওয়াজ মাহফিলে বা যেকোন মাহফিলে সকলে একসঙ্গে সুর করে দুরূদ পাঠ করা জায়িয কি না? ৪. রাসূলের উপর দুরূদ পাঠকালে তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়ানো জায়েয কি না? এ সব প্রশ্নের উত্তর এ পুস্তকে দেয়া হয়েছে। এছাড়াও ওয়াহাবী সম্প্রদায় নিয়ে যে বিভ্রান্তি, অপপ্রচার রয়েছে তার নিরসন করা হয়েছে। যারা ইবাদাতে মাকসূদার বিনিময়ে অর্থের লেনদেন ইসালে সওয়াবের লক্ষ্যে ফাতিহা পাঠ এবং এগুলো জায়েয বলার অপচেষ্টা করেছেন; তিনি সেগুলোর জওয়াব দিয়েছেন। এগ্রন্থে বিধৃত তাঁর বক্তব্যের সারকথা হলো- ইসালে সওয়াবের উদ্দেশে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা, তাসবীহ, তাহলীল পড়া, জানাযার নামায পড়া, কবর যিয়ারত প্রভৃতির বিনিময়ে আর্থিক লেনদেন সব যুগের ফকীহগণ অবৈধ বলেছেন। তবে অপরকে কুরআন, হাদীস, ফিক্হ শিক্ষা দান করা, ইমামতি, আযান, ওয়াযের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ পরবর্তী যুগের ফকীহগণের মতে বৈধ। ফকীহগণের মতে ইবাদতে মাকসূদা আর অপরকে ইল্‌ম শিক্ষাদান করার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। কারণ প্রথমটি অবৈধ, দ্বিতীয়টি বৈধ। প্রথমটিকে যারা বৈধ বলেছেন এবং এর স্বপক্ষে বিভিন্ন কিতাবের উদ্বৃতি দিয়েছেন; উক্ত গ্রন্থগুলোর লেখকগণের অবস্থা অজ্ঞাত, অপরিচিত। দ্বিতীয়ত বিশুদ্ধ বক্তব্য ও দুর্বল বক্তব্য পরস্পর বিরোধী হলে বিশুদ্ধ বক্তব্য প্রাধান্যযোগ্য। মুবাহ ও হারাম পরস্পর বিরোধী হলে হারাম প্রাধান্যযোগ্য। ইবাদতে মাকসুদার বিনিময়ে অর্থনৈতিক লেনদেন যে অবৈধ তার প্রমাণ পবিত্র কুরআনে এসেছে وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين এবং তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়নি তবে একমাত্র এ আদেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেন তাঁর ইবাদত করে একমাত্র আল্লাহর জন্য খালেস করতঃ নিঃস্বার্থভাবে।[২] পবিত্র কুরআনে আরও এসেছে- ولا تشتروا بايتي ثمنا قليلا 'তোমরা আমার আয়াতগুলোর বিনিময়ে

১. ফয়যুল কালাম, পৃ. ১০৭, হাদীস নং ১৩৭

২. আল-কুরআন, ৯৮: ৫।

সামান্য ধনসম্পদ গ্রহণ করো না'।[১] হযরত হাসান বসরী র. কে ছামানে কালীল শব্দের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এর অর্থ দুনিয়া এবং দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদ। তাফসীরে আযীযিয়ায় আবূল আলিয়া বলেন, এর অর্থ পবিত্র কুরআনের আয়াতের বিনিময়ে সামান্যতম হীন মজুরি নেবে না। এ গ্রন্থে বলা হয়েছে, এ আয়াত বনী ইসরাঈলের জন্য উপদেশ বাণী হলেও এ উম্মতের কতক ভ্রান্ত ফেরকার জন্য কঠোর সাবধান বাণীও বটে। ফাতাওয়া শামীর কিতাবুল কারাহিয়্যাহ তে বলা হয়েছে- ইবাদত আল্লাহ তাআলার জন্য খালিস করা ওয়াজিব। তাতে রিয়ার (লোক দেখানো) এরাদা করা হারাম। এ বিষয়ে ইজমা সংঘটিত হয়েছে। রাসূল সা. রিয়াকে ছোট শির্‌ক বলেছেন। কুরআন শরীফ তিলাওয়াত, ইত্যাদি মজুরীর বিনিময়ে করা রিয়ার শামিল। পরকালীন আমলসমূহ টাকা পয়সার বিনিময়ে করা হারাম। ***হিদায়া*** গ্রন্থে এসেছে, ইবাদতে মাকসুদার বিনিময়ে মজুরী নেয়া জায়িয হবে না। রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, তোমরা কুরআন শরীফ তিলাওয়াত কর, তার বিনিময়ে কিছু গ্রহণ করে খাবে না। ***শারহু বিকায়া*** গ্রন্থে বলা হয়েছে, প্রকৃত কথা হলো- আমাদের (হানাফী) মাযহাব মতে ইবাদত ও গুনাহর কাজের বিনিময়ে মজুরী নেয়া বৈধ নয়। আল্লামা তাজুস সিরিয়া বলেন, নিশ্চয়ই মজুরী লাভের বিনিময়ে পবিত্র কুরআন পড়ালে সওয়াব হবে না। না মৃতের জন্য না পাঠকের জন্য। আল্লামা আইনীর মতে উভয়ে গুনাহগার হবে। আল্লামা খায়রুদ্দিন রমলী ***বাহরুর রায়িক*** গ্রন্থের টীকায় লিখেন, কুরআন শিক্ষা দেয়ার বিনিময়ে মজুরী গ্রহণ করা মুজতাহিদ ইমামগণ বৈধ বলেছেন, কিন্তু শুধু কুরআন তিলাওয়াতের বিনিময় গ্রহণ করাকে অবৈধ বলেছেন।

ফকীহগণ এও বলেছেন, টাকা পয়সার বিনিময়ে কুরআন পাঠকারীর জন্য কোন সওয়াব নেই। সুতরাং সে মৃতকে কোথা থেকে হাদিয়া দেবে? শুধু তিলাওয়াতের বিনিময়ে মজুরী নেয়া বৈধ বলে ইমামগণের কেউ অভিমত দেননি। তবে মজুরীর বিনিময়ে কুরআন শিক্ষা দেওয়া বৈধ না হলে কুরআন শিক্ষা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। পবিত্র কুরআনে আরো এসেছে, 'নিশ্চয় যারা আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাবকে গোপন করে এবং এর বিনিময়ে পার্থিব অর্থ সম্পদ গ্রহণ করে তারা নিজেদের পেটে দোযখের আগুন ব্যতীত অন্য কিছু পুরে না। আল্লাহতাআলা কিয়ামতের দিনে তাদের সাথে দয়াদ্র হয়ে কথা বলবেন না, তাদেরকে গুনাহ হতে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে'।[২] পবিত্র কুরআনে আরো এসেছে- 'আমি তোমাদের নিকট কোন বিনিময় প্রার্থনা করছি না; বরং আমার বিনিময় একমাত্র আল্লাহ পাকই দেবেন।[৩] আবূ দাউদ শরীফে এসেছে হযরত আবূ হুরায়রা রা. এর বর্ণনা, জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে আল্লাহর রাস্তায় যে জিহাদ করা হয় তা পার্থিব সম্পদ অর্জন লক্ষ্যে করেছে তার কি বিধান? রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, সে কোন নেকি পাবে না।[৪] অন্য এক হাদীসে এসেছে, عن ابي هريرة الله عليه و سلم من تعلم علما مما يبتغي به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها হযরত আবূ হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, ইল্‌ম যদ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, দুনিয়ার কোন সামগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি তা শিক্ষা করবে কিয়ামতের দিন সে বেহেশতের গন্ধও লাভ করতে পারবে না। (আবূ দাউদ)[৫] যারা জাওহারা নিয়াবা, ফাতাওয়া আলমগীরি, বাহরুর রায়িক, ফাতাওয়া হামীদ আফিন্দী, তাহতাবী, আল-আসবা, ফাতাওয়া আযীযিয়া, তাফসীরে ফাতহুল আযীয ইত্যাদি গ্রন্থের বরাত দিয়ে কুরআন পাঠ ও তাসবীহ তাহলীল পাঠের বিনিময়ে টাকা পয়সা গ্রহণ করা বৈধ বলে ফাতাওয়া দিয়েছেন মুফতী ফয়যুল্লাহ ঐ সব বক্তব্য ও উদ্বৃতির বিস্তারিত জবাব দিয়েছেন এবং এ বিষয়টি প্রমাণ করতে প্রয়াস পেয়েছেন যে, ইবাদতে মাকসুদার বিনিময়ে টাকা পয়সা গ্রহণ করা বৈধ নয়।[৬]

---

১. আল- কুরআন, ২ : ৪১।
২. আল- কুরআন, ২ : ১৭৪।
৩. আল- কুরআন, ২৬ : ১০৯।
৪. *মেশকাত শরীফ*, (নূর মুহাম্মদ আ'জমী, অনূ), প্রাগুক্ত, খ. ২য়, পৃ. ২২, হাদীস নং ২১৪।
৫. ঐ,
৬. ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মদ, মুফতী, রাফিউল ইশকালাত আলা হুরমাতিল ইসতীজারি আলাত তা'আতি, চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, পৃ. ২-৬৪।

২. তাওযীহুল বায়ান ফী হুকমি তালাকিল গাযবান

توضيح البيان في حكم طلاق الغضبان

মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ রচিত ফিক্‌হ বিষয়ক এ পুস্তিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা আট। মূল ভাষা ফার্সী। রচনাকাল ২০-০৬-১৩৪০ হি.। এর উর্দু অনুবাদ করেছেন মুফতী মুহাম্মদ ইযহারুল ইসলাম চৌধুরী। প্রকাশ করেছে কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। প্রকাশকাল অজ্ঞাত। মূল ফার্সীর সাথে উর্দু অনুবাদ যুক্ত রয়েছে। নেশাগ্রস্থ, মাতাল রাগ ও উত্তেজনাবশত: স্ত্রীকে তিন তালাক দিলে তালাক পতিত হবে এটি পুস্তিকার মূল বক্তব্য। হতবুদ্ধি, বিকৃত মস্তিস্ক, নির্বোধ, মানসিক বিকারগ্রস্থ, পাগল, নাবালেগ ছেলে এবং কখনো পাগলের প্রলাপ বকে, কখনো ভাল কথা বলে এমন ব্যক্তির তালাক পতিত হবে না বলে *দুররে মুখতার*, *আত-তানকীহ*, *তানবীর*, *তাতারখানিয়া*, ইত্যাদি গ্রন্থের বরাত উল্লেখ করেছেন। যাদের কথাবার্তা, কর্ম, আচরণে অসংলগ্নতা রয়েছে, কখন কি বলছে তা নিজেও মনে রাখতে পারে না, এমন ব্যক্তির তালাক পতিত হবে। কেউ ইচ্ছা করে জ্ঞান বুদ্ধির বিকৃতি ঘটালে অর্থাৎ নেশাগ্রস্থ হয়ে মাতাল অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দিলে তালাক পতিত হবে না। এমতাবস্থায় তালাক কার্যকর করার বিষয়ে হানাফী ফকীহগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। উদ্দেশ্য এ ধরণের অপরাধ প্রবণতা প্রতিরোধ করা।[১]

৩. ইনজাহুল হাজাত রিসালাহ রাহে নাজাত ফার্সী

انجاح الحاجات رساله راه نجات فارسي

এটা মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহর অনুবাদগ্রন্থ। বত্রিশ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটির মূল লেখক মাওলানা মুহাম্মদ আলী পানিপথী র.। এর আরবী অনুবাদ করেছেন মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ। অনুবাদকাল মহররম ১৩৬৫ হি.। গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী চট্টগ্রাম। প্রকাশকাল অজ্ঞাত। গ্রন্থটি ফিক্হ হানাফী বিষয়ক। হানাফী মাযহাব মতে মাস'আলাসমূহ আলোচনা করা হয়েছে। উর্দু ভাষায় রচিত এ ছোট্ট মূল কিতাবটি বাংলাদেশে কওমী মাদ্রাসাসমূহে প্রাথমিক স্তরে পড়ানো হয়। তবে গ্রন্থের বিষয়বস্তু সবার জন্য উপকারী। গ্রন্থে ঈমানের মৌলিক বিষয়সমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। অতপর অযু, গোসল, তায়াম্মুম, হায়েয-নেফাস, নামাযের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নতসমূহ, বিভিন্ন প্রকার নামায, কবর যিয়ারত, যাকাত, সদকা-ফিতর, কুরবানী, রমযানের রোযা, ই'তিকাফ এবং হজ্বের বিষয়গুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। সংক্ষিপ্ত পরিসরে এগুলো মুখস্ত রেখে আমল করার উপযোগী। এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে মুফতী সাহেব এর উর্দু অনুবাদ করেছেন। উর্দু অনুবাদে প্রশংসা করেছেন, দারুল উলূম দেওবন্দের খ্যাতিমান উস্তাদ, মাওলানা ইব্রাহীম বলিয়াবী র.। পুস্তিকাটি অনুবাদ করে মুফতী সাহেব তাঁর আরবী ভাষা জ্ঞানের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সাথে সাথে আরবী ভাষাবিদদের নিকট এ পুস্তিকাটি পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছেন।[২]

৪. দাফউল ই'তিসাফ ফী আহকামিল ই'তিকাফ

دفع الاعتساف في احكام الاعتكاف

গ্রন্থটির রচয়িতা মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ র.। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা চব্বিশ। রচনার ভাষা ফার্সী। এর উর্দু অনুবাদ করেছেন মুফতী মুহাম্মদ ইউসুফ ইসলামাবাদী। মূল গ্রন্থের সাথে উর্দু অনুবাদ যুক্ত রয়েছে। গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন মৌলবী মুহাম্মদ কাসিম ফয়যী। প্রকাশক কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী চট্টগ্রাম। গ্রন্থের রচনাকাল ১২মহররম ১৩৭৬ হি.। প্রকাশকাল অজ্ঞাত। ই'তিকাফের মাস'আলা আলোচনায় গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। 'একাধারে চল্লিশ দিন ই'তিফাক করা নফল; এরচেয়ে বেশিদিন ই'তিকাফ করার মধ্যে কোন ফযীলত আছে মর্মে কোন নস নেই।' এ ধরণের বক্তব্যের প্রতিবাদ করা হয়েছে এ গ্রন্থে। মাযহাবের ইমামগণ, নির্ভরযোগ্য ফকীহগণের মাধ্যমে এ বিষয়ে কোন বক্তব্য আসেনি।

---

১. ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মদ, মুফতী, তাওযীহুল বায়ান ফী হুকমি তালাকিল গাযবান, চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, তা. বি. পৃ. ১-৮।
২. ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মদ, মুফতী, রাহে নাজাত ফার্সী, চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, তা. বি. পৃ. ১-৫।

সালফে সালিহীন এ ধরণের ই'তিকাফ করেছেন বলে কোন বর্ণনা পাওয়া যায়নি। সুতরাং চল্লিশ দিন ই'তিকাফ করা মুস্তাহাব বা নফল এমন দাবী সম্পূর্ণ নিজস্ব। হাদীসে এ মর্মে কোন দুর্বল বর্ণনাও পাওয়া যায়নি। এ ধরণের ই'তিকাফের উদ্ভাবন ও ফযীলত বর্ণনা করা স্পষ্টত বিদআত। হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী র.-এর বরাতে তারা চল্লিশ দিন ই'তিকাফের বিষয়টি প্রমাণের অপচেষ্টা করেছেন। প্রকৃত তিনি সাধারণ জনগণ, সাগরেদ, বিশেষ খলীফাকেও চল্লিশ দিন ই'তিকাফের কথা বলেননি। চল্লিশ দিন ই'তিকাফের জন্য কোন মসজিদে সমবেত হওয়া, সেখানে যাওয়ার জন্য বিশাল আয়োজন সাজানো, উচ্চস্বরে যিক্র করা-সাহাবা, তাবিঈন, মুজতাহিদ ইমাম, আকাবিরে দেওবন্দ হতে প্রমাণিত নয়। রাসূলুল্লাহ সা. এক বছর ই'তিকাফ করতে পারেননি বিধায় পরবর্তী বছর বিশ দিন ই'তিকাফ করেছেন। অন্যথায় তিনি সর্বদা দশদিন ই'তিকাফ করেছেন। অপরদিকে মসজিদে সারা রাত উচ্চ স্বরে যিক্র করে মানুষের ঘুম ও আরামের ব্যাঘাত ঘটানো অন্যায় কাজ। গ্রন্থে অপর একটি বিষয়েরও আলোচনা হয়েছে। ওয়াজ মাহফিলে সুর করে অধিক পরিমাণে শের গাওয়া তাঁর মতে নিন্দনীয়। সুর ছাড়া কবিতা পাঠ বৈধ। কুরআন হাদীসের উদ্ধৃতি ছেড়ে দিয়ে অধিক পরিমাণে কবিতা আবৃত্তি নিন্দনীয়। গ্রন্থের বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত একটি সার কথা মুফতী সাহেব সংযোজন করেছেন যার রচনাকাল ৩০ জমাদিউল আখির ১৩৭৯ হি.। এখানেও তিনি পূর্বের বক্তব্যের সারকথা ব্যক্ত করেছেন।[১]

৫. হুকমু ইস্তি'মালি মুকাব্বিরুস্ সাওত حكم استعمال مكبر الصوت

চব্বিশ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটি মুফতী ফয়যুল্লাহ আরবী ভাষায় রচনা করেছেন। এর উর্দু অনুবাদ করেছেন মুফতী মুহাম্মদ ইউসুফ ইসলামাবাদী। মূল গ্রন্থের সাথে উর্দু অনুবাদ সংযোজিত। গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে কুতুবখানা

ফয়যিয়া হাটহাজারী চট্টগ্রাম। গ্রন্থটির রচনাকাল ১ মহররম ১৩৭৭ হি.। রচনার স্থান হাটহাজারী। প্রকাশকাল অজ্ঞাত। এ গ্রন্থে ওয়াজ নসীহতে লাউড স্পীকার, টেপ রেকর্ডার, রেডিও, ইত্যাদি ব্যবহারের নীতিমালা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তার সাথে আলোচনা করেছেন ওয়াকফকৃত বস্তুর ব্যবহারবিধি সংক্রান্ত একটি ফাতাওয়া এবং কওমী মাদ্রাসাসমূহের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ। মুফতী সাহেবের বক্তব্য মতে আওয়াযে উচ্চস্বর সৃষ্টি করে অপরের নিকট পৌঁছানোর মাধ্যম মাইক, লাউডস্পীকার ইত্যাদি, ওয়াযের সময় প্রয়োজনে ব্যবহার করা বৈধ। কারণ, ওয়াজের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে অপরের নিকট দীনের আহ্বান পৌঁছে দেয়া। তাই উচ্চস্বরে আওয়াযের ব্যবস্থাকরণ ব্যতীত তা সম্ভব নয়। সে হিসেবে মাইক, লাউডস্পীকার ব্যবহার করা বৈধ।

তবে মসজিদে খুতবা পাঠকালে লাউডস্পীকার ব্যবহার করা ইবাদতের মর্যাদাকে কমিয়ে দেয়। বরং গান বাজনার ন্যায় মনে হয়। তাই খুতবা ও নামাযের সময় এর ব্যবহার দোষনীয়। তদ্রুপ আজানের সময় এ যন্ত্রের ব্যবহার না করা চাই। কারণ আযান বরকতপূর্ণ ইবাদত এবং ইসলামী নিদর্শন। কারণেই আযানের শব্দসমূহে কোন হ্রাস বৃদ্ধি নেই এবং আরবী ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা আযানের শব্দসমূহ উচ্চারণ করা বৈধ নয়। তাই আযানে লাউডস্পীকার ব্যবহার উচিত নয়। তবে সবার নিকট আযানের আওয়াজ পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে উঁচুস্থানে দাঁড়িয়ে আযান দেবে। আযান ইবাদত হিসেবে গণ্য বিধায় মহিলা, ফাসেক, পাগল, জুনুবী ব্যক্তির আযান দেওয়া বৈধ নয়। বসে, কিবলার দিকে পিঠ করে আযান দেওয়া বৈধ নয়। মোট কথা আযান খাস ইবাদত এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম। কারণেই আযান, খুতবা, কুরআন তিলাওয়াত, ও নামাযে লাউডস্পীকার ব্যবহার করা বৈধ নয়। ব্যবহার করলে সালফে সালিহীনের আমলের পরিপন্থী আমল বলে গণ্য হবে। এছাড়া আযান, নামায, খুতবা ইত্যাদিতে লাউডস্পীকার ব্যবহার করলে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে জটিল সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। তখন পুনরায় মাইক ছেড়ে মিনারায় দাঁড়িয়ে আযান দিতে হয়। কারণেই লাউড স্পীকার ব্যবহার করা অনুচিত। তবে ওয়াজ নসীহতের সময় একান্ত প্রয়োজনে শ্রোতাদের নিকট আওয়ায পৌঁছানোর লক্ষ্যে ব্যবহার করা বৈধ।[২]

---

১. ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মদ, মুফতী, দাফউল ই'তিসাফ ফী আহকামিল ই'তিকাফ, চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, তা. বি. পৃ. ৮-১২।
২. ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মদ, মুফতী, হুকমু ইস্তি'মালি মুকাব্বিরুস্ সাওত , চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, তা. বি. ১-১২।

৬. আল-কাওলুস সাদীদ ফী হুকমিল আহওয়ালি ওয়াল মাওয়াজীদ
القول السديد في حكم الا حوال والمواجيد

মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ রচিত ১২ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা। পুস্তিকার বিষয়বস্তু ফিক্হ। পুস্তিকার ভাষা ফার্সী তবে অধিকাংশ উদ্ধৃতি আরবী। রচনাকাল ১২ রবিউল আউয়াল ১৩৭২ হি.। পুস্তিকার উর্দু অনুবাদ করেছেন মুফতী মুহাম্মদ ইউসুফ ইসলামাবাদী। উর্দু অনুবাদ মূল গ্রন্থের সাথে যুক্ত রয়েছে। প্রকাশক মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন ফয়যী। প্রকাশ করেছে কুতুবখারা ফয়যিয়া হাটহাজারী চট্টগ্রাম। প্রকাশকাল ১৩৭৩ হি. / ১৯৫৩ খৃ.। পুস্তিকার বিষয়বস্তু হলো- বিভিন্ন হালকা-ই যিক্র, ওয়ায-নসীহতের সময় না'ত, গযল, জোশ সৃষ্টিকারী বক্তৃতা শুনে ইশ্ক, আবেগ, উত্তেজনাময় কবিতা আবৃত্তি শোনে শ্রোতারা যে ভাবাবেগে উত্তেজিত হয়ে ওঠে, নারায়ে তাকবীর শ্লোগান দেয়, মাটিতে গড়াগড়ি খায়, হাত-পা ছুড়ে মারে, বেহুশ হয়ে যায়; এসব বিষয় নিষেধ করা হয়েছে। মুফতী সাহেবের মতে এগুলো অপছন্দনীয়, নিন্দনীয়, সুন্নত পরিপন্থি। এগুলো বানোয়াট, নিসন্দেহে অনর্থক কাজ, নিষিদ্ধ কর্ম, সালফে সালিহীন তথা- সাহাবা, তাবিঈন, মুজতাহিদ ইমামগণের আমল পরিপন্থি। শামাইলে তিরমিযীর বর্ণনামতে রাসূলের মজলিসসমূহে কখনো এমন হয়নি; বরং রাসূলের মজলিস ছিল ইল্ম, হায়া, সবর ও আমানতের মজলিস।সেখানে কোন উচ্চ আওয়াজ হতনা, মজলিসে সমবেতগণ এমন ভাবে মাথা নীচু করে নীরবে বসতেন যেন তাদের মাথায় পাখী বসে আছে। হৃদয়কে প্রভাবিত করে, ভেতরকে প্রচন্ডভাবে নাড়া দেয় এমন বয়ান শুনলে পর শরীরের পশম দাঁড়িয়ে যাওয়া, অশ্রূ প্রবাহিত হওয়া, অন্তরে ভয়-শংকা সৃষ্টি হওয়া প্রশংসনীয় ও দীনদারীর

বিষয়। সালফে সালিহীনের জীবনে এমন হয়েছে। কুরআন-হাদীসে এর প্রমান রয়েছে-
الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব যা সুসামঞ্জস্য এবং যা পুন: পুন: আবৃত্তি করা হয়। এতে যারা তাদের প্রভুকে ভয় করে তাদের শরীর রোমাঞ্চিত হয়।'[১] পবিত্র কুরআনের আয়াত ও হাদীসের মাধ্যমে এটা প্রমানিত হয়নি যে, উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে নারায়ে তাকবীর শ্লোগান দিতে হবে, মাটিতে লুটিয়ে পড়তে হবে। ইমাম শাতিবী তাঁর ***আল-ই'তিসাম*** গ্রন্থে লিখেন, সাহাবীগণের মধ্যে যে ভাবাবেগ, উত্তেজনা সৃষ্টি হত তা ছিল হৃদয়ের, ভয়ের অংশ। বেহুঁশ হয়ে যাওয়া, চিৎকার করা, বকওয়াস করা ইত্যাদি ছিল না। আব্দুল্লাহ ইব্ন ওমর রা. একদিন একজন ইরাকি অধিবাসীর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তখন মাটিতে গড়িয়ে পড়েছিলেন। তার পার্শ্বে লোকের সমাগম হয়েছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ঘটনা কি? লোকেরা জানালো, যখন এ ব্যক্তির নিকট কুরআন শরীফ পাঠ করা হয় অথবা যখন তার নিকট আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় তখন আল্লাহর ভয়ে মাটিতে গড়াগড়ি খায়। আবদুল্লাহ ইব্ন ওমর রা. বললেন, আল্লাহর কসম! নিঃসন্দেহে আমরাও আল্লাহকে ভয় করি কিন্তু আমরা মাটিতে লুটিয়ে পড়িনা। আনাস ইব্ন মালিক রা.-এর এক বক্তব্যে এসেছে, কুরআনের মজলিসে বেহুশ হয়ে যাওয়া খারিজীদের কাজ। ওয়াযের মজলিসে চিৎকার দিয়ে ওঠা, বেহুঁশ হয়ে যাওয়া, শোরগোল করা শয়তানের কাজ। মুফতী সাহেব আল্লামা হুলওয়ানীর বরাত দিয়ে বলেন, কাওয়ালী গাওয়া, শোনা, আবৃত্তি, নাচ ইত্যাদি যেগুলোকে বর্তমানে সুফী ও মারিফতের দাবীদাররা করে থাকেন এগুলো হারাম। এধরণের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা এর জন্য বসা বৈধ হবে না। সাধারণ গান, বাঁশির সুর শোনা আর এসবের মধ্যে কোন তফাত নেই। প্রকৃত অর্থে ইবাদতে ইখলাস অর্জন করা, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত থাকা পরকালীন মুক্তির জন্য নেক কাজে লিপ্ত থাকা এসব অভ্যাস অর্জিত হলেই কামিল বুযুর্গ হওয়া যায়। ওয়াজ-নসীহতের সময় ইশক, আবেগ-উত্তেজনা, লাফিয়ে ওঠা, কাশফ, কারামত প্রকাশ পাওয়া জরুরী কিছু নয়।[২]

১. আল-কুরআন, ৩৯ : ২৩।
২. ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মদ, মুফতী, ***আল-কাওলুস সাদীদ ফী হুকমিল আহওয়ালি ওয়াল মাওয়াজীদ,*** চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, তা. বি. পৃ. ২-৭।

৭. যাম্মুল ইকছার ফী ইনশাদিল আশ'আর ওয়াল ই'রাজ আন বায়ানিল আহকামি ওয়াল আছারি
ذم الاكثار في انشاد الاشعار والاعراض عن بيان الاحكام والاثار
এটা মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ রচিত **১২** পৃষ্ঠার ফিক্হ বিষয়ক একটি পুস্তিকা। এর ভাষা ফার্সী। রচনাকাল **২৩** জমাদিউস সানী **১৩৭৩** হি.। পুস্তিকার উর্দু অনুবাদ করেছেন মুফতী মুহাম্মদ ইউসুফ ইসলামাবাদী। গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী চট্টগ্রাম, প্রকাশক, মৌলবী মুহাম্মদ হুসাইন ফয়যী। প্রকাশকাল অজ্ঞাত। মূল গ্রন্থের সাথে উর্দু অনুবাদ যুক্ত রয়েছে। পুস্তিকার বিষয়বস্তু হল- ওয়ায-নসীহতে, বয়ানে, অধিকমাত্রায় শে'র- কবিতা আবৃত্তি করা এবং কুরআন হাদীসের আলোচনা থেকে বিরত থাকার সমালোচনা। ওয়াইয-বক্তাগণ সব মৌসুমে, সব জায়গায়, সবধরণের শ্রোতার সামনে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আকর্ষনীয় কণ্ঠে কবিতা, শে'র, গজল ইত্যাদি গেয়ে থাকেন। কুরআন-হাদীসের আলোচনা যৎসামান্য করেন মাত্র। এর ফলে উম্মত গুমরাহ হচ্ছে। দীনী ইলম থেকে বঞ্চিত থাকছেন। এটা অনুচিত। রাসূলুল্লাহ সা. উম্মতকে কিভাবে হিদায়াত করেছেন তার বর্ণনা পবিত্র কুরআনে এসেছে-
لقد من الله علي المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلوا عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب و الحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلل مبين তাদের নিজেদের মধ্যে হতে তাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করে আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন। সে তাঁর আয়াত তাদের নিকট আবৃত্তি করে, তাদেরকে পরিশোধ করে এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়। যদিও তারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিল।[১] পবিত্রকরন দ্বারা উদ্দেশ্য শির্ক, গুনাহ, সব ধরণের অপবিত্রতা হতে পবিত্র করা। কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য এর বিধি-বিধান, ফরযসমূহ, মাসআলা ইত্যাদি। হিকমত দ্বারা উদ্দেশ্য সুন্নত তরীকা। রাসূলুল্লাহ সা.

খুলাফা-ই রাশিদীন ওয়াজ নসীহতে খুতবাসমূহে কবিতা, শে'র আবৃত্তি, গযলখানি করেছেন বলে প্রমাণ নেই। বরং কবিতা রচনা, আবৃত্তি নিয়ে ব্যস্ত থাকতে কুরআন হাদীসে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। আল্লাহতাআলা পবিত্র কালামে বলেন- وما علمناه الشعروما ينبغي له ان هو الا ذكر و قرأن مبين আমি রাসূলকে কাব্য রচনা করতে শিখাইনি এবং এটা তার পক্ষে শোভন নয়। এটা তো কেবল এক উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুরআন।[২] و الشعراء يتبعهم الغاون এবং কবিদের অনুসরণ করে বিভ্রান্তরাই।[৩] রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, لان يمتلي جوفه احدكم قيحا يريه خير من ان يمتلي شعرا তোমাদের একজনের পেট কবিতায় ভরা থাকা অপেক্ষা বমি ভরা থাকা অধিক ভাল।[৪] রাসূলুল্লাহ সা. আরো বলেন, الشعر من مزامير ابليس কবিতা হলো ইবলিসের বাঁশী।[৫] কবিতার ভাবনা যদি কাউকে পূর্ণ ভাবে আচ্ছন্ন করে, আল্লাহর শরম হতে গাফিল করে, কুরআন পাঠ, আল্লাহর যিক্‌র, ইবাদত হতে বিরত রাখে তাহলে তা অবশ্যই নিন্দনীয় ও পরিত্যাজ্য। এ পর্যায়ে না হলে গুনাহ নেই। কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী র. বলেন, কবিতা বাক্যের সৌন্দর্য, এ নান্দনিকতা ভাল। এর খারাপ দিকটা অপছন্দনীয়। কবিতার পিছনে অধিক সময় ব্যয় করা মাকরূহ। ইমাম গায্‌যালী র. *ইয়াহ্‌ইয়াউল উলূম* গ্রন্থে লিখেছেন, বক্তা যদি মেয়েদের উদ্দেশ্যে রং ঢং ছড়ানোর ইচ্ছা করে, তার লেবাস পোশাক, আচরণ, বাচনভঙ্গিতে অধিক কবিতা পড়ার অভ্যাস থাকে তার মজলিসে নারীরা থাকে তাহলে এটা নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয়। তাকে বারণ করা ওয়াজিব। কারণ এর দ্বারা সংশোধনের চেয়ে বিগড়ে যাওয়ার আশংকা বেশি। মুফতী সাহেবের মতে ওয়াইয-বক্তাদের মধ্যে দ্বিতীয় বিভ্রান্তি হল তারা মাউযু হাদীস, ভুল বর্ণনা, বানোয়াট গল্প কিস্‌সা- কাহিনী বলে থাকেন। যা নির্ভরযোগ্য কিতাবে পাওয়া যায় না। তিনি *ইয়াহ্‌ইয়াউল উলূমের* উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, এ ধরণের বক্তাদেরকে ইমাম গায্‌যালী র. শয়তান বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাদের বিভ্রান্তি শয়তানের বিভ্রান্তির চেয়ে মারাত্মক। এসব বক্তার নিয়্যত শুদ্ধ নয়, এটাই বাস্তব।[৬]

---

১. আল কুরআন, ৩: ১৬৪।
২. আল কুরআন, ৩৬ : ৬৯।
৩. আল কুরআন, ২৬ : ২২৪।
৪. তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং- ২৮৫১।
৫-৬. ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মাদ, মুফতী, যাম্মুল ইকছার ফী ইনশাদিল আশ'আর ওয়াল ই'রাজ আন বায়ানিল আহকামি ওয়াল আছারি , চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, তা: বি: পৃ. ৩, ৫, ১৩।

৮. হুকমুত তাকাল্লুমি বিন- নিয়্যাতি বিল- লিসানিল আরাবিয়্যে

حكم التكلم بالنية باللسان العربي

এটা মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ রচিত ৬ পৃষ্টার ফিক্‌হ বিষয়ক একটি পুস্তিকা। এর ভাষা ফার্সী। এর উর্দু অনুবাদ করেছেন মুফতী মুহাম্মদ ইউসুফ ইসলামাবাদী। এর উর্দু অনুবাদ মূল গ্রন্থের নিচে রয়েছে। রচনাকাল ১৩৬৬ হি.। প্রকাশক মৌলবী মুহাম্মদ হুসাইন ফয়যী। প্রকাশকাল অজ্ঞাত। গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী চট্টগ্রাম, পুস্তিকার বিষয়বস্তু হল- নামাযের নিয়্যত আরবীতে উচ্চারণ করা জরূরী কি না? এ প্রশ্নের উত্তরে রচিত একটি ফাতাওয়া। এ ফাতাওয়ায় মুফতী সাহেবের মূল বক্তব্য হলো: ইবাদতের মূল বিষয় নিয়্যত। বিশুদ্ধ নিয়্যত ছাড়া আল্লাহর দরবারে কোন আমল, ইবাদত গ্রহণযোগ্য হয় না। রাসূলুল্লাহ সা. হাদীসে বলেছেন- انما الاعمال بالنيات و انما لامري ما نوي فمن كانت هجرته الي دنيا يصيبها او الي أمرأة ينكحها فهجرته الي ما هاجر اليه প্রত্যেক কাজ নিয়্যতের সাথে সম্পৃক্ত। আর মানুষ তার নিয়্যত অনুযায়ী ফল পাবে। যার হিজরত হবে দুনিয়া লাভের অথবা কোন নারীকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে; সে উদ্দেশ্যই হবে তার প্রাপ্য।[১] শরীআতে নিষিদ্ধ, অবৈধ, হারাম, গুনাহর কাজে ভাল নিয়্যত গ্রহণযোগ্য নয়। নিয়্যতের কারণে অনেক ছোট আমল বিশাল নেকীর কারণ হবে। আবার নিয়্যত না থাকার কারণে বহু ইবাদত বন্দেগী, ভাল কাজ পুণ্যে পরিণত হবে না। নিয়্যত না থাকলে নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, দান-খয়রাত কোনটাই আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হয় না। তাই নিয়্যত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নিয়্যত আরবী শব্দ এর অর্থ অন্তরে কোন কাজের সংকল্প করা, ইচ্ছা করা। আমি

আল্লাহর ওয়াস্তে নামায পড়ছি এমন ইচ্ছা, সংকল্পই নিয়্যত। সুতরাং তা অন্তরের কাজ। মুখে বলা আবশ্যক নয়। যদি মুখে বলা হয় কিন্তু অন্তরে তা উদয় না থাকে ঐ নিয়্যত শুদ্ধ নয়। পক্ষান্তরে অন্তরে নিয়্যত আছে কিন্তু মুখে বলা হয়নি অথবা মুখে তার বিপরীত বলা হয়েছে তাতে ক্ষতি নেই। ফকীহগণের বক্তব্য হলো- উচ্চ স্বরে নিয়্যত বলা শরী'আতে জরূরী নয়। নামাযের জন্য মুখে নিয়্যত বলা শর্ত নয়। তবে পরবর্তী যুগের হানাফী ফকীহগণ বলেছেন অন্তরে নিয়্যতের সাথে মুখেও বলা বৈধ এবং উত্তম। মুখে বলা এবং অন্তরের অবস্থা একত্রিত হলে নিয়্যতের শক্তি বৃদ্ধি পায়। ফাতাওয়া শামী গ্রন্থে এসেছে এটা বিদআতে হাসানা অর্থাৎ সুন্নতের সাথে যুক্ত। নিয়্যত হলো দুটো বিষয়ের মধ্যে একটিকে প্রাধান্য দেওয়া। যেমন: ইখলাসের সাথে নামায পড়ছি এমন নিয়্যত করতে হবে। এর দ্বারা মনকে বিক্ষিপ্ত চিন্তা হতে মুক্ত করে নামাজের মধ্যে নিয়ে আসা যায়। কারণেই সাধারণ নিয়্যত গ্রহণযোগ্য নয়। আরবী নিয়্যত করার বিষয়ে মুফতী সাহেব বলেন, এ বিষয়ে ইমামগণের মতানৈক্য রয়েছে। এ বিষয়ে সালফে সালিহীনগণের বর্ণনা না থাকার কারণে তা বিদআত। *দুররে মুখতার* গ্রন্থে এসেছে- রাসূলুল্লাহ সা., সাহাবা, তাবিঈগণ হতে এ আমল বর্ণিত নয়। রাসূলুল্লাহ সা. যখন নামাযের জন্য দাঁড়াতেন তখন আল্লাহু আকবার বলতেন, অন্য কিছু বলতেন না। মুজাদ্দিদ র. বলেছেন আরবীতে নিয়্যত করা- রাসূলুল্লাহ সা. সাহাবা, মুজতাহিদ ইমামগণ হতে বর্ণিত নয় বিধায় তা নিষিদ্ধ। আধুনিককালের ফকীহ মুফতীগণের মতে মাতৃভাষায় নিয়্যত করা মুস্তাহাব ও উত্তম। আরবী ভাষায় করতে হবে এমনটি মুস্তাহাব নয়। তবে বৈধ। সাধারণ মানুষের পক্ষে আরবী উচ্চারণ করা এর অর্থ ও মর্ম জানা কঠিন বিধায় আরবীতে উচ্চারণ করা তাদের জন্য জরূরী নয়।[২]

৯. কারাহাতু তাকরারিল জামা'আতি كراهة تكرار الجماعت

এটা মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ রচিত একটি ফাতাওয়া পুস্তিকা। এ পুস্তিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০। এর ভাষা আরবী। রচনাকাল ১৩৫৭ হি.। গ্রন্থটির উর্দু অনুবাদ করেছেন মুফতী মুহাম্মদ ইউসুফ

১. *বুখারী শরীফ*, সম্পাদনা পরিষদ, ইফাবা, ২০১১, খ. ১ম, সং. ১০ম, পৃ. ৩, হাদীস নং-১।
২.ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মাদ, মুফতী, হুকমুত তাকাল্লুমি বিন- নিয়্যাতি বিল- লিসানিল আরাবিয়্যে, চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, তাঃ বিঃ পৃ. ১, ২, ৩, ৫।

ইসলামাবাদী। মূল গ্রন্থের নীচে উর্দু অনুবাদ যুক্ত রয়েছে। পুস্তিকাটি প্রকাশ করেছে কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। প্রকাশক মৌলবী মুহাম্মদ হুসাইন ফয়যী। প্রকাশকাল অজ্ঞাত। এ পুস্তিকায় মহল্লার মসজিদে দ্বিতীয়বার জামা'আতের সাথে নামায পড়ার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ পুস্তিকায় মুফতী সাহেব বলেন, মহল্লার মসজিদে মহল্লাবাসী প্রথমবার জামাআতের সাথে নামায আদায়ের পর দ্বিতীয়বার তাতে জামাআতে নামায পড়া মাকরূহ। দ্বিতীয়বার আযান, ইকামতসহ প্রথম জামাআতের ন্যায় আদায় করুক বা শুধু জামাআত আদায় করুক সর্বাবস্থায় মাকরূহ। হানাফী মাযহাবের তিন ইমামের (আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ র., মুহাম্মদ র.) অভিমত *দুররে মুখতার* গ্রন্থেও দ্বিতীয়বার জামাআত পড়াকে মাকরূহ বলা হয়েছে। যদি রাস্তার পাশের মসজিদ হয় অর্থাৎ মসজিদের আশে পাশে জনবসতিপূর্ণ কোন মহল্লা, দোকানপাট, ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র ইত্যাদি না থাকে; শুধুই পথিকদের জন্য ঐ মসজিদ বানানো হয়ে থাকে তাহলে দ্বিতীয়বার জামাআত পড়তে কোন ক্ষতি নেই। তদ্রুপ বাজারের মসজিদ অর্থাৎ যেখানে শুধুমাত্র সাপ্তাহে বা মাসে একদিন বা দুইদিন এবং বাজারে আগত লোকেরা ঐ সময়ে নামায পড়ে এমন মসজিদে দ্বিতীয় জামাআত পড়া মাকরূহ নয়। তবে রাস্তায় বা বাজারের আশেপাশে জনবসতি গড়ে ওঠেছে এবং স্থানীয়রা ঐ মসজিদে জামাআতের সাথে নামায আদায় করে থাকে। এমন মসজিদে দ্বিতীয়বার জামাআতের সাথে নামায পড়া ***ইমদাদুল ফাতাওয়ার*** বর্ণনামতে মাকরূহে তাহরীমি। ***রদ্দুল মুহতার*** শামীর বর্ণনা মতেও মাকরূহ। রাসূলুল্লাহ সা. একবার আনসারদের নিকট একটি শান্তি ও সংশোধন বিষয়ক কাজের জন্য

বের হয়েছিলেন। অত:পর ফিরে এসে দেখলেন মসজিদে নববীতে নামাযের জামাআত আদায় হয়ে গেছে। তিনি ঘরে চলে গেলেন এবং স্ত্রীদের নিয়ে ঘরে জামাআতের সাথে নামায আদায় করলেন। কিন্তু মসজিদে দ্বিতীয় জামাআত পড়েননি। হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, আসহাবে রাসূলের নীতি ছিল মসজিদে জামাআত ছুটে গেলে একাকী মসজিদে নামায পড়ে নিতেন। বাদায়ে’ গ্রন্থে এসেছে দ্বিতীয় জামাআতের ক্ষতিকর দিক হলো- যখন মানুষ জানবে যে, দ্বিতীয় জামাআত পড়া কোন রকম দোষ ছাড়াই বৈধ তাহলে প্রথম জামাআতে উপস্থিত হওয়ার গুরুত্ব কমে যাবে। এতে জামাআতে লোক সংখ্যাও কমে যাবে। পক্ষান্তরে যখন জানবে যে, দ্বিতীয় জামাআত পড়া মাকরূহ তখন প্রথম জামাআতে উপস্থিত হওয়ার বিষয়ে গুরুত্ব দেবে। সে উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করবে ফলে জামাআতে লোক সংখ্যা বেশি হবে। ***ফাতাওয়া যাহিরিয়্যা রদ্দুল মুহতার শামী, হিদায়া, আইনী*** গ্রন্থে বলা হয়েছে- মসজিদে যদি মহল্লাবাসী ব্যতীত অপর কেউ প্রথম জামাআত পড়ে নেয় তাহলে মহল্লাবাসীর পক্ষে উক্ত মসজিদে দ্বিতীয় জামাআত পড়া বৈধ। পক্ষান্তরে মহল্লাবাসী প্রথম জামাআত আদায় করার পর অপর মহল্লার লোকদের জন্য তাতে দ্বিতীয়বার জামাআত পড়া মাকরূহ। এক বর্ণনায়- *ফাতাওয়া* ***বায্যাযিয়া*** **ও** ***ফাতাওয়া তাতারখানিয়া*** বরাতে এসেছে, ইমাম আযম আবূ হানীফার মতে দ্বিতীয় জামাআতের লোক সংখ্যা তিন জনের বেশী হলে মাকরূহ, তিনজনের কম হলে মাকরূহ নয়। ইমাম আবূ ইউসুফ র.-এর মতে দ্বিতীয় জামাআত প্রথম জামাআতের ন্যায় শ্বানদার না হলে মাকরূহ নয়। *। রদ্দুল মুহতার শামী গ্রন্থে* এসেছে- মসজিদে দ্বিতীয় জামাআত, আযান, ইকামত, ব্যতিরেকে হলে মাকরূহ হবে না। এ বক্তব্য সম্বন্ধেও মুফতী সাহেবের বক্তব্য হলো- এ বর্ণনা যাহিরী রিওয়ায়েতে নেই এবং দলীল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয়। এছাড়া যাহিরী রিওয়ায়েত ও গায়রে যাহিরী রিওয়ায়েতের মধ্যে দ্বন্দ্ব হলে যাহিরী রিওয়ায়েতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। যাহিরী রিওয়ায়েতে মহল্লার মসজিদে দ্বিতীয় কোন জামাআত মাকরূহ বলা হয়েছে। সে হিসেবে দ্বিতীয় জামাআত মাকরূহ এ বক্তব্যকে প্রাধান্য দিতে হবে। এর উপর আমল করার মধ্যে অধিক সতর্কতা রয়েছে। সুতরাং যেসব মসজিদে ইমাম, মুয়াযযিন নিয়োজিত আছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআতের সাথে আদায় করা হয় এমন মসজিদে দ্বিতীয় জামাআত পড়া মাকরূহ। [১]

---

১. ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মাদ, মুফতী, ***কারাহাতু তাকরারিল জামা’আতি***, চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, তা: বি: পৃ. ১-১০।

১০. রিসালাতুত তাম্বীহ আলা মুনকিরাতিল কুবূর
رسالة التنبيه علي منكرات القبور

মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ রচিত এ পুস্তিকায় পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪। এর ভাষা ফার্সী। এর উর্দু অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সংযোজন করেছেন মুফতী ইযহারুল ইসলাম চৌধুরী। মূল গ্রন্থের নিচে উর্দু অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সংযোজন করা হয়েছে। পুস্তিকার রচনাকাল ১৩৭০ হি./১৯৫০ খৃ.। মূল গ্রন্থটি প্রথমে হাটহাজারী মাদ্রাসার পক্ষ থেকে আরাকীনে আঞ্জুমানে ইশাআতে ইসলাম কর্তৃক প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে ১৪০০ হি. / ১৭৭৯ খৃ. গ্রন্থটি প্রকাশ করে কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী চট্টগ্রাম। প্রকাশক মৌলবী মুহাম্মদ কাসিম ফয়যী। পরবর্তীতে গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্গানুবাদ করেছেন মুফতী মুহাম্মদ ইউসুফ ইসলামাবাদী। প্রকাশ করেছে কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। পুস্তিকায় আরবী, ফার্সী ভাষায় রচিত অসংখ্য গ্রন্থের উদ্বৃতি রয়েছে বিধায় এর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রন্থটিতে কবর যিয়ারতের বিস্তারিত মাসআলা আলোচিত হয়েছে। এতে মুফতী সাহেবের অভিমত এবং তাঁর মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। পুস্তিকার শুরুতে কবর যিয়ারতের সুন্নত তরীকা আলোচনা করা হয়েছে যে, কবরের নিকট দাঁড়িয়ে পবিত্র কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করত: তা মৃতের জন্য বখশে দেওয়া এবং তার জন্য মাগফিরাতের দু’আ করা। এর দ্বারা নিজের আখিরাতের কথা স্মরণ করে উপদেশ গ্রহণ করা যাবে। এ প্রসঙ্গে তিনি রাসূলুল্লাহ সা. -এর বেশকিছু হাদীসের উদ্বৃতি দিয়েছেন। তন্মধ্যে একটি হাদীস হলো- রাসূলুল্লাহ সা.বলেন- আমি তোমাদেরকে পূর্বে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। তবে আজ হতে তোমরা কবর যিয়ারত কর।

কারণ এটা দুনিয়ার মহব্বত কমিয়ে দেয় এবং আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।[১] এতে আরো বলা হয়েছে- যে ব্যক্তি প্রতি শুক্রবার নিজ পিতা মাতার কবর যিয়ারত করবে তার গুনাহ মাফ করা হবে। তাকে পিতা মাতার সঙ্গে সদাচরণকারী বলে গণ্য করা হবে। বায়হাকী।[২] কবর যিয়ারত প্রসঙ্গে হাদীসের উদ্বৃতি দিয়ে মুফতী সাহেব বলেন, কবরের মায়্যিত একমাত্র ফরিয়াদকারী হিসেবে হাবুডুবু খেতে থাকে, পিতা-মাতা, ভাই-বেরাদর, বন্ধু- বান্ধবদের দুআর অপেক্ষায় থাকে। অত:পর যখন তাঁর নিকট কেউ দুআ পৌঁছায় তখন উক্ত দুআ তার নিকট দুনিয়া এবং দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদ হতে অত্যধিক আদরের বস্তু বলে মনে হয়। তবে মজুরীর বিনিময়ে অন্য ব্যক্তি দ্বারা দুআ করানো বৈধ নয়। তাতে সওয়াব নেই বরং গুনাহ। কোন হাদীস দ্বারাই অপর ব্যক্তির মাধ্যমে কবর যিয়ারত করানোর বিষয়টি প্রমাণিত নয়। তিনি আরো বলেন, কবরে সিজদা করা এর চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করা, তাতে চুমু খাওয়া, কবর পাকা করা, এর উপর ইমারত নির্মাণ করা, গিলাফ দিয়ে ঢেকে দেওয়া, পর্দা লটকানো, কবরবাসীর নিকট উদ্দেশ্য পূরণের আশা করা, কবরে মান্নত করা, দূর দূরান্ত থেকে এসে ওরশ করা, গরু, মহিষ, উট ইত্যাদি পশু নিয়ে হাজির হওয়া, মহিলাদের জমায়েত হওয়া, কবরে মোমবাতি জ্বালানো, পীরের নামে পশু জবাই করা ইত্যাদি শরীআত বিরুদ্ধ, সুন্নত পরিপন্থী কাজ। এসবের মধ্যে অনেক অপকর্মই হারাম, কুফ্‌র, শির্‌ক ও বিদআত বলে গণ্য। সম্পূর্ণই গুনাহর কাজ। এসব থেকে আত্মরক্ষা করা অত্যাবশ্যক। তিনি এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। এক হাদীসে আল্লাহর রাসূল বলেন, আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক খারাপ ঐ ব্যক্তিরাই হবে যাদের জীবিত অবস্থায় কিয়ামত এসে পৌঁছবে এবং যারা কবরগুলোকে সিজদার স্থান বানিয়ে নেবে। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, সফরের প্রস্তুতি তিন মসজিদ ব্যতীত উচিত নয়। ১. পবিত্র মক্কার মসজিদে হারাম ২. ফিলিস্তিনের মসজিদে আকসা (বায়তুল মুকাদ্দাস) ৩. আমার এ মসজিদ (মসজিদে নববী) । উক্ত তিন মসজিদ ব্যতীত সম্মান ও বরকতের স্থান মনে করে সফর করা বৈধ নয়। সওয়াব ও ইবাদত মনে করা তো অনেক দূরের বিষয়। মোট কথা অলি দরবেশগণের মাজার, কবর যিয়ারত করা, ওরশ, বিদআত ও অসংখ্য গুনাহর কর্মস্থলে পরিণত হয়েছে। মুসলমানদের উচিত মাজার এবং মাজারকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত মাহফিলে যোগ না দেয়া, এসব কাজে সহযোগিতা না করা। তাদের দলকে ভারী না করা।

---

১. ফয়যুল কালাম, পৃ. ৩৩৪, হাদীস নং ৬০৭।
২. ঐ, পৃ. ৩৩৪, হাদীস নং ৬০৮।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহতাআলা বলেন,

তোমরা তাকওয়া সৎকর্মে পরস্পরকে সাহায্য কর। গুনাহ ও সীমা লঙ্ঘনে পরস্পর সাহায্যকারী হয়োনা।[১] সুতরাং ওরশ করা, মাজার তৈরী করা, নবীর হোক বা কোন পীর আউলিয়ার হোক সম্পূর্ণ বিদআত ও অবৈধ। রাসূলুল্লাহ সা., সাহাবা, তাবিঈনদের যুগে এসবের নাম নিশানা ছিল না। এ গ্রন্থের প্রশংসা দেওবন্দের আল্লামা ইব্রাহিম বলিয়াবী র. বলেন, মুফতী ফয়যুল্লাহ রচিত গ্রন্থ রিসালাতুত তাম্বীহ আলা মুনকিরাতিল কুবূর সুন্নত পুনরুজ্জীবনে একটি বলিষ্ঠ প্রয়াস। আল্লাহ তাআলা তার আগ্রহকে আরো বাড়িয়ে দিন।[২]

১১. উমদাতুল আকওয়াল ফী রাদ্দি মা ফী আহসানিল মাকাল

عمدة الاقوال في رد ما في احسن المقال

মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ র. রচিত ৪৪ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটি ফার্সী ভাষায় রচিত। গ্রন্থটি মৌলবী মুহাম্মদ আশরাফ আলীর (বাঁশখালী) অনুরোধে রচনা করেছিলেন। গ্রন্থটি ১৩৩৪ হি.মোতাবিক ১৯১৫ খৃ. মাওলানা হাবীবুর রহমানের মালিকানাধীন দেওবন্দের কাসিমী প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত, দুআ- দরূদ পাঠ, নামাযের ইমামত, তদ্রুপ অন্যান্য ইবাদতের কাজে দান সদকা গ্রহণ করার যে রীতি বাংলাদেশে প্রচলিত আছে তার সমর্থনে চট্টগ্রামের নাহলার অধিবাসী মৌলবী জমির উদ্দিন[১] রচিত *আহসানুল মাক্বাল ফী জাওয়াযিল খায়রাতিল মুরাওয়াজাতি ফী মুলুকি বাঙ্গাল*

جواز الخيرات المروجات في ملك بنغال শীর্ষক একটি পুস্তক রচনা করেছিলেন। ঐ গ্রন্থের প্রতিবাদে

মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ ১৩৩৪ হি./১৯১৫ খৃ. উক্ত গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি কুরআন- হাদীস, ফকীহগণের অভিমত এবং বিভিন্ন ফাতাওয়ার কিতাবের মাধ্যমে উপরোক্ত ইবাদতসমূহের বিনিময়ে দানসদকা গ্রহণ করা অবৈধ বলে প্রমাণ করতে সক্ষম হন। তাঁর মতামতকে দেওবন্দের অনেক বড় বড় আলিম সমর্থন করেছেন। [৩] যেমন- দেওবন্দের মাওলানা আযীযুর রহমান, শাহ আনওয়ার কাশ্মীরি, শাব্বীর আহমদ উসমানী, আল্লামা ইব্রাহীম বলিয়াবীর ন্যায় মনীষীগণ এর উচ্চ প্রশংসা করেছেন। ভারতবর্ষের প্রায় একশ' জন আলিম, শাইখ, দিক নির্দেশনা দিয়েছেন এবং দস্তখত দিয়ে এর নির্ভুলতা, গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে দিয়েছেন।[৪] আল্লামা আযীযুর রহমান দেওবন্দী লিখেন 'উমদাতুল আকওয়াল ফী রাদ্দি মা ফী আহসানিল মাকাল' রিসালাটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনেছি। পুস্তিকায় লেখকের নির্ভুল বিশ্লেষণ হানাফী মাযহাবের বিজ্ঞ আলিমগণের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ন্যায় এবং আহসানুল মাকালের লেখক শরীআত অসমর্থিত ও বিদআতকে সমর্থন জানাতে যেসব ভিত্তিহীন, দুর্বল দলীল-প্রমাণের আশ্রয় নিয়েছেন; সেগুলোকে যৌক্তিকভাবে নির্ভরযোগ্য মনীষীগণের বক্তব্য দ্বারা তিনি প্রতিহত করেছেন। আল্লাহ তাঁকে উত্তম পুরস্কার দান করুন এবং হিদায়াতের অনুসারীদের উপর শান্তি বর্ষণ করুন।[৫]

অধম বান্দা

আযীযুর রহমান, মুফতী

মাদ্রাসা আলিয়া দেওবন্দ, ১০ জমাদিউল উলা ১৩৩৪ হি.।

এ গ্রন্থের প্রশংসায় আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী র. লিখেন, এ পুস্তিকার লেখক আমার ভাই মৌলবী ফয়যুল্লাহ সাল্লামাল্লাহুকে আল্লাহ তা'আলা ইলম ও আমলে উচ্চ মর্যদা দান করুন এবং উভয় জগতে কামিয়াব করুন। আল্লাহর মদদে তিনি কঠোর পরিশ্রম, পূর্ণ সতর্কতা, মনোযোগ, দূরদর্শিতা ও

---

১. আল কুরআন, ৫ : ২

২. ফয়যুল্লাহ, মুফতী, মুহাম্মদ, রিসালাতুত তাম্বীহ আলা মুনকিরাতিল কুবূর, চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, ১৪০০ হি. পৃ. ১-২৪; আব্দুল বাকী, মুহাম্মদ, ড. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫।

৩. যিনি এক সময় মিরাঠের ইসলামীয়া মাদ্রাসার ছাত্র ছিলেন। তিনি প্রচলিত নযর- নিয়ায, দান-অনুদান, শিরনী ইত্যাদির প্রচলনকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।

৪-৫. হায়াতে মুফতী আযম, পৃ. ৯৬-৯৭; আব্দুল বাকী, মুহাম্মদ, ড. , প্রাগুক্ত , পৃ. ১৪৪।

দূরদৃষ্টির মাধ্যমে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এ সময়ের মানবরূপী শয়তানের ভন্ডামীর মুলোচ্ছেদ করেছেন। মানুষকে কূপথে পরিচালনা করা ও গুমরাহীর যে সয়লাব নতুনভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছিল এর মূল ও শিকড় উৎপাটন করেছেন। সম্ভবত বিদআতকে ছড়িয়ে দিতে এবং ইবাদতের বিনিময়ে মূল্য গ্রহণ করা বৈধ এ জাতীয় পুস্তকের সংখ্যা কম আছে বলেই আহসানুল মাক্বাল রচিত হয়েছে। পুস্তকটিকে আহসানুল মাক্বাল না বলে আসওয়াউল মাক্বাল (কুৎসিৎ আলোচনা) বলাই যুক্তিযুক্ত। যেহেতু এর মাধ্যমে ইবাদত বেচাকেনা, ইবাদতকে উদর পূর্তির মাধ্যম বানানোর বিষয়টিকে শরীআত সিদ্ধ বলে প্রমাণ করার অপচেষ্টা করেছেন। তবে আমার প্রিয় মানুষ মৌলবী ফয়যুল্লাহ চাটগামী যিনি দেওবন্দের একজন মেধাবী ছাত্র, বাতিলের বিরুদ্ধে আপোষহীন এবং ধর্মের বিষয়ে অবাধ্য, ঔদ্বত্য প্রতিরোধে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তিনি দৃঢ়তার সাথে নিজের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। বলা যায় তিনি এ যুগের সিরাজীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন।[১] -শাব্বীর আহমদ উসমানী।

১২. সালাতুল মুসাফির صلوة المسافر

সালাতুল মুসাফির তথা মুসাফিরের নামায নামক পুস্তিকাটি মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ রচিত একটি ফাতাওয়া। এটি ফার্সী ভাষায় রচিত। রচনাকাল অজ্ঞাত। পুস্তিকাটি প্রকাশ করেছে কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী চট্টগ্রাম। এর বঙ্গানুবাদ করেছেন মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ ইসলামাবাদী। বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেছে কুতুবখানা ফয়যিয়ার পক্ষে মৌলবী মুহাম্মদ হুসাইন ফয়যী। প্রকাশকাল অজ্ঞাত। পুস্তিকায় নৌকা, সাম্পান, জাহাজ, স্টিমারে যারা থাকেন বা চাকুরী করেন তাদের নামাযের আলোচনা স্থান পেয়েছে।

জনৈক ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে এ ফাতাওয়া পুস্তিকা রচিত হয়েছে। প্রশ্নটির সারসংক্ষেপ হলো যারা নৌকা, সাম্পান, জাহাজ, স্টিমারে যারা চাকুরী করেন এবং তথায় বছরাধিককালও অবস্থান করেন; তারা মুসাফির হবেন কি না অথবা মুকীম থাকবেন কি না? এ প্রশ্নের উত্তর প্রদানের পূর্বে মুফতী সাহেব হযরত ওমর রা. বর্ণিত একটি হাদীস পেশ করেছেন- تعالي عنه صلوة المسافر ركعتان و صلوة الجمعة ركعتان

تام غير قصر علي لسان نبيكم صلي الله عليه وسلمহযরত ওমর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুসাফিরের নামায দুই রাকাআত, জুমুআর নামায দুই রাকাত পরিপূর্ণ ;এর কম করা যাবেনা।এটা তোমাদের নবীর মখ থেকে শুনেছি। শুরুতে তিনি আল্লাহতাআলার তাওফিক ও সাহায্য কামনা করে এ প্রশ্নের দালীলিক ও প্রামাণিক আলোচনা করেছেন। আলোচনার সার কথা হলো- নৌকা ও সমুদ্র ইকামতের যোগ্য স্থান নয়। জাহাজে আরাম আয়েশে জীবন যাপন করলেও শরীআতের দৃষ্টিতে মুসাফিরই থেকে যাবে। *ফাতাওয়া আলমগীরী*, *বাহরুর রায়িক*, গ্রন্থের বরাতে তিনি বলেন, মুকীম হওয়ার নিয়্যত পাঁচটি শর্তে ফলপ্রসু হয়। তন্মধ্যে একটি হলো স্থানটি ইকামতের নিয়্যতের উপযোগী হওয়া। সুতরাং সে যদি জঙ্গলে কিংবা অনাবাদ মাঠে অথবা দ্বীপে ইকামতের নিয়্যত করে তবে শুদ্ধ হবে না। তিনি বাদায়ি সানায়ি কিতাবের বরাত উদ্বৃত করেন-

اما المفازة والجزيرة والسفينة ليست موضع الاقامة حتي لو نوي الاقامة في هذه المواضع خمسة عشر يوما لايصير مقيما عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي

অনাবাদ মাঠ বা জঙ্গল, দ্বীপ এবং নৌকা বা জাহাজ ইকামতের স্থান নয়। এমনকি কেউ যদি উপরোক্ত স্থান সমূহে ইকামতের তথা পনের দিন বা তদুর্ধ্ব দিনের ইকামতের নিয়্যত করে তাহলে ইমাম আযম আবূ হানীফা র. -এর মতে সে মুকীম হবে না। এছাড়া তিনি দুররুল মুখতার, ফাতাওয়া শামীর বরাত দিয়ে অনুরূপ বক্তব্য পেশ করেছেন এবং দালীলিকভাবে প্রতিষ্ঠা ও প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন যে, মুসাফির যদি চার রাকাআত বিশিষ্ট ফরয নামাযে কসর না করে যথা নিয়মে চার রাকাত আদায় করে নেয় তাহলে তার নামায শুদ্ধ হবে কিন্তু আল্লাহর দেয়া রুখসত গ্রহণ না করার কারণে গুনাহগার হবে। [২]

১. আব্দুল বাকী, মুহাম্মদ, ড. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৪; ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মদ, মুফতী, উমদাতুল আকওয়াল ফী রাদ্দি মা ফী আহসানিল মাকাল, চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, ১৯১৫ খৃ. পৃ.

২. ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মদ, মুফতী, সালাতুল মুসাফির, চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, তা. বি. পৃ.১-৮।

১৩. আল- ফালাহু ফীমা ইয়াতা'আল্লাকু বিন্‌নিকাহি

الفلاح فيما يتعلق بالنكاح

মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ র. রচিত ৫৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত আরবী ভাষার এ ফিক্‌হ বিষয়ক গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী চট্টগ্রাম। এটি গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেছেন মৌলবী মুহাম্মদ কাসিম ফয়যী। গ্রন্থটি জমাদিউস সানী ১৩৬৬ হি. রচিত। প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৭৮ হি. / ১৯৫৮ খৃ. ৩২ পৃষ্ঠা সম্বলিত হয়ে। বর্তমানে মূল গ্রন্থের সাথে উর্দূ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সংযোজিত হয়েছে। এর উর্দু অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেছেন মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ ইসলামাবাদী।এ গ্রন্থে আলোচ্য বিষয়ের উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো-বিয়ে, বিয়ের উপকারিতা, অপকারিতা, বিয়ের ফযীলত, গুরুত্ব, রহস্য ইত্যাদি। এছাড়া আরো আলোচিত হয়েছে স্বামী-স্ত্রীর হক, সন্তান লালন-পালন, আদব শিষ্টাচার শিক্ষাদান এবং বিয়ে সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় মাস'আলা। গ্রন্থের শেষে মোহরে ফাতেমী সম্পর্কে হুসাইন আহমদ মাদানী র. -এর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও অভিজ্ঞতা এবং লেখকের নিজস্ব অভিমত। মোহরে ফাতেমী এবং মোহরে মিসাল সম্বন্ধে বেহেশতী জেওর গ্রন্থের কিছু অংশ সংযোজন করা হয়েছে। এ গ্রন্থে অবস্থা ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে বিয়ের প্রকারভেদ আলোচনা করা হয়েছে। যেমন- বিশুদ্ধ বর্ণনামতে, স্বাভাবিক অবস্থায় বিয়ে করা সুন্নতে মুআক্কাদা। কখনো বিয়ে করা ফরয বা ওয়াজিব হয়ে যায়। কখনো মুবাহ, কখনো অপছন্দনীয় (মাকরূহ), কখনো হারাম ইত্যাদি। যিনি বিয়ে করবেন তার অবস্থার প্রেক্ষিতে এসব বিধান সাব্যস্ত হবে। দ্বিতীয় বিষয় হলো- বিয়ে-শাদীদে রাসূলুল্লাহ সা. -এর সুন্নত, সালফে সালিহিনের আমলের দিকে তাকালে বিয়ে একটি অতি সহজ বিষয় ও সহজ কাজ মনে

হয়। কিন্তু বর্তমানে এ সহজ বিষয়টিতে এতসব কৃত্রিমতা, বানোয়াট বিষয় ও শরীআত বিরুদ্ধ রুসুম- প্রথা চালু হয়েছে; যা বিয়ে-শাদীকে একটি কঠিন ও জটিল বিষয়ে পরিণত করেছে। হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী র. বিষয়টিকে ভয়ানক কিয়ামত আখ্যায়িত করেছেন। শুধু নাম-ধাম কামানোর জন্য এতসব রুসুম রেওয়াজ চালু করা হয়েছে। তাই মুফতী সাহেব এ গ্রন্থে বিষয়টিকে উম্মতের সামনে সহজভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। দীন -দুনিয়ার ক্ষতি থেকে হেফাজতের লক্ষ্যে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। বিয়ের পাত্র বা ক্ষেত্র নির্বাচনের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন-'যখন তোমাদের নিকট এমন ব্যক্তি বিয়ের প্রস্তাব পাঠাবে, যার দীন ও চরিত্র সম্বন্ধে তোমরা সন্তুষ্ট; তাহলে বিয়ে দিয়ে দাও। অন্যথায় পৃথিবীতে ফাসাদ ছড়িয়ে পড়বে, অনেক নর-নারী বিয়ের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে, যিনা ব্যভিচারের ফেতনা মারাত্মকভাবে দেখা দিবে।'[১] তদ্রুপ অতিরিক্ত দেনমোহর নির্ধারণও অপছন্দনীয় কাজ। রাসূলুল্লাহ সা.-এর হাদীসে এসেছে, আবূ সালমা বলেন, আমি উম্মত মাতা আয়িশা রা. কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সা. দেনমোহর কত দিতেন? তিনি বললেন, স্ত্রীদের জন্য রাসূলের দেনমোহর ছিল **১২** আওকিয়া ও অর্ধেক আওকিয়া। এটা ছিল ৫শ' দিরহাম সমতুল্য।' [২] হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বিয়ে করতে এবং কন্যাদের বিয়ে দিতে **১২** আওকিয়ার বেশি মোহর দেননি।[৩] সুতরাং দেনমোহর কম নির্ধারণ করাই হবে উত্তম। এতে সুন্নতে নববীর অনুসরণ হবে এবং দীন -দুনিয়ার ফেতনা থেকে নিজেকে রক্ষা করা যাবে। মুফতী সাহেবের মতে সুন্নতের অনুসরণকল্পে মোহরে মিসাল পরিত্যাগ করা কর্তব্য। আজকাল অনেকে অধিক হারে মোহর নির্ধারণ করেন কিন্তু স্বামী তা আদায় করার ইচ্ছা রাখেন না। সে মনে করে এটা খাতিরে লিখা হয়েছে মাত্র। বিয়ের মজলিসে মুখ দিয়ে সে এমন কথা বলে যা তার অন্তরে থাকে না। يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم তাদের অন্তরে যা নেই তা তারা মুখ দিয়ে বলে।[৪] কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। অন্যান্য ঋণের মতো মোহর একটি ঋণ। অনাদায়ে গুনাহ হবে। পবিত্র কুরআনে এসেছে و اتوالنساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم من شيء منه فكلوه هنيأ مريأ

১. ফয়জুল কালাম, পৃঃ হাদীস নং-৬৩১
২ ঐ, পৃঃ হাদীস নং- ৬৬২
৩. ঐ, পৃঃ হাদীস নং - ৬৬১
৪. আল কুরআন : ৩ : ১৬৭ ।

'আর স্ত্রীদের মোহরানা স্বেচ্ছায় খুশীমনে দিয়ে দাও। তবে তারা যদি সন্তুষ্ট চিত্তে মোহরানার অংশ বিশেষ তোমাদের জন্য ছেড়ে দেয় তাহলে তা স্বাচ্ছন্দে ভোগ কর।' রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন- কেউ যদি মোহর আদায় না করে এবং আদায় করার ইচ্ছা না রাখে এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাহলে কিয়ামতের দিন সে যিনাকারী হিসেবে উপস্থিত হবে। সুতরাং মোহর কম নির্ধারণ করা কর্তব্য। বিয়েতে অলীমা (বিবাহোত্তর বৌভাত) করা মুস্তাহাব। বিয়ের পর অলীমা করা রাসূলুল্লাহ সা. - এর সুন্নত। তিনি নিজেও বিয়েতে যৎ সামান্য হলেও অলীমা করেছেন। তবে হযরত যয়নব রা.-এর বিয়েতে গোস্ত-রুটি দ্বারা পরিতৃপ্তি সহকারে আহার করিয়েছেন। অলীমায় শুধুমাত্র ধনীদের আহ্বান করা এবং গরীবদের এড়িয়ে যাওয়া, আমন্ত্রণ ছাড়া দাওয়াতে অংশগ্রহণ শরীআত বিরুদ্ধ কাজ। সন্তানদেরকে উত্তম আদব আখলাক শিক্ষা দেয়া এবং শিক্ষিত করে তোলা সদকাতুল্য নেকীর কাজ। কন্যা সন্তানকে লালন পালন দ্বারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি মিলবে বলে হাদীসে এসেছে।

বিয়ের উপকার-অপকার:

বিয়ের উপকার ৫টি: ১. সন্তান সন্তুতি জন্ম হয়। এর দ্বারা বংশ রক্ষা হয়। দুনিয়া মানবশূন্যতা থেকে রক্ষা পায়। ২. শয়তানের চক্রান্ত থেকে নিজেকে বাঁচানো সম্ভব হয়। কামস্পৃহা দমিত হয়, দৃষ্টি নত হয় এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত হয়। ৩. চিত্ত বিনোদন হয়, আনন্দ, আমোদ-প্রমোদ, স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সান্নিধ্যে মন-শরীর প্রফুল্ল হয়, মনে প্রশান্তি আসে, ইবাদত-বন্দেগীতে মানসিক শক্তি সঞ্চারিত হয়। ৪. বিভিন্ন চিন্তা থেকে মন অবসর হয়ে একমুখী হয়। ৫. স্ত্রী, সন্তান সন্তুতির পক্ষ থেকে প্রাপ্ত আঘাত, কষ্টে ধৈর্য্য ও সবর অবলম্বনের মাধ্যমে আত্মার রিয়াযত মুজাহাদা অর্জিত হয়। নফসের বিরুদ্ধে সাধনা হয়।

বিয়ের ক্ষতি তিনটি:

১. স্ত্রী, সন্তানদের জন্য রুটি রোজগারে প্রায়ই অক্ষম হয়। বিষয়টি কারো জন্যই সহজ হয় না; বরং কারো পক্ষে মারাত্মক বিপদ ঘটে। ২. স্ত্রী সন্তানের যথাযথ অধিকার আদায়ে অক্ষমতা, অসহায়ত্ব। ফলে তাদের পক্ষ থেকে আচরণগত কষ্টের উপর ধৈর্য্য ধারণে অক্ষমতা আসতে পারে। ৩. স্ত্রী, সন্তানের স্বার্থে আল্লাহ বিমূখতা, দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হওয়ার আশংকা থাকে।

স্ত্রীর অধিকারসমূহ:

স্ত্রীর দেনমোহর পরিশোধ করা, স্ত্রীর অযু, গোসলের পানির ব্যবস্থা করা, স্ত্রীর জন্য বিছানাপত্র ইত্যাদির ব্যবস্থা করা, কাপড় পোশাক প্রদান করা, নান নফকা প্রদান করা, পৃথক ঘরের ব্যবস্থা করা, স্বামীর বাড়ীর লোকজন যেন তাকে বিরক্ত করতে না পারে সে ব্যাবস্থা করা। স্ত্রী বিত্তশালী পরিবারের হলে তার জন্য খাদেমের ব্যবস্থা করা ও তার বেতন ভাতার ব্যবস্থা করা। একাধিক স্ত্রী থাকলে সময় বা রাত বণ্টন করা এবং পোশাক ইত্যাদি বিষয়ে সমতা রক্ষা করা।[২]

১৪. আহকামু দা'ওয়াতিল মুরাওওয়াজাহ احكام دعوات المروجة

আহকামু দা'ওয়াতিল মুরাওওয়াজাহ গ্রন্থটি মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ র. রচিত কয়েকটি ফাতাওয়ার সমষ্টি। ৯টি ফাতাওয়া নিয়ে সংকলিত এ গ্রন্থের ভাষা আরবী ও ফার্সী। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৪, গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী চট্টগ্রাম। প্রকাশের সন তারিখ অজ্ঞাত। তবে বর্ণিত ফাতাওয়া সমূহের রচনাকাল ১৩৯৫, ১৩৮৬, ১৩৮৫, ১৩৮৩, ১৩৮২, ১৩৭৮ হি.। গ্রন্থটির উর্দু অনুবাদ ও বিন্যাস করেছেন মুফতী ইযহারুল ইসলাম চৌধুরী। এ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদও প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্গানুবাদ করেছেন মাওলানা এনামুল হক। বাংলা সংস্করণে নামকরণ করা হয়েছে প্রচলিত দুআর বিধান। বাংলা সংস্করণটি প্রকাশ করেছে কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী চট্টগ্রাম। প্রকাশকাল অজ্ঞাত। গ্রন্থটিতে প্রচলিত দুআ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বিদআতের পরিচয় ও

---

১. আল- কুরআন : ৪ : ৪

২.ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মদ, মুফতী, আল- ফালাহু ফীমা ইয়াতা'আল্লাকু বিন্নিকাহি, চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, তা. বি. পৃ. ১-৩২।

প্রকারভেদ, বিদআতের নিন্দা এবং বিদআতমুক্ত জীবন যাপনের প্রতি আহ্বান করেছেন। গ্রন্থে বর্ণিত বিদআতের যে পরিচয় ও প্রকারভেদ তুলে ধরা হয়েছে তার সারসংক্ষেপ হলো- রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন- من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد 'যে ব্যক্তি আমাদের এ দীন সম্বন্ধে কোন নতুন কথা সৃষ্টি করেছে যা এতে নেই তার সে কথা প্রত্যাখ্যানযোগ্য।' বুখারী, মুসলিম।[১] রাসূলুল্লাহ সা. আরো বলেন, من وقر صاحب بدعة فقد اعان علي هدم الاسلام যে ব্যক্তি কোন বিদআতীকে সম্মান দেখাল সে নিশ্চয়ই ইসলামকে ধ্বংস করতে সাহায্য করল।'[২] বিদআত এবং বিদআতী দীনের জন্য কত ভয়ানক ক্ষতিকর উপরোক্ত দুটি হাদীস তার প্রমাণ। বিদআত ঐ সব নব আবিস্কৃত বিষয়কে বলে যা দীনের নামে চালু হয় কিন্তু তা দীন ও শরীআত সম্মত নয়, দীনের হেফাজত তার উপর নির্ভরশীল নয়। বিদ'আত দু প্রকার: ১. আকীদাগত বিদ'আত। যেমন- খারিজী, রাফিজী, মু'তাযিলা, মুরজিয়া, কাদরিয়া, শিয়া ইত্যাদি সম্প্রদায়। ২. আমলী বিদ'আত। যেমন- ফাতেহাখানি, মীলাদ, কিয়াম, ওয়াজে উচ্চস্বরে দরূদপাঠ, সবীনা পড়া, খতমে খাজেগান, ইত্যাদি। এগুলো নিঃসন্দেহে বিদ'আতে সায়্যিয়াহ ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য। তবে যেসব নব আবিস্কৃত বিষয়ের উপর দীনের হিফাজত নির্ভরশীল তা বিদআত বলে গণ্য হবে না। যেমন- মাদ্রাসা, মক্তব নির্মাণ করা। কারণ এগুলো দীনে ইল্ম শিক্ষার সহায়ক। অনুরূপ নাহু, সরফ, ফাসাহাত, বালাগাত, ইত্যাদি। এগুলো মৌলিকভাবে দীন নয় কিন্তু দীনি শিক্ষা পূর্ণতা দানে সহায়ক বিধায় এগুলো দীনের কাজে অন্তর্ভূক্ত। বরং দীন রক্ষার্থে নব আবিস্কৃত বিষয়গুলো শাব্দিক অর্থে বিদআত হলেও শরীআতের পরিভাষায় বিদআত নয়।[৩]

ফরয নামায শেষে ইমাম, মুক্তাদীর সম্মিলিতভাবে দুআ করা এবং এর স্বপক্ষে নুরূল ইযাহ ও হিদায়া গ্রন্থের যেসব বক্তব্য রয়েছে সেগুলোর উত্তর প্রদান করে মুফতী সাহেব নিজের অভিমত ব্যক্ত করেছেন

এবং বিভিন্ন কিতাবে উদ্বৃতির মাধ্যমে নিজের বক্তব্য ও অভিমত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। তাঁর বক্তব্যের স্বপক্ষে চার মাযহাবের ইমামগণের ফাতাওয়া, ইমাম শাতাবী, ইমাম ইব্‌ন তাইমিয়া, ইব্‌ন বাত্তাল, মোল্লা আলী ক্বারী র. আল্লামা তীবি, আল্লামা ইবনুল কায়্যিম, শাহ আব্দুল হক দেহলবী, খলীল আহমদ সাহারানপুরী, শাহ আনওয়ার কাশ্মীরি, মাওলানা ইউসুফ বিন নূরী, মুফতী মুহাম্মদ শফী , মাওলানা মুনযুর নোমানী, মাওলানা আব্দুল হাই লাখনৌবী, মুফতী রশীদ আহমদ লুধিয়ানবী, হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী (রাহিমাহুমুল্লাহু) প্রমূখের ফাতাওয়ার উদ্বৃতি দিয়েছেন।
ফরয নামাযের পর ইমাম, মুক্তাদীর মধ্যে প্রচলিত সম্মিলিত দুআর বিষয়ে মুফতী সাহেব দ্বিমত করেছেন। তাঁর বক্তব্য হলো- চার মাযহাবের প্রথম সারির আলিমগণের পক্ষ থেকে এ দুআ সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এদেশের অধিকাংশ আলিম বিষয়টি সম্বন্ধে অনবগত। মুফতি সাহেব প্রকৃত বিষয়টি আবিষ্কার করতে এবং জাতির সামনে পেশ করতে সক্ষম হয়েছেন। ফরয নামাযের পর ইমাম মুক্তাদীর সম্মিলিত মুনাজাতকে বিদ'আত আখ্যা দিয়ে প্রচণ্ড সমালোচনা সম্মুখীন হয়েছিলেন।

অনেকের অভিযোগ ছিল, তিনি আকাবিরে দেওবন্দ এবং তরীকতের শায়খগণের আমল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। কেউ কেউ এমন বক্তব্যও দিয়েছেন, কোন কিছু সুন্নত বা মুস্তাহাব হিসেবে গণ্য ও প্রমাণিত হওয়ার জন্য প্রয়োজন মহানবী সা. এর পক্ষ থেকে প্রমাণ থাকা। মুফতী সাহেবের মতে এ ধরণের প্রশ্ন বা সংশয় সম্পূর্ণ ভুল এবং প্রকৃত বিষয় সম্বন্ধে অজ্ঞতার প্রমাণ। তিনি তাঁর রচিত الدعوات المروجة في هذه الازمنة المتاخرة গ্রন্থে মুফতী রশীদ আহমদ লুধিয়ানুবী র. আহসানুল ফাতাওয়ায় শিরোনামে এবং মুফতী ইব্রাহীম সাদিকাবাদী دعاء بعد الفرائض كا مسنون طريقه গ্রন্থসমূহে আকাবিরে আলিমগণের অনেক বক্তব্য উদ্বৃত করেছেন এবং ফরয নামাযের পর প্রচলিত মুনাজাতকে অবৈধ

১. মেশকাত শরীফ, নূর মুহাম্মদ আজমী, (অনূ), প্রাগুক্ত, খ.১ম, পৃ. ১৫৪, হাদীস নং-১৩৩।
২. ঐ, পৃ. ১৯০, হাদীস নং-১৮০
৩. ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মদ, মুফতী, আহকামু দা'ওয়াতিল মুরাওওয়াজাহ, চট্টগ্রাম কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, তা. বি. পৃ.

প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। উপরোক্ত গ্রন্থসমূহে কয়েকজন বিখ্যাত আলিমে দীন যেমন- আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি র., খলীল আহমদ সাহারানপুরী র., মাওলানা ইজায আলী দেওবন্দী র., মুফতী মুহাম্মদ শফী র., আল্লামা ইউসুফ বিননূরী র.[১] মুফতী মাহমূদুল হাসান গাঙ্গূহী এবং মাওলানা মনযূর আহমদ নোমানী র. প্রমূখের বক্তব্যের উদ্ধৃতি রয়েছে। বুখারী শরীফের ভাষ্যগ্রন্থ ফয়যুল বারীর ২য় খন্ডে ১৬৭ পৃষ্ঠায় আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি র. বলেন: واعلم ان الادعية بهية الكذائية لم يثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم ولم يثبت عنه رفع الايدي دبر الصلوات في الدعوات ভাল করে জানা উচিত আজকাল যেভাবে দুআ করার রেওয়াজ চলছে এটা রাসূলুল্লাহ সা.থেকে প্রমাণিত নয়। নামাযের পরে যে দুআ করা হয় তাতে হাত ওঠানোর বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সা. থেকে প্রমাণিত নয়।[২]

আল উরফুশ্‌শুজী গ্রন্থে (পৃ. ৮৬) এসেছে, শাহ সাহেব অন্যত্র বলেছেন, نعم الادعية بعد الفريضة ثابتة كثيرا بلا رفع اليدين و بدون الاجتماع হাঁ ফরয নামাযের পর দুআ করার বিষয়ে অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে তবে হাত ওঠানো এবং সম্মিলিতভাবে দুআ করার বিষয়টি প্রমাণিত নয়।[৩] উপরোক্ত গ্রন্থে (খন্ড ১ম, পৃ. ১৮৭) তিনি অন্যত্র বলেন, استدل بعض بحديث الباب علي الدعاء بعد المكتوبة با لهيأة المتعارفة في اصل العصر والحال انه لم يدل عليه فانه ليس فيه ذكر انهم دعوا مجتمعين বর্তমানে ফরয নামাযের পর যে দুআ প্রচলিত রয়েছে বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কেউ সংশ্লিষ্ট হাদীস দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করেছেন। প্রকৃত এ হাদীসটি এ বিষয়ের প্রমাণ বহন করে না। কেননা এর মধ্যে এমন কোন প্রমাণ নেই যে, সাহাবাগণ সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে দুআ করেছেন।[৪]

ফয়যুলবারী গ্রন্থে আরও এসেছে, আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি র. বলেন, نعم نحكم بكونها بدعة اذا افضي الامر الي النكير علي من تركها আমরাও এভাবে দুআ করাকে বিদআত বলব। কারণ কেউ দুআ না করলে তাকে তিরস্কার করা হয়।[৫] তিনি অন্যত্র বলেন,

للدعاء كجماعة الصلوة و الانكار علي تاركها و نصب امام ثم اتمام به فيه وغير ذالك من قلة العلم و كثر الجهل و الجاهل اما مفرط او مفرط যেসব বিষয় নতুন পরে আবিষ্কার করা হয়েছে তা হলো, নামাযের ন্যায় দুআর জন্যও জমায়েত হওয়া বা একসাথে দুআ করা, কেউ দুআ না করলে তাকে তিরষ্কার করা হয়, দুআর জন্য একজন ইমাম নির্বাচন করা হয় এবং অন্যরা আমীন আমীন বলে তার আনুগত্য করে। এগুলো জ্ঞানের দৈন্যতা ও অজ্ঞতার কারণে হচ্ছে মূর্খরা হয়তো সীমাতিক্রম করবে অথবা প্রয়োজনীয় দায়িত্বের চেয়ে কম আদায় করবে।[৬] মাআরিফুস সুনান গ্রন্থে (খ. ৩য়, পৃ. ৪১০) এসেছে, আল্লামা ইউসুফ বিননূরী র. বলেন, و يقول بعض اهل العصر من الحنفية لما ثبت الدعاء بتلك الهيية في موضع فليعد الي دبر المكتو بات ايضا و ليستدل لذالك بالعموم – قال شيخنا (الكشميري) ان الاحتجاج بالعموم انما ينبغي فيما لم يرد للخاس حكم عليحدة و نفس ثبوت الرفع في الدعاء بالامراخر ان الادعية عنه صلي الله عليه و سلم في اثرالمكتوبات لم يثبت فيه الرفع নফল নামাযের পর নবী করীম সা. দু জায়গায় হাত উঠিয়ে দুআ করেছেন বলে প্রমাণ আছে। এর ভিত্তিতে আধুনিককালে হানাফী মাযহাবের কোন আলিম বলেন, যেহেতু একটি নির্দিষ্ট সময়ে দুআ করার বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সা. হতে প্রমাণিত তাই ফরযের পর দুআ করার ক্ষেত্রে একে প্রয়োগ করা যাবে। কিন্তু আমাদের শায়খ আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি র. বলেন, সাধারণ অবস্থার দলীল দ্বারা বিশেষ অবস্থার জন্য তখনি প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা যাবে যখন বিশেষ অবস্থার জন্য পৃথক কোন আদেশ বা বিধান থাকবে না। কিন্তু এখানে এ বিষয়টি আরোপিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সা. ফরয নামাজের পর সম্মিলিতভাবে এবং হাত উঠিয়ে দুআ

১. আল্লামা ইউসুফ বিন নূরী র. ছিলেন সর্বজন পরিচিত খ্যাতিমান মুহাদ্দিস ফকীহ তাঁর রচিত *মাআরিফুস সুনান* গ্রন্থখানা মুসলিম মিল্লাতের জন্য এক বিরাট অবদান। এছাড়াও তিনি অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। করাচীর নিউটাউন মাদ্রাসার প্রধান পরিচালক ও শায়খুল হাদীস ছিলেন। তিনি আরবীতে অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারতেন। (নূর মোহাম্মদ আ'জমী, *হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩।

২. নোমান, পৃ.১১-১২; ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মদ, মুফতী, *আহকামুদ দা'ওয়াতিল মুরাওওয়াযাহ* চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, তা.বি., পৃ. ৫৯।

৩-৪. নোমান, পৃ. ১১ : ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মদ, মূফতি, মাজমুয়াহ রাসায়েলে ফয়যিয়া, চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফায়যিয়া, হাটহাজারী, তা. বি. খ. ১ম, পৃ. ৬-১২।

৫-৬.*আহকামুদ দা'ওয়াতিল মুরাওওয়াযাহ,* পৃ. ৬০,৬১; নোমান, পৃ. ১২,১৫।

করেননি। দুআর সময় দুহাত উত্তোলনের বিষয়টি প্রমাণ হওয়া একটি ভিন্ন বিষয়। আর ফরয নামাযের পর দুআ করার জন্য হাত ওঠানো ওপর একটি ভিন্ন বিষয়। সুতরাং ফরয নামাযের পর দুআ করার সময় হাত ওঠানোর বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সা. হতে প্রমাণিত নয়।[১]

অন্যত্র তিনি পরিষ্কার বলেছেন, قد راج في كثير من البلاد الدعاء بهيية الاجتماعية رافعين ايديهم بعد الصلوة المكتوبة ولم يثبت ذالك في عهده صلي الله عليه و سلم و بالاخص بالمواظبت نعم ثبتت ادعية كثيرة بالتواتر بعد الكمتوبة ولكنها من غير رفع الايدي ومن غير هيية اجتماعية অসংখ্য শহর বন্দরে এটা প্রথা হয়ে গেছে যে, লোকেরা ফরয নামাযের পর সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে দুআ করে। অথচ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সা. এর সময় কখনো প্রচলিত ছিল না। সব সময় করবেন তো দূরের কথা। হ্যাঁ ফরয নামাযসমূহের পর দুআ করার বিষয়টি মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তবে ঐ দুআ ইজতিমাঈ ভাবে হাত উঠিয়ে করেননি।[২] মুফতী সাহেবের মতে, কোন কাজ বা আমল তা'মীলযোগ্য হওয়ার জন্য সালফে সালিহীনের আমলের প্রমাণ থাকতে হবে। অন্যথায় সবকিছুকে আমল মনে করা হলে বিদআত আর বিদআত থাকবে না। কেননা, প্রতিটি বিদআতের স্বপক্ষে কিছু না কিছু যুক্তি, প্রমাণ ও প্রয়োজনের কথা উত্থাপন করা হয়ে থাকে। কারণেই কোন বিষয়কে সুন্নত, মুস্তাহাব, প্রমাণ করতে হলে প্রয়োজন বিশেষ কোন দলীল অথবা উত্তম তিন যুগের কোন আমল।[৩]

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি ও ইউসুফ বিন নূরী র. এর বক্তব্য দ্বারাও প্রচলিত দুআর বিষয়টি অবৈধ প্রমাণিত হয়েছে। কারণেই মুফতী সাহেব তাঁর احكام الدعوات المروجة في هذه الازمنة গ্রন্থে বিষয়টি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যার কিছু সারকথা হলো: বিষয়টি গুরুত্বের সাথে অনুধাবন করতে হবে যে, হাদীস বর্ণনাকারীগণ রাসূলুল্লাহ সা.এর বক্তব্য, কর্ম ও সম্মতিসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করেছেন। এমনকি ঘরের ভেতর অন্ধকার রাতে যখন তিনি ছাড়া আর কেউ থাকতনা

সেসময় তিনি কি কি আমল করেছেন ও কি কি দুআ করেছেন সেগুলোর খুটিনাটি বিষয়ও বর্ণনাকারীগণ বর্ণনা করেছেন। তার কিছু আমল এমন ছিল যেগুলো শুধুই অভ্যাসবশত প্রকাশ পেত। যে বিষয়গুলো ইবাদত, আনুগত্যের অন্তর্ভূক্ত ছিলনা সেগুলোও তারা বর্ণনা করেছেন। যেমন- আকাশের দিকে তাকিয়ে মহানবীর হাসি দেয়া, চিন্তা গবেষণার সময় লাঠি দিয়ে মাটিতে আলতো আঘাত করতে থাকা ইত্যাদি। এসব বিষয়ও মুহাদ্দিস, বর্ণনাকারীগণের নিকট অজ্ঞাত থাকেনি। সুতরাং যে আমল রাসূলুল্লাহ সা.প্রকাশ্যে সম্মিলিতভাবে আদায় করেছেন সেগুলো কোন বর্ণনাকারী বর্ণনা করবেন না তা কেমন করে হয়? এটা অসম্ভব! যদি সাহাবাগণের যুগে ফরয নামাযের পর রাসূলুল্লাহ সা. একবারও মুনাজাত করতেন বিষয়টি কত সংখ্যক হাদীসে বর্ণিত হতো তার কোন হিসেব থাকতো না। পক্ষান্তরে প্রসঙ্গটির নাম নিশানাও হাদীসের গ্রন্থসমূহে উল্লেখ নেই। আরো একটি বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে যে, নবুওয়্যতের তেইশ বছরে তিনি একা নামাযের ইমামতি করেছেন। দীর্ঘ দিনের ইমামতিতে যদি ফরয নামাযের পর সাহাবীগণকে নিয়ে হাত উঠিয়ে একদিন বা একবারও দুআ করতেন তাহলে অবশ্যই তাঁরা বিষয়টি বর্ণনা করতেন। অথচ বিশুদ্ধ বা দুর্বল কোন প্রকারের হাদীসেই প্রসঙ্গটি আসেনি। বরং সাহাবা, তাবিঈন এবং মুজতাহিদ ইমামগণের মাধ্যমে এ ধরণের দুআর বিষয়টি বর্ণিত হয়নি। সুতরাং বিষয়টি নাজায়িয তাই প্রমাণিত হয়।[৪]

মুফতী সাহেব অন্যত্র বলেন, نعم قرأة بعض الالفاظ الاذكار و بعض الفاظ اللادعية بعد المكتوبات ثابتة مسنونة يقينا لكن علي طور الانفراد بغير رفع الايدي لا علي طور الهيية الاجتماعية رافعين الايدي ফরয নামাযের পর কিছু যিক্‌র এবং দুআর বাক্য পাঠ করার বিষয়টি

১-২. ঐ, পৃ. ৬০,৬১; নোমান, পৃ. ১২,১৫।
৩-৪. *মাজমুআ রাসাইলে ফয়যিয়া*, খ. ১ম, পৃ. ৬১।

রাসূলুল্লাহ সা. এর পক্ষ হতে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত এবং সুন্নত। তবে হাত ওঠানো ব্যতীত এবং একাকীভাবে। সম্মিলিতভাবে, হাত উঠিয়ে নয়। পাঠকগণ! বিষয়গুলো আমার মত দরদের সাথে পাঠ করবেন এবং নীরবে চিন্তা গবেষণা করবেন। বিস্তারিত জানতে আমার কিতাবটি পড়বেন।[১]

মুফতী ফয়যুল্লাহ র. ফরয নামাযের পর প্রচলিত ইজতিমাঈ দুআকে প্রতিহত করতে অত্যন্ত জোরালো ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি বলেন, এটা স্পষ্ট যে, এ প্রচলিত মুনাজাত বিষয়ে তাহকীক করার পূর্বে আমি নিজেও বৈধ ও সুন্নত মনে করতাম। কিন্তু চূড়ান্ত তাহকীক, বিশ্লেষণ, অনুসন্ধান ও গবেষণার পর বুঝতে পারলাম এর কোন ভিত্তি নেই। সহীহ্, যয়ীফ, এমনকি বানোয়াট হাদীসেও এর কোন প্রমাণ নেই। অনুসরণীয় তিন যুগে এ আমলের প্রচলন ছিল না। সুতরাং আগে আমি এ দুআর বিষয়টিকে যে সুন্নত বলেছিলাম তা প্রত্যাখ্যান করলাম। এখন সবাইকে ঘোষণার মাধ্যমে জানিয়ে দিচ্ছি যে, এটা দ্বীনের মধ্যে বিদআত হিসেবে অনুপ্রবেশ করেছে। তিনি এও জানিয়ে দিলেন যে, অনারব দেশে সাধারণ মানুষ এবং আহলে ইলমগণও নেক নিয়তেই এ আমলটি করে আসছিল। এটা অসম্ভব কিছু নয়। অনেক সময় বড়দেরও ভুল হয়ে থাকে। যেমন- *হায়াতে আশরাফ* গ্রন্থে (পৃ. ২৮৬) এসেছে, হাকীমুল উম্মত শাহ আশরাফ আলী থানবী র. বলেন, লিখনীর জগতে কোন কোন স্থানে
ব্যক্তিগত ধারণা অথবা অমনোযোগিতার কারণে কিছু ভুল-ত্রুটি হয়ে গিয়েছিল। যা এখন বুঝে আসছে। পৃথকভাবে বিষয়টি অবগত করিয়ে দিচ্ছি। অনেক সময় লিখার পর আমার নিজেরও মনে পড়ে যে, পূর্বের কোন কোন উত্তর যে গলদ ছিল এটা প্রমাণ হয়েছে। প্রশ্নকারীর ঠিকানা অবগত হবার পর তাকে বিষয়টি জানিয়ে দিয়েছি। ঠিকানা না জানা থাকলে অথবা তার কাছে আমার সংশোধিত কপি না থাকলে তার ভুলের মধ্যে নিপতিত থাকার আশংকা থাকে। তাই সতর্কতার জন্য এ সংশোধনী লিখে দিলাম।[২] মুফতী সাহেবের দর্শনমতে দুআর ক্ষেত্রে এ বিদআতটি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার কারণ- দ্বীনের নামে কোন একটি ভুল, অশুদ্ধ বিষয় চালু হয়ে গেলে সাধারণ মানুষের কাছে সেটি পবিত্র ও শরীআতসিদ্ধ হিসেবে

স্থান লাভ করে। তখন এর বিপক্ষে, বিরুদ্ধে কথা বললে তারা শুনতে রাজী হয় না। তাইতো আজকাল সমাজে দ্বীনের নামে প্রচলিত অমূলক বর্ণনা, ঘটনা, মনচাহী অভ্যাস, রুসুম-রেওয়াজ, নিজেদের আবিস্কৃত বিদআত ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে। যেগুলো প্রত্যাখ্যান করতে সাধারণ মানুষ রাজী হচ্ছে না। শাহ ওয়ালী উল্লাহ র. বলেন, ইসলামে বিদআতকে গুরুতর অপরাধ হিসেবে গণ্য করার কারণ এটা ইসলামকে বিকৃত করে। আগেকার মুসলমানগণ আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহর সুন্নতের মধ্যে নিজেদের পক্ষ থেকে কিছু সংযোজন করেছেন। পরবর্তী প্রজন্ম তন্মধ্যে আরো কিছু সংযোজন করেছে। এভাবে সংযোজন পরম্পরার কারণে শেষ পর্যন্ত বলা যাচ্ছেনা যে, মূল দ্বীন কোনটি এবং মানুষের পক্ষ থেকে সংযোজিত হয়েছে কোনটি? আফসোস যে, রাসূলুল্লাহ সা. -এর সুন্নতের এত গুরুত্ব দেয়া এবং শরীআতের পাবন্দি সত্ত্বেও উম্মতে মুসলিমা এত বাড়াবাড়িতে আক্রান্ত হয়েছে যে, দ্বীনের প্রতিটি শাখা-প্রশাখায় এর প্রভাব দৃষ্টিগোচর হয়।[৩]

হাদীসে এসেছে, قال مابتدع قوم بدعة في دينهم الا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها اليهم الي يوم القيامة হযরত হাস্‌সান রা. বলেন, কোন জাতি দ্বীনের মধ্যে কোন বিদআত অনুপ্রবেশ করালে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সে পরিমাণ সুন্নত উঠিয়ে নেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত উক্ত সুন্নত তাদের মধ্যে ফিরিয়ে দেননা। (দারামী, মিশকাত)।[৪] অপর হাদীসে এসেছে-

قال ما اعرف شيأ مما كنا علي عهد رسول الله فقلت اين الصلوة

হযরত আনাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা.এর যুগে আমরা দ্বীন ও শরীআতের যে বিষয়গুলোর উপর ছিলাম সেগুলোর কোন নমুনাই আজ অবশিষ্ট

১-২. ঐ, পৃ. ৬১; নোমান, পৃ. ১৬।

৩.*মাআরিফুল কুরআন*, (অনূ) ঢাকা, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০, ১ম সং. খ.২য়, পৃ. ৬০৩-৬০৪

৪. *ফয়যুল কালাম*, পৃ. ৯০, হাদীস নং ১২৪।

নেই চেনার মতো। তাঁর এক শিষ্য বললেন, তাহলে আমাদের নামাযের কি অবস্থা? তিনি বললেন, তবে কি তোমরা তোমাদের নামাযে এমন কিছু করছ না যা তোমাদের কাছে ভাল মনে হয়।[১]

قال ما يأتي علي الناس من عام الا احدثوا فيه بدعة و اماتوا سنة حتي تحي

ইব্‌ন আব্বাস রা. বলেন, মানুষের উপর কোন বছর গত হয়না কিন্ত তারা একটা না একটা বিদ'আত আবিস্কার করেই এবং সাথে একটি সুন্নতকে মিটিয়ে দেয়। এভাবে চলতে চলতে এক সময় বিদ'আত জীবিত হয় এবং সুন্নতসমূহ মিটে যায়।[২]

ঈদের নামাযে খুৎবার পর, তারাবীর নামাযের প্রতি চার রাকাআত পর পর, বিশ রাকাআত আদায়ের পর, বিতর নামাযের পর, বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হবার পর, যিয়ারতের পর, বুখারী শরীফ খতমের পর সম্মিলিতভাবে হাত উত্তোলন করে দুআ করাকে তিনি বিদআত বলেছেন। যদিও বাংলাদেশে অসংখ্য নির্ভরযোগ্য আলিমের মধ্যে এভাবে দুআ করার অভ্যাস ও আমল চালু রয়েছে।

দ্বীনের আমলের মাপকাঠি প্রসঙ্গে মুফতী সাহেব বলেন, আমি মুজাদ্দিদে আলফে সানীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা বলব, সীরাতে ইমামে রব্বানী গ্রন্থের ২৬৮ পৃষ্ঠায় এসেছে, মুজাদ্দিদে আলফে সানীর খলীফা মাওলানা সালিহ র.বলেন, শায়খের অযীফাসমূহ একত্রিত করার পর আমলের অনুমতি প্রার্থনা করলাম। তখন তিনি বললেন, আনুগত্য করার উপযুক্ত তো রাসূলুল্লাহ সা.-এর আমল ও কর্মসমূহ যেগুলো হাদীসের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। আমি বললাম, হযরতের আমল তো রাসূলের আমলের মতই। তখন তিনি বললেন, যাও তোমাকে অনুমতি দিলাম। এ কথাটি স্মরণে রাখবে যে, আমার কোন আমল রাসূলুল্লাহ সা.এর সুন্নত মোতাবেক না হলে ত্যাগ করবে। খতমে খাজেগান যা প্রায় সব কওমী মাদ্রাসায় প্রচলিত রয়েছে। মুফতী সাহেব বিষয়টিকে বিদআত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এ বিষয়ে বাংলাদেশের হাজারো আলিমের সাথে তিনি দ্বিমত করেছেন।[৩]

১৫.আল-আদইয়া মা'সূরা আনিন নাবিয়্যি সা.

الادعية مأثورة عن النبي صلي الله عليه وسلم

আদইয়া মা'সূরা আনিন নাবিয়্যি সা. মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ রচিত *মাজমুআ রাসাইল* এর অন্তর্ভূক্ত ছোট পুস্তিকা। ৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত দুআর এ পুস্তিকার রচনাকাল অজ্ঞাত। গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী চট্টগ্রাম। প্রকাশের সন তারিখ অজ্ঞাত। এ পুস্তিকার বাংলা সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছে। অনুমান যে এর বাংলা সংস্করণ মুফতী সাহেবের জীবদ্দশাতেই প্রথমবার প্রকাশিত হয়েছিল। তারও সন তারিখ অজ্ঞাত। তবে বঙ্গানুবাদের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ২০০৪ খৃ.। প্রকাশক মাওলানা মুহাম্মদ শুআইব ফয়যী। প্রকাশ করেছে কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী। পুস্তিকার শুরুতে মুফতী সাহেব ছোট্ট একটি ভূমিকা রচনা করেছেন। যার সার কথা হলো- আল্লাহু সুবহানাহু ওয়াতাআলার দরবারে লাখ শুকরিয়া এবং সরদারে দুজাহাঁ আখিরী নবী হযরত মুহাম্মদ সা. এর উপর হাজার হাজার দরূদ ও সালাম। মুসলমান নরনারী নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, দুআ মূল্যবান ও উপকারী বিষয়। কারণেই রাসূলুল্লাহ সা. এর প্রতি উম্মতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং আদায় করার তাকিদ দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে এসেছে- তোমরা আমার নিকট দুআ প্রার্থনা কর আমি তা কবুল করব।[৪] রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন- দুআ ইবাদতের সার।[৫] অন্য হাদীসে এসেছে- আল্লাহর দরবারে দুআর চেয়ে অধিক মূল্যবান কোন বস্তু নেই।[৬] রাসূলুল্লাহ সা. আরো বলেছেন- তোমাদের মধ্যে যার জন্য দু'আর দরজা খোলা হয়েছে (দু'আর তাওফীক দেওয়া হয়েছে) তার জন্য রহমতের দরজা খোলা হয়েছে এবং আল্লাহর দরবারে

---

১. ঐ, পৃ. ১১০, হাদীস নং- ১৪১।
২. ঐ, পৃ. ১১২, হাদীস নং ১৪৬।
৩. *আহকামুদ দা'ওয়াতিল মুরাওওয়াযাহ,* পৃ. ৬০,৬১;
৪. আল-কুরআন, ২৩: ৫।
৫. ফয়যুল কালাম, পৃ.১৮৬ , হাদীস নং ২৬০ ।
৬. ঐ, প্র.১৮৬, হাদীস নং ২৬১।

যা কিছু ভিক্ষা কর তন্মধ্যে আশ্রয় ভিক্ষাই সর্বাধিক প্রিয়।[১] এ ক্ষুদ্র পুস্তিকায় বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ হতে অল্প সংখ্যক এমন কিছু দুআ চয়ন করা হয়েছে যেগুলো বিভিন্ন সময় মুফতী সাহেব নিজে পড়তেন ও অপরকে পড়ার উপদেশ দিতেন। এ পুস্তিকায় যেসব দু'আ চয়ন করা হয়েছে সেগুলো হলো- ১. সকাল সন্ধায় পাঠ করার দু'আ। ২. ফজর ও মাগরিব নামাযের পর পাঠ করার দুআ। ৩. ফরয নামায সমূহের পর হাত ওঠানো ব্যতীত পাঠ করার দু'আ। ৪. অযূ থেকে ফারিগ হওয়ার পর পাঠ করার দু'আ। ৫. প্রস্রাব- পায়খানায় প্রবেশকালের দু'আ। ৬. প্রস্রাব- পায়খানা হতে বের হওয়ার সময় পাঠ করার দু'আ। ৭. আযান শোনার পর দু'আ। ৮. মসজিদে প্রবেশকালের দু'আ। ৯. মসজিদ থেকে বের হওয়ার দু'আ। ১০. নিজ ঘরে প্রবেশকালে দু'আ। ১১. ঘর থেকে বের হওয়ার দু'আ। ১২. ঘুমানোর দু'আ এবং ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার দু'আ। ১৩. পানাহারের পূর্বে ও পরের দু'আ। ১৪. অপরের বাড়ীতে দাওয়াত খাওয়ার পর দু'আ। ১৫. দুধ পান করার দু'আ। ১৬. কাপড় পরিধান কালের দু'আ। ১৭. সফরে বের হওয়ার সময় দু'আ এবং পথে কোথাও নামলে পাঠ করার দু'আ ১৮. কাউকে বিদায়কালে দু'আ। ১৯. বিপদগ্রস্থকে দেখলে পাঠ করার দু'আ। ২০. নৌকায় এবং ইঞ্জিনযুক্ত জলযানে আরোহন কালের দু'আ। ২১. বাজারে প্রবেশকালের দু'আ। ২২. নতুন চাঁদ দেখার দু'আ। ২৩. বৈঠক হতে উঠার সময়ের দু'আ। ২৪. বিপদের সময় পাঠ করার দু'আ। ২৫. ঋণগ্রস্থ ও দুশ্চিন্তার সম্মুখীন হলে সকাল সন্ধায় পাঠ করার দু'আ। ২৬. ঋণ আদায়ের দু'আ। ২৭. লাইলাতুল কদরের দু'আ। ২৮. বৃষ্টি ও তুফানের সময় পাঠ করার দু'আ। ২৯. অসুস্থকালের দু'আ। ৩০. মোরগ, গাধা বা কুকুর ডাকলে পাঠ করার দু'আ। ৩১. মনে ওয়াসওয়াসা আসলে পাঠ করার দু'আ। ৩২. ইফতারের সময় পাঠ করার দু'আ। ৩৩. মৃত্যুকালীন দু'আ। ৩৪. মাইয়্যিতকে কবরে রাখার সময় দু'আ। ৩৫. কবর যিয়ারতের দু'আ। ৩৬. রোগ মুক্তির আয়াতসমূহ ৩৭. ইত্যাদি। উপরোক্ত দু'আসমূহ ছাড়াও আরো বেশকিছু দু'আ মুফতী সাহেবের এ পুস্তিকায় স্থান লাভ করেছে। প্রতিটি দু'আ উল্লেখ করার পর এগুলোর সূত্রও আলোচনা করেছেন। এসব দু'আর উৎস বা সূত্র

হলো বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজাহ, মিশকাত, হাদীসগ্রন্থ। বলা যায় মানব জীবনে গুরুত্বপূর্ণ দু'আসমূহ এ পুস্তিকায় আলোচিত হয়েছে। যা একটি চমৎকার পুস্তিকার মূল্য ও মর্যাদা রাখে।[২]

১৬. তারগীবুল উম্মাহ ইলা তাহসীনিন নিয়্যাহ ترغيب الامة الي تحسين النية

মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ রচিত তারগীবুল উম্মাহ ইলা তাহসীনিন নিয়্যাহ ১৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত একটি পুস্তিকা। এর ভাষা আরবী। রচনাকাল এবং প্রকাশকাল অজ্ঞাত। গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে আল মাকতাবুল ফয়যিয়া, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। প্রকাশক অজ্ঞাত। গ্রন্থটির উর্দু অনুবাদ করেছেন মুফতী মুহাম্মদ ইযহারুল ইসলাম চৌধুরী। মূল আরবীর সাথে নিচে উর্দু অনুবাদ সংযোজিত হয়েছে। এ গ্রন্থের বাংলা সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশক, প্রকাশকাল এবং অনুবাদকের নাম উল্লেখবিহীন। গ্রন্থটিতে প্রথমে নিয়্যতের পদ্ধতি অত:পর সংক্ষিপ্তভাবে অসংখ্য বিষয় সম্বন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে যে, কোন কাজ বা আমল করার সময় কি নিয়্যত করবে? সে বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থের সারসংক্ষেপ হলো- প্রসাব পায়খানায় প্রবেশকালে, অযূ করা, মাথা মাসেহ করার সময়, মসজিদে যেতে, প্রবেশ করতে ও বের হবারকালে, জীবিকা অর্জনে লিপ্ত হলে, ইশরাক ও চাশতের নামাযকালে, আহার করতে, কায়লুলা করতে, সন্ধ্যার পর ঘরের দরজা বন্ধ করতে, নিদ্রায় যেতে, রাতে ঘুম হতে জাগ্রত হলে, কুরআন শরীফ তিলাওয়াত বা শ্রবণকালে, আযান দেয়ার সময়, নামাযের ইমামতি করতে, ওয়ায- নসীহত করার সময়, মুরীদ হওয়ার সময়, বালক-বালিকাদের শিক্ষা দিতে, ইলম দীন শিক্ষা করতে, রোগীর সেবাকালে, চিকিৎসাকালে, দাওয়াত খেতে গেলে, ফাতাওয়া লিখতে, হাদিয়া দিতে, বিয়ে শাদী করতে বসলে, কাউকে করজ দিতে, ঘরবাড়ী ঝাড়ু দিতে, রান্না কালে, বাচ্চাদের লালন পালনে, দান খয়রাতকালে,

---

১.ঐ, পৃ.১৮৮, হাদীস নং-২৬৬।

২. ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মদ, মুফতী, *আল- আদইয়া-ই মা'সূরা*, চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, তা. বি. পৃ. ১-৮।

মাদ্রাসায় চাঁদা দিতে, আত্মীয় স্বজনের সাথে মিলিত হলে, বাজারে গমন কালে, ব্যবসাকালে, শ্রমিকের মজুরী আদায় করলে, নতুন কাপড় পরিধানকালে, সুরমা, তেল, সুগন্ধি ও ওষুধ ব্যবহারকালে, খালি পায়ে হাটলে, জুতো পায়ে হাটলে, উপোস থাকলে, ইত্যাদি বিষয়ের সময় কি নিয়্যত করতে হবে? এসব বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করেছেন। পুস্তিকাটি অতি সংক্ষিপ্ত হলেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন মু'মিন যাবতীয় কাজে নিয়্যতকে কিভাবে সঠিকভাবে পরিচালনা করবে, শুদ্ধ, পরিশুদ্ধ করবে এর দিক নির্দেশনা রয়েছে। পুস্তিকার শুরুতে তিনি বুখারী শরীফের প্রথম হাদীসের প্রথম বাক্যটি উল্লেখ করেছেন- الاعمال بالنيات নিশ্চয়ই আমলসমূহ নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল।[১] পুস্তিকার শুরুতে মুফতী সাহেব ভূমিকায় লিখেন- প্রাত্যাহিক কাজ কর্মের মধ্যে বিনাপরিশ্রমে অসংখ্য নেকী অর্জনের সুযোগ মুসলমানদের রয়েছে। যারা বিষয়টি এখনো সঠিকভাবে উপলদ্ধি করতে পারেননি তাদের জন্যই এ গ্রন্থ। মনে মনে ইচ্ছা বা সংকল্প করার নাম নিয়্যত,যা অন্তরের কাজ। মুখে বলার প্রয়োজন নেই। শরীআতে নিষিদ্ধ কাজকর্মে ভাল নিয়্যত প্রযোজ্য নয় বরং গুনাহ ও অবৈধ। রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস - انما الاعمال بالنيات দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যাবতীয় কাজের ভিত্তি নিয়্যত। বান্দা প্রতিটি কাজে যেমন নিয়্যত করবে তেমনই ফল পাবে। রাসূলুল্লাহ সা. এর এক হাদীসে এসেছে আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি জ্ঞানী ব্যক্তির প্রতিটি কাজ কবূল করি এমন নয় বরং আমি তার নিয়্যত ও ইচ্ছাকে কবূল করি। তার নিয়্যত যদি আমার ইবাদত ও হুকুম পালনের উদ্দেশ্যে হয় তখন তার চুপ থাকাকেও প্রশাসার্হ ও সম্মানজনক বাক্য বলে গণ্য করি। যদিও সে মুখে কোন কথা উচ্চারণ না করে।[২]

১৭.আল- মানযূমাতু আল- মুখতাসারাতু ফী হুকমিল উজরাতি আলাত তাআতি المنظومة المختصرة في حكم الاجرة علي الطاعات

আল মানযূমাতু আল মুখতাসারাতু ফী হুকমিল উজরাতি আলাত তাআতি মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ'র ছাত্রজীবনে রচিত ফার্সী কাব্য। এ পুস্তিকাটি আল মানযূমাতি খাকি গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত। এটি প্রকাশ করেছে

কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী চট্টগ্রাম। প্রকাশকাল অজ্ঞাত। মুফতী সাহেব এ পুস্তিকায় ইবাদতে মাকসূদা তথা মৌলিক ইবাদতের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা অবৈধ সেই আলোচনা সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন। জানাযার নামায পড়িয়ে, বিভিন্ন খতম, তাসবীহ, তাহলীল পড়ে বিনিময় গ্রহণ করা হারাম বলে এ কাব্যে উল্লেখ করেছেনএবং এ বিষয়ে সমাজে যেসব রুসুম- রেওয়াজ প্রচলিত রয়েছে সেগুলো প্রতিহতের আহ্বান জানিয়েছেন। এর একটি সংস্করণ দেওবন্দের কাসিমী প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়েছিল।[৩]

১৮.ইযালাতুল খাবতি ওয়াল হায়মানি ফী ইসবাতি রুইয়াতি হিলালিল ঈদে ও রমাদান

ازالة الخبط والهيمان في اثبات روية هلال العيد ورمضان

মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ র. রচিত একটি গুরুত্বপূর্ণ পুস্তিকার নাম *ইযালাতুল খাবতি ওয়াল হায়মানি ফী ইসবাতি রুইয়াতি হিলালিল ঈদে ও রমাদান*। পুস্তিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০। এ পুস্তিকার রচনাকাল ১৩৭২ হি. ও ১৩৭৭ হি.। পুস্তিকাটি প্রকাশ করেছে কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী চট্টগ্রাম। প্রথম প্রকাশকাল ১৩৭৮ হি./১৯৫৮ খৃ.। পুস্তিকার ভাষা উর্দু। পুস্তিকাটি মূলত কয়েকটি প্রশ্ন তথা ফাতাওয়ার উত্তর। যেমন- ১. ঈদের চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার জন্য স্বাক্ষী শর্ত কি না? ২. কোথাও চাঁদ দেখা গেলে অন্যান্য এলাকার জন্য তা প্রযোজ্য হবে কি না? অথবা আধুনিক প্রযুক্তি-রেডিও, টেলিভিশন, টেলিফোন, ট্রাঙকল,ইন্টারনেট ইত্যাদি প্রযুক্তির মাধ্যমে শ্রোত বা সরকারী গণমাধ্যমে প্রচারিত সংবাদের ভিত্তিতে ঈদ ও রোযা আদায় করা যাবে কি না? এসব প্রশ্নের উত্তরে এ পুস্তিকা রচিত হয়েছে। মুফতী সাহেব বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য কিতাবের আলোকে প্রামাণিক আলোচনা করেছেন। তাঁর বক্তব্যের সারকথা হলো চাঁদ দেখার বিষয়টি প্রমাণের জন্য স্বাক্ষী প্রয়োজন। এ বিষয়ে উম্মতের ইজমা রয়েছে। কোন শহর / দেশে সরকারী কর্মকর্তা না থাকলে আর চাঁদ দেখা না গেলে তারা রোযা রাখবে না, ঈদ করা থেকে বিরত থাকবে।

১. বুখারী শরীফ, (সম্পাদনা পরিষদ), প্রাগুক্ত, খ.১ম,প্র.৩, হাদীস নং ১ ।
২. ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মদ, মুফতী, তারগীবুল উম্মাহ ইলা তাহসীনিন নিয়্যাহ, চট্টগ্রাম কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, তা. বি. পৃ. ১-১৬।
৩. ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মদ, মুফতী, আল মানযূমাতু আল মুখতাসারাতু ফী হুকমিল উজরাতি আলাত তাআতি চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, পৃ.২৯-৩১; আব্দুল বাকী, মুহাম্মদ, ড., প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৩-১৩৪।

শুধুমাত্র আধুনিক প্রযুক্তির উপর নির্ভর করে ঈদ আদায় করা, রোযা, ই'তিকাফ ছেড়ে দেয়া বৈধ হবে না। রেডিও, টেলিগ্রামের সংবাদ শরীআতের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ বিষয়টি প্রমাণের জন্য যেমন স্বাক্ষীর প্রয়োজন তেমনি তাতে স্বাক্ষীর সংখ্যার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। মুফতী সাহেবের উদ্বৃত ফাতাওয়াসমূহ সাধারণ জনগণ এবং শাসকদেরকেও চমৎকার দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে।[১]

১৯. হাদিয়্যাতু রমাদান هدية رمضان

মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ র. রচিত হাদিয়্যাতু রমাদান একটি ছোট্ট পুস্তিকা। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা দশ। রচনাকাল অজ্ঞাত। পুস্তিকাটি প্রকাশ করেছে কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী চট্টগ্রাম। প্রকাশক মৌলবী মুহাম্মদ কাসিম ফয়যী। এ গ্রন্থের বিষয়গুলো ফাতাওয়া শামী, ফাতাওয়া আলমগীরি ইত্যাদি নির্ভরযোগ্য ফিক্হী গ্রন্থ হতে সংকলন করেছেন। এ গ্রন্থে মুফতী সাহেব রমাদানের ফযীলত সম্বন্ধে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। যেমন- রোযা জাহান্নামের আগুন থেকে আত্নরক্ষার ঢাল এবং শক্তিশালী দূর্গ।[২] রাসূলুল্লাহ সা. আরো বলেন-আল্লাহ তা'আলা বনী আদমের নেককাজের বদলা দশ গুন হতে সাতশ' গুন পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছেন, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বলেন, রোযা আমার জন্য খাছ, আমি নিজেই এর পুরস্কার প্রদান করব। রোযাদারের দুটি আনন্দ- একটি ইফতারের সময়, দ্বিতীয়টি প্রভুর সাথে সাক্ষাতের সময়।[৩] পবিত্র রমযানের চাঁদ দেখা প্রসঙ্গে মুফতী সাহেব বলেন, রমযানের চাঁদ দেখা, এর খোঁজ রাখা ফরযে কিফায়া। এ ক্ষেত্রে দ্বীনদার- পরহেজগার মানুষের সাক্ষী প্রয়োজন।

রোযা ফরয হওয়া, শুদ্ধ হওয়া, সাহরী খাওয়া, সুর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করা, ইফতার করার সময় দু'আ পাঠ করা, রোযার মাকরূহ বিষয়াবলী, রোযা ভঙ্গ হওয়া, না হওয়া, তারাবীর নামায এবং তা বিতর নামাযের পূর্বে আদায় করা, শবে কদর, ফিতরা, ঈদের দিন এবং ঈদের দিনের সুন্নত, ঈদের মাঠ ইত্যাদি

বিষয় এ পুস্তিকায় আলোচিত হয়েছে। পুস্তিকাটি যুগোপযোগী এবং মুসলিম মিল্লাতের জন্য রোযা পালনকে সহজ করে দিয়েছে।[৪]

২০. ফাযাইলে জিলহাজ্ব ওয়া মাসাইলে কুরবানী فضائل ذي الحج و مسائل قرباني

মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ র. রচিত এ পুস্তিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭। রচনাকাল অজ্ঞাত। প্রকাশ করেছে কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী চট্টগ্রাম। এর নতুন সংস্করণের প্রকাশকাল ১৯৯১ খৃ.। প্রকাশক মৌলবী মুহাম্মদ কাসিম ফয়যী। এ পুস্তিকায় কুরবানীর ফযীলত এবং কুরবানী সংক্রান্ত ৩৩টি মাসআলা আলোচনা করেছেন। মালদার ব্যক্তির উপর কুরবানী করা ওয়াজিব। মুসাফিরের উপর কুরবানী করা ওয়াজিব নয়। কুরবানী শুধুমাত্র নিজের উপর ওয়াজিব; স্ত্রী পুত্র-কন্যাদের পক্ষ থেকে আদায় করা ওয়াজিব নয়। ছাগল, ভেড়া, দুম্বা দ্বারা একজনের কুরবানী প্রযোজ্য এবং গরু, মহিষ, উট দ্বারা ৭ জনের কুরবানী আদায় হবে। শরীকে কুরবানী দাতাদের নিয়ত সম্পূর্ণ সহীহ শুদ্ধ, খালিস আল্লাহর ওয়াস্তে হতে হবে। অন্যথায় সবার কুরবানী নষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং বিষয়টি সম্পর্কে সতর্ক থাকার জন্য তিনি সবাইকে আহ্বান জানিয়েছেন। যেসব কাজের লোককে বেতন-খোরাকি দেয়া হয় তাদেরকে কুরবানীর গোশত দ্বারা আহার করানোর বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। যাতে তা মূল্য হিসেবে পরিণত না হয়। দারিদ্রতা যখন রাসূলের জীবনে নিত্য সঙ্গী ছিল তখনও তিনি এক বছর একশত উট কুরবানী করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর হতে অদ্যাবধি দুনিয়াতে এমন কোন মনীষী দেখা যায়নি যিনি একই বছর একশত উট, গরু, বা অন্য কোন পশু কুরবানী করার মত গৌরব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। মুসলিম উম্মাহর জন্য এ পুস্তিকার বিষয়গুলো এবং সংশ্লিষ্ট মাসআলাগুলোর উপর আমল করা যেমন সহজ হয়েছে, তদ্রুপ কুরবানী করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে। এ জন্য লেখক ধন্যবাদ যোগ্য।[৫]

---

১. ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মদ, মুফতী, *ইযালাতুল খাবতি ওয়াল হায়মানি ফী ইসবাতি রুইয়াতি হিলালিল ঈদে ও রমাদান* চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, তা. বি. পৃ. ১-১০ ;আব্দুল বাকী, মুহাম্মদ, ড.,প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৩-১৩৪।

২. ফয়যুল কালাম, পৃ.২৮৮, হাদীস নং-৪৮৭ ।

৩.মেশকাত শরীফ, (নুর মোহাম্মদ আ'জমী অনূ) ,ঢাকা, এমদাদিয়া পুস্তকালয়,২০১১, খ.৪র্থ, পৃ. ২১৫, হাদীস নং-১৮৬৩ ।

৪. ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মদ, মুফতী, হাদিয়াতু রমাদান, চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, তা. বি. পৃ. ১-১০

৫. ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মদ, মুফতী, *ফাযাইলে জিলহাজ্ব ওয়া মাসাইলে কুরবানী* , চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, ১৯৯১ , পৃ. ১-৭।

২১. ইসতিহবাবুদ দা'ওয়াতি ফী নাযরি আল- মুফতী আল- আযম استحباب الدعوات في نظر المفتي الاعظم

মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ রচিত এ পুস্তিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬ । রচনাকাল অজ্ঞাত। পুস্তিকার ভাষা আরবী। প্রকাশ করেছে কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী চট্টগ্রাম। প্রকাশকাল ২০১৪ খৃ.। এ পুস্তিকাটি মাজমুআ রাসাইলে ফয়যিয়া ১ম খন্ডের অন্তর্ভূক্ত। পুস্তিকাটিতে হাকীমুল উম্মত শাহ আশরাফ আলী থানবী র. -এর বক্তব্যের সাথে কিছু সংযোজন করেছেন। হযরত থানবী র, তাঁর জীবদ্দশায় ১৩৫৪ হি. রজব মাসের প্রথম দিকে এ গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। এ পুস্তিকায় কোন সময় কোন দুআটি পাঠ করা উত্তম বলে পবিত্র কুরআন,হাদীসে বর্ণিত হয়েছে সেগুলো সনদসহ উল্লেখ করেছেন এবং দুআগুলো পাঠ করার কি নেকী, কি ফায়দা সেগুলো বর্ণনা করেছেন। গ্রন্থের আলোচনাকে চৌদ্দটি ভাগে ভাগ করেছেন। হাম্বলী ফকীহগণের মতে ফরয নামাযের পর দুআ করা সুন্নত। যেহেতু এ সময় দুআ কবূল হয়ে থাকে। হানাফী আলিমগণের মতে ইমামসাহেব নামাযের পর (যে নামাযের পর অন্য কোন নামায থাকে না) মুসুল্লীদের দিকে ফিরে বসা মোস্তাহাব। বুখারী ও মুসলিম শরীফে এসেছে-রাসূলুল্লাহ সা. নামায শেষ করার পর মুসুল্লীদের দিকে ফিরে বসতেন। হযরত থানবী র. ও মুফতী সাহেব নির্ভরযোগ্য হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, নামাযের পর দুআ করা চার মাযহাব মতেই সুন্নত ও শরীআতসিদ্ধ।[১]

২২. ইযহারুল ইখতিলাল اظهار الاختلال

মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ র. রচিত *ইযহারুল ইখতিলাল* একটি ফিকহ বিষয়ক পুস্তিকা। এর রচনাকাল অজ্ঞাত। গ্রন্থের ভাষা আরবী। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৫। প্রকাশ করেছে কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী চট্টগ্রাম। প্রকাশকাল অজ্ঞাত। গ্রন্থটি মাজমুআ রাসাইলে ফয়যিয়া ২য় খন্ডের অন্তর্ভূক্ত। গ্রন্থটির উর্দু অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেছেন মুফতী মুহাম্মদ ইউসুফ ইসলামাবাদী। মূল বাক্যের নিচে উর্দু অনুবাদ সংযোজিত হয়েছে।

এ পুস্তিকায়ও মুফতী সাহেব রমযান ও ঈদের চাঁদ দেখা বিষয়ে এবং সেগুলোর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[২]

২৩. দরূদ ও কিয়াম درود و قيام

দরূদ ও কিয়াম পুস্তিকাটি মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ র. রচিত একটি দীর্ঘ ফাতাওয়া। পরবর্তীতে একে পুস্তিকা হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে। এটি মাজমুআ রাসাইলে ফয়যিয়া চতুর্থ খন্ডের অন্তর্ভূক্ত। এর রচনাকাল ১৩৪৫ হি.। এর ভাষা আরবী। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০। প্রকাশ করেছে কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী চট্টগ্রাম, প্রকাশকাল অজ্ঞাত। এ পুস্তিকার বক্তব্যের সারকথা হলো- বক্তাগণ যেভাবে সুর করে সমস্বরে দরূদ শরীফ পাঠ করে তা শরীআতসিদ্ধ নয় বরং বিদআতে সাইয়্যিআহ । দরূদ পাঠের জন্য লোকজনের জমায়েত হওয়া, জমায়েত করা, তাতে কিয়াম করা তথা দাঁড়িয়ে দরূদ শরীফ পাঠ করা শরীআত বিরুদ্ধ কাজ। রাসূলুল্লাহ সা. সাহাবা, তাবিঈন, মুজতাহিদ ইমামগণের যুগে এসব আমল ছিল না। সুতরাং এগুলো পরিত্যাজ্য এবং বিদআতে সাইয়্যিআহ হিসেবে গণ্য।[৩]

২৪. ফাতাওয়া ফয়যিয়া (১ম খন্ড)

فتاوي فيضية (جلد اول)

মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ র.-এর জীবনের উল্লেখযোগ্য রচনা ও সংকলন হলো ফাতাওয়া তাঁর রচিত ও প্রদত্ত ফাতাওয়ার সংখ্যা অনুমান পাঁচ হাজার। তন্মধ্যে প্রায় ১ হাজার ফাতাওয়া ছাপা হয়েছে এবং প্রায় ৪ হাজার ফাতাওয়ার পাণ্ডুলিপি এখনও ছাপার বাকি আছে। তাঁর ফাতাওয়া ভান্ডার হতে ৩০৮টি ফাতাওয়া নিয়ে *ফাতাওয়া ফয়যিয়া* **১ম** *খন্ড* প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে কুতুবখানা

১. ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মদ, মুফতী, *ইসতিহবাবুদ দা'ওয়াতি ফী নাযরি আল- মুফতী আল- আযম*, চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, ২০১৪ , পৃ. ১-১৬।

২. ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মদ, মুফতী, ইযহারুল ইখতিলাল, চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি. পৃ. ১১-৩২

৩. ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মদ, মুফতী, মাজমুআ রাসাইলে ফয়যিয়া, চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি. খ. ৪র্থ পৃ. ৫০-৫৯।

ফয়যিয়া, হাটহাজারী চট্টগ্রাম। প্রকাশকাল ১ রবিউল আউয়াল ১৪৩১ হি. মোতাবেক ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০১০ খৃ.। মুফতী সাহেব রচিত এ গ্রন্থের ফাতাওয়াগুলোকে বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস করেছেন মুফতী মুহাম্মদ রহীম উদ্দীন। এ ফাতাওয়া গ্রন্থের শুরুতে প্রারম্ভিক ভূমিকা লিখেছেন হাটহাজারী মাদ্রাসার প্রধান পরিচালক দেশ বরেণ্য আলিম আল্লামা শাহ আহমদ শফী দা. বা.। গ্রন্থটির গুরুত্ব এবং মুফতী ফয়যুল্লাহর মহান ব্যক্তিত্ব ও ইলমী যোগ্যতার বিবরণ সমৃদ্ধ অপর একটি ভূমিকা লিখেছেন মুফতী ইযহারুল ইসলাম চৌধুরী। ফাতাওয়া সমূহের বিন্যাসকারী মুফতী রহীম উদ্দীনেরও একটি দীর্ঘালোচনা রয়েছে গ্রন্থটির পরিচিতি ও গুরুত্ব সম্বন্ধে। গ্রন্থের শুরুতে সংক্ষেপে মুফতী সাহেবের জীবনী আলোচনা করা হয়েছে। অত:পর মুফতী সাহেবের ফাতাওয়া সমূহ বিষয় ভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে। এ ফাতাওয়া গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৯২। মুফতী সাহেব রচিত ফাতাওয়া সমূহের বৈশিষ্ট্য হলো- ১. তিনি ফাতাওয়া সমূহ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। ২. দীর্ঘ প্রশ্ন বা মাসআলার উত্তর তিনি অতি সংক্ষেপে প্রদান করে অনন্য বৈশিষ্ট্য রাখতে সক্ষম হন। ৩. অধিকাংশ ফাতাওয়ার রচনাকাল উল্লেখ করেননি, যেগুলোর রচনাকাল উল্লেখ করেছেন, সেগুলোতে হিজরী সন তারিখ উল্লেখ করেছেন। ৪. তাঁর ফাতাওয়া সমূহের ভাষা আরবী, ফার্সী ও উর্দু। ফাতাওয়া সমূহ কুরআন, হাদীস, ফিক্হ নির্ভরযোগ্য কিতাব, মুজতাহিদ ইমামগণের বক্তব্য সালফে সালিহীনের আমলের মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করেছেন। ফাতাওয়া ফয়যিয়া ১ম খন্ডে ফাতাওয়াসমূহকে ১১টি অধ্যায়ে বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়-ঈমান ও আকীদা, দ্বিতীয় অধ্যায়-সুন্নত ও বিদআত, তৃতীয় অধ্যায়-তাসাউফ ও সুলূক, চতুর্থ অধ্যায়- আলহুকূক, মুআশারা ওয়া আদাবিহা, পঞ্চম অধ্যায়- পবিত্রতা, ষষ্ঠ অধ্যায়- নামায, সপ্তম অধ্যায়- জানাযার নামায, অষ্টম অধ্যায়- যাকাত, নবম অধ্যায়-সাওম, দশম অধ্যায়-হজ্ব, একাদশ অধ্যায়-নিকাহ।[১]

প্রথম অধ্যায় : ঈমান ও আকাইদ

এ অধ্যায়ে মোট সাতটি পরিচ্ছেদ রয়েছে।

১ম পরিচ্ছেদঃ ঈমান ও ইসলাম

এ পরিচ্ছেদে ক. ইসলাম কী? খ. ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম গ্রহণযোগ্য নয়, গ. ইসলামের নির্দশন কি কি? ঘ. ইচ্ছা করে নামায ছেড়ে দেওয়া এবং নামায পড়তে বারণ করলে কেউ মুসলমান থাকতে পারে কি? ঙ. শরীআত, তরীকত, মা'রিফাত, হাকীকত কি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়? একটি কি অপরটির মুখালিফ? চ. কারো জীবদ্দশায় নামায, রোযা, ইত্যাদি থেকে পরিত্রাণ পাবার কোন প্রমাণ আছে কি? ছ. হাজারো কামালতের অধিকারী হয়েও নামায, রোযা আদায় না করলে কামিল হবার সুযোগ আছে কি? জ. ঢোল, বাদ্য-বাজনা, বাজানো, নর্তন, কুর্দন, মানুষকে সিজদা করা কি শরীআত সিদ্ধ? ঝ. কাউকে আল্লাহ তাআলার ন্যায় রিযকদাতা বলে বিশ্বাস করা যায়? মৃত্যুর পর লাশ দাফন না করা, তিনদিন পর্যন্ত ফেলে রাখার বিধান, ট. কবর বা লাশের উপর ফুল ছিটানো, কবর পাকা করা, লাশের নিচে তোষক ইত্যাদি বিছিয়ে দেয়া, ঠ. শরীআত বিরুদ্ধ হারাম কাজকে বৈধ ও মসনুন মনে করা কি শুদ্ধ হবে? এসব বারটি প্রশ্নের উত্তর তথা ফাতাওয়া এই পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে। এ ফাতাওয়াসমূহ তিনি হাটহাজারী মাদ্রাসায় কর্মরত অবস্থায় ৬ মহররম ১৩৭০ হিজরীর মধ্যে রচনা করেছিলেন।[২]

২য় পরিচ্ছেদ : ইসলামী উসূল ও ইসলামী নিদর্শনকে অস্বীকার করার বিধান

ক. ইসলামী বিধান ও ইসলামী নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করা, খ. তাওবার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা, গ. আমি সত্য এমন স্লোগান দেওয়া ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরসমূহ এ পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে। এরা হত্যাযোগ্য অপরাধী বলে গণ্য হবে এমনটি মুফতী সাহেব প্রামাণিক আলোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে রচিত একটি ফাতাওয়ার রচনাকাল ৯ জিলহজ্ব ১৩৬৬ হি.। স্থান হাটহাজারী মাদ্রাসা।

১.ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মদ, মুফতী, *ফাতাওয়া ফয়যিয়া*, চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী ২০১০, খ. ১ম, পৃ. ১-৩৪

২. ঐ, পৃ. ৩৫-৩৮ ।

৩য় পরিচ্ছেদ : ইলম ও আলিমদেরকে বকাবাদ্য করা

ক. অন্যায় অনর্থকভাবে আলিমকে গালি দেওয়া কবীরা গুনাহ, কুফরী। খ. শরীআতকে গালি দিলে পুনরায় ঈমান আনতে হবে, নতুন করে বিয়ে সম্পন্ন করতে হবে। গ. আহলে বিদআত ও বাতিল ফিরকার পক্ষ থেকে আলিমে দীনকে গালি দেয়া কুফ্‌র, মুসলমানকে গালি দেয়া ফিস্‌ক। ঘ. ফাতাওয়া সম্বন্ধে ঔদ্বত্যমূলক শব্দের ব্যবহার করার মধ্যে কুফ্‌রের আশংকা রয়েছে। ঙ. যারা সূদ, ঘুষ খায়, জুলুমবাজীতে লিপ্ত, শরীআতের আলিমগণকে খারাপ মনে করে, তাদের বিষয়ে অশালীন উক্তি করে; তারা ফাসিক। দীনের প্রতি বিদ্বেষবশত: হলে কাফির। চ. মাসায়িলে আরবাঈন নির্ভরযোগ্য কিতাব। ছ. অনুষ্ঠানে বর-কনে থেকে অর্থ আদায় করা অবৈধ। ইত্যাদি বিষয় সম্বলিত ৯টি ফাতাওয়ার আলোচনা এ পরিচ্ছেদে রয়েছে। এ ফাতাওয়াসমূহের রচনাকাল-২ জমাদিউল আখির ১৩৭৭ হি., ১৫ রমযান ১৩৭৬ হি., ৩০ মহররম ১৩৭৩ হি.। স্থান হাটহাজারী মাদ্রাসা।

৪র্থ পরিচ্ছেদ : ইসলামী বিধি- বিধানকে তাচ্ছিল্য করা

ইসলামী বিধি-বিধান, নামায, ইত্যাদিকে অস্বীকার করা, তাচ্ছিল্য করা কুফ্‌র। এ প্রসঙ্গে দুটি ফাতাওয়ায় এ পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে।

৫ম পরিচ্ছেদ : ইল্‌ম গায়েব সম্বন্ধে

ক. ইল্‌ম গায়েব কি? মহানবী সা. আলিমুল গায়েব ছিলেন না বরং ইল্‌ম নবুয়্যতের অধিকারী ছিলেন। তাঁকে আলিমুল গায়েব মনে করা শির্‌ক। ইত্যাদি বিষয় নিয়ে এ পরিচ্ছেদে পাঁচটি ফাতাওয়া আলোচিত হয়েছে। এ ফাতাওয়াসমূহের রচনাকাল-১১ রমযান ১৩৭৪ হি., ২৮ রমযান ১৩৭৪ হি., ২৯ রবিউল আউয়াল ১৩৭৭ হি.। রচনার স্থান হাটহাজারী মাদ্রাসা।

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ : জ্যোতিষীর নিকট যাওয়া

জ্যোতিষী ও জাদুকরের নিকট যাওয়া, তাদের আশ্রয় গ্রহণ করা কুফ্র। এ প্রসঙ্গে একটি ফাতাওয়া আলোচিত হয়েছে।

৭ম পরিচ্ছেদ : নবুওয়্যত প্রসঙ্গ

এ পরিচ্ছেদে পিঠে কোন নিদর্শন থাকলে নব্যুয়তের দাবী করা, দরূদ শরীফ পাঠ করার বিধান, আমি নবীর চেয়ে উত্তম এমন কথা বলা, আমার কুরআন শরীফের দরকার নেই, আব্দুল কাদির জিলানী র. কে মুশকিলকুশা বলা, জ্বীনদের নিকট গায়বের সংবাদ জিজ্ঞেস করা প্রসঙ্গে ৮টি ফাতাওয়া আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : সুন্নত ও বিদ'আত

এ অধ্যায়ে কোন পরিচ্ছেদ নেই বরং এ অধ্যায়ের অধীন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আঠারটি ফাতাওয়ার আলোচনা করা হয়েছে। ক. সুন্নত বিদ'আতের পরিচয় ও প্রকারভেদ খ. তারাবীহর নামাযে চার রাকাআত ও বিশ রাকাআত আদায়ের পর মুনাজাত করার বিষয়টিকে অতি জরূরী মনে করা। গ. উস্তাদ, পীর, মুর্শিদ, পিতা- মাতাকে কদমবুছি করা পরিত্যাজ্য। ঘ. পুরুষের চোখে সুরমা লাগানো বৈধ, যিনার উদ্দেশ্যে হলে অবৈধ। ঙ. সীরাতুন্নবী সা., ঈদে মীলাদুন্নবী সা. অনুষ্ঠান করা, চ. আযানের পর হাত উঠিয়ে দুআ করা, ছ. ঈদের নামাযের পর মুনাজাত করা, জ. শবে বারাআত, শবে কদরে গরু, ছাগল, ইত্যাদি জবাই করা, মিষ্টান্ন রান্না করা। ঝ. মীলাদ ও ক্বিয়াম এবং মীলাদ মাহফিলে উচ্চস্বরে দরূদ শরীফ পাঠ করা। ঞ. ১২ রবিউল আউয়ালের কিছু অনুষ্ঠান ইত্যাদি বিষয় সম্বলিত মুফতী সাহেবের আঠারটি ফাতাওয়া এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। কয়েকটি ফাতাওয়ার রচনাকাল- ১০ শাওয়াল ১৩৫২ হি., ২০ জিলহজ্ব ১৩৭৬ হি., ১১ রমযান ১৩৮২ হি., ১৩ রমযান ১৩৭৪ হি., ২১ রমযান ১৩৭২ হি.। রচনার স্থান হাটহাজারী মাদ্রাসা।[১]

তৃতীয় অধ্যায় : তাসাউফ ও সুলূক

এ অধ্যায়ের অধীন কোন পরিচ্ছেদ নেই। অধ্যায়ের অধীন সরাসরি নিম্নোক্ত মাসআলা সমূহের ফাতাওয়াগুলো আলোচনা করা হয়েছে। ক. তাসাউফ, তরীকত, সূলূক সংক্রান্ত আলোচনা।

১. ঐ, পৃ. ৮২-১২৭।

খ. কামিল পীরের শর্তাবলী, গ. মুরীদ মহিলার সাথে পীরের পর্দা না করা এবং তার মাথায় হাত রাখা। ঘ. ফাসিক, বিদআতী পীরের হাতে বায়আত হওয়া, ঙ. প্রচলিত পীর মুরিদী ও বায়আতের বিধান। চ. ইসলাহে বাতেনের জন্য প্রচলিত পীর মুরীদীর প্রয়োজনীয়তা। ছ. আহলে তাসাউফ, আহলে মা'রিফাতের দাবীদার বিভ্রান্ত গোষ্ঠীর বিধান। জ. ইসলাহে বাতিনের জন্য বায়আত হওয়া প্রয়োজন। ঝ. শরীআত, তরীকত, মা'রিফাতের পরিচয় এবং এগুলোর মধ্যকার পার্থক্য। এ অধ্যায়ে মুফতী সাহেবের নয়টি ফাতাওয়া উল্লেখ রয়েছে। কয়েকটি ফাতাওয়ার রচনাকাল ২৮ জিলকদ ১৩৭২ হি., ২৭ জিলকদ ১৩৭৪ হি. ৬ মহররম ১৩৭০ হি.। রচনার স্থান হাটহাজারী মাদ্রাসা।

চতুর্থ অধ্যায়: সামাজিক অধিকার ও আদব সমূহ

এ অধ্যায়ের অধীন কোন পরিচ্ছেদ নেই বরং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আটটি ফাতাওয়ার আলোচনা রয়েছে। ক. সামাজিক অধিকার ও আদব, খ. নিজের জমি অন্যের নামে বন্দোবস্ত দেয়া, গ. দুইভাইয়ের যৌথ মালিকানাধীন সম্পত্তির বিধান ঘ. যৌথ পরিবারে এক ভাইয়ের ক্রয়কৃত সম্পত্তিতে দ্বিতীয় ভাই হকদার হবেন কি না? ঙ. বিনা টিকিটে রেলগাড়ীতে ভ্রমণ করা অন্যায়, চ. ইয়াতীমের জন্য নিজের সম্পদ থেকে ব্যয় করা পরবর্তীতে তা ফিরিয়ে নেয়া, ছ. যৌথ পরিবারে স্থাবর- অস্থাবর সম্পত্তির ওয়ারিশের বিধান জ. পিতা- মাতার অবাধ্যতা করা এবং কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে পিতার সাথে বিরোধ করা কি অবাধ্যতার অন্তর্ভূক্ত? কয়েকটি ফাতওয়ার রচনাকাল- ৬-১-১৩৪৬ হি., ১২-৪-১৩৬২ হি., ২২-০১-১৩৬৭ হি., ২৭-১১-১৩৭৪ হি., ১৭-০৪-১৩৭৪ হি., ০৯-০২-১৩৬৯ হি., ০৭-০২-১৩৮৩ হি.। রচনার স্থান হাটহাজারী মাদ্রাসা।[১]

পঞ্চম অধ্যায়: তাহারাত

এ অধ্যায়ে কোন পরিচ্ছেদ ছাড়াই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তিনটি ফাতাওয়া উল্লেখ করা হয়েছে। ক. পাক-নাপাক সংক্রান্ত আলোচনা, খ. ঢিলা দ্বারা ইস্তিঞ্জা করার বিধান, গুরুত্ব এবং বিষয়টি সুন্নত তা অস্বীকার করার বিধান, গ. ছোট চৌবাচ্চায় অযূ করা, ঘ. মানুষ এবং শূয়োর ছাড়া অন্য সব প্রাণীর চামড়া দাবাগাত করলে পবিত্র হয়ে যায়, ঙ. শরীআত সম্মতভাবে জবাইকৃত প্রাণীর গোস্তের মধ্যে শূয়োরের রক্ত মিশ্রিত হলে তার বিধান। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ফাতাওয়াসমূহের রচনাকাল- ১০রবিউল আউয়াল ১৩৭৪ হি., ২০ রবিউল আউয়াল ১৩৭৪ হি.। রচনার স্থান হাটহাজারী মাদ্রাসা।[২]

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ সালাত

এ অধ্যায়ের অধীন সাতটি পরিচ্ছেদ রয়েছে।

১ম পরিচ্ছেদ : ইমামত ও জামাআত প্রসঙ্গে। এ পরিচ্ছেদে সাতটি ফাতাওয়া উল্লেখ রয়েছে।

২য় পরিচ্ছেদ : জুমুআ ও ঈদ প্রসঙ্গে। এ পরিচ্ছেদে সাতটি ফাতাওয়ার উল্লেখ রয়েছে। কয়েকটি ফাতাওয়ার রচনাকাল-১৩-০১-১৩৭২ হি., ১৩-০২-১৩৭৪ হি., ২৮-০১-১৩৭০ হি., রচনার স্থান হাটহাজারী মাদ্রাসা।

৩য় পরিচ্ছেদ : বিত্‌র নামায। এ পরিচ্ছেদে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দুটি ফাতাওয়ার উল্লেখ রয়েছে।

৪র্থ পরিচ্ছেদ : তারাবীহর নামায। এ পরিচ্ছেদে তিনটি ফাতাওয়ার আলোচনা রয়েছে। রচনাকাল- ১৩ রজব ১৩৭৪ হি., ৮ রমযান ১৩৭৪ হি., স্থান হাটহাজারী মাদ্রাসা।

৫ম পরিচ্ছেদ : ক্বিরাআত। এ প্রসঙ্গে মুফতী সাহেবের দুটি ফাতাওয়া উল্লেখ রয়েছে।

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ : মাসজিদের আদাবসমূহ। এ পরিচ্ছেদে সাতটি ফাতাওয়ার উল্লেখ রয়েছে।

৭ম পরিচ্ছেদ : নামাযের বিভিন্ন মাসআলা। এ পরিচ্ছেদে আটটি ফাতাওয়ার উল্লেখ রয়েছে। রচনাকাল ২৫ জমাদিউস সানী ১৩৭৪ হি., ১৩ রমযান ১৩৭৪ হি., ২৫ জিলহজ্ব ১৩৭৭ হি.। রচনার স্থান হাটহাজারী মাদ্রাসা।

সপ্তম অধ্যায় : জানাযা প্রসঙ্গ। এ অধ্যায়ের অধীন তিনটি পরিচ্ছেদ রয়েছে।

---

১. ঐ, পৃ. ১২৮-১৭২।
২. ঐ, পৃ. ১৭৩-১৭৬।

১ম পরিচ্ছেদঃ

ক. কোন মুসলমান পুরুষ কর্তৃক অমুসলমান নারীর গর্ভ হতে অবৈধভাবে শিশু জন্ম গ্রহণ করার পর শিশু অবস্থায় মারা গেলে তার বিধান। খ. জানাযার নামায পড়ানোর জন্য কাউকে অসীয়ত করে গেলে অসীয়ত প্রাপ্ত ব্যক্তি অগ্রাধিকার পাবেন কি না? গ. আত্মহত্যাকারীর উপর জানাযার নামায পড়া হবে কি না? এতদসংক্রান্ত মুফতী সাহেবের তিনটি ফাতাওয়ার উল্লেখ রয়েছে।

২য় পরিচ্ছেদ : জানাযা বহনকরা, দাফন করা, স্থানান্তর করা

ক. জানাযা বহনকরা, দাফন করা, স্থানান্তর করা, খ. জীবদ্দশায় কবর খনন করে রাখা, গ. জানাযার নামাযের পর মৃতের ওয়ালীর অনুমতি ব্যতীত চলে যাওয়া, ঘ. পুরনো কবরে দ্বিতীয়বার লাশ দাফন করা সংক্রান্ত তিনটি ফাতাওয়ার উল্লেখ রয়েছে। একটি ফাতাওয়ার রচনাকাল ১২ জিলকদ ১৩৭১ হি.।

৩য় পরিচ্ছেদ : কবরে ইমারত নির্মাণ করা

ক. কবরের উপর ইমারত ইত্যাদি নির্মাণ করা, খ. পুরনো কবরস্থানে বাড়ী ঘর, ইমারত নির্মাণ করা, শস্য আবাদ করা, নতুন করে মরদেহ দাফন করা; সংক্রান্ত দুটি ফাতাওয়ার উল্লেখ রয়েছে। একটি ফাতাওয়ার রচনাকাল ১৭ শাবান ১৩৭৪ হি.। রচনার স্থান হাটহাজারী মাদ্রাসা।

অষ্টম অধ্যায় : যাকাত

এ অধ্যায়ের অধীন পাঁচটি পরিচ্ছেদ রয়েছে।

১ম পরিচ্ছেদ : ব্যবসার মাল ও নগদ অর্থের যাকাত প্রসঙ্গে।

এ প্রসঙ্গে মুফতী সাহেবের তিনটি ফাতাওয়ার উল্লেখ রয়েছে। একটির রচনাকাল ১৮-০২-১৩৩১ হি.।

২য় পরিচ্ছেদ : সদকাতুল ফিত্‌র

এ পরিচ্ছেদে চারটি ফাতাওয়ার উল্লেখ রয়েছে। রচনার স্থান হাটহাজারী মাদ্রাসা।

৩য় পরিচ্ছেদ : ওয়াজিব সদকা ও নফল সদকা

এ পরিচ্ছেদে মুফতী সাহেবের দুটি ফাতাওয়ার উল্লেখ রয়েছে। রচনাকাল ৭ই রজব ১৩৭৪ হি.। রচনার স্থান হাটহাজারী মাদ্রাসা।

৪র্থ পরিচ্ছেদ : উশর ও খিরাজ

এ পরিচ্ছেদে মুফতী সাহেবের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফাতাওয়ার উল্লেখ রয়েছে। রচনার স্থান ও তারিখ উল্লেখ নেই। তবে প্রশ্নকর্তা ১৯৩৪ খৃ. ফাতাওয়াটি জানতে চেয়েছিলেন বলে উল্লেখ রয়েছে।

৫ম পরিচ্ছেদ : যাকাত, সদকাতুল ফিত্‌র ইত্যাদি ব্যয়ের খাতসমূহ

এ প্রসঙ্গে মুফতী সাহেবের চারটি ফাতাওয়া উল্লেখ রয়েছে। রচনাকাল ২৩ জিলকদ ১৩৬৬ হি.। রচনার স্থান হাটহাজারী মাদ্রাসা।

নবম অধ্যায় : সাওম

এ অধ্যায়ের অধীন চারটি পরিচ্ছেদ ও চৌদ্দটি ফাতাওয়ার উল্লেখ রয়েছে।

১ম পরিচ্ছেদঃ চাঁদ দেখা

এ পরিচ্ছেদে মুফতী সাহেবের তিনটি ফাতাওয়া উল্লেখ রয়েছে। দুটির রচনাকাল ০৮-১১-১৩৭৪ হি., ০১-১২-১৩৮৩ হি.। রচনার স্থান হাটহাজারী মাদ্রাসা।

২য় পরিচ্ছেদঃ যে কারণে রোযা ভঙ্গ হয় ও কাযা কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হয়।

এ প্রসঙ্গে মুফতী সাহেবের দুটি ফাতাওয়ার উল্লেখ রয়েছে। রচনাকাল ০৫-১১-১৩৭৪ হি., ০৪-১১-১৩৭৭ হি.। রচনার স্থান হাটহাজারী মাদ্রাসা।

৩য় পরিচ্ছেদ : ই'তিকাফ

এ পরিচ্ছেদে মুফতী সাহেবের সাতটি ফাতাওয়ার উল্লেখ রয়েছে।

৪র্থ পরিচ্ছেদ : রোযা সম্বন্ধে বিভিন্ন মাসআলা

এ প্রসঙ্গে দুটি ফাতাওয়ার উল্লেখ রয়েছে।

দশম অধ্যায়ঃ হজ্ব

এ অধ্যায়ের অধীন দুটি ফাতাওয়ার উল্লেখ রয়েছে। রচনাকাল ২৪ জিলহজ্ব ১৩৭৪ হি., ১ শাওয়াল ১৩৭৪ হি.। রচনার স্থান হাটহাজারী মাদ্রাসা।

একাদশ অধ্যায় : নিকাহ

এ অধ্যায়ের অধীন সতেরটি পরিচ্ছেদে ১৬৮টি ফাতাওয়ার আলোচনা রয়েছে।

১ম পরিচ্ছেদঃ মাহরামাত

এ পরিচ্ছেদে মুফতী সাহেবের ১৭টি ফাতাওয়ার উল্লেখ রয়েছে। এগুলোর রচনাকাল-৯মহররম ১৩৭৫ হি., ১০ সফর ১৩৭৫ হি., ২২ জিলকদ ১৩৭৪ হি., ১৬ সফর ১৩৭৪ হি., ৮ রমযান ১৩৭৩ হি., ১২ রজব ১৩৬৬ হি.। রচনার স্থান হাটহাজারী মাদ্রাসা।

২য় পরিচ্ছেদ : বিয়ের ওয়ালী ও কুফু

এ পরিচ্ছেদে তিনটি ফাতাওয়ার উল্লেখ রয়েছে। রচনাকাল ১৭ সফর ১৩৫৫ হি., ১৭ রমযান ১৩৭৪ হি.। রচনার স্থান হাটহাজারী মাদ্রাসা।

৩য় পরিচ্ছেদ : হুরমতে মুসাহ্‌হারাত

এ পরিচ্ছেদে পাঁচটি ফাতাওয়ার উল্লেখ রয়েছে। রচনার স্থান হাটহাজারী মাদ্রাসা। রচনাকাল ২৯ জমাদিউস সানী ১৩৭৪ হি., ১৫ জমাদিউস সানী ১৩৬৯ হি.।

৪র্থ পরিচ্ছেদ : বিয়ের জন্য মেয়ের নিকট হতে অনুমতি গ্রহণ করা এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের বিয়ের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে।

এ পরিচ্ছেদে মুফতী সাহেবের একটি ফাতাওয়ার উল্লেখ রয়েছে। রচনাকাল ২১-০৬-১৩৭৪ হি.। রচনার স্থান হাটহাজারী মাদ্রাসা।

৫ম পরিচ্ছেদ : জাহীয, মোহর, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার প্রসঙ্গে।

এ পরিচ্ছেদে ৬টি ফাতাওয়ার উল্লেখ রয়েছে। রচনার স্থান হাটহাজারী মাদ্রাসা। রচনাকাল ২৫-০৭-১৩৭৪ হি., ০৮-০১-১৩৭০ হি.।

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ : নিকাহ সংক্রান্ত বিভিন্ন মাসআলা

এ পরিচ্ছেদে মুফতী সাহেবের ৮টি ফাতাওয়ার উল্লেখ রয়েছে। রচনাকাল ১৭ রমযান ১৩১৭ হি., ০২-০৮-১৩৬৬ হি.। রচনার স্থান হাটহাজারী মাদ্রাসা।

৭ম পরিচ্ছেদ : তালাক পতিত হওয়া বা না হওয়া প্রসঙ্গে।

এ পরিচ্ছেদে মুফতী সাহেবের ২৪টি ফাতাওয়ার উল্লেখ রয়েছে। রচনাকাল ০২ রবিউল আউয়াল ১৩৪৬ হি., ১০-০৩-১৩৬৬ হি., ০২-১১-১৩৭৩ হি., ০৪-০৩-১৩৭৪ হি., ০৩-০৬-১৩৭৪হি., ১৫-০৭-১৩৭৪ হি., ০৯-০১-১৩৭৫ হি.। রচনাকেন্দ্র হাটহাজারী মাদ্রাসা।

৮ম পরিচ্ছেদ : তালাকে সারীহ্'র বিধান

এ পরিচ্ছেদে ৬টি ফাতাওয়ার উল্লেখ রয়েছে। রচনাকাল ০৮-১০-১৩৭৩ হি., ২৪-০২-১৩৭৫ হি., ২০-১১-১৩৭১ হি.। রচনার স্থান হাটহাজারী মাদ্রাসা।

৯ম পরিচ্ছেদ : কিনায়াহ তালাকের বিধান

এ পরিচ্ছেদে মুফতী সাহেবের ৫টি ফাতাওয়ার উল্লেখ রয়েছে। রচনাকাল ২৮-০২-১৩৭৪ হি., ২৮-০৩-১৩৭৪ হি.। রচনার স্থান হাটহাজারী মাদ্রাসা।

১০ম পরিচ্ছেদ : তিন তালাকের বিধান

এ পরিচ্ছেদে মুফতী সাহেবের ৮টি ফাতাওয়ার উল্লেখ রয়েছে। রচনাকাল ০৮-০৯-১৩৬৬ হি., ০১-০৮-১৩৭৪ হি. রচনার স্থান হাটহাজারী মাদ্রাসা।

১১ শ পরিচ্ছেদ : লিখিতভাবে তালাক দেয়া

এ প্রসঙ্গে মুফতী সাহেবের ৪টি ফাতাওয়ার উল্লেখ রয়েছে। রচনাকাল ০৩-০৭-১৩৭৪ হি.। রচনার স্থান হাটহাজারী মাদ্রাসা।

১২শ পরিচ্ছেদ : জোরপূর্বক তালাক দেয়া

এ পরিচ্ছেদে ৫টি ফাতাওয়ার উল্লেখ রয়েছে। রচনাকাল ২২-১২-১৩৬৭ হি., ১৯-১২-১৩৭৪ হি., রচনাকেন্দ্র হাটহাজারী মাদ্রাসা।

১৩শ পরিচ্ছেদ : স্ত্রী নিজের জন্য তালাক গ্রহণের অধিকার

এ পরিচ্ছেদে মুফতী সাহেবের ২২টি ফাতাওয়া উল্লেখ রয়েছে। ফাতাওয়াসমূহের রচনাকাল ২২-১০-১৩৫৭ হি., ২৫-০৩-১৩৫৯ হি., ১১-০৯-১৯৬৬ হি., ১৪-০৬-১৩৭৪ হি. ০২-০৭-১৩৭৪ হি. ২২-০২-১৩৭৫ হি. রচনার স্থান হাটহাজারী মাদ্রাসা ও মেখল গ্রাম।

১৪শ পরিচ্ছেদ : কোন শর্তের সাথে তালাক সম্পৃক্ত করা

এ পরিচ্ছেদে ১৯টি ফাতাওয়ার উল্লেখ রয়েছে। রচনাকাল ২৯-১২-১৩৬৬ হি., ১৯-০২-১৩৬৯ হি., ২৪-০৩-১৩৭৪ হি., ০৭-০৬-১৩৭৪ হি. রচনার স্থান হাটহাজারী মাদ্রাসা।

১৫শ পরিচ্ছেদ : হতবুদ্ধি ও রাগান্বিত অবস্থায় তালাক দেওয়া

এ পরিচ্ছেদে মুফতী সাহেবের ১৩টি ফাতাওয়ার উল্লেখ রয়েছে। রাগান্বিত অবস্থায় তালাক দেয়া প্রসঙ্গে তিনি দীর্ঘালোচনা করেছেন। ফাতাওয়া সমূহের রচনাকাল ০৪-০৪-১৩৭৩ হি., ২৩-০১-১৩৬৭ হি., ৩০-০১-১৩৬৮ হি., ২২-০১-১৩৭০ হি., ০১-০৮-১৩৭৪ হি.। রচনার স্থান মেখল গ্রাম ও হাটহাজারী মাদ্রাসা।

১৬শ পরিচ্ছেদ : তালাকের স্বাক্ষী প্রসঙ্গে

এ পরিচ্ছেদে মুফতী সাহেবের ১১টি ফাতাওয়ার উল্লেখ রয়েছে। রচনাকাল-০৪-০৪-১৩৬৬ হি., ১১-০৬-১৩৬৯ হি., ২৮-০৮-১৩৬৯ হি., ২৬-০৪-১৩৭৪ হি., ২৮-০৮-১৩৭৪ হি., ০৯-০১-১৩৭৫ হি., রচনার স্থান হাটহাজারী মাদ্রাসা।

১৭শ পরিচ্ছেদঃ ইদ্দত, নফকা, বংশাসূত্র স্থাপিত হওয়া ইত্যাদি প্রসঙ্গে

এ পরিচ্ছেদে ১১টি ফাতাওয়ার উল্লেখ রয়েছে। দুটি ফাতাওয়ার রচনাকাল-২৩-০৬-১৩৭৪ হি., ০৩-০৭-১৩৭৪ হি.। রচনার স্থান হাটহাজারী মাদ্রাসা।[১]

২৫. ফাতওয়া দারূল উলূম হাটহাজারী ১ম খন্ড

فتاوي دارالعلوم هاتهازاري جلد اول

ফাতওয়া দারূল উলূম হাটহাজারী ১ম খন্ড গ্রন্থটি মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ র. মুফতী আহমদুল হক ও অন্যান্য মুফতীগণের সমন্বয়ে রচিত। গ্রন্থটি বিন্যাস করেছেন মুফতী জসীম উদ্দীন, মুফতী কিফায়াত উল্লাহ ও মুফতী ফরীদুল হক গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ দারূল উলূম মুঈনুল ইসলাম, হাটহাজারী চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। প্রকাশকাল ১৪২৩ হি.-২০০৩ খৃ.। এ গ্রন্থের অধিকাংশ ফাতাওয়া মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহর রচিত ও সংকলিত। হাটহাজারী মাদ্রাসায় তিনি যতদিন মুফতী পদে দায়িত্ব পালন করেছেন সে সময়ে রচিত তাঁর ফাতাওয়াসমূহ এবং মাদ্রাসার অপরাপর মুফতী সাহেবের রচিত ফাতাওয়াসমূহ এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। অপরের লিখা বা রচিত ফাতাওয়াসমূহকে মুফতী সাহেব সত্যায়ন ও নির্ভুল আখ্যায়িত করেছেন সেগুলোও এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এ গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫১৯। সর্বমোট ২৬৪টি ফাতাওয়া এ গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে মুফতী ফয়যুল্লাহ র. রচিত ফাতাওয়ার সংখ্যা ৭৯টি। তাঁর সত্যায়িত ফাতাওয়ার সংখ্যা ৩০টি। তাঁর রচিত ফাতাওয়া সমূহের ভাষা উর্দু, ফার্সী ও আরবী। ফাতাওয়া দারূল উলূম হাটহাজারী ১ম খন্ডকে ৫টি অধ্যায়ে সাজানো হয়েছে-

---

১. ঐ, পৃ. ১৭৬-৫৬৮।

প্রথম অধ্যায় : ঈমান ও আকাঈদ

এ অধ্যায়ে মোট ১১৬টি ফাতাওয়ার উল্লেখ রয়েছে। তন্মধ্যে মুফতী ফয়যুল্লাহ র. সংকলিত ও রচিত ফাতাওয়ার সংখ্যা ৩২টি এবং তাঁর সত্যায়িত ফাতাওয়ার সংখ্যা ৮টি। ফাতাওয়াসমূহের রচনাকাল- ১-৬-১৩৭০ হি., ২-৬-১৩৭০ হি., ২৮-৯-১৩৭৪ হি., ৮-১-১৩৭৭ হি., ২৯-১১-১৩৬৬ হি., ৬-২-১৩৭০হি., ১০-৮-১৩৮১ হি., ২৭-৮-১৩৮৩ হি. ইত্যাদি।

দ্বিতীয় অধ্যায় : সুন্নত, বিদ'আত ও রুসূমাত

এ অধ্যায়ে ৫২টি ফাতাওয়ার উল্লেখ রয়েছে। তন্মধ্যে মুফতী সাহেবের রচিত ফাতাওয়ার সংখ্যা ২৭টি। তাঁর সত্যায়িত ফাতাওয়ার সংখ্যা ১২টি। মুফতী সাহেবের রচিত ফাতাওয়াগুলোর রচনাকাল- ২-৫-১৩৮২ হি., ১০-৩-১৩৯৪ হি., ২০-৩-১৩৮০ হি., ২৭-৬-১৩৮১ হি.,।

তৃতীয় অধ্যায় : তাসাউফ ও সুলূখ

এ অধ্যায়ে মোট ৩৭টি ফাতাওয়া উল্লেখ রয়েছে। তন্মধ্যে মুফতী সাহেবের রচিত ফাতাওয়ার সংখ্যা ১২টি। তাঁর সত্যায়িত ফাতাওয়া সংখ্যা ২টি।

চতুর্থ অধ্যায় : তাফসীর ও পবিত্র কুরআন সম্বন্ধে

এ অধ্যায়ে ১০টি ফাতাওয়া রয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় : ইলম

এ অধ্যায়ে ৪৯টি ফাতাওয়ায় উল্লেখ রয়েছে। তন্মধ্যে মুফতী সাহেবের রচিত ফাতাওয়ার সংখ্যা ৮টি।

এ গ্রন্থের ফাতাওয়াসমূহ যুগোপযোগী। সময়ের চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়েছে এবং আগামী দিনেও জ্ঞানের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম। এ ফাতাওয়া সমূহে মানুষের জানা ও জিজ্ঞাসার জবাব রয়েছে। মুফতী সাহেব জাতির জিজ্ঞাসার জবাব পূরণ করতে পেরে মুসলিম মিল্লাতের বিরাট উপকার করতে সক্ষম হয়েছেন। এ জন্য তিনি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার যোগ্য।[১]

---

১. সম্পাদনা পরিষদ, *ফাতাওয়া দারুল উলূম ১ম খন্ড*, চট্টগ্রাম, প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ হাটহাজারী মাদ্রাসা, ২০০৩ খৃ., পৃ. ১৪-৫১৫।

ঘ. তাসাউফ বিষয়ক রচনা

১. হুব্বে ঈমানী ও হুব্বে ইশকী حب ايماني و حب عشقي

মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ র. রচিত আট পৃষ্ঠার একটি ছোট পুস্তিকা *হুব্বে ঈমানী ও হুব্বে ইশকী* । পুস্তিকার রচনাকাল ১২ রমযান ১৩৭৯ হি.। পুস্তিকাটি ফার্সী ভাষায় রচিত। এর উর্দূ অনুবাদ করেছেন মাওলানা ইউসুফ ইসলামাবাদী। প্রকাশ করেছে কুতুবখানা ফয়যিয়া। প্রকাশকাল অজ্ঞাত। পুস্তিকায় তিনি তাসাউফ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, কোন কিছুকে ভালবাসা ঈমানের দাবীতে হতে হবে। আবার কোন কিছুকে ভাললাগার প্রেক্ষিতে ভালবাসার জন্ম হয়। এসব বিষয় গ্রন্থে আলোচনায় স্থান পেয়েছে। এগ্রন্থে মুফতী সাহেব ইশক, তথা ভালবাসাকে চারভাগে ভাগ করেছেন। ১. প্রকৃতিগত (তবয়ী) ভালবাসা : যে ভালবাসা জন্মগতভাবে প্রাপ্ত হয়। যেমন পিতা মাতার প্রতি সন্তানের ভালবাসা, সন্তানের প্রতি পিতা মাতার ভালবাসা। এ ভালবাসা শুধুমাত্র মানুষ নয় প্রাণীর মধ্যেও বিদ্যমান। ২. কামনাগত (নফসানী) ভালবাসা : এটা এমন এক আলোড়ন, চাঞ্চল্যের নাম যা কোন বাহ্যিক সৌন্দর্য, গাঠনিক নান্দনিকতা, পরম সুন্দরতার কারণে সৃষ্টি হয়। যা প্রেমিকার স্বভাব, চিন্তা ও রুচির সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে যায়। এ ভালোবাসা প্রত্যক্ষ দর্শন বা শোনার মাধ্যমে অর্জিত হয়। ৩. যৌক্তিক (আকলী) ভালবাসা : কোন বস্তুর লাভ, সুফল, সুবিধা, জানার মাধ্যমে অন্তরে এ ভালবাসা উদিত হয়। ৪. ঈমানী ভালবাসা : ভালবাসা যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দীন, ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত হয় তাকে ঈমানী

ভালবাসা বলে। কামনা বাসনার ভালবাসার সীমারেখা থাকে। কখনো বাড়ে, কখনো কমে। যেমনটি ছেলে-মেয়েদের মধ্যে একজনের প্রতি অপরজনের হয়ে থাকে। এ ভালবাসার মধ্যে ইজ্জত, সম্মান, মানসিক প্রশান্তি, নেকির কোন অংশ নেই; বরং এর দ্বারা অস্থিরতা, বিমূঢ়তা সৃষ্টি হয়। কখনো উন্মাদনা, মানসিক বিকৃতি ঘটায়। নিজের প্রেমিকাকে পাবার বিষয়ে হতাশ হলে একজন অপরজনকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কখনো আত্মঘাতী হয়। পরবর্তীতে কামনার লক্ষ্য অর্জিত হলে ভালবাসা বিদূরিত হয়ে যায়। কখনো লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার আগেই হ্রাস পেয়ে যায়। এ ভালবাসা মানুষের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য নয় এবং পূর্ণও নয়; বরং একটা সাধারণ অবস্থা মাত্র। এর মধ্যে বেআদবী ও ঔদ্ধত্য থাকে। পক্ষান্তরে ঈমানী ভালবাসার কোন সীমা পরিসীমা নেই। রাসূলুল্লাহ সা. -এর সাথে, দীন ও ঈমানের সাথে, আহকামে শরীআহ ও আকাবিরে দীনের সাথে যে ভালবাসা সৃষ্টি হয় তা ঈমানী ও যৌক্তিক। এ ভালবাসায় মুসলমানের কাঙ্খিত লক্ষ্য ও পূর্ণাঙ্গ। এ ভালবাসা অর্জন করার জন্য পবিত্র কুরআন ও হাদীসে আহ্বান জানানো হয়েছে। আম্বিয়া কিরাম, উলিল ইহতিরাম, আসলাফ, আউলিয়া ইযাম, এ ভালবাসার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। এ ভালবাসায় কোন অস্থিরতা, চঞ্চলতা, অস্বাভাবিকতা নেই; বরং এর দ্বারা মনে প্রশান্তি অর্জিত হয়। এ ভালবাসার সম্পর্ক পূর্ণাঙ্গ মানবের সাথে । এর দ্বারা আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। ঈমানী ভালবাসা বিদূরিত হবার নয়; বরং ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। এ ভালবাসার শাখা প্রশাখাসমূহের সীমা পরিসীমা নেই। এ ভালবাসার মধ্যে বেআদবী ও ঔদ্ধত্য থাকে না। ঈমানী ভালবাসার দাবী হলো- কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করা, একে সম্মান করা, এর অর্থ, বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা, দীনি কিতাব মুতালা'আ করা, কুরআন- হাদীসে বর্ণিত দুআসমূহ যত্নের সাথে সর্বদা আদায় করা, কুরআন ও হাদীসের উপর আমল করাকে জীবনের উদ্দীষ্ট লক্ষ্য বানানো, সুন্নতে নববীর অনুসরণ, এসবই হুব্বে ঈমানী হুব্বে ইশকীর বহিপ্রকাশ।[১]

২. আল- হাক্কুস্ সারীহ্ ফী আল-মাসলাকিস্ সাহীহ الحق الصريح في المسلك الصحيح

মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ রচিত আট পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকার নাম *আল- হাক্কুস্ সারীহ্ ফী আল-মাসলাকিস্ সাহীহ*। পুস্তিকার রচনাকাল ১৩৮০ হি.। এর ভাষা ফার্সী। প্রকাশ করেছে কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী। প্রকাশকাল ১৩৮৭ হি.। পুস্তিকায় বিশুদ্ধ কর্মপন্থা, ধর্মীয় নীতি, আদর্শ, আলোচিত হয়েছে। এর মধ্যে মুফতী সাহেব তাঁর নিজস্ব নীতি, আদর্শের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, আমার কর্মপন্থা, নীতি, আদর্শ হলো- কুরআন, হাদীস ও নির্ভরযোগ্য ফিকহ'র কিতাব। সালফে সালিহীন তথা

১. ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মদ, মুফতী, *হুব্বে ঈমানী ও হুব্বে ইশকী*, চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, তা: বি: পৃ. ১-৮

সাহাবা, তাবিঈন ও মুজতাহিদ ইমামগণের বিপরীত মতাদর্শকে আমি গুমরাহী মনে করি। কোন সূফীর মাধ্যমে কুরআন, হাদীস, সালফে সালিহীনের আমলের বিপরীত কোন আমল প্রকাশ পেলে তাঁর অনুসরণ বৈধ মনে করি না। যদিও তাঁর মাধ্যমে কাশফ্ , কারামত প্রকাশ পেয়ে থাকে। তারপরও তার হাতে হাত না রাখা চাই। বরং কুরআন -সুন্নাহর অনুসারী, শরী'আতের পাবন্দ কামিল আলিমের হাতে বায়আত হওয়া এবং দীনের উপর দৃঢ়তা অর্জন করা অনেক উত্তম ও প্রয়োজন। কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী র. বলেন, কেউ শরীআতের উপর পাবন্দ না হলে তাঁর নিকট হতে বায়আতের গন্ধও নেবে না। মুজাদ্দিদে আলফে সানী র.-এর বক্তব্য হলো হাকীকত ও তরীকত শরীআতের সেবক। আফসোস! আজকাল মানুষ কাশফ, কারামত, অলৌকিক বিষয়কে কামালিয়ত মনে করে এবং একে উদ্দেশ্য বানিয়ে নিয়েছে। অথচ হিন্দু যোগীদের মাধ্যমেও অলৌকিক বিষয় প্রকাশ পাওয়া সম্ভব। আবার কোন কোন সূফীর মাধ্যমে কুরআন, সুন্নাহর বক্তব্য, এবং সালফে সালিহীনের আমলের খেলাফ কর্মকাণ্ড প্রকাশ পেয়ে থাকে। সেগুলো তাদের নিজস্ব ইজতিহাদের ভুলের কারণে, হালের প্রভাব এবং মত্ততার কারণে হয়। এ বিষয়ে তিনি ক্ষমাযোগ্য, নিন্দাযোগ্য নন। তবে এসবে তার অনুসরণ বেধ মনে করিনা। অধিকাংশ নিষিদ্ধ কাজকর্ম প্রকাশ পাচ্ছে অদক্ষ সূফী এবং দুনিয়াদার, অযোগ্য পীর, মুর্শিদদের কারণে। তাই বলব তার চেয়ে বরং সুন্নতের অনুসারী শরীআতের কামিল আলিমের হাতে বায়'আত হয়ে শরী'আতের উপর ইস্তিকামাত থাকা অনেক ভাল এবং এটাই উত্তম। মুফতী সাহেব আরো বলেন, অধিকাংশ মূর্খ, অনবিজ্ঞ

লোকের ধারণা ও অনুমান যে, কোন পীরের মুরীদ না হলে মানুষ বেহেশতে যাবে না এবং যার কোন পীর নেই তার পীর শয়তান। এ ধরণের ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক, ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন। কুরআন, হাদীসে এর কোন প্রমাণ নেই। বরং জান্নাতে যাওয়ার শর্ত হলো শরীআতের অনুসরণ করা। যদিও পীরের হাতে বায়আত না হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে শরীআতের অনুসরণ না করে শুধু পীরের মুরীদ হলে জান্নাতে যাওয়া যাবে না। বরং জাহান্নামে যেতে হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, يا ايها الناس قد جاء كم برهان من ربكم و انزلنا اليكم نورا مبينا হে মানবমন্ডলী! প্রভূর নিকট হতে তোমাদের নিকট প্রমাণ এসেছে এবং আমি তোমাদের প্রতি স্পষ্ট জ্যোতি অবতীর্ণ করেছি।[১] قد جاء كم من الله نور و كتاب مبين আল্লাহর নিকট হতে এক জ্যোতি এবং স্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট এসেছে।[২]

মহানবী সা. বলেছেন- تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله و سنة رسوله আমি তোমাদের মধ্যে দুটো জিনিস রেখে গেলাম যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সে দুটো জিনিস আঁকড়ে ধরে থাকবে গুমরাহ হবে না। আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নত।[৩]

বায়'আত হওয়া এবং সুলূকের রাস্তা অবলম্বন করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, শরীআতের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকা, ইবাদতে একাগ্রতা সৃষ্টি করা। আফসোস! অজ্ঞতার কারণে মানুষ তরীকতকে মূল উদ্দেশ্য মনে করছে এবং বায়'আত হওয়ার দ্বারা দুনিয়ার উন্নতি কামনা করছে।

এ গ্রন্থে আলিম,ওয়াইজগণের (বক্তা) সংশোধন বিষয়ে মুফতী সাহেব বলেন, আফসোস! শত আফসোস, বর্তমান সময়ে আলিম ওয়াইযগণ হিদায়াতের রাজপথ ছেড়ে দিয়ে বিভিন্ন রাস্তা অবলম্বন করেছে। কেউ কিস্‌সা বলে, কেউ বানোয়াট গল্প বলে, কেউ ভিত্তিহীন কাহিনী বলেন। কেউ শে'র, কবিতা, গজল ইত্যাদিকে নিজের আলোচনার বিষয় বানিয়ে নিয়েছে। ফলে দুনিয়াতে সব ধরণের গুমরাহী ছড়িয়ে পড়ছে, হিদায়াতের আলো নিভে যাচ্ছে। মুফতী সাহেবের মতে ওয়াযের মাহফিলে এবং মহিলা মজলিশ সমূহে সুললিত কণ্ঠে কবিতা, শে'র আবৃত্তি বিপদজনক, অপছন্দনীয়। আল্লাহতাআলা পবিত্র কালামে বলেন- علمناه الشعروما ينبغي له ان هو الا ذكر و قرأن مبين আমি রাসূলকে কাব্য রচনা করতে শিখাইনি এবং এটা তার পক্ষে শোভন নয়। এটা তো কেবল এক উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুরআন।[৪]

---

১. আল- কুরআন, ৪: ১৭৪।

২. আল- কুরআন, ৫: ১৫।

৩. *মেশকাত শরীফ*, নূর মুহাম্মদ আ'জমী, (অনু,) প্রাগুক্ত, খ.১ম, সং.৬ষ্ঠ, পৃ.১৮৯ হাদীস নং ১৭৭ ।

৪. আল কুরআন, ৩৬: ৬৯।

و الشعراء يتبعهم الغاون এবং কবিদের অনুসরণ করে বিভ্রান্তরাই।[১]

রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, لان يمتلي جوفه احدكم قيحا يريه خير من ان يمتلي شعرا তোমাদের একজনের পেট কবিতায় ভরা থাকা অপেক্ষা বমি ভরা থাকা অধিক ভাল।[২] রাসূলুল্লাহ সা. আরো বলেন, مزامير ابليس কবিতা হলো ইবলিসের বাঁশী।[৩] মুফতী সাহেব বলেছেন, মহিলাদের জন্য যেমন কর্তব্য তাঁর কণ্ঠ, আওয়াজ যেন কোন পুরুষের কানে না পৌঁছতে পারে; তদ্রুপ পুরুষের উপর কর্তব্য হলো মহিলাদের মাঝে সুকণ্ঠে কবিতা ইত্যাদি আবৃত্তি না করা। কারণ মহিলাদের হৃদয় অল্পতে বিগলিত হয়ে যায়। তাই যে কোন ধরণের ফেতনা, অনাসৃষ্টির আশংকা থাকে।[৪] ফয়যুল্লাহ।

২৫ রবিউস সানী, ১৩৮০ হি

৩. দাফিউল বালা دافع البلاء

মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ রচিত দু পৃষ্ঠার একটি লিফলেট *দাফিউল বালা*। এর ভাষা উর্দূ। রচনাকাল ২৫ রবিউস সানী ১৩৮০ হি.। মুফতী সাহেব এ লিফলেটের মাধ্যমে জাতির উদ্দেশে আপতিত বিভিন্ন গযব থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় বাতলে দিয়েছেন এবং যেসব অপরাধের কারণে আল্লাহ তাআলার গযব আপতিত হয় সেগুলো হতে সাবধান থাকতে বলেছেন। তিনি বলেন, এটি কিয়ামত নিকটবর্তী ও গুরবতে ইসলামের যুগ। রাসূলের হাদীসের মিসদাকে পরিণত হয়েছে- 'ইসলাম প্রবাসীর (নি:সঙ্গ) ন্যায় আরম্ভ হয়েছে এবং তা সেভাবে প্রত্যাবর্তন করবে যেভাবে আরম্ভ হয়েছিল। সুতরাং প্রবাসীদের জন্য সুসংবাদ।'

মুসলিম শরীফ।[৫] দুনিয়ার প্রতি আসক্তি সকল অপরাধের উৎস। তাই রাসূলুল্লাহ সা. দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ ছিলেন। তিনি এও বলেছেন, তোমরা গুনাহ থেকে অবশ্যই দূরে থাকবে, কারণ গুনাহ আল্লাহর ক্রোধকে ত্বরান্বিত করে। সুতরাং এ ফেতনার সময়ে মুসলমানদের উপর কর্তব্য হলো সাবধান থাকা, গাফেল না হওয়া, খালেস তাওবা করা, আল্লাহ তাআলার ইবাদতে যত্নশীল হওয়া। তাহলে আল্লাহ তাআলার বালা মুসীবতের পরিবর্তে রহমত, বরকত প্রাপ্ত হব। যে ঘোষণা পবিত্র কুরআনে এসেছে ولو ان اهل القري امنوا والتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و الارض যদি সে সকল জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত ও তাকওয়া অবলম্বন করত তবে আমি তাদের জন্য আকাশসমূহ ও পৃথিবীর কল্যাণ উন্মুক্ত করতাম।[৬] হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত হাদীসে এসেছে- রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, তোমাদের প্রভূ বলেছেন, আমার বান্দা যদি আমার আনুগত্য করে তাহলে আমি তাদের জন্য রাতে বৃষ্টি দেব, দিনে তাদের উপর সূর্য উদিত করব। তাদের বজ্রের আওয়াজ শোনাবনা।[৭] সুতরাং প্রতিটি মুসলমানের উপর কর্তব্য হলো গুনাহ, আল্লাহর নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকা, দীন, আহকামে শরইয়্যাহকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরা, প্রতিটি কাজে সুন্নতের অনুসরণ করা। বুযুর্গী ও দরবেশী, কাশফ্ কারামতের উপর নির্ভরশীল নয়; বরং শরীআতের বিধান পালনের উপর নির্ভরশীল। উক্ত লিফলেটে মুফতী সাহেব তালিবে ইলমদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, ১. বিদআত ও বদরুসুম থেকে নিজেকে যথা সম্ভব রক্ষা করবে। ২. প্রতিটি কাজে সুন্নতের অনুসরণ করবে। ৩. মিসওয়াক, ঢিলা, কুলূখ ব্যবহার করবে, ফরয, ওয়াজিব, সুন্নতে মুওয়াক্কাদাসমূহের ইহতিমাম করবে। এগুলো আদায়ে গাফলতি করবে না। ৪. বন্ধু, সাথীদের সাথে সদাচরণ করবে, বড়দের সম্মান ও বিনয় দেখাবে, ছোটদের স্নেহ করবে। ৫. প্রাচুর্যের জীবন অবলম্বন করবে না, আরাম আয়েশ পরিত্যাগ করবে, উন্নত খানাপিনার পেছনে দৌড়াবে না। ৬. খারাপ, নিন্দনীয় অভ্যাস পরিত্যাগ করবে। ৭.বিড়ি, সিগারেট, তামাক সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করবে। ৭. অসৎ চরিত্রের যুবকদের থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখবে। নেককার, দীনদার মনীষীগণের লেবাস- পোশাক গ্রহণ করবে। ৮. অল্পে তুষ্টি ও মোটা কাপড় পরার অভ্যাস করবে।[৮]

---

১. আল কুরআন, ২৬: ২২৪।
২. তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং- ২৮৫১।
৩-৪.ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মাদ, মুফতী, *আল-হাক্কুস্ সারীহ্ ফী আল-মাসলাকিস্ সাহীহ*, চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, তাঃ বিঃ পৃ. ৬-৭।
৫. *মেশকাত শরীফ*, নূর মুহাম্মদ আজমী, (অনূ), প্রাগুক্ত, খ. ১ম, পৃ. ১৭০, হাদীস নং-১৫২।
৬. আল কুরআন, ৭: ৯৬।
৭. ফয়যুল কালাম, পৃ. ১৩০, হাদীস নং-১৬৪।
৮. ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মাদ, মুফতী, *দাফিউল বালা*, চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, ১৩৮০ হি. পৃ. ১-২।

৪. ইসলাহুন নুফূস ওয়াল হাক্কুস সারীহ
اصلاح النفوس و الحق الصريح

ইসলাহুন নুফূস মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ . রচিত তাসাউফ বিষয়ক তের পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা। এর রচনাকাল ৯ সফর ১৩৭৬ হিজরী। পুস্তিকার ভাষা ফার্সী। এর উর্দু অনুবাদ করেছেন মুফতী মুহাম্মদ ইযহারুল ইসলাম চৌধুরী। এর বঙ্গানুবাদ করেছেন মুহাম্মদ ইউসুফ ইসলামাবাদী। প্রকাশ করেছে কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। প্রকাশকাল অজ্ঞাত। এ পুস্তিকায় মুফতী সাহেব লিখেন, তাসাউফের প্রধান শর্ত আত্মশুদ্ধি। আর আত্মশুদ্ধির প্রধান শর্ত নিয়্যতের শুদ্ধি, আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্য লাভ, সর্বদা মৃত্যুর কথা স্মরণে রেখে মুখে যিক্র চালু রাখা, উত্তম চরিত্রের উপর অধিষ্টিত থাকা, কুরআন শরীফ পাঠ করা, কবর যিয়ারতের মাধ্যমে মৃত্যুর কথা স্মরণ করা, পিতা- মাতার প্রতি দায়িত্ব পালন করা, তাদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা বহাল রাখা, ইয়াতিম, মিসকীন, অভাবীদের খাদ্য খাওয়ানো ও সহানুভূতি দেখানো, পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়ে নিচু স্তরের লোকদের প্রতি তাকানো। জামাতের সাথে নামায আদায় করা। কুরআন-সুন্নাহ মতে যিন্দেগী পরিচালনা করা। কখনো শয়তানের প্ররোচনায় গুনাহ সংঘটিত হলে সঙ্গে সঙ্গে তাওবা করা এবং তাওবার নামায আদায় করা। কাজে কর্মে মাসনূন দুআসমূহ পাঠ করা।

সালাতু তাহিয়্যাতুল অযু, সালাতুত তাসবীহ ইত্যাদি আদায় করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের উদ্বৃতির মাধ্যমে তিনি প্রতিটি বক্তব্যের স্বপক্ষে প্রমাণ পেশ করেছেন। এ পুস্তিকায় আত্মশুদ্ধির বিষয়ে মুফতী সাহেব এমন কিছু নীতিমালা উপস্থাপন করেছেন, যেগুলোর উপর আমল করে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের উঁচু সিঁড়িগুলো অতিক্রম করা যায়, বিলায়াতের স্তরসমূহ অতিক্রম করে মর্যাদার আসনে পৌঁছা যায়। তিনি নবুওয়্যতের তরীকা অবলম্বনকারী সালিকীনদের ইসলাহে নফ্সের জন্য পনেরটি আমলের অযীফা তাঁর এ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থের শুরুতে তিনি বলেছেন, অত্যন্ত লাভজনক, সহজ এবং বাস্তবসম্মত কিছু আমল যেগুলো মানুষের ভেতর, বাহির সংশোধনের জন্য প্রযোজ্য, আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক স্থাপনে গভীর প্রভাব রাখে, যেগুলোর উপর আমল করলে গুমরাহীর আশংকা নেই। এ আমলগুলোর কথা সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে সূফীগণের আমল ও অযীফায় এমনকিছু অর্থহীন কঠোরতা রয়েছে যেগুলো হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত নয়, মানুষের যাহির, বাতিন সংশোধনে তেমন কোন প্রভাব রাখে না এবং যেগুলো ইবাদত হিসেবেও গণ্য নয়। তাই নিজের এবং মুসলমান ভাইদের জন্য পনেরটি আমলের কথা উল্লেখ করা হলো। যদিও এগুলোতে যাওক, শাওক, জযবা নেই, তবে উম্মতের জন্য খুব লাভজনক।[১]

১. ইসলাহে নিয়্যত : প্রতিটি কাজে নিয়্যত আগে সহীহ্ করতে হবে। তাহলে মুবাহ, অভ্যাস ও দায়িত্ব হিসেবে আদায়কৃত কাজগুলোতেও সওয়াব পাওয়া যাবে। রিসালাহ তারগীবুল উম্মাহ ইলা তাহসীনিন নিয়্যাহ رساله ترغيب الامة الي تحسين النية পুস্তিকা পাঠের মাধ্যমে নিয়্যতের শুদ্ধতা ঠিক করে নেবে। ইনশাআল্লাহ অল্প কিছুদিন মশ্‌ক করলে উদ্দেশ্যে পৌঁছা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ নামায ও অযূর মধ্যে বিশুদ্ধ নিয়্যতের বিষয়টি মশ্‌ক করলে আস্তে আস্তে অন্যান্য বিষয়েও মশ্‌ক হয়ে যাবে।[২]

২. যিক্রুল্লাহ : মুজাদ্দিদে আলফে সানীর র. মতে শরীআত সম্মত প্রতিটি কাজ আল্লাহর যিক্রের অন্তর্ভূক্ত। যদিও সেটা বেচাকেনাই হোক না কেন।[৩]

৩. আহলে যিক্রের সান্নিধ্য লাভ করা : রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে বলব না, দ্বীনের দৃঢ়তা এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ কীসে? আহলে যিক্রের সান্নিধ্য অবলম্বন কর। একাকী সময়ে মাসনূন দুআ ও যিক্র পাঠ করবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কারো সাথে

১-৩. ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মদ, মুফতী, ইসলাহুন নুফূস, চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, তা.বি. পৃ. ১-৫,১৮।

বন্ধুত্ব করবে এবং আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার নিমিত্ত কারো সাথে দুশমনি রাখবে।[১]

৪. মৃত্যুর কথা স্মরণ করা: রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, 'তোমরা স্বাদ বিনাশকারী মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর। কবর প্রতিদিন ডাকে এবং বলে, আমি মুসাফিরখানা, আমি একাকী থাকার ঘর, আমি মাটির ঘর, আমি পোকামাকড়ের বাসস্থান।'[২]

৫. কুরআন তিলাওয়াত করা : কুরআন তিলাওয়াতের ফযীলত কুরআন ও হাদীসে অসংখ্যবার উচ্চারিত হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল ইয্যতের আয্মত,আল্লাহর কালামের মর্যাদা অন্তরে উপস্থিত রেখে মা'বুদের সাথে কথা বলা এবং জিহ্বা, কান, চোখের হক আদায় করার নিয়্যতে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা। কলব পরিষ্কার করতে পবিত্র কুরআন দ্রুত ক্রিয়া করে।[৩]

৬. কবর যিয়ারত করা : রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, আমি তোমাদেরকে প্রথমে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, এখন বলছি, তোমরা কবর যিয়ারত কর, এটা দুনিয়ার প্রতি আসক্তি কমায় এবং আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি আরো বলেন, প্রত্যেক মাইয়্যাত কবরের মধ্যে ফরিয়াদকারীর ন্যায় চিৎকার করতে থাকে। বাপ, ভাই, দোস্ত ও পরিচিতজনদের অপেক্ষায় থাকে যে, আমাদের কবরে দুআ পৌঁছাও। যখন দুআ পৌঁছে তখন দুনিয়ার সব নিয়ামত থেকে একে উত্তম নিয়ামত মনে করে। দুনিয়ার বাসিন্দারা কবরবাসীর জন্য যখন দুআ ও সওয়াব পাঠায় তখন আল্লাহ তাআলা সওয়াবের বিষয়টিকে পাহাড়ের মত

বিশাল আকার দিয়ে মৃতের নিকট উপস্থাপন করেন। জীবিতদের হাদিয়া মৃতের জন্য আল্লাহর নিকট মাগফিরাত কামনা করে। [৪]

৭. পিতা মাতার কবর যিয়ারত করা: রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যে ব্যক্তি প্রতি শুক্রবার তাঁর পিতা মাতা বা তাদের কোন একজনের কবর যিয়ারত করবে, তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে এবং তাকে সদাচরণকারীদের অন্তর্ভূক্ত করা হবে।[৫] এ হাদীস এবং অন্যান্য হাদীসের ভিত্তিতে উক্ত ফযীলত অর্জনের নিয়্যতে প্রতি শুক্রবার পিতা-মাতার কবর যিয়ারত করবে এবং তাদের জন্য দুআ করবে। ইনশা আল্লাহ অনেক ফায়দা হবে।

৮. দয়ার দৃষ্টিতে মা বাবার চেহারা দর্শন করা : রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যখন কোন পিতা- মাতার নেক্কার সন্তান, নিজের পিতা মাতার চেহারার দিকে অনুগ্রহের দৃষ্টিতে তাকাবেন, আল্লাহপাক তার প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে একটি করে কবূল হজ্জের সওয়াব লিখেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, যদি প্রতিদিন একশ বার দৃষ্টি প্রদান করে তবেও? তিনি বললেন, হাঁ, তবেও। আল্লাহ মহান ও পবিত্র।[৬]

৯. ইয়াতিমের মাথায় হাত বুলানো এবং মিসকীনকে খাদ্য খাওয়ানো: বিখ্যাত সাহাবী আবূ হুরায়রা রা. বলেন, এক ব্যক্তি নিজের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল যে, আমার হৃদয় খুবই কঠোর, সুতরাং কী করব? রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, 'ইয়াতিমের মাথায় হাত বুলাও এবং মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াও। তিনি আরো বললেন, যে ব্যক্তি ইয়াতিমের মাথায় হাত বুলায় সে তার (ইয়াতিম) মাথার প্রতিটি চুলের বিনিময়ে অনেক গুণ বেশি নেকি লাভ পাবে।'[৭] রাসূলুল্লাহ সা.-এর হাদীসের উপর আমল করত: দয়া, অনুকম্পার সাথে ইয়াতিমের মাথায় হাত বুলালে এবং মিসকীনকে খাদ্য খাওয়ালে অন্তরের কঠোরতা দূরীভূত হয়ে কোমল হবে, নিজের জন্য অনেক ফায়দা অর্জিত হবে।[৮]

১০. দুনিয়ার বিষয়ে নিজের চেয়ে নিম্ন শ্রেণীর মানুষের দিকে তাকাতে হবে : রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যার মধ্যে দুটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে আল্লাহ তাআলা তাকে কৃতজ্ঞ ও ধৈর্য্যশীল হিসেবে গ্রহণ করবেন। দ্বীনের বিষয়ে নিজের চেয়ে উপর শ্রেণীর দ্বীনদারগণের দিকে তাকানো এবং তাঁদের অনুসরণ করা। দুনিয়ার বিষয়ে নিজের চেয়ে দূর্বলদের প্রতি তাকিয়ে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করা। প্রত্যেকের উপর কর্তব্য

---

১. *মেশকাত শরীফ*, নূর মোহাম্মদ আ'জমী (অনূ), প্রাগুক্ত, খ. ১ম, সং ৬ষ্ঠ, পৃ. ৫৪, হাদীস নং ২৮।

২-৩. ইসলাহুন নুফূস, পৃ. ২০।

৪. *মেশকাতশরীফ*, নূর মোহাম্মদ আ'জমী (অনূ), প্রাগুক্ত, খ. ৪র্থ, সং ৯ম, পৃ. ১০৫, হাদীস নং ১৭৭৭।

৫.ঐ, পৃ.১০৫, হাদীস নং ১৭৭৬; ফয়যুল কালাম, পৃ. ৪০৬, হাদীস নং ৮২৫।

৬. ঐ, পৃ. ৪০৪, হাদীস নং ৮২০।

৭-৮. *ইসলাহুন নুফূস*, পৃ. ২২,২৩।

হলো এ হাদীস মোতাবেক আমল করা।[১]

১১. একাধারে চল্লিশ দিন তাকবীরে উলার সাথে জামাআতে নামায পড়া : রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন 'যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে একাধারে চল্লিশ দিন তাকবীরে উলাসহ জামাআতের সাথে নামায আদায় করবে তার জন্য দুটি মুক্তি বা পরিত্রাণ নির্ধারিত হয়। তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও মুনাফিকী থেকে মুক্ত ঘোষণা করা হয়।'[২] এ হাদীসের উপর আমল করা অত্যন্ত জরুরী। এর দ্বারা দ্বীনের সাথে সম্পৃক্ততা বাড়বে এবং চিল্লার ফযীলত ও বুযুর্গী অর্জিত হবে। দোযখ ও মুনাফিকী থেকে মুক্তির ঘোষণার চেয়ে বড় বুযুর্গী আর কি হতে পারে?

১২. তাওবার নামায পড়া: 'রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যখন কোন ব্যক্তি গুনাহ করে সেখান থেকে ওঠে ভালভাবে পাক-পবিত্র হয়, অত:পর নামায আদায় করে আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে; তখন আল্লাহ তাআলা তাকে নিশ্চিত ক্ষমা করে দেন।'[৩]

১৩. সালাতুত তাসবীহ্ আদায় করা: এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীসটি বেশ প্রসিদ্ধ এবং এ নামায আদায় করার পদ্ধতিও অনেকের জানা। সুতরাং আগ্রহ, উৎসাহের সাথে এ নামায আদায় করলে অনেক ফায়দা হবে।[৪]

১৪. তাহিয়্যাতুল অযু : একদিন রাসূলুল্লাহ সা. ফজর নামাযের পর হযরত বিলালকে জিজ্ঞেস করলেন, হে বিলাল! তুমি বল দেখি তুমি মুসলমান হয়ে এমন কোন আমলটা করেছ, যার সওয়াবের আশা তুমি

করতে পার? কারণ বেহেশতে আমি আমার সম্মুখে তোমার জুতোর শব্দ শুনেছি। হযরত বিলাল বললেন, হুযুর আমি এ ছাড়া এমন কোন আমল করিনি, যা আমার নিকট অধিক সওয়াবের কারণ হতে পারে। তবে আমি রাতে বা দিনে, যখনই অযু করেছি তখনই সে অযু দ্বারা কিছু নামায (নফল) আদায় করেছি, যা আমাকে তাওফীক দেওয়া হয়েছে।[৫]

১৫. কোন বৈঠক থেকে ওঠার পূর্বে নিম্নোক্ত দুআটি পাঠ করা: ভাল মন্দ যে কোন বৈঠক হোক না কেন, নিম্নোক্ত দুআটি কমপক্ষে একবার পড়া চাই। سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك হাদীসে এসেছে, এ দুআর বরকতে ঐ বেঠকে অনিষ্টকর কিছু থাকলে ক্ষমা পাওয়ার আশা করা যায়। আর যদি ভাল বৈঠক হয় তাহলে কবূলের জন্য মহর মেরে দেয়া হয়।[৬]

এ পনেরটি আমলের কথা বলা হল, ভেতর বাহির ইসলাহের জন্য এগুলো যথেষ্ট। এগুলোতে শুধুই লাভ রয়েছে। গুমরাহ হওয়ার আশংকা নেই। সরাসরি ইবাদতও বটে।[৭]

৫. হক কি রেহনুমায়ী حق كي رهنمائ

মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ র. রচিত একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকার নাম হক কি রেহনুমায়ী। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫। রচনাকাল ৯ই রবিউল আখির ১৩৮০ হি.মোতাবেক ১ অক্টোবর ১৯৬০ খৃ. ১৫ আশ্বিন ১৩৬৭ বাংলা। পুস্তিকার ভাষা ফার্সী। এর উর্দু অনুবাদ করেছেন মুফতী মুহাম্মদ ইযহারুল ইসলাম চৌধুরী। বঙ্গানুবাদ করেছেন মুফতী মুহাম্মদ ইউসুফ ইসলামাবাদী। পুস্তিকাটি প্রকাশ করেছে কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী চট্টগ্রাম। প্রকাশকাল অজ্ঞাত। গ্রন্থের বিষয়বস্তু তাসাউয়ের সাথে সম্পৃক্ত। গ্রন্থে তিনি তাসাউফ, সুলূক, আত্মশুদ্ধি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। আত্মশুদ্ধি অর্জনের প্রকৃত পথ বাতলে দিয়েছেন এবং আত্মশুদ্ধি অর্জনকারীগণ প্রিয়পাত্র এবং দুশ্চিন্তামুক্ত জীবন উপভোগ করবেন; কুরআন হাদীসের আলোকে তিনি এসব তথ্য তুলে ধরেছেন। শুরুতে পবিত্র কুরআনের আয়াত উল্লেখ করেছেন-

১. *ইসলাহুন নুফূস*, পৃ. ২২,২৩।
২. *ফয়যুল কালাম*, পৃ. ২৬১, হাদীস নং ৪২২।
৩. ঐ, পৃ. ১৯৯, হাদীস নং ২৮৮।
৪. *ইসলাহুন নুফূস*, পৃ. ২৪।
৫. *মেশকাতশরীফ*, নূর মোহাম্মদ আ'জমী (অনূ), খ. ৩য়, সং ৯ম, পৃ. ১৬০, হাদীস নং ১২৪৬।
৬. ঐ, পৃ. ২৩৫-২৪০,
৭. হায়াতে মুফতী আযম, পৃ. ২৩৫-২৪০; ইসলাহুন নুফূস, পৃ. ১৬-১৯।

الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون

জেনে রাখ! আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা দু:খীত হবে না।[১]

ان اولياءه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون

শুধু মুত্তাকীগণই এর তত্ত্বাবধায়ক কিন্তু তাদের অধিকাংশ সে বিষয়ে অবগত নয়।[২]

মহানবী সা. তাঁর হাদীসে বলেন, مجاهد من جاهد نفسه والمهاجر من هاجر ما نهي الله عنه প্রকৃত মুজাহিদ ঐ ব্যক্তি যে নিজের নফসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং প্রকৃত মুহাজির ওই ব্যক্তি আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করে।[৩]

পুস্তিকাটিতে তিনি ইসলাহে বাতেন তথা আত্মশুদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করেন। কারামত, কাশফ্, অলৌকিক ঘটনার প্রকাশ, আলমে মালাকূতে পরিভ্রমণ করা, বুযুর্গদের রূহসমূহের সাথে সাক্ষাত লাভ ইত্যাদি বিষয় আলোচনায় স্থান লাভ করেছে। বযুর্গগণের খান্দানী সিলসিলা তাঁদের অযীফা, যিক্র, শুগ্ল ইত্যাদি আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য হলো নিজের বাহির, ভেতর, সংশোধনের অনবরত চেষ্টা, ফিক্র চালিয়ে যাওয়া। উদ্দেশ্য শরীআতের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং দীনী বিধি-বিধানের গুরুত্ব অন্তরে স্থান দেয়া, ইবাদতে পূর্ণ মনোযোগ সৃষ্টি হওয়া এবং প্রতিটি কাজে ইখলাস অর্জিত হওয়া। এসব বিষয় আদায় করার জন্য বান্দা আদেশপ্রাপ্ত । আর মানব জীবনের মূল

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো ঈমানের পরিপূর্ণতা ও তাকওয়া অর্জন করা। এটাই প্রকৃত পথ, এটাই বিলায়াত, এটাই আল কুরআনের দরবেশী। এসব কিছু অর্জন করার সহজ রাস্তা হলো সুন্নতের অনুসরণ করা। অর্থাৎ নিজের যাবতীয় কাজকর্ম, চলাফেরা, ওঠাবসায় রাসূলুল্লাহ সা. -এর আদব, আখলাক, চাল চলন অবলম্বন করা। এটাই আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয় তরীকা ও কুরআনের সার নির্যাস। পবিত্র কুরআন ও রাসূলের সুন্নাহর উপর আমল করা অত্যন্ত সহজ কাজ। এর মধ্যে অসম্ভব বা কঠোরতার কিছু নেই। বর্তমানে কুরআন সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা কঠিন মনে হওয়ার কারণ, কুরআন- সুন্নাহ ও শরী'আত নয়; বরং যুগের ফিতনা, যুগের চাহিদা মানুষের চিন্তা-চেতনার বিবর্তন। আধুনিককালে অনেকে মনে করেন যে, কোন প্রসিদ্ধ সিলসিলার অন্তর্ভূক্ত না হলে এবং শায়খের দেয়া দরূদ, অযীফা, যিক্র,আমল না করলে ইসলাহে নফ্স সম্ভব নয়। এমন ধারণা অমূলক এবং পবিত্র কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক। ইসলাহে নফ্স বলতে বুঝায় শরীআতের উপর পূর্ণ অবস্থান করা, শরঈ বিধি- বিধানসমূহের আযমত এবং সর্বোচ্চ ধ্যান- খেয়ালের সাথে ইবাদত করা। কারামত, অলৌকিক ঘটনা, হালতে মাযযুব, আলমে মালাকুতে ভ্রমণ করা, আলমে আরওয়াহের সাথে সাক্ষাত এগুলো ইসলাহে নফ্স বা বুযুর্গী নয় এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও নয়। কারণ, এগুলো আহ্লে কুফ্র দ্বারাও প্রকাশ পেতে পারে। ভয়ানক কাফির, দাজ্জাল এ ধরণের অনেক অলৌকিক, অসম্ভব ঘটনা ঘটাতে সক্ষম। সুতরাং অসম্ভম, অলৌকিক কিছু ঘটানোর সাথে ইসলাহে নফসের কোন সম্পর্ক নেই। মুরীদ শাগরেদদের মধ্যে দু'আ, যিক্র, অযীফা ইত্যাদির প্রচলন করাই মুল লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও ইবাদত নয়; বরং লক্ষ্যে পৌঁছার মাধ্যম। রাসূলুল্লাহ সা., সাহাবা, তাবিঈন, আয়িম্মা-ই মুজতাহিদীনের মধ্যে এমনটি পাওয়া যায়নি ; বরং মাশাইখে কিরাম এগুলো নির্বাচন করে থাকেন। আরও সহজভাবে বলা যায়- যিক্র, দু'আ ইত্যাদির ব্যবহার ওষুধ- পথ্যের ন্যায়। এগুলো গ্রহণের মূল লক্ষ্য সুস্থতা অর্জন করা। তাই শরীআতের সীমানার মধ্যে থেকে দু'আ, যিক্র ইত্যাদি আদায় করতে হবে। কোন কোন সালিকীন উচ্চস্বরে যিক্র করা এবং চল্লিশ দিন পর্যন্ত ই'তিকাফ করার যে প্রথা পালন করেন এগুলো বাড়াবাড়ি, শরীআতের সীমালঙ্ঘন এবং প্রকাশ্য গুমরাহী। মুজাদ্দিদে আলফে সানী র. বলেন, কোন একটি মুস্তাহাব আদায় করা এবং মাকরূহে তানযিহী থেকে বেঁচে থাকা যিক্র, ফিক্র, মুরাকাবা ও তাওয়াজ্জুহ থেকে কয়েক দফা উত্তম। মিশকাত শরীফের ভাষ্য গ্রন্থ ***মিরকাত*** এ বলা হয়েছে সুন্নত মোতাবেক প্রস্রাব-পায়খানা, ইস্তিঞ্জা ব্যবহার করা মুসাফিরখানা ও মাদ্রাসা বানানোর চেয়ে উত্তম। কারণ বায়তুলখোলা ও ইস্তিঞ্জায় সুন্নতের অনুসরণ করলে তা ইবাদতে পরিণত হয়। দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মুজাদ্দিদ

১. আল কুরআন, ১০: ৬২।

২. আল কুরআন, ৮: ৩৫।

৩. *মেশকাত শরীফ*, নূর মোহাম্মদ আজমী, (অনু), প্রাগুক্ত, খ.১ম,পৃ. ৩২, হাদীস নং-৫

শায়খ আহমদ সিরহিন্দী র. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা.-এর সুন্নতের বিন্দু পরিমাণ আদায় করা দুনিয়া ও আখিরাতের সকল নিয়ামতের চেয়ে উত্তম। যেমন সুন্নত আদায়ের নিয়্যতে দুপুরে আহার গ্রহণের পর শোয়া রাতভর জাগ্রত থেকে ইবাদত করার চেয়ে উত্তম। যদিও দুপুরে শোয়ার বিষয়টি ইবাদত নয় কিন্তু রাসূলুল্লাহ সা. -এর সুন্নত হওয়ার কারণে এর মর্যাদা বেশি। পক্ষান্তরে সারারাত জাগ্রত থেকে ইবাদত করা বাহ্যিকভাবে মনে হয় ইবাদত, কিন্তু এটা রাসূলের সুন্নত নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ সা. রাতের কিছু অংশ ঘুমাতেন এবং কিছু অংশ জাগ্রত থাকতেন। মুজাদ্দিদে আলফে সানী র. বলেন, প্রকৃত অর্থে তরীকত হল শরীআতের খাদেম। তিনি আরো বলেন, হুব্বে নবুওয়্যত, হুব্বে ইশ্ক বিলায়াতের চেয়ে হাজারগুণ উত্তম। বিলায়াতের রাস্তা ছেড়ে দিয়ে নবুওয়্যতের রাস্তা অবলম্বন করলে ফানাহ, বাকা, জযবা, সুলূক এসবের দরকার হয় না। হুব্বে নবুওয়্যত হলো মূল, হুব্বে বিলায়াত হলো ছায়া। নবুওয়্যতের রাস্তা অবলম্বনকারী, ঈমানের মহব্বতকারী সালিকীন লক্ষ্য -উদ্দেশে পৌঁছতে সক্ষম হন। অর্থাৎ আল্লাহর প্রিয় বান্দায় পরিণত হন। পক্ষান্তরে বিলায়াতের রাস্তা অবলম্বনকারী আশিকীনরা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন। মুজাদ্দিদে আলফে সানী র. আরো বলেন, আমার পিতা বলতেন, গুমরাহ বাহাত্তুর দলের অধিকাংশই সূফীদের রাস্তা অবলম্বনের কারণে গুমরাহ হয়েছে এবং ভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হওয়ার ফলে গন্তব্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়েছে।[১]

৬. তারগীবুল উম্মাহ ইলা ইত্তিবায়িস্ সুন্নাহ ترغيب الامة الي اتباع السنة

তারগীবুল উম্মাহ ইলা ইত্তিবায়িস্ সুন্নাহ মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ র. রচিত তাসাউফ বিষয়ক পুস্তিকা। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২। ভাষা ফার্সী। রচনাকাল অনুমান ১৩৬৭ বাংলা। এর উর্দু অনুবাদ করেছেন মুফতী মুহাম্মদ ইযহারুল ইসলাম চৌধুরী। উর্দু অনুবাদ মূল ফার্সীর সাথে যুক্ত রয়েছে। প্রকাশ করেছে কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। প্রকাশকাল অজ্ঞাত। পুস্তিকায় সুন্নতের উপর আমলের গুরুত্ব বিধৃত হয়েছে। বর্তমান সময়ে বদ রুসুম ও বিদ'আতের কারণে রাসূলের সুন্নতের প্রতি মানুষের অবজ্ঞা এসে গেছে। বদরুসুম সমাজকে প্রচণ্ডভাবে আক্রান্ত করেছে। যেমনটি হাদীসে এসেছে سيخرج عن امتي اقوام ' تتجاري بهم تلك الاهواء كما يتجاري الكلب لصاحبه لا يبقي منه عرق ولا مفصل الا دخله – আমার উম্মতের মধ্যে এমন সব লোক প্রকাশ পাবে যাদের সর্ব শরীরে সেই বিদআত ও কুপ্রবৃত্তি অনুপ্রবেশ করবে যেভাবে জলাতংক রোগ রোগীর সর্বশরীরের প্রবেশ করে; তার ফলে তার কোন শিরা বা গ্রন্থি অবশিষ্ট থাকে না যাতে সে সঞ্চার করেনা।' (আবু দাউদ)[২] . বদরুসুম.শরী'আতের বিরোধিতাকে মানুষ নিজের ইজ্জত, সম্মান, মযার্দার মাপকাঠি ভাবতে শুরু করেছে। রাসূলের অনুসরণ, শরীআতের বিধান পালনকে লজ্জা, অপমানের কারণ ভাবতে শুরু করেছে। এ পুস্তিকায় তিনি বলতে চেয়েছেন, মানুষের অভ্যাস আচরণে এক ভয়ানক পরিবর্তন এসেছে। সুন্নতের উপর আমল রাসূলের ভবিষ্যত বাণীর ন্যায় হয়ে গেছে- يأتي علي الناس زمان الصابر فيهم علي دينه كالقابض علي الجمر মানুষের সামনে এমন এক যুগ আসবে যখন দ্বীনের উপর অটল, অবিচল এবং দৃঢ়ভাবে অবস্থানকারীদের অবস্থা হবে জ্বলন্ত অঙ্গার মুষ্টিবদ্ধকারীর অবস্থার ন্যায়। (তিরমিযী)[৩] এ পুস্তিকায় তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি রাসূলের অনুসরণের উপর নির্ভরশীল। যেমনটি পবিত্র কালামে এসেছে
كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفرلكم ذنوبكم والله غفوررحيم বলুন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৪] ফেতনার যুগে যারা রাসূলের সুন্নতের অনুসরণ করবে তাদের মর্যাদা আল্লাহ তা'আলার দরবারে অনেক বেশি। হাদীসে এসেছে -
امتي فله أجر مأة شهيد যে ব্যক্তি আমার উম্মত বিগড়ে যাবারকালে আমার সুন্নত দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে তার জন্য একশ' শহীদের সওয়াব রয়েছে।[৫]

১.ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মদ, মুফতী, *হক কি রেহনুমায়ী* চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, তা. বি. পৃ. ১-১৫।
২. *ফয়যুল কালাম*, পৃ. ১০৭, হাদীস নং-১৩৭।
৩. *ঐ*, পৃ. ১১০, হাদীস নং-১৪২।
৪. আল- কুরআন, ৩: ৩১।
৫. *মেশকাত শরীফ* , নূর মুহাম্মদ আ'জমী, (অনু) প্রাগুক্ত, খ. ১ম, পৃ. ১৮৪, হাদীস নং ১৬৭।

৭. ইযহারুল মুনকিরাতিশ শায়ি'আহ ফিল মাদারিসি ওয়াল জালসাতির রায়িজাহ

اظهار المنكرات الشائعة في المدارس والجلسات الرائجة

তাসাউফ বিষয়ক রচিত মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহর এ পুস্তিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭। এর ভাষা ফার্সী। এর উর্দূ অনুবাদ করেছেন মুফতী ইযহারুল ইসলাম চৌধুরী। উর্দু অনুবাদটি মূল গ্রন্থের নীচে উল্লেখ রয়েছে। গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। পুস্তিকার রচনাকাল ও প্রকাশকাল অজ্ঞাত। গ্রন্থে দীনি মাদ্রাসাসমূহে যেসব বে উসুলী কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয় সেগুলো সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা দিয়েছেন এবং সেগুলো থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। মাদ্রাসা, মক্তব প্রতিষ্ঠা করা, সেগুলোকে কেন্দ্র করে বার্ষিক ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করে জনসাধারণকে ডেকে দীন- শরীআত সম্বন্ধে অবগত করানো নিসন্দেহে প্রশংসনীয় কাজ। উলামা-ই কিরাম একে প্রশংসনীয় আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে এসব ধর্মীয় কাজে অসংখ্য ক্ষতিকর বিষয় সংযুক্ত হয়ে গেছে। যেমন- প্রতিষ্ঠাতাদের নিয়্যত অশুদ্ধ এবং তারা এটাকে জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছে। তা'লীম, তাদ্‌রীসে বাচ্চাদের যোগ্যতা সৃষ্টির বিষয়টি উপেক্ষিত রেখেছে, শুধুমাত্র সিলেবাস সমাপ্ত করাকে দায়িত্ব

মনে করছে। ফলে ছাত্ররা দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত করার পরও নির্ভুলভাবে আরবী বাক্য পড়তে পারে না, অনুবাদ ও অর্থ প্রকাশে ভুল করে। এ ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা মানে সময় নষ্ট করা, ছাত্রদের দীনী যিন্দিগী বিগড়ে দেয়া। তাদের মধ্যে শিক্ষক, শায়খদের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা, আনুগত্যের অভ্যাস গড়ে ওঠে না। এদের অভ্যাস আচরণে ভারসাম্য থাকে না। শিক্ষকদের মধ্যে নৈতিক আখলাকের বড়ই ত্রুটি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মাদ্রাসাসমূহে দাতাদের ইখলাস, একদমই থাকে না। মাদ্রাসার ওয়ায মাহফিলগুলোতে সাধারণ শ্রোতাদের উপযোগী ওয়াজ-নসীহত হয় না। কোথাও ওয়াজ নসীহত চলাকালে মাদ্রাসার জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা হয়। ফারেগ হাফেজ এবং তাকমীলের ছাত্রদের পাগড়ী প্রদানকালে অনেক বেউসুলী কার্যক্রম লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া হাফেজে কুরআনরা তারাবীহর নামায পড়াতে অর্থের প্রতি ঝুঁকে যাচ্ছে। আলিমদের মনে দুনিয়ার মোহ প্রভাব বিস্তার করছে। মুফতী সাহেবের মতে এ থেকে পরিত্রাণের পথ হলো উলামায়ে দীন আল্লাহর উপর ভরসা করে বাড়ীতে বা মসজিদে বসে দীনের তা'লীম দেবেন। এর মাধ্যমে খারাপ দিকগুলো হতে নিজেদেরকে রক্ষা করা যাবে। এতে ছাত্র সংখ্যা কম হলেও সমস্যা নেই। সাহাবা, তাবিঈন, তাবি তাবিঈনগণের যুগে দীনের দরসের গুরুত্ব কোন অংশে কম ছিল না। তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে বাড়ীতে, মসজিদে ইলমে দীনের দরস দিয়েছেন। মুফতী সাহেব অবশেষে দ্বীনি ইল্ম অন্বেষণকারীদের মধ্যে যে নানান ধরণের বিপত্তি, বিকৃতি ঘটবে এ সম্বন্ধে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সা. এর প্রায় ২৮টির মতো হাদীসের সারকথা উপস্থাপন করেছেন। যেমন- হযরত আলী রা.-এর বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, অচিরেই মানুষের নিকট এমন এক যুগ আসবে যখন ইসলামের নাম ব্যতীত কিছুই বাকি থাকবেনা। কুরআন শরীফের অক্ষর ব্যতীত কিছুই বাকি থাকবেনা।তাদের মসজিদসমূহ থাকবে আবাদ তবে হিদায়াত মুক্ত থাকবে। তাদের আলিমরা হবে আকাশের নীচে সর্বাপেক্ষা মন্দ লোক। সমুদয় দীনের ফেতনা তাদের নিকট হতে প্রকাশ পাবে অতপর ঐ ফেতনা তাদের দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে।[১]

৮. শূমী মা'আসী شومي معاصي

(গুনাহর পরিণতি)

এটি মুফতী সাহেবের রচিত ৮ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা। এর রচনাকাল অজ্ঞাত। রিসালাহটি প্রকাশ করেছে কুতুখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী চট্টগ্রাম। প্রকাশকাল অজ্ঞাত। পুস্তিকায় বিভিন্ন গুনাহর কি পরিণতি, এর দ্বারা জলে, স্থলে মানব জীবনে কি বিপর্যয় নেমে আসে, কুরআন হাদীসের আলোকে সেগুলো আলোচনা করেছেন। ভূমিকায় পবিত্র কুরআনের কিছু আয়াত এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সা.-এর কিছু

---

১. *মেশকাত শরীফ*, নূর মুহাম্মদ আ'জমী (অনু), প্রাগুক্ত, খ.২য়, সং, ৫ম, পৃ.৪৫, হাদীস নং ২৫৮; ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মদ, মুফতী, ইযহারুল মুনকিরাতিশ শায়ি'আহ ফিল মাদারিসি ওয়াল জালসাতির রায়িজাহ, চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, তা: বি: পৃ. ১০-১৪।

হাদীস উদ্বৃত করেছেন, অতপর সেগুলো উর্দু অনুবাদ করেছেন। আয়াত- ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলে ও সমুদ্রে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে। যার ফলে তাদেরকে এর কোন কোন কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান। যাতে তারা ফিরে আসে।[১] ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمي যে আমার স্মরণে বিমুখ থাকবে অবশ্যই তার জীবন যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করব অন্ধ অবস্থায়।[২] সমাজে যখন অপরাধের মাত্রা বেড়ে যাবে, বদমাশ লোকদের সংখ্যা বাড়তে থাকবে, তখন সমাজে ভাল, দীনদার মানুষগুলো থাকার পরও আল্লাহর গযব নেমে আসবে। তিনি তিরমিযী শরীফ সূত্রে রাসূলুল্লাহ সা.-এর এ হাদীস উদ্বৃত করেছেন, 'যখন গণীমতের মালকে দৌলতরূপে গণ্য করা হবে, আমানতকে গণীমত মনে করা হবে, যাকাতকে ঋণ ভাববে, ইল্ম শিক্ষা করা হবে দুনিয়ার জন্য, পুরুষ স্ত্রীর আনুগত্য করবে, সন্তান মায়ের সাথে নাফরমানী করতে লাগবে, বন্ধুকে নিজের কাছে রেখে পিতাকে দূরে সরিয়ে রাখবে, মসজিদে উচ্চস্বরে আওয়াজ হবে, ফাসেক লোকরা লোকদের গোত্রপতি হবে, নিকৃষ্ট লোকেরা কওমের অভিভাবক হতে থাকবে, কেবল অনিষ্টের ভয়ে মানুষ মানুষকে সম্মান করবে। গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্রের ছড়াছড়ি হবে। প্রকাশ্যে সরাব পান হবে। এ উম্মতের পরবর্তীরা

পূর্ববর্তীদের অভিশাপ দেওয়ার প্রয়াসী হবে; তখন তোমরা লাল বাতাস (লু হাওয়া),ভূমিকম্প, জমিন ধ্বসে যাওয়া, আকৃতি বিকৃত হওয়া, প্রস্তর বর্ষণ ও সুতা ছিড়ে পুথির দানা একের পর এক পতিত হওয়ার ন্যায় কিয়ামতের অন্যান্য আলামত আগমনের অপেক্ষা করতে থাকবে।[৩]
তিনি মিশকাত শরীফ সূত্রে অপর একটি হাদীস উদ্বৃত করেছেন, কোন জাতির মধ্যে ব্যাভিচার প্রকাশ পেলে তাদেরকে দুর্ভিক্ষ দ্বারা পাকড়াও করা হয়। কোন জাতির মধ্যে সূদ, ঘুষ, বৃদ্ধি পেলে সদা ভয় ভীতি দ্বারা তাদের পাকড়াও করা হয়। তিনি তিরমিযী শরীফের অপর একটি হাদীস উদ্বৃত করেছেন, يكون في امتي خسف و مسخ و قذف اذا ظهرت القينات والمعازف 'আমার উম্মতের মধ্যে ধ্বসে যাওয়া এবং আকৃতির বিকৃতি ঘটবে। আর তা ঐ সময় ঘটবে যখন গায়িকার দল এবং বিভিন্ন রকম খেলার সরঞ্জামাদি প্রকাশ পাবে।'[৪] এ ধরণের গুরুতর অপরাধ ও গুনাহর কারণে নানা বিপত্তি, গযব ও বঞ্চনার কারণ হবে; এ সম্বন্ধে বর্ণিত বেশকিছু হাদীস তিনি এ পুস্তিকায় উল্লেখ করেছেন।[৫]

৯. আল-ফাওয়ায়িদুন নাফি'আহ الفوائد النافعه

আল-ফাওয়ায়িদুন নাফি'আহ মুফতী ফয়যুল্লাহ রচিত একটি তাসাউফ বিষয়ক গ্রন্থ। ৩৮ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় রচিত। গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে আল-মাকতাবাতুল ফয়যিয়া হাটহাজারী চট্টগ্রাম। এর রচনা ও প্রকাশকাল অজ্ঞাত। এ গ্রন্থের তিনটি অধ্যায় বা অংশ রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে ইমাম আবূ হানীফা র. ও ইমাম আবূ ইউসুফ র. সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যকার ছাত্র-শিক্ষকের গভীর সম্পর্ক, শিষ্যত্ব এবং ইমাম আবূ ইউসুফ র. এর জন্য প্রদত্ত ইমাম আবূ হানীফার মূল্যবান উপদেশসমূহ তুলে ধরেছেন। মুফতী সাহেব ইমাম আযম আবূ হানীফার গভীর ইল্মের কিছু দৃষ্টান্ত, ঘটনাবলী উপস্থাপন করেছেন। ইমাম আবূ ইউসুফ ইয়াকুব বসরীর জন্য ইমাম আযমের উপদেশসমূহ ছিল; ১. বাদশাহগণকে ইজ্জত সম্মান দেবে তাঁদের আসনকে উঁচু মনে করবে। ২. বাদশাহদের সামনে মিথ্যা বলা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকবে। ৩. রাজা বাদশাহদের দরবারে তলব না করলে যাতায়াত করবে না। অপ্রয়োজনে যাতায়াত করলে তোমার মর্যাদা কমে যাবে। তাঁদেরকে আগুনের ন্যায় মনে করবে। আগুন দ্বারা উপকৃত হও বটে কিন্তু নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখ। ওদের সামনে কথা একদম কম বলবে। অন্যথায় তোমারই কথা দ্বারা তোমার বিরুদ্ধে প্রমাণ গ্রহণ করবে। ৪.তোমাকে কোন পদ দিতে চাইলে গ্রহণ করবে না। তবে যদি মনে কর যে, তোমার অভিমতকে তারা গ্রহণ করেছে ও পছন্দ করেছে তবে যেতে পার।

১. আল-কুরআন, ৩০: ৪১।
২. আল-কুরআন, ২০ : ১২৪।
৩. *ফয়যুল কালাম*, পৃ. ১২৩-১২৪, হাদীস নং- ১৫৬।
৪. ঐ, পৃ. ১৩৩, হাদীস নং-১৬৯।
৫. ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মদ, মুফতী, *শূমী মা'আসী*, চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, তা. বি. পৃ. ৩-৫।

৫. শাহজাদা, আমীর-উমারা, মন্ত্রীদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে না। ৬. অধিক পরিমাণে বাজারে যাতায়াত করবে না। ৭. রাস্তার মধ্যে বসবে না, প্রয়োজনে মসজিদে বসবে। ৮. দোকানে বসবে না। ৯. অহংকার প্রকাশ পায় এমন পোশাক পরবে না। ১০. বিছানায় স্ত্রীর সাথে কথা, স্বাক্ষাত কম করবে। স্ত্রীর নিকট অপর কোন মহিলা প্রসঙ্গে কথা বলবে না। ১১. যেসব মহিলার প্রথম স্বামীর পক্ষ থেকে ছেলে-মেয়ে রয়েছে এমন মহিলাদের বিয়ে করবে না। কারণ সে তার সন্তানের জন্য তোমার সম্পদ ব্যয় করবে, প্রয়োজনে চুরি করবে। তার নিকট তার সন্তান যতটুকু প্রিয় তুমি সে পরিমাণ প্রিয় নও। ১২. প্রথমে ইলম্ শিখবে, অতপর সম্পদ উপার্জন করবে, তারপর বিয়ে শাদী করবে। এর অন্যথা হলে জীবন বিপর্যস্ত হয়ে বিদ্যা, বুদ্ধি অর্জন থেকে বঞ্চিত থাকবে। ১৩. মানুষকে অবমূল্যায়ন করবে না। ১৪. কেউ তোমার নিকট কোন ফাতাওয়া জানতে চাইলে শুধু ওটার উত্তর দাও। অতিরিক্ত কথা বলবে না। এর সাথে অন্য বিষয়ে সংমিশ্রণ করো না। ১৫. যদি দশ বছরও কামাই রুজী থেকে বঞ্চিত থাক তবেও ইল্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিওনা, বিমুখ হয়ো না। তাহলে তোমার জীবন বিপদগ্রস্থ হবে। ১৬. জ্ঞানী-গুণী বুদ্ধিজীবীদের শহরে কখনো গমন করলে নিজের নেতৃত্বের চিন্তা করবে না বরং সেখানকার অধিবাসীদের ন্যায় থাকবে। ১৭. নিজের শিক্ষক এবং ছাত্রদের জন্য মাগফিরাতের দুআ করবে। ১৮. আযান হওয়ার সাথে সাথে মসজিদে

যাওয়ার প্রস্তুতি নিবে। ১৯. রাজা-বাদশাহদের বাড়ীর নিকট ঘর-বাড়ী তৈয়ার করবে না। ২০. সর্বদা মানসিক ঐশ্বর্য বজায় রাখবে। লোভ, দুনিয়ার প্রতি আসক্তি কম দেখাবে। ২১. সর্বদা নিজের মধ্যে সৎ সাহস বজায় রাখবে। ২২. দর্শনীয় স্থান, পার্ক, ভ্রমণে যাবে না। ২৩. বিয়ে-শাদী , জানাযা, ঈদের নামায এলাকার খতীব ও ইমামদের দায়িত্বে ন্যাস্ত করবে ইত্যাদি প্রায় ১১১ টি উপদেশ উল্লেখ রয়েছে।[১]

দ্বিতীয় অধ্যায়ে মুফতী সাহেব ইল্‌ম ও আলিমদের ফযীলত, ইল্‌ম অর্জনের তরীকা, বয়স, সফর, দৃঢ়তা ইত্যাদি আলোচনা করেছেন। ১. হযরত হাসান বসরীর বর্ণনা, আল্লাহর ওয়াস্তে হাদীস শিক্ষা করা দুনিয়ার সমুদয় নিয়ামত হতে উত্তম। ২. আলিমগণ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রহরী। ৩. ইল্‌মের একটি অধ্যায় শেখা তার উপর আমল করা দুনিয়ার সমুদয় সম্পদ হতে উত্তম। হাদীসে এসেছে- যে ব্যক্তি ছোটদের স্নেহ করবে না, বড়দের সম্মান করবে না এবং আলিমদের তাযীম করে না সে আমার উম্মত নয়।[২] ৩. আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মোবারকের উক্তি : আল্লাহ তাআলা হযরত সুলায়মান আ. কে ইল্‌ম ও রাজত্ব যে কোন একটি গ্রহণের স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তিনি ইল্‌মকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। এর উসীলায় আল্লাহতা'আলা তাকে রাজত্বও দান করলেন। ৪. হযরত মুআয ইব্‌ন জাবালের বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, ইল্‌ম অর্জন কর কেননা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইল্‌ম অর্জন করা তাকওয়া, ইল্‌ম তলব করা ইবাদত, ইল্‌মের আলোচনা তাসবীহতুল্য, ইলম অন্বেষণ জিহাদতুল্য, মূর্খদের তা'লীম দেওয়া সদকা, উপযুক্ত স্থানে ইল্‌ম খরচ করা আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম। ইল্‌ম হারাম- হালালের প্রতীক, জান্নাতের রাস্তার আলোকস্তম্ভ, নির্জনের সাথী, প্রবাসের বন্ধু, শান্তি- অশান্তির পথ প্রদর্শক, দুশমনের বিরুদ্ধে হাতিয়ার, বন্ধুদের মধ্যে সৌন্দর্য, ইল্‌মের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা কাউকে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করেন, কল্যাণের রাজত্বে, নেতৃত্বের দুনিয়ায় এমন ইমাম বানিয়ে দেয় যে, মানুষ তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে, তার জীবন চরিতকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করে, তার বক্তব্য মতে কাজ করে, তার সেবার জন্য ফিরিশতা আগ্রহী হয়, তাদের পাখা দিয়ে তাকে স্পর্শ করে, তার মাগফিরাতের জন্য প্রতিটি সৃষ্টি এমনকি পানির মাছ, মাটির পোকা-মাকড়, কিড়া, জঙ্গলের পশু-পাখি দুআ করে। ইল্‌ম অন্ধকারে চোখের আলো, ইল্‌মের উসীলায় বান্দা দুনিয়া আখিরাতে নিরাপত্তা ও উচ্চ মর্যাদা লাভ করে। জ্ঞানের জন্য চিন্তা-গবেষণা রোযাতুল্য নেকী। ইলমী লিপ্ততা রাত্রি জাগরণ (ইবাদত) তুল্য, ইল্‌মের মাধ্যমে হালাল হারাম শনাক্ত করা যায়। ইল্‌ম আমলের পথ প্রদর্শক। আমল ইল্‌মের অনুসারী। সৌভাগ্যবানদের জন্যই ইল্‌ম নসীব হয়। দূর্ভাগারা ইল্‌ম হতে বঞ্চিত থাকে।[৩] হযরত দাউদ আ. বলেন, সীনায় ইল্‌ম থাকার দৃষ্টান্ত অন্ধকার ঘরে বাতির

---

১. ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মদ, মুফতী, *আল-ফাওয়ায়িদুন নাফিআহ*, চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, তাঃ বিঃ পৃ. ১৪-২২
২. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন শরফ্ নববী ইমাম নববী) *রিয়াজুস সালিহীন*, ঢাকা, কোহিনুর লাইব্রেরী, ২০০৮, খ. ১ম, সং. ৩য়,। হাদীস নং ৩৫৬।
৩. *আল-ফাওয়ায়িদুন নাফিআহ*, পৃ. ২৩-২৪।

ন্যায়। খলীফা আব্দুল মালেক ইব্‌ন মারওয়ান র. নিজ সন্তানদের উপদেশ হিসেবে বলেছেন, ইল্‌ম অর্জন কর। যদি প্রাচুর্যের অধিকারী হও তাহলে ইল্‌ম এর সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেবে। যদি গরীব হও তাহলে ইল্‌ম তোমার প্রাচুর্য বলে গণ্য হবে। তদ্রুপ অল্প বয়সে ইল্‌ম অর্জন করা, জানার জন্য প্রশ্ন করা, ইল্‌মের জন্য দূর দূরান্তে সফর করা, ইল্‌ম তলব করতে দৃঢ়তা ও স্থায়ীত্ব, ইল্‌ম অর্জন পদ্ধতি আয়ত্বকরণ, ক্রমান্বয়ে ইল্‌ম অর্জন বৃদ্ধি পাওয়া, ইল্‌মের আপতসমূহ, আলিম ও মুআল্লিমের সম্মান, ইল্‌মের সাধারণ পুরস্কার, ইল্‌মের স্তর, ইল্‌মের ইশাআত, ছাত্র -শিক্ষকদের জন্য ইল্‌মের আদব, ইল্‌মের দুনিয়ায় ইনসাফ, চুপ থাকার ফযীলত, আলিম মুআল্লিমের বৈশিষ্ট্যসমূহ, অপকারী ইল্‌ম, দুনিয়ার জন্য ইল্‌ম তলব করা, ইত্যাদি বিষয়ক অত্যন্ত গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ, চমৎকার কিছু হাদীস মুফতী সাহেব উপস্থাপন করেছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন মহামনীষীদের মধ্যে যারা গরীব ছিলেন, তাঁদের ইল্‌ম অর্জনের দু:খ কষ্ট, কঠোর সাধনা ও ত্যাগের কথা। অর্থ ও খাদ্যাভাবে তাঁরা কী ভীষণ কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন সে কথা, তাঁদের জীবন কাহিনী, সংক্ষিপ্ত বাক্যসমূহ ও তুলে ধরেছেন।[১]

১০. অসীয়তনামা وصيت نامه

মুফতী সাহেব তাঁর জীবন সায়াহ্নে নিজের এবং উম্মতে মুসলিমার উদ্দেশ্যে একটি অসীয়তনামা লিখে গেছেন।এর রচনাকাল অজ্ঞাত। রচনার ভাষা উর্দু। প্রকাশ করেছে কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী চট্টগ্রাম। দ্বিতীয় প্রকাশকাল ১৯৭৮ খৃ.। পৃষ্ঠা সংখ্যা দুই। এ অসীয়তনামাটি মুফতী সাহেব রচিত *তা'লীমুল মুবতাদী আল- লিসানুল আরাবী*-এর সাথে যুক্ত।মুফতী সাহেব তাঁর অসীয়তনামায় বলেন, আল্লাহ তা'আলার প্রসংসা, মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা.- এর উপর অসংখ্য দরূদ ও সালাম পাঠের পর বান্দার বক্তব্য হলো: আমি এখন জীবন সায়াহে অবনীত। নানা রোগ-বালাই শরীরে ভীড় করেছে। শারীরিক দুর্বলতা,অক্ষমতা এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। মৃত্যু এখন শিয়রে। জানিনা শরীর থেকে কখন প্রাণ বের হয়ে যাবে। মৃত্যুর সময় যেন আমার দ্বারা সুন্নতের খেলাফ কোন কাজ প্রকাশ না পায় এবং মৃত্যুর পরও যেন সুন্নতের খেলাফ কোন কাজ প্রকাশ না পায়। আমার আকাঙ্খা আমাকে যেন লাহ্‌দ কবরে দাফন করা হয়। ডান দিকে কেবলামূখী করে শোয়ানো হয়। আমার আকাঙ্খা আমার কবরে দিন তারিখ ও সময় নির্দিষ্ট না করে, দলবদ্ধ না হয়ে বরং একাকী যিয়ারত করবে। দুআ, ইস্তিগফার, পবিত্র কুরআন ইত্যাদি পাঠ করবে সওয়াব রেসানীর উদ্দেশে। প্রতিটি কাজে কর্মে সুন্নতকে মূল লক্ষ্য স্থির করবে, বিদআত, শরীআত গর্হিত কোন কাজ করবে না। জীবনের কামালিয়ত বুযুর্গী এবং ইহকালীন ও পরকালীন সৌভাগ্য রাসূলের সুন্নতের অনুসরণ ও শরীআতের পাবন্দির মধ্যে সীমাবদ্ধ জানতে হবে, বিশ্বাস করতে হবে।[২] এটা শেষ যুগ ইসলামের গুরবতের যুগ, বিদআত উদ্ভবের যুগ, শরীআত গর্হিত কাজের যুগ, যেমনটি রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন -بدأ كما سيعود و غريبا ইসলাম প্রবাসীর ন্যায় (অপরিচিত, নিসঙ্গ) সূচনা হয়েছে এবং তা সেভাবে প্রত্যাবর্তন করবে যেভাবে আরম্ভ হয়েছে।[৩] দীনের এমন কোন কাজ নেই, এমন কোন শাখা নেই যেখানে অবৈধ নিষিদ্ধ কাজের ছড়াছড়ি নেই। সব কিছুর শুধু নাম, আকার আকৃতি বাকি আছে। ভিতরে কোন তাৎপর্য, হাকীকত অবশিষ্ট নেই, যেমনটি রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন سيأتي علي الناس زمان لا يبقي من الاسلام الا اسمه و من القرأن الا اسمه و مساجد هم عامرة و هي خراب عن الهدي علماأ هم شر تحت اديم السماء عندهم تخرج الفتنة و فيهم تعود অচিরেই মানুষের নিকট এক যুগ আসবে যখন ইসলামের নাম শুধু বাকি থাকবে কুরআন শরীফের রুসুম বজায় থাকবে, মসজিদ লোকে লোকারণ্য হবে তবে হিদায়াত মুক্ত থাকবে। আকাশের নিচে নিকৃষ্ট জীব হিসেবে অবতীর্ণ হবে আলিমরা। সমুদয় ফেতনা তাদের মাধ্যমে প্রকাশ হবে এবং ঐসব ফেতনায় তারাই

---

১. ঐ, পৃ. ২৩-২৪।

২.ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মদ, মুফতী, *অসীয়ত নামা*, চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি. পৃ.১-২।

৩. ***মেশকাত শরীফ***, নূর মুহাম্মদ আ'জমী, (অনূ), প্রাগুক্ত, খ. ২য়, পৃ. ১৭০, হাদীস নং-১৫২।

নিপতিত হবে।[১] উলামা-ই সূর ফেতনা,ফাসাদ, বেশরা কর্মকাণ্ড এমন পর্যায়ে পৌঁছে যাবে যে, মানুষ সালফে সালিহীন এবং কুরআন হাদীসের অনুসরণকে অপূর্ণ মনে করবে। এ ভয়াবহ ফেতনার যুগে আল্লাহর নেককার বান্দাগণকে কোমর বেধে ইসলামের প্রতি প্রচণ্ড ভালোবাসা বজায় রেখে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে ইখলাসের সাথে মাঠে নামতে হবে এবং সুন্নতের ইশা'আত, দীনের নুসরত এবং বিদআত মিটিয়ে দিতে ও শরীআত বিরুদ্ধ যাবতীয় কাজের বিপক্ষে সর্ব শক্তি নিয়ে মুজাহাদা করতে হবে। রাসূলের হাদীসের মিসদাক হতে হবে। ان الدين بدأ غريبا و سيعود كما بدأ فطوبي للغرباء الذين يصلحو দীন নি:সঙ্গ প্রবাসীর ন্যায় যাত্রা শুরু করেছে আবার সেভাবে প্রত্যাবর্তন করবে। যেভাবে যাত্রা শুরু করেছিল। সুতরাং ঐসব প্রবাসীর জন্য সুসংবাদ রয়েছে। তারা ঐসব লোক যারা আমার পর মানুষ যেসব সুন্নত নষ্ট করে দিয়েছে সেগুলোকে পুনঃ ঠিক করে নেয়। তিরমিযী।[২] রাসূলুল্লাহ সা. আরও বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার সুন্নতকে ভালবাসে সে আমাকেই ভালবাসে আর যে আমাকে ভালবাসে সে বেহেশতে আমার সাথেই থাকবে। তিরমিযী।[৩]

১১. ইযহারুল খিয়াল اظهار الخيال

মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ রচিত ৮ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা ইযহারুল খিয়াল। পুস্তিকার ভাষা ফার্সী। রচনাকাল ১৩৬৬ হি. মোতাবেক ১৯৬৬ খৃ.। পুস্তিকাটি ১৩৯০হি. মোতাবেক ১৯৭০ খৃ. কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী থেকে প্রকাশিত হয়। রিসালার উর্দু অনুবাদ করেছেন মুফতী মুহাম্মদ ইযহারুল ইসলাম চৌধুরী। উর্দু অনুবাদ মূল গ্রন্থের প্রত্যেক পৃষ্ঠার নিম্নাংশে স্থান লাভ করেছে। এ পুস্তিকায় মুফতী সাহেবের নিজস্ব অভিমত, চিন্তা- চেতনা, ধ্যান-ধারণা, মন মানসিকতা বিধৃত হয়েছে। যেসব সভা, সমিতি, সিম্পোজিয়াম ও বিয়ে অনুষ্ঠানে শরীআত বিরুদ্ধ কাজ কর্ম হত তিনি ঐসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন না। অনৈসলামিক রীতি-নীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। তাঁর মতে এসব অনুষ্ঠান থেকে তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তাতে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে যে, এটা শেষ জমানা, কিয়ামতের পূর্বে নিদর্শনসমূহ প্রকাশের যুগ। মানুষের অন্তর সম্পূর্ণ বিগড়ে গেছে। ইখলাস মন থেকে উঠে গেছে। হিংসা-বিদ্বেষ, প্রবৃত্তির চাহিদায় অন্তর ভরে গেছে। বৈধ-অবৈধ, হালাল-হারামের ধ্যান-খেয়াল সাধারণ জনগণ এমনকি মাদ্রাসার ছাত্র এবং আলিমগণের মন থেকেও উঠে গেছে। এ যুগে দীন, ঈমান, ইয়াকীন, ইজ্জত-আব্রুর হেফাজত, কঠিন সংকটের মুখে পতিত হয়েছে। তাই নীরবে নিভৃতে একা সময় কাটানোই উত্তম। যেমন- রাসূলুল্লাহ সা.-এর এক হাদীসে এসেছে-

عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه و سلم يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال و مواقع المطر يقر بدينه من الفتن *

সুতরাং আমি বলব, যদি কোন মাহফিল, অনুষ্ঠান, সমাবেশ, সম্বন্ধে ধারণা থাকে যে, সেখানে শরীআত বিরুদ্ধ কর্মকাণ্ড হবে বা হচ্ছে তাহলে নেতৃস্থানীয়, অনেতৃস্থানীয় কারো সেখানে উপস্থিত হওয়া বৈধ নয়।[৪]

১২. সীরাজুত তাবলীগ سيراج التبليغ

সীরাজুত তাবলীগ মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ রচিত একটি উপদেশমূলক পুস্তিকা। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭। রচনাকাল ১৫ জমাদিউল আখির ১৩৬৬ হি.। এর ভাষা আরবী। পুস্তিকাটি প্রকাশ করেছে কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী চট্টগ্রাম। প্রকাশকাল অজ্ঞাত। এ পুস্তিকাটি মাজমুআ রাসাইলে ফয়যিয়া চতুর্থ খন্ডের

১. ঐ, পৃ. ৪৫, হাদীস নং- ২৫৮
২. নূর মুহাম্মদ আ'জমী, (অনূ), মেশকাত শরীফ, প্রাগুক্ত, খ. ১ম, পৃ. ১৮০, হাদীস নং-১৬২
৩. ফয়যুল কালাম, পৃ. ৬৬, হাদীস নং ১০২।
৪. ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মদ, মুফতী, *ইযহারুল খিয়াল*, চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, ১৯৭০, পৃ. ১-৮।

অন্তর্ভূক্ত। এ পুস্তিকায় মুফতী সাহেব আমানত ও খিয়ানত প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। পুস্তিকার শুরুতে পবিত্র কুরআনের এ আয়াত উদ্বৃত করেছেন-

انا عرضنا الامانة علي السموت والارض والجبال فابين ان يحملنها و اشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلو ما جهولا

আমি তো আসমান যমীন ও পর্বতমালার প্রতি এ আমানত পেশ করেছিলাম তারা তা বহন করতে অস্বীকার করল এবং তাতে শংকিত হলো, কিন্তু মানুষ তা বহন করল, সে তো অতিশয় জালিম, অতিশয় অজ্ঞ।[১] পবিত্র কুরআনের এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা নবুয়্যতের ইলমকে আমানত বলে আখ্যায়িত করেছেন। মুফতী সাহেব বলতে চেয়েছেন, যারা মাদ্রাসায় লিখাপড়া করেন ও পড়ান, তারা এ আমানতের দায়িত্ব পালন করেন ও বহন করেন। সুতরাং যারা তালিবে ইল্ম তাদেরকে আমানত মনে করে যথোপযুক্ত তালীম দিতে হবে। শিক্ষা-দীক্ষায় নবুওয়্যতের ইল্মের যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। আরা যারা মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করবেন তাদের মধ্যে দুনিয়াদারী, দুনিয়ার সম্পদ, যশ-খ্যাতি, ইত্যাদির মন মানসিকতা ও ধ্যান-ধারণা থাকতে পারবে না। কারণ তারা নবুওয়্যতের ইল্মের বাহক ও বিতরণকারী। সুতরাং তাদের অন্তর থাকবে ইখলাসে পরিপূর্ণ ও নবুওয়্যতের দায়িত্ব পালনের অনুভবসম্পন্ন। মুফতী

সাহেব তাঁর রিসালার শেষে পবিত্র কুরআনের এ আয়াত উদ্বৃত করেছেন- ولتكن منكم امة يدعون الي الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر و اولئك هم المفلحون তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক হোক যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকাজের আদেশ দিবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। এরাই সফলকাম।[২] গ্রন্থটি মাদ্রাসার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য একটি মাইলফলক হিসেবে ভূমিকা পালন করে আসছে। [৩]

১৩. মাকালাতি মুফতী আযম مقالات مفتي اعظم

মাকালাতি মুফতী আযম মুফতী সাহেবের রচিত তাসাউফ বিষয়ক গ্রন্থ। এ গ্রন্থের ভাষা ফার্সী। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪৪। গ্রন্থটির রচনাকাল ১৩৮৫ হি.। প্রকাশ করেছে কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী চট্টগ্রাম। প্রকাশকাল ১৪০৯ হি.। প্রকাশক মৌলবী মুহাম্মদ হুসাইন ফয়যী। মুফতী সাহেব এ গ্রন্থে প্রথমে আহলে ইসলামদের সতর্ক করেছেন ফেতনা ফাসাদের যুগে দীনের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য। সাথে এর ফযীলত সম্বন্ধে বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করেছেন- من تمسك بسنتي عند فساد امتي فله اجر مأة شهيد যে ব্যক্তি আমার উম্মত বিগড়ে যাবার কালে আমার সুন্নতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে তার জন্য একশ' শহীদের সওয়াব রয়েছে।[৪] يأتي علي الناس زمان الصابر فيهم علي دينه كالقابض علي الجمر মানুষের মধ্যে এমন এক সময় আসবে যখন দীনের উপর অটল, অবিচল অবস্থানকারীদের অবস্থা হবে জ্বলন্ত অঙ্গার মুষ্টিবদ্ধকারীর অবস্থার ন্যায়।[৫] এবং নিজের নফসের গোলামী থেকে বিরত থাকতে হবে। শয়তানের ধোকা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে। 'নিশ্চয়ই শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে তোমাদের সাথে বিবাদ করতে প্ররোচনা দেয়। যদি তোমরা তাদের কথা মত চল তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক হবে।'[৬] অত:পর মুফতী সাহেব ইসলাম এবং আহলে ইসলামের পতনের কারণ উল্লেখ করেছেন। একটি আছারে সাহাবা উল্লেখ করেছেন-

عن زياد ابن حدير قال قال لي عمر هل تعرف ما يهدم الاسلام – - قال يهدمه زلة العالم و جدال المنافق بالكتاب و حكم ائمة المضلين – তাবিঈ হযরত যিয়াদ বিন হুদাইর বলেন, একবার হযরত ওমর রা. আমাকে জিজ্ঞেস করলেন; তুমি বলতে পার কি? ইসলামকে কিসে ধ্বংস করবে? আমি বললাম না। তখন তিনি বললেন, আলিমদের পদস্খলন, মুনাফিকের আল্লাহর কিতাব নিয়ে

১. আল-কুরআন, ৩৩ : ৭২।
২. আল-কুরআন, ৩: ১০৪।
৩. ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মদ, মুফতী, *সীরাজুত তাবলীগ*, চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, তা. বি. পৃ. ১-৭।
৪. মেশকাত শরীফ, নূর মোহাম্মদ আজমী (অনূ), প্রাগুক্ত, খ. ১ম, পৃ. ১৮৪, হাদীস নং ১৬৭,
৫. ফয়যুল কালাম, পৃ. ১৪২, হাদীস নং-১১০।
৬. আল-কুরআন, ৬ : ১২১।

বাদ-প্রতিবাদে লিপ্ত হওয়া এবং গুমরাহ শাসকদের শাসন।[১] মুফতী সাহেব এর মাধ্যমে বুঝাতে চেয়েছেন যে, দুনিয়ালোভী আলিমদের ফিতনা হবে ভয়াবহ। মূর্খ পেট পূজারী সূফীদের উৎপাত হবে আরো মারাত্মক। কিছু লোক বাহ্যিকভাবে মুসলমান থাকলেও ওদের চরিত্র হবে মুনাফিকদের ন্যায়। ওরা কুরআন, হাদীস মুজতাহিদ ইমামগণের বিরুদ্ধে আছড়ে পড়বে। ওদের সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন- انما اخاف علي هذه الامة كل منافق يتكلم بالحكمة ويعمل بالجور – بيهقي 'আমি এ উম্মতের উপর ঐ জাতীয় মুনাফিকদের বিষয়ে আশংকা করছি যারা প্রজ্ঞার কথা বলবে আর অত্যাচারের কাজ করবে।'[২] মুফতী সাহেব মানুষের অন্তরের ব্যাধি সমূহ চিহ্নিত করেছেন এবং সেগুলোর চিকিৎসার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। এ গ্রন্থে তিনি তাবলীগ জামাআতকে দীন ও শরীআতের বাহক বলে আখ্যায়িত করেছেন। এর ব্যাপ্তি মাশরিক-মাগরিব তথা সারা দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়বে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। এ গ্রন্থে মুফতী সাহেব কুরআন, হাদীসের আলোকে ভোটকে আমানত ও স্বাক্ষী হিসেবে তুলনা করেছেন। সিয়াসত ও ইসলাম শিরোনামে এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, ইসলামী রাজনীতি প্রকৃত ন্যায়- ইনসাফের রাজনীতি এবং সব ধরণের কল্যাণ, বরকত, সৌভাগ্য, উভয় জগতের কামিয়াবী এর উপর নিহিত। এ গ্রন্থে তিনি মাদ্রাসার জিম্মাহদারগণকে সহী শুদ্ধ ভাবে আল্লাহর ওয়াস্তে দীনের সেবা, দীনি ইলমের দরস-তাদরীসের

আহবান জানিয়েছেন। অন্যথায় সেগুলোকে খালিছ দীনি প্রতিষ্ঠান বলে আখ্যায়িত করা যাবে না। দীনি শিক্ষার মান নেমে আসা কারণ হিসাবে তিনি দায়ী করেছেন মাদ্রাসার মুহতামিম ও ব্যবস্থাপকগণকে। তাদের দূর্বলতার কারণে দীনের অন্যান্য বিষয়েও দুর্বলতা অনুপ্রবেশ করছে। দীনি মাদ্রাসাসমূহে তালিবে ইলমগণের মূল লক্ষ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও দীনের সেবা করা। তাদেরকে দরসে অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে। ইলমের প্রতি প্রচণ্ড তৃষ্ণা থাকবে এবং সময়কে গণীমত মনে করবে। ইলম শিক্ষা লাভের পর আল্লাহর নির্দেশ মতে কাজ করবে- لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم اذا رجعوا তাদের (মু'মিন) প্রতিটি দলের এক অংশ বের হয় না কেন যাতে তারা দীন সম্বন্ধে জ্ঞান অনুশীলন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে যখন তারা তাদের নিকট ফিরে যাবে সতর্ক করতে পারে।[৩] এ গ্রন্থে মুফতী সাহেব আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোকপাত করেছেন, তাহলো তাকলীদে শখ্সী। তিনি বলতে চেয়েছেন- চার মাযহাবের কোন একজন ইমামের অনুসরণ করা মানেই কুরআন, হাদীস ও রাসূলের অনুসরণ করা। অন্যথায় দীনের উপর চলা সম্ভব নয়। এছাড়া তিনি খতমে খাজেগান, খতমে শবীনা, খতমে বুখারী বিষয়েও আলোচনা করেছেন। বিষয়গুলো শরীআত সিদ্ধ নয় বলে, তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[৪]

১৪. খাততে ইমাম গায্যালী خط امام غزالي رح

এ পত্রের মূল রচয়িাত ইমাম গায্যালী র.। মুফতী ফয়যুল্লাহ র. তা সংকলন করেছেন। পত্রের উৎসের কারণ ইমাম গায্যালীর জনৈক ছাত্র। যিনি ইমাম গায্যালীর নিকট দীর্ঘদিন ইলম অর্জন করার পর তাঁর নিকট হতে সনদ লাভ করেছিলেন। পরবর্তীতে তার মনে এ প্রশ্নের উদয় হল যে, ইলমের মধ্যে কোন ইলম দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য কল্যাণকর যা আমলে আনতে হবে এবং কোন ইলম ক্ষতিকর যা পরিত্যাগ করতে হবে। তার সে প্রশ্নের উত্তরে ইমাম গায্যালী র. এ পত্র রচনা করেছিলেন। যার সারকথা হলো- অনর্থক কাজে লিপ্ত হওয়া আল্লাহ বিমূখতার লক্ষণ, বয়স চল্লিশ বছর অতিক্রম করার পরও আমলের পরিবর্তন না হওয়া জাহান্নামের উপযুক্ত হওয়ার লক্ষণ, যে আলিম ইলম দ্বারা উপকৃত হয় না কিয়ামতের দিন তার শাস্তি হবে ভয়াবহ। আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের আশা রাখলে নেক কাজ করতে হবে,

---

১. মেশকাত শরীফ, নূর মোহাম্মদ আজমী (অনূ), প্রাগুক্ত, খ. ২য়, পৃ.৪১ , হাদীস নং ২৫০।

২. ফয়যুল কালাম, পৃ. ৪৮, হাদীস নং-৭৪।

৩. আল-কুরআন, ৯: ১২২।

৪. ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মদ, মুফতী, *মাকালাতি মুফতী আযম*, চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, ১৪০৯ হি. পৃ.১০০-১০১, ১৩৬-১৩৮।

সৎকর্ম করা ব্যতীত জান্নাতের আশা করা গুনাহ। সর্বাধিক নির্বোধ ঐ ব্যক্তি যে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। পক্ষান্তরে আল্লাহর উপর ভরসা করে। ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত এই দীর্ঘ পত্র পুরো মানবগোষ্ঠীর জন্যই প্রযোজ্য। কারণেই এর গুরুত্ব অনুভব করে মুফতী সাহেব তা সংকলন করেছেন। এ পত্রের পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৩। প্রকাশ করেছে কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী চট্টগ্রাম। প্রকাশক ও প্রকাশকাল অজ্ঞাত।[১]

১৫. ফাযায়িলে দরূদ শরীফ

فضائل درود شريف

মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ র. রচিত এ পুস্তিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০। ভাষা আরবী। পুস্তিকাটি প্রকাশ করেছে কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী চট্টগ্রাম। প্রকাশকাল অজ্ঞাত। এ পুস্তিকার বঙ্গানুবাদও প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশ করেছে কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী। প্রকাশকাল ২০০৪ খৃ.। প্রকাশক মৌলবী শুআইব ফয়যী। বঙ্গানুবাদকের নাম অজ্ঞাত। এ পুস্তিকায় মুফতী সাহেব দরূদ শরীফ পাঠ করার ফযীলত তুলে

ধরেছেন। যেমন- রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন- যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদশরীফ পাঠ করবে আল্লাহ তাআলা তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করবে। দশটি ছোট গুনাহ মাফ করবেন এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের দশটি দরজা উন্মুক্ত করে দেবেন।[২]

রাসূলুল্লাহ সা. আরো বলেন, বনী আদমের মধ্যে আমার নিকটবর্তী কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি হবে যে আমার উপর অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করবে।[৩] এ ধরণের বেশ কিছু হাদীস তিনি উল্লেখ করেছেন এবং দরূদ শরীফ পাঠ করার উপযুক্ত স্থান, সময় ও পরিবেশ কোনটি এবং কোন সময় কোন অবস্থায় দরূদ শরীফ পাঠ করলে যথার্থ নেকী পাওয়া যাবে। সে বিষয়েও আলোচনা করেছেন। পবিত্র কুরআনে রাসূলুল্লাহ সা.-এর মর্যাদা সম্বন্ধে নাযিলকৃত কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করেছেন। নবীপ্রেমিকদের জন্য এ পুস্তিকাটি যথার্থ উপযুক্ত।[৪]

১৬. ইরশাদুত তালিবীনা ইলা হাক্বিল মুবীন
ارشاد الطالبين الي حق المبين

মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ র. রচিত ৪টি পুস্তিকার সমষ্টি এ গ্রন্থ। ক. হক কি রেহনুমায়ী। এ রিসালার পরিধি ১-১৫ পৃষ্ঠা। ভাষা উর্দু। মানুষ কিভাবে মুক্তির পথ আবিষ্কার করতে পারে সে বিষয়ে এ পুস্তিকায় আলোকপাত করা হয়েছে। খ. ইসলাহুন নুফূস। এর পৃষ্ঠা ১৬-২৯। ভাষা ফার্সী। পৃথকভাবে এ পুস্তিকা আলোচনা গত হয়েছে। গ. পায়রবীয়ে সুন্নত। এর ব্যাপ্তি ৩০-৪০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। রচনার ভাষা ফার্সী। এ পুস্তিকায় সুন্নত অনুসরণ, অনুকরণের জন্য মুসলমানদের আহ্বান করেছেন। ঘ. আদইয়ায়ে মাসূরা আনিন নাবিয়্যি সা. । এর পরিধি ৪১-৪৮ পৃষ্ঠা। ভাষা আরবী। এ পুস্তিকার উর্দু অনুবাদ করেছেন মুফতী মুহাম্মদ ইযহারুল ইসলাম চৌধুরী। এ প্রসঙ্গে পৃথক আলোচনা গত হয়েছে।[৫]

১.ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মদ, মুফতী, *খাততে ইমাম গায্যালী*, চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, তা. বি. পৃ. ১-৫।
২. ফয়যুল কালাম, পৃ. ১৮৯, হাদীস নং-২৬৯
৩. ঐ, পৃ. ১৯০, হাদীস নং- ২৭০।
৪. ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মদ, মুফতী, *ফাযায়িলে দরূদ শরীফ*, চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, ২০০৪, পৃ. ১-১০।
৫. আব্দুল বাকী, মুহাম্মদ, ড. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০।

ঙ. কাব্য রচনা

মুফতী সাহেব কবিতা, কাব্য, অপছন্দ করতেন না। তবে কুরআন হাদীসের চর্চা ছেড়ে দিয়ে কাব্য কবিতা নিয়ে লিপ্ত থাকাকে অপছন্দ করতেন। তিনি ছিলেন মজ্জাগত ও স্বত্ত্বাগতভাবে কাব্য প্রতিভার অধিকারী। তাঁর কাব্য প্রতিভা ছিল অসাধারণ। চমৎকার শব্দে ও বাক্যে কাব্য রচনা করতে ছিলেন দক্ষ। তাঁর কয়েকজন শিক্ষকের জীবনী তিনি ফার্সী কাব্যে রচনা করতে সক্ষম হয়েছেন। একজন বিশাল কর্মময় মনীষীর জীবনী তিনি অতি সংক্ষেপে ফার্সী কাব্যে রচনা করতে পারতেন। কাব্য রচনায় তিনি আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছেন। হাটহাটাজারী মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম এবং তাঁর উস্তাদ মাওলানা হাবীবুল্লাহ র. -এর জীবন ও কর্ম ফার্সী কাব্যে জীবন্তভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি ছিলেন ফার্সী ভাষার যোগ্য উস্তাদ। ছাত্রদের মধ্যে ফার্সী ভাষার প্রতি অদম্য আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে সক্ষম ছিলেন। কাব্যের মাধ্যমে তিনি মুসলিম সমাজকে সুন্নত অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং বিদআতের প্রতি ঘৃণা জন্মিয়েছেন। খাইরুল কুরূনের যুগের মনীষীগণের অনুসরণ করতে মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছেন। তাঁদের পরবর্তী যুগের উদগত বিদআত, শরীআত বিরুদ্ধ কর্মকাণ্ড, শিরকের অনিষ্ট মানুষের সামনে কাব্যে স্পষ্টভাবে উম্মোচন করতে সক্ষম হয়েছেন। কিতাবুল্লাহ ও সুন্নতে রাসূলের শিক্ষা মুসলিম উম্মাহর সামনে

উপস্থাপন করেছেন। তিনি কাব্যের মাধ্যমে উত্তম যুগের মুসলমানদের সাথে এ যুগের মুসলমানদেরকে একত্রিত করেছেন। উত্তম যুগের পর উদ্ভাবিত বিদআত সমূহের মূল তত্ত্ব উদ্ঘাটন করেছেন। শিরক, বিদআত, শরীআত বিরুদ্ধ কর্মকাণ্ডের পর্দা উম্মোচন করেছেন। মুফতী সাহেব ওয়ায-নসীহতের সময় অধিক হারে কবিতা আবৃত্তি বা শে'রগুয়ী পছন্দ করতেন না; বরং এর ক্ষতিকর দিকগুলো বক্তব্য ও লিখনীর মাধ্যমে বিস্তারিতভাবে জাতির সামনে তুলে ধরেছেন। লিখনীতে তিনি কোন না কোন কবিতার মাধ্যমে উপমা উপস্থাপন করেছেন। মহব্বত নামার অধিকাংশ কবিতার লাইন তার মুখস্থ ছিল। তিনি অবসরে গুণগুণ করে কবিতা আবৃত্তি করতেন। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু ছিল-আল্লাহর সত্ত্বা, তাঁর গুণাবলি, তাঁর প্রভূত্বকে স্মরণ করা। আরবী, ফার্সী ও উর্দু সাহিত্যের অসংখ্য কবিতা তাঁর মুখস্ত ছিল। ছাত্রজীবনে তিনি ফার্সী ভাষায় ছন্দে ***ফান্দে ফয়েয*** নামক কাব্যগ্রন্থ রচনা করে ছাত্র, শিক্ষক ও সতীর্থদের মতে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। ছাত্র জীবনে মাওলানা আহমদ হাসান র.-এর চাচাত ভাই মাওলানা আব্দুল জব্বার এর বিয়ে উপলক্ষে একটি কবিতা রচনা করেন। উক্ত বিয়ে অনুষ্ঠানে তা পাঠ করে শুনানোর প্রভাব এতবেশী হয়েছিল যে, বিয়েটি ইসলামী শরীআত ও সুন্নত মোতাবেক পরিচালিত হয়েছিল। হাটহাজারী মাদ্রাসার বার্ষিক মাহফিলে তিনি প্রায়ই স্বরচিত কবিতা, কাছিদা পাঠ করতেন। ঐ সব কাছিদায় মাদ্রাসার প্রশংসা, মাদ্রাসার গুরুত্ব ও ফযীলত, উক্ত মাহফিলে আগমনের ফযীলত ফুটে ওঠত। মুফতী সাহেব কাব্যে বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন-

ند فيض
الكلام الفاصل بين الحق والباطل

ند نامه خاكي
زير

الارشاد الامة الي التفرقة بين البدعة و السنة
الكلام الفاصل بين اهل الحق و الباطل
حفظ الايمان عن مكائد دجال قادياني

الرسالة المنظومة في الرد علي الفرقة النيـ
فيض ستار هاشيه
فيض بـ بها شرح كريما

এছাড়া তিনি ***ফয়যে বে পায়া*** নামে শেখ সাদী র.[১] রচিত গুলিস্তাঁ গ্রন্থের ব্যাখ্যা ও উর্দু অনুবাদ রচনা করেছেন এবং ***ফয়যে বে কারা*** নামে শেখ সাদী র. রচিত বোস্তাঁ গ্রন্থের ব্যাখ্যা ও উর্দু অনুবাদ রচনা করেছেন এবং ফয়যে সাত্তার নামে আল্লামা ফরীদ উদ্দীন আত্তার র. রচিত কারীমা গ্রন্থের ব্যাখ্যা ও উর্দু অনুবাদ রচনা করেছেন।[২]

১. পান্দে ফয়েয پند فيض

মুফতী সাহেবের ছাত্রজীবনে রচিত ফার্সী কাব্যের নাম পান্দে ফয়েয। এ মসনবী তিনি বিখ্যাত ফার্সী কাব্যগ্রন্থ ***কারীমা*** এর রচনা ভঙ্গীতে রচনা করেছেন। গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০। এ কাব্যগ্রন্থটি মহান পণ্ডিত, দার্শনিক, পরিব্রাজক আল্লামা শেখ সাদী র. রচিত গুলিস্তাঁ, বোস্তাঁ, পাঠ করার সময় রচনা করেছেন। গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। প্রকাশকাল অজ্ঞাত। এ কাব্য গ্রন্থটি ছন্দ শাস্ত্রমত অনুযায়ী রচিত হয়নি। তবে পরবর্তীতে রচিত তাঁর কাব্যগ্রন্থসমূহে ছন্দশাস্ত্রের প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। মাওলানা হাবীবুল্লাহর নিকট হতে এবং বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে ছন্দ প্রকরণসহ বিভিন্ন

অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। গ্রন্থটিতে বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা স্থান পেয়েছে। অসৎ, প্রতারক, ভন্ডপীরদের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে তিনি এ কাব্যগ্রন্থটি রচনা করেন এবং এর মাধ্যমে জাতিকে সতর্ক করেছেন।[৩]

২. আল- কালামুল ফাসিলু বায়নাল হাক্কি ওয়াল বাতিলি

الكلام الفاصل بين الحق والباطل

এ ফার্সী কাব্যে মুফতী সাহেব বিভিন্ন ভন্ডপীর ও দরবার শরীফ নামধারীদের শরীআত বিরুদ্ধ কর্মকাণ্ডের চিত্র তুলে ধরেছেন এবং সেগুলো প্রতিহত করার চেষ্টা করেছেন। ঐসব অনুষ্ঠানে ইসলামী লেবাস-পোশাক, আচার-আচরণ থাকতো না; হিন্দুদের ধর্মযজ্ঞের মতো চলতো যাবতীয় কর্মকাণ্ড এসব দেখেই তিনি মর্মাহত হতেন। এগুলোর প্রতিকার করা ও সংশোধনের নিমিত্ত তাঁর এ কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়েছে। এ কাব্যের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯ এবং কবিতার লাইন সংখ্যা ২০৩টি। কাব্য গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। প্রকাশকাল অজ্ঞাত। [৪]

৩. পান্দেনামায়ে খাকী پند نامۂ خاکي

পান্দেনামায়ে খাকী মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ র. রচিত একটি বিশাল কাব্যগ্রন্থ। এ গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্য ৮০। কাব্যের ভাষা ফার্সী। রচনাকাল অজ্ঞাত। তবে অনুমান যে গ্রন্থের কিছু অংশ ১৩৯১ হি. রচিত হয়েছে। গ্রন্থটির উর্দু অনুবাদ করেছেন মুফতী ইযহারুল ইসলাম চৌধুরী। মূল গ্রন্থের নিচের অংশে উর্দু অনুবাদ যুক্ত রয়েছে। প্রকাশ করেছে কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী চট্টগ্রাম। প্রকাশক মৌলবী মুহাম্মদ কাসিম ফয়যী। প্রকাশকাল অজ্ঞাত। গ্রন্থ সম্বন্ধে বলা হয় এটা মুফতী সাহেবের জীবনের শেষের দিকে রচিত এবং গ্রন্থটি তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়েছিল বলে অনুমেয়। এ কাব্যে গ্রন্থে তিনি আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ তাআলার দিকে ফিরে আসার জন্য মানুষকে আহ্বান করেছেন। এ গ্রন্থে তিনি যে বিষয়গুলোকে কাব্যের মাধ্যমে পৃথক পৃথক শিরোনাম দিয়েছেন সেগুলো হলো- ১. সর্বপ্রথম তিনি পান্দেনামায়ে খাকী গ্রন্থটি পাঠ করার জন্য ছাত্র শিক্ষক সবাইকে আহ্বান জানিয়েছেন। ২. আল্লাহ জাল্লাহ শানুহুর নিয়ামত সমূহের আলোচনা, ইসলামের সৌন্দর্য ও পূর্ণতা তুলে ধরেছেন ত্রিশ লাইনে। ৩. নামাযের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন ও এর ফযীলত বর্ণনা করেছেন। ৪. শরীআত, রাসূলের সুন্নত অনুসরণ,

১. শেখ সা'দী র. : নাম শরফ উদ্দীন মুসলিহ উদ্দীন সা'দী র.। পিতার নাম আব্দুল্লাহ সিরাজী। সম্রাট ইব্‌ন সা'আদের আমলে ৫৮৯ হি. মোতাবেক ১১৯৩ খৃ. সিরাজ নগরে তাঁর জন্ম। পিতার নিকট হতে প্রাথমিক শিক্ষা ও দৈনন্দিন আমলের চর্চা লাভ করেন। আরবী ও ফার্সী ভাষার পন্ডিত হিসেবে খ্যাত ছিলেন। তাঁর রচিত গুলিস্তাঁ, বোস্তাঁ, কারীমা তাঁকে অমরত্ব দান করেছে। তিনি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকুরী ও মানবসেবায় বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন। ৬১৯ হি. / ৬২৯ হি. তিনি ইন্তিকাল করেছেন। সিরাজ নগরে সমাহিত হয়েছেন। (মাহবুবে এলাহী , মাওলানা, ***হায়াতুল মুসান্নিফীন***, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪-১৫৫)।

২. হায়াতে মুফতী আযম, পৃ. ৭৪-৭৭ ।

৩. ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মদ,মুফতী, *পান্দে ফয়েয, চট্টগ্রাম*, কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, তা. বি. পৃ. ১-১০।

৪. ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মদ,মুফতী, *আল কালামুল ফাসিলু বায়নাল হাক্কি ওয়াল বাতিলি*, চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, তা. বি. পৃ. ৩২-৩৪, ৫৭।

আল্লাহ তাআলার যিক্‌র, দীনি ইল্‌ম চর্চায় লিপ্ত হওয়ার ফযীলত, জান্নাতে আল্লাহ তাআলা কি উপভোগ্য নি'আমত রেখে দিয়েছেন তার আলোচনা। ৫. প্রকৃত শান্তি আল্লাহর আনুগত্য, পবিত্র জীবন যাপন এবং দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তির মধ্যে। ৬. ধার্মিক মনীষীগণের সান্নিধ্য লাভ করার ও দুষ্ট মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করার গুরুত্ব। ৭. সৎ কাজের আদেশ, দীনের তাবলীগ এবং তাবলীগ জামাআতের ফযীলত ও গুরুত্ব। ৮. আলিমগণের ধ্বংস হওয়া ও তার কারণ এবং ধর্মীয় কাজে নব আবিস্কৃত যন্ত্রপাতির ব্যবহার বিধি। ৯. গুনাহর ক্ষতি, গুনাহ হতে তাওবা করা এবং সুন্নত অনুসরণে উৎসাহ প্রদান। ১০. যৌবন কালের জন্য আক্ষেপ, বার্ধক্য, শারীরিক অক্ষমতার জন্য অনুশোচনা। ১১. ধনী-গরীবকে ভিন্নভাবে মূল্যায়ন করাকে প্রত্যাখ্যান এবং সবাইকে সমান চোখে দেখার মধ্যে পরকালীন সফলতা নির্ভর করে ধন-দৌলতের মধ্যে নয়। ১২. যিন্দেগী-বন্দেগীর মূল লক্ষ্য আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি আর বন্দেগীর বুনিয়াদ হলো সুন্নতের অনুসরণ। ১৩. পৃথিবীতে আমরা মুসাফির সুতরাং দুনিয়ার সাথে দীল লাগিওনা। ১৪. সত্যের অনুসরণ করা, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সাথে লেগে থাকা, বিদআতে লিপ্ত না হওয়া। আহলে বাতিলের

সব অশ্রাব্য উক্তি সহ্য করা। ১৫. মুসলমানকে কাফির বলা হারাম। ১৬. বদরুসুমের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করা। ১৭. বিদআত এবং শরীআত বিরুদ্ধ কাজের সম্প্রচার এবং সুন্নতে নববী হারিয়ে যাওয়ার কারণে অনুশোচনা করা। ১৮. সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দুআ না করা। ১৯. শবীনা তথা হাফিজে কুরআনদের মাধ্যমে রাত জেগে কুরআন শরীফ মুখস্থ পাঠ করানো, খতমে বুখারী, খতমে দুআ ইউনুস, মহররম উৎসব, ২৭ শে রজব পালন করা, শবে বরাত, শবে কদরের বিভিন্ন রুসুমের আলোচনা। কাব্যের এ অংশে মুফতী সাহেব উপরোক্ত বিষয়গুলোকে পরিত্যাগ যোগ্য এবং বিদআত বলেছেন। শবীনা, খতমে বুখারী সালফে সালিহীনের জীবনে ছিল না বলে তিনি দাবী করেছেন। ১৩৮৫ হি. রচিত তাঁর এক ফাতাওয়ায় তিনি বলেছেন- তিন দিনের কম সময়ে পবিত্র কুরআন খতম করার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এটা খেলাফে সুন্নত তো বটেই এবং কোন ইবাদতও নয়। শুধুই লোক দেখানো। কারণেই গুনাহর কাজ। দুআ ইউনুসের খতম সম্বন্ধে তিনি বলেন, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দুআ এবং পবিত্র কুরআনের আয়াত। এটি পাঠ করলে বালা-মসীবতে নিশ্চিত উপকার পাওয়া যায়। এ দুআ পাঠ করার জন্য হাদীসে তাগিদ এসেছে। প্রতিটি মুসলমানের উপর কর্তব্য হলো একাকী এ দুআ পাঠ করা। ইনশা আল্লাহ উপকার হবে। তবে আমাদের সমাজে খতমে ইউনুস পাঠ করার জন্য লোক ডেকে এনে একত্রে পাঠ করার যে গুরুত্ব রয়েছে তা ইবাদত হিসেবে গণ্য নয়। সালফে সালিহীন হতে এ আমল প্রচলিত নয়। ২০. খতমে খাজেগান হাদীসে বর্ণিত নয়। এ সম্বন্ধে মুফতী সাহেবের বক্তব্য হলো- বর্তমান সময়ে মাদ্রাসাসমূহে খতমে খাজেগানের যে গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং তা না পড়লে খারাপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়; বিষয়টি সম্বন্ধে ধর্মীয় বক্তব্য হলো এটা রাসূলুল্লাহ সা., সাহাবা,তাবিঈন, তাবে তাবিঈন এবং মুজতাহিদ ইমামগণের আমল নয়। তারা এ আমল শিক্ষা দেননি। এটা দীনি কোন আমল বা কর্তব্য নয়। কেউ এমন করলে তা বিদআত হিসেবে গণ্য হবে। ২১. অবর্ণিত বিষয়সমূহের উপর বর্ণিত বিষয়সমূহের প্রাধান্য দিতে হবে। ২২. ওয়াজ-নসীহতে অধিক পরিমানে কবিতা পাঠ করা যাবে না। সারা রাত ওয়াজ করা অনুচিত। ২৩. পাগড়ী বাঁধা বিশেষ করে নামাযে এবং হাটুর নীচ পর্যন্ত লম্বা ফাটল বিহীন জামা পরিধান করা সুন্নত। ২৪. বিয়ে শাদীতে মোহরে ফাতেমীর অনুসরণ করা সুন্নত। ২৫. তাকওয়ার হাকীকত ও বিলায়াতের হাকীকত আলোচনা করেছেন এবং বিলায়াতে রহমানী ও বিলায়াতে শয়তানীর মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরেছেন। ২৬. সাফায়ে কাল্‌ব ও ইসলাহে বাতেন অর্জনের উপায়সমূহ বর্ণনা করেছেন। ২৭. কোন কামিল আল্লাহ ওয়ালার হাতে বায়আত হওয়া সুন্নত। ২৮. তাকলীদে সখসী (কোন ইমামের অনুসরণ) ওয়াজিব। ২৯. কাদিয়ানীদের প্রতিহত করা ওয়াজিব। ৩০. দীনের গুরুত্বপূর্ণ কাজে অপব্যাখ্যা করা নিন্দনীয়। ৩১. ছোট জিহাদ ও বড় জিহাদের আলোচনা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। ৩২. সর্বশ্রেণীর মানুষকে হক ও আমানত আদায় করতে হবে। অপরের সম্পদ খেয়ানত, অন্যের হক নষ্ট করা থেকে বিরত থাকতে হবে। সবাইকে উন্নত আখলাক অর্জন করতে হবে। এ শিরোনামের অধীন কবিতাগুলো গুরুত্বপূর্ণ-

হে আলিম সমাজ! ইলম দীনের সম্মান কর।
হে সাধারণ মানুষ! আলিমে দীনের ইজ্জত কর।
হে ধন দৌলতের অধিকারী! সম্পদের হক আদায় কর।
হে প্রতিপত্তির মালিক! প্রতিপত্তির হক আদায় কর।[১]

৩৩. পৃথিবীতে আমানতের সব ধরণের খেয়ানত প্রকাশিত হবে। প্রতিটি কাজে প্রতিটি বিভাগে প্রতিটি শরীরের খেয়ানত প্রকাশিত হবে। আমাদেরকে এসব থেকে বিরত থাকতে হবে। ৩৪. ফেতনা- ফাসাদ প্রকাশিত হবে। সব ধরণের ফেতনা-ফাসাদ থেকে মুক্ত থাকার মাধ্যমে দুজাহানের শান্তি লাভের উপায় হিসেবে সুন্নত পালনের প্রতি আগ্রহ রাখতে হবে এবং বিদআতকে ঘৃণা করতে হবে। ৪২. পৃথিবীর শান্তি - অশান্তি আলিমদের শান্তি- অশান্তির উপর নির্ভরশীল। ৪৩. রাষ্ট্র প্রধান ন্যায় বিচারক বা জালিম হবেন তা নির্ভর করে সুনাগরিক ও কুনাগরিকের উপর। ৪৪. খারাপের অনুসরণ নিন্দনীয়। ৪৫. তাওবা ও তাওবার শর্তসমূহ ৪৬. দু'আ, ইসালে সওয়াব, মুর্দার জন্য রহমত প্রার্থনা আল্লাহর নিকট করতে হবে। ৪৭. 'জান্নাত পরিবেষ্টিত আছে কষ্টের দ্বারা, জাহান্নাম পরিবেষ্টিত আছে প্রবৃত্তি দ্বারা' এ হাদীসের ব্যাখ্যা। ৫১. মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে মুনাজাত। ৫২. পান্দে নামায়ে খাকীর রচনা ভাবনা জীবন যেন প্রভূর

স্মরণে ব্যয় হয়, গাফিলতির মধ্যে ব্যয় না হয় অসীম দয়ালু প্রভূর দরবারে সে প্রার্থনা। ৫৪. প্রিয়তমা স্ত্রীর স্মরণে শোকগাঁথা। **১৩৯১** হি. ২৬ রবিউল আওয়াল শনিবার বেলা দ্বিপ্রহরের সময় মুফতী সাহেবর স্ত্রী মৃত্যুবরণ করেন। এ মৃত্যুতে তিনি বিমর্ষ, বিষন্ন হন। একাকী নিভৃতে গুণগুণ করে কি যেন গাইতেন। স্ত্রী বিয়োগ ব্যাথায় একটি শোকগাঁথা রচনা করেন। যার শিরোনাম **প্রিয়তমা স্ত্রীর আনওয়ার- এর মাতা'র** মৃত্যুতে মর্সিয়া-

প্রিয়তমা মরহুমা পৃথিবী ছেড়ে গেল চলে
তার আত্মা রবের নিকট গেল উড়ে
তার রূহ চলে গেল আলমে আরওয়াহ-এ
তার প্রাণ মিশে গেছে নেককারদের প্রাণের সাথে
গিয়েছিলাম তার গোরের শিয়রে
হযরত আলীর রা. কবিতা আসলো স্মরণে
তুমিও পাবে সেখানে ঐ সৌভাগ্যের দেখা
নিশ্চিত জান জান্নাত তার ঠিকানা
আমার আগে সে দুনিয়া হ'তে বিদায় হল
তার জন্য আমার তুষ্টি পূর্ণ রইল।
মনে পড়ে মোর বারে বারে তার পূণ্য স্মৃতি
হে রাহীম সে মোর চিরদিনের স্মৃতি
হে দুজাহানের প্রভূ বানাও তার ঠিকানা
জান্নাতুল ফিরদাউসে দাও ইজ্জত সম্মাননা। [২]

৪. মসনবীয়ে খাকী مثنوي خاكي

মসনবীয়ে খাকী মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ র. রচিত ৩২ পৃষ্ঠার একটি কাব্য সংকলন। এটি ফার্সী ভাষার কাব্য। পূর্ণ সংকলনটির রচনাকাল উল্লেখ করা হয়নি। তবে কিছু কাব্যের রচনার দিন তারিখ উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী চট্টগ্রাম। প্রকাশকাল অজ্ঞাত। এ কাব্যের শুরুতে জগতের সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা করা হয়েছে। অত:পর সারওয়ারে কায়েনাত রাসূল সা., সাহাবা, তাবিঈন ও তাঁদের অনুগামীদের প্রশংসা করা হয়েছে। মুজতাহিদ ইমামগণ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির, কারী,

১-২. ঐ, পৃ. ৭৮-৭৯; হায়াতে মুফতী আযম, পৃ. ১৬২-১৬৩; ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মদ,মুফতী, *পান্দে নামায়ে খাকী*, চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, তা. বি. পৃ. ১-৮০।

সূফীয়া-ই কিরাম, আউলিয়া ইযামগণের প্রশংসা করেছেন। উম্মতের মুজাহিদীন, বক্তা, দীনী কিতাবের লেখক, শিক্ষক ও মুফতীগণের প্রশংসা করেছেন। এরপর অস্থায়ী দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক না রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। প্রভূর দরবারে মুনাজাত জানিয়েছেন, নিজের সন্তান আনওয়ার, কন্যা রহিমা খাতুন, চোখের মনি কলিজার টুকরো নাতি মুহাম্মদ হুসাইন -এর দীর্ঘায়ু, সুস্থ- সুন্দর জীবন কামনা করেছেন। নাতিন জামাই মুফতী ইযহারুল ইসলামের জন্য দুআ করেছেন।[১] মুফতী ইযহারের ছেলে হারূন ইযহারের দীর্ঘায়ু ও সুন্দর জীবন কামনা করেছেন।[২] কন্যা যয়নব খাতুনের জন্য সুস্থ, সুন্দর জীবন কামনা করেছেন। এছাড়া তাঁর পরিবারের প্রতিটি সদস্য ও তাদের সন্তানদের জন্য দুআ কামনা করেছেন। এছাড়া এ কাব্যগ্রন্থে সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ রাখার গুরুত্ব ও ফযীলত, আল্লাহ তাআলার সাথে ইশকের সম্পর্ক স্থাপনের উপকারীতা, আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে জান্নাত প্রাপ্তি এবং বিমূখ হওয়ার মধ্যে জাহান্নাম বলে উল্লেখ করেছেন। পবিত্র রমযান মাসের আগমন কে শুভেচ্ছা স্বাগতম জানিয়েছেন এবং রমযান মাস চলে যাওয়াতে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। এছাড়া ইস্তিগফারের ফযীলত, বিধৃত হয়েছে। ইসলামের সৌন্দর্য, নান্দনিকতা, আল্লাহ তাআলার রহমত ও মাগফিরাত কামনা করেছেন। মুফতী সাহেবের প্রিয় উস্তাদ

মাওলানা সাঈদ আহমদ র., মাওলানা হাবীবুল্লাহ র., মাওলানা জমীর উদ্দিন র. প্রমূখ মনীষীর প্রশংসা ও স্তুতি এ কাব্য গ্রন্থে করেছেন। এ কাব্য গ্রন্থটিতে মুফতী সাহেবের আকুতি এবং তার বলিষ্ঠ কাব্য প্রতিভা ফুটে ওঠেছে।[৩]

৫. কান্দে খাকী قند خاكي

মুফতী সাহেবের রচিত কান্দে খাকী ছয় পৃষ্ঠার কাব্য। এ কাব্যের ভাষা ফার্সী। এর ছন্দ সংখ্যা ১০৬টি। কাব্যটি মনজুমাতে খাকীর অন্তর্ভূক্ত। কাব্যটি প্রকাশ করেছে কতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী চট্টগ্রাম। ইল্‌ম, ইল্‌ম দীনের প্রতিষ্ঠান, ইল্‌ম দীনের বাহকের ফযীলত সম্বন্ধে বর্ণিত হাদীসের বক্তব্য ফার্সী কাব্যে প্রকাশ করেছেন। কান্দে খাকী এ কাব্য গ্রন্থে মুফতী সাহেব তাঁর দীর্ঘ দিনের কর্মস্থল হাটহাজারী মাদ্রাসার প্রশংসা করেছেন। হাজার হাজার ছাত্র এ মাদ্রাসা থেকে ইল্‌ম নববীর সুধা পান করছে, ইসলামের সাহায্যকারী হিসেবে দুনিয়াতে হিদায়াত, সুন্নতের নূর ছড়িয়ে দিচ্ছে এবং শিরক বিদআত, গুমরাহী বিদূরিত করছে; এটা তাঁর বড় প্রাপ্তি। তাঁর চোখকে জুড়িয়ে দিয়েছে। আহলে বাতিলদের জীবনে রয়েছে হাজারো অপমান। পক্ষান্তরে আহলে হকদের জীবনে রয়েছে হাজারো সম্মান। এখানে যারা শিক্ষা গ্রহণ করছে তারা সৌভাগ্যবান। এখানকার শিক্ষকগণ দেশের সেরা আলিম, হাদীয়ে উম্মাহ, ওয়ালী উল্লাহ ও আলমের কুতুব। তাঁদের তাকওয়া, পরহেযগারী দুনিয়াতে দৃষ্টান্ততুল্য। তাদের মৃত্যুতে পুরো আলম ক্রন্দন করবে, ফিরিশতাদের মধ্যে আলোচনা হবে নিশ্চয়ই। এ মাদ্রাসার মাধ্যমে দুনিয়াতে দীনি ইল্‌ম, কুরআন-হাদীস চিরস্থায়ীত্বের মর্যাদা লাভ করবে এ প্রত্যয় ও প্রত্যাশা তাদের মধ্যে দৃঢ় ভাবে স্থান লাভ করেছে। তার প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে রচিত কাব্যাংশের কয়েকটি লাইনের বঙ্গানুবাদ হলো-বাংলায় এক চেরাগ প্রজ্বলিত হয়েছে

সারা পৃথিবী এর আলোয় আলোকিত হয়েছে
মাদ্রাসা মুঈনুল ইসলাম দ্বীন, ঈমানের মুঈন
মাদ্রাসা দেওবন্দের মর্যাদা বৃদ্ধিকারী
একদিন দেওবন্দ এর প্রতি ঈর্ষান্বিত হবে
কত উত্তম এ মাদ্রাসা। [৪]

---

১. রচনাকাল ৩০ জিলহজ্ব ১৩৮৯ হি.
২. রচনাকাল ১২ রবিউল আওয়াল ১৩৯৪ হি.
৩. ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মদ, মুফতী, *মসনবীয়ে খাকী*, চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, তা. বি. পৃ. ২-৫, ৮-১০, ১৩-২৬।
৪. ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মদ, মুফতী, কান্দে *খাকী*, চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, তা. বি. পৃ. ২৭-৩২।

৬. মসনবীয়ে দিল পযীর مثنوى دل پزير

মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ রচিত বৃহদাকারের কাব্যগ্রন্থ মসনবীয়ে দিল পযীর। এ কাব্যের পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০৮। বয়েত সংখ্যা ৩২০। কাব্যের ভাষা ফার্সী। রচনাকাল অজ্ঞাত। গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী চট্টগ্রাম। প্রকাশক মৌলভী মুহাম্মদ কাসেম ফয়যী। প্রকাশকাল ১৪০৪ হি.। এ মসনবী গ্রন্থের ব্যাখ্যা ও টীকা লিখেছেন মাওলানা কবীর আহমদ। ব্যাখ্যা ও টীকার ভাষা উর্দু। কাব্যের যে লাইন বা লাইনগুলো ব্যাখ্যাযোগ্য সেখানেই নিচে ব্যাখ্যা ও টীকা সংযোজন করেছেন। ***লামিয়াতুল মু'জিযাত*** গ্রন্থে[১] আরবী কাব্যে যেভাবে রাসূলুল্লাহ সা. এর মু'জিযাসমূহ তুলে ধরা হয়েছে মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহও তেমনিভাবে রাসূলের মু'জিযাসমূহ ফার্সী বয়েতে ফুটিয়ে তুলেছেন। এ কাব্য গ্রন্থের ব্যাখ্যা ও টীকা পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থের আলোকে সংযোজন করা হয়েছে। কাব্যের বক্তব্য যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি এর ব্যাখ্যা ও টীকাসমূহ অত্যন্ত গুরূত্বপূর্ণ। এ কাব্যগ্রন্থে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর প্রশংসা, সীরাত, তাঁর মহান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও তাঁর অসংখ্য মু'জিযা তুলে ধরা হয়েছে। অত্যন্ত

সুখপাঠ্য এ গ্রন্থ এ কাব্যে মুফতী সাহেব শুরুতে একটিমাত্র শিরোনাম ব্যবহার করেছেন। তাহলো মসনবীয়ে দর না'তে সারওয়ারে কায়েনাত মুফাখখারে মওজুদাত আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। রাসূলের সীরাত, প্রশংসা, এবং তার অসংখ্য মু'জিযার বর্ণনা, হাদীস, সীরাতগ্রন্থ, আছারে সাহাবায় বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর অভিব্যক্তি ফার্সী কাব্যে তুলে ধরা হয়েছে। বিষয়টি অনেকটা মাওলানা জালাল উদ্দীন রূমী র. রচিত মসনবীর ন্যায়।[২] যা পবিত্র কুরআনেরই ব্যাখ্যা ফার্সী ভাষায় বিধৃত হয়েছে। এ জন্যই মনীষীগণ বলেন, তিনটি কিতাব পৃথিবীতে অভিনব। কুরআন শরীফ, বুখারী শরীফ, মসনবী শরীফ। মসনবী শরীফ অন্তরে ইশকে ইলাহীর আগুন ধরায়। মুফতী ফয়যুল্লাহর মসনবী শরীফও অন্তরে ইশকে নববীতে আগুন ধরাতে সক্ষম। মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ র. বাংলাভাষী হওয়া সত্ত্বেও ভার্ষী ভাষায় মাতৃভাষার ন্যায় এ কাব্যটি রচনা করেছেন। তাঁর কাব্যের ছন্দ, বয়েতের গাঁথুনী অনেকটা সাদৃশ্য রাখে আল্লামা ফরীদ উদ্দীন আত্তার র. (৫১৩-৬২৯ হি.) রচিত পান্দেনামা রচনার শৈলীর সাথে। হাদীসের বিশাল ভান্ডার তিনি কাব্যে নিয়ে এসেছেন। বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ সা. এর মু'জিযা সমূহের এক কাব্যিক সমষ্টি তিনি রচনা করেছেন। এ কাব্যগ্রন্থ প্রমাণ করে যে, মুফতী সাহেব রাসূলুল্লাহ সা. এর জীবন সীরাত সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও গবেষণা শক্তি রাখতেন। তিনি রাসূলে আকরামের জীবনের প্রতিটি দিক সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। রাসূলের অসংখ্য মু'জিযা সম্বন্ধে তিনি পূর্ণ জ্ঞান রাখতেন। তিনি মুফতী ফকীহ হিসেবে যতটা খ্যাতি অর্জন করেছেন, রাসূলের সীরাত বিশেষজ্ঞ হিসেবে তেমন খ্যাতি অর্জন করতে না পারলেও সীরাত বিষয়ে তাঁর জ্ঞান, পাণ্ডিত্য ছিল পরিপূর্ণ। এ কাব্যের প্রথম তিনটি লাইনের বঙ্গানুবাদ হলো-

বিশ্বের গৌরব, নবীগণের ইমাম,
আদিকাল থেকে উত্তীর্ণকাল পর্যন্ত পথ প্রদর্শক।

---

১. **লামিয়াতুল মু'জিযাত** গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ সা. এর গুণাগুণ, মু'জিযা সম্পর্কে আরবী ভাষায় তিনশ শে'র ব্যবহার করা হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ সা. এর একশত মু'জিযা আলোকপাত করা হয়েছে। যেগুলো নির্ভরযোগ্য হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থ হতে চয়ন করা হয়েছে। লামিয়াতুল মু'জিযাত গ্রন্থের রচয়িতা হলেন মাওলানা হাবীবুর রহমান র.। পিতার নাম মাওলানা ফজলুর রহমান। ১৩২৫ হি. সাহারানপুরে তাঁর জন্ম। দারুল উলূম দেওবন্দ হতে ফারাগাত অর্জনের পর সেখানে শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত হন। ১৩৪৪ হি. তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিম পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৩৪৮ হি. তিনি ইন্তিকাল করেছেন। (মাহবুব এলাহী, মাওলানা, ঢাকা, আনোয়ার লাইব্রেরী, ২০১৩ খৃ. পৃ. ১৩৬)।

২. **মাওলানা জালাল উদ্দীন রূমীর** বিশ্ববিখ্যাত **মসনবী শরীফ**কে বলা হয় ফার্সী ভাষার কুরআন। মসনবীয়ে মানবীয়ে হাস্তে কুরআন দর যবানে পাহলবী। আউলিয়া কিরাম, দার্শনিক, চিন্তাবিদ, গবেষক, সাহিত্যিক, কবি ও বুদ্ধিজীবীদের প্রায় সবাই শত শত বছর যাবৎ রূমীর মসনবী সম্বন্ধে উল্লিখিত উক্তির সততা ঘোষণা করে আসছেন। মূলত পবিত্র কুরআনেরই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হলো দ্বিপদী কাব্য মসনবী। যদিও রূপকার্থে কুরআনের নামে অভিহিত করা হয়েছে তবুও মসনবী কুরআন নয় বরং কুরআনের প্রতিচ্ছবি। (আহমদ নাওয়াজ, *হাজার হামদ*, ঢাকা, অনন্ত প্রকাশনী, ২০০৯, সং. ১ম, পৃ. ১৭।

সমস্ত আলম তাঁর নূরে অস্তিত্বপ্রাপ্ত,
জগতকর্তা মহান অস্তিত্ব দিয়েছেন তাঁকে।
তার অস্তিত্বের সামনে দাতা হাতেমের নাম নিওনা,
কেননা তিনি দু'জাহানের দাতা।[১]

মা'আরিফুল কুরআন সূত্রে এসেছে আল্লামা সুবকী র. *আত-তা'যীম ওয়াল লুগাহ* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, দুনিয়াতে এমন কোন নবী অতিক্রান্ত হননি যিনি রাসূলুল্লাহ সা. এর সত্বাগত বৈশিষ্ট্যের বিষয়ে সমর্থন, সাহায্য এবং তার উপরে ঈমান রাখার অঙ্গীকার নেননি। এমন কোন নবী রাসূল গত হননি যিনি তার উম্মতকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা. এর উপর ঈমান আনা, সমর্থন ও সাহায্য করার জন্য অসীয়ত করেননি। রাসূলের আগমন যদি নবীদের যুগে হতো তাহলে তারাও রাসূলের উম্মত বলে গণ্য হতেন। এর দ্বারা অনুমেয় যে তিনি শুধু উম্মতের নবী নন বরং নবীগণেরও নবী। হাদীসে এসেছে- রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন-আজকে মূসা আ. বেঁচে থাকলে আমার আনুগত্য ছাড়া তার অন্য কোন উপায় ছিল না।[২]

گه باليقين - بود ادم درميان ماء و طين

ছিলেন তিনি নবী নি:সন্দেহে
আদম তখন মাটি ও পানিতে।[৩]

بولهب كو از ولادت شاد شد – هم ثوبية
روز هر د شنبه يابد خفتے - از عذاب و هم به بيند فرحتے

আবু লাহাব রাসূলের শুভ জন্মে উৎফুল্ল হলো,
সে সুসংবাদের উসিলায় সুরাইয়া মুক্ত হলো।
প্রতি সোমবারে আবু লাহাবের আযাব হয় লগু,
সামান্য শান্তি, আরাম দেন প্রভু।[৪]

چوں نبوت شد قريب اے نيكخو - گشت تنها همي مرغوب او
چوں چهل شد سال عمرش اي جوان – يـ

হে সত্যান্বেষী! নবুয়্যত প্রাপ্তির পূর্বে
তিনি একাকীত্ব ভালোবাসতেন।
হে যুবক যখন তার চল্লিশ বছর হলো পূর্ণ
সন্দেহ নেই যে, নবুয়্যত পেয়ে হলেন ধন্য।[৫]

– نور بيرون ازدهانش بـ
خوانده اور هم نمود - ليك دورا ز صدق ا هرگز نبود

হাসলে কথা বললে, তাঁর মুখ থেকে,
নূরের জ্যোতি বেরুত।
ঠাট্টা করতেন হাসতেন,
ছিল না তা সত্য ঘটনা ব্যতীত।[৬]

هم طعام يش اوتسبيح –

খাদ্য ও তার সামনে তাসবীহ পাঠ করেছে
উপস্থিত সবাই কৌতূহলী হয়ে শুনেছে।[৭]

কাব্যের শেষে মুফতী সাহেব লিখেন- আমি কবিতা বিদ্যায় একদম অনবিজ্ঞ। সূক্ষ্ম কবিতা ছন্দবদ্ধ করণে যথেষ্ট অনবিজ্ঞ,তারপরও আমি সহৃদয় প্রেমিক ভক্ত, আমার চৌকস ভালোবাসা পূর্ণ সত্য।[৮]

---

১. ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মদ, মুফতী, *মসনবীয়ে দিল পযীর*, চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, ১৪০৪ হি. পৃ.
২. ***মেশকাত শরীফ,*** নূর মুহাম্মদ আজমী (অনূ) প্রাগুক্ত, খ. ১ম, পৃ.১৮৫, হাদীস নং-১৬৮।
৩. *মসনবীয়ে দিল পযীর*, পৃ. ৪-৫
৪-৮. ঐ, পৃ. ৮, ১৩, ২০, ৪৮, ১০৫।

৭. ফয়যে বে পায়াঁ উর্দু শরহে গুলিস্তাঁ
فيض بے پاياں اردو شرح گلستان

মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লা র. রচিত বিখ্যাত গুলিস্তাঁ কিতাবের ব্যাখ্যা গ্রন্থের নাম ফয়যে বে পায়াঁ। মূল গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪৬। প্রকাশ করেছে কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী চট্টগ্রাম। প্রকাশকাল অজ্ঞাত। বিশ্ববিখ্যাত লেখক, সাধক, দরবেশ ও কবি শেখ সা'দী র. রচিত গুলিস্তাঁ গ্রন্থের ব্যাখ্যা ও উর্দু অনুবাদ করেছেন এটি শেখ সা'দীর গুলিস্তাঁ গ্রন্থটি মূলত তাসাউফ বিষয়ক। এর রচনাকাল ৬৫৬ হি.। গল্প ও উপদেশমূলক ঘটনার আকারে নৈতিক বিষয়াবলী এ কাব্যগ্রন্থে খুবই হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গীতে বর্ণিত হয়েছে। শেখ সা'দী র.গুলিস্তাঁ গ্রন্থকে জান্নাতের বাগানের সাথে তুলনা করে বলেন- জান্নাত যেমন আট স্তরে বিভক্ত, সে হিসেবে আমি গুলিস্তাঁ কিতাবকে আট অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি। প্রথম অধ্যায় বাদশাহদের কাহিনী, দ্বিতীয় অধ্যায় দরবেশগণের চরিত্র, তৃতীয় অধ্যায় ধৈর্য্যের ফযীলত, চতুর্থ অধ্যায় নীরবতা অবলম্বনের উপকারিতা, পঞ্চম অধ্যায় যৌবনকাল ও ইশক ভালোবাসা সম্বন্ধে, ষষ্ঠ অধ্যায় দূর্বলতা ও বার্ধক্য সময়ের কাহিনী, সপ্তম অধ্যায় শিক্ষা দীক্ষার প্রতিক্রিয়া এবং অষ্টম অধ্যায় আদব ও সাহচর্যের

পদ্ধতি সম্বন্ধে । শেখ সা'দী র. প্রতিটি অধ্যায়ে বিভিন্ন ঘটনা উপস্থাপন করে নসীহত প্রদান করেছেন। মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ র. উর্দু ভাষায় পুরো গুলিস্তাঁ গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা সংযোজন করেছেন। তাঁর ব্যাখ্যা ও অনুবাদ যুগোপযোগী এবং যুগের চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়েছে। সে সময়ে এবং বর্তমানেও মাদ্রাসাসমূহে উর্দু ভাষায় শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। মূল গ্রন্থে ফার্সী কাব্যের সাথে তার উর্দু অনুবাদ ও ব্যাখ্যা যুক্ত রয়েছে।[1]

৮. ফয়যে বে কারাঁ মুকাম্মাল শরহে উর্দু বোস্তাঁ

فیض بے کران مکمل شرح اردو بوستان

শেখ সা'দীর বিখ্যাত বোস্তাঁ গ্রন্থের ব্যাখ্যা, অনুবাদ ও টীকা, গ্রন্থের নাম ***ফয়যে বে কারাঁ মুকাম্মাল শরহে উর্দু বোস্তাঁ।*** মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ রচিত এ ব্যাখ্যাগ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪৪। এর প্রকাশকাল অজ্ঞাত। প্রকাশ করেছে কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী চট্টগ্রাম। এ ব্যাখ্যা গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় রচিত। বিখ্যাত সাধক লেখক শেখ সা'দী র. এর রচিত বোস্তাঁ গ্রন্থটি তাসাউফ বিষয়ক ও উপদেশমূলক । এর রচনাকাল ৬৫৫ হি.। গল্প ও উপদেশমূলক ঘটনার আকারে নৈতিক বিষয়াবলী হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গীতে এ কাব্য গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে। শেখ সা'দী বলেন- শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য এ গ্রন্থকে আমি দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি। প্রথম অধ্যায় ন্যায় বিচার, রাজ্য পরিচালনার পদ্ধতি, আল্লাহ ভীতি ও মানব সেবা সম্বন্ধে, দ্বিতীয় অধ্যায় উত্তম ব্যবহার ও ইহসান সম্বন্ধে, যাতে বিত্তশালীরা আল্লাহর ইহসানের শুকরিয়া আদায় করেন এবং গরীবদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করেন, তৃতীয় অধ্যায় প্রেম ও ইশক সম্বন্ধে, চতুর্থ অধ্যায় বিনয় সম্বন্ধে, পঞ্চম অধ্যায় আল্লাহতাআলার ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা বিষয়ে, ষষ্ঠ অধ্যায় ধৈর্য্য অবলম্বন ও অল্পে তুষ্ট থাকা সম্বন্ধে, সপ্তম অধ্যায় চরিত্র সংশোধন সম্বন্ধে, অষ্টম অধ্যায় সুস্থতার জন্য শুকরিয়া জ্ঞাপন করা, নবম অধ্যায় তাওবা ও সরল পথ প্রাপ্তি, দশম অধ্যায় আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা সম্বন্ধে। শেখ সা'দী র. প্রতিটি অধ্যায়ে বিভিন্ন শিক্ষামূলক ঘটনা উপস্থাপন করেছেন এবং সেগুলো থেকে উপদেশ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বেশ কয়েকজন ন্যায় বিচারক, জননন্দিত শাসকের কথা উল্লেখ করেছেন আবার জননিন্দিত ও ধিকৃত রাজা বাদশাহদের করুণ পরিণতির কথা তুলে ধরেছেন। মুফতী ফয়যুল্লাহ র. উর্দু ভাষায় এ গ্রন্থের প্রয়োজনমত ব্যাখ্যা করেছেন, উর্দুতে অনুবাদ করেছেন ও টীকা সংযোজন করেছেন। তাঁর এ ব্যাখ্যা ও টীকা ছাত্র, শিক্ষক, পাঠক সবার নিকট সমাদৃত হয়েছে। তাঁর ব্যাখ্যা ও টীকা মূল কাব্যের সাথে যুক্ত রয়েছে।[2]

---

১. ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মদ, মুফতী, *ফয়যে বে পায়াঁ উর্দু শরহে গুলিস্তাঁ,* চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, তা. বি. পৃ. ২-২৪৮

২. ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মদ, মুফতী, *ফয়যে বে কারাঁ মুকাম্মাল শরহে উর্দু বোস্তাঁ* , চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, তা. বি. পৃ. ১-১৪৪

৯. ফয়যে সাত্তার হাশিয়া আত্তার فیض ستار حاشیۂ عطار رح

এটা মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ রচিত অনুবাদ গ্রন্থ। আল্লামা শেখ ফরীদ উদ্দীন আত্তার র. রচিত *পান্দেনামা* پند نامه গ্রন্থের উর্দু অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও টীকার সংযোজন করেছেন তিনি। প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী চট্টগ্রাম। প্রকাশকাল অজ্ঞাত। গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৪। মূল গ্রন্থের ভাষা ফার্সী। কাব্যে রচিত ফরীদ উদ্দীন আত্তার র. পান্দেনামা গ্রন্থটিকে অনেকগুলো শিরোনামে বিভক্ত করেছেন। যেমন- আল্লাহ তাআলার প্রশংসা, সায়্যিদুল মুরসালীন সা. - এর না'ত, আয়িম্মা -ই দীন, মুজতাহিদ ইমামগণের ফযীলত, দুআ কবূলকারীর দরবারে মুনাজাত,নফসে আম্মারার বিরুদ্ধাচরণ করা, নীরব থাকার ফায়দা, খাছ আমলের বর্ণনা, রাজা-বাদশাহদের চরিত্র, উত্তম আখলাক, ধ্বংসে লিপ্তকারী চার বস্তু, সৌভাগ্যবানদের আলোচনা, নিরাপত্তা লাভের মাধ্যম, বিনয় এবং দরবেশগণের সান্নিধ্য লাভের আলোচনা, আত্মপ্রশংসা-আত্মপ্রবঞ্চনা ত্যাগ করার উপদেশ, যিক্‌রের ফযীলত, নিন্দনীয় চরিত্র, রাগ ও ক্রোধের নিন্দা, রাজ্য ধ্বংস হওয়ার কারণ, দুশমনদের থেকে সতর্ক থাকার আলোচনা, আল্লাহর মারিফাত

লাভের আলোচনা, দুনিয়ার নিন্দা, সেবা কর্মের উপকারিতা, সদকা করা, মেহমানকে সম্মান করা, আহম্মকের নিদর্শন, কৃপণের নিদর্শন, মুনাফিকের নিদর্শন, মুত্তাকী ও আহলে জান্নাতের নিদর্শন, ধৈর্যের ফায়দা, ইত্যাদি বিষয় সম্বলিত পান্দেনামা গ্রন্থটি। গ্রন্থের শেষে লেখক খাতিমা সংযোজন করেছেন। মুফতী সাহেব এ গ্রন্থের উর্দু অনুবাদ, ব্যাখ্যা, প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজন করে উর্দুভাষী পাঠক, ছাত্র শিক্ষকদের জন্য কিতাবটিকে বোধগম্য ও সহজ করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর এ যোগ্যতা ও সময়োপযুক্ত কর্মের জন্য তিনি সত্যি প্রশংসার যোগ্য। মুফতী সাহেব এ গ্রন্থের শেষে পুত্রের জন্য প্রদেয় লোকমান হাকিমের একশ' উপদেশকে সংযোজন করেছেন।[১]

১০. ফয়যে বে বাহা শরহে কারীমা فیض بے بها شرح كريما

শেখ সা'দী র. রচিত বিখ্যাত কারীমা গ্রন্থের ব্যাখ্যা ও অনুবাদ গ্রন্থের নাম ফয়যে বে বাহা শরহে কারীমা। এ গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে কুতুবখানা ফয়যিয়া। প্রকাশকাল অজ্ঞাত। মূল গ্রন্থের ভাষা ফার্সী। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০। মূল গ্রন্থে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে ফার্সী কাব্যে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা, রাসূলুল্লাহ সা.-এর না'ত, আল্লাহর দয়া প্রশংসা, দানশীলতার পরিচয়, কৃপণতার নিন্দা, বিনয়ের প্রশংসা, অহংকারের নিন্দা, ইল্‌মের ফযীলত, মূর্খদের সান্নিধ্য হতে দূরে থাকা, জুলুম ও লোভের নিন্দা, আল্লাহ তা'আলার ইবাদত-বন্দেগীর পরিচয়, শয়তান, শরাব, ইশকের নিন্দা, কৃতজ্ঞতার পরিচয়, মিথ্যা বলার নিন্দা, আল্লাহর কুদরতের বিবরণ, মাখলুক থেকে কোন কিছু প্রাপ্তির আশা করা যাবে না ইত্যাদির শিরোনাম ব্যবহার করেছেন।[২]

১১. মসনবীয়ে দালাবীয مثنوي دلاويز

মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ রচিত মসনবীয়ে দালাবীয ৬০ ছন্দের একটি কাব্য। এ কাব্যের ভাষা ফার্সী। রচনাকাল অজ্ঞাত। প্রকাশ করেছে কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী চট্টগ্রাম। প্রকাশক মৌলবী মুহাম্মদ হুসাইন ফয়যী। প্রকাশকাল অজ্ঞাত। এটি মাজমুআ রাসাইলে ফয়যিয়া তৃতীয় খন্ডের অন্তর্ভূক্ত। এর উর্দু অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেছেন মুফতী ইযহারুল ইসলাম চৌধুরী। মূল কবিতার সাথে উর্দু অনুবাদ ও ব্যাখ্যা যুক্ত রয়েছে। এ কাব্যে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা, মহানবী সা.-এর উপর দরূদ পাঠের পর কিছু উপদেশ ব্যক্ত করেছেন। উপদেশসমূহকে তিনি আত্মার জন্য আবেহায়াত আখ্যায়িত করেছেন। এর মাধ্যমে জীবনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা যাবে এবং জান্নাতের স্বাদ অনুভব করা সম্ভব হবে। প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহর যিক্‌রে ব্যয় করার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। দীন ও শরীআতের বিষয়ে কারো আনুগত্য করা যাবে না। তাহলে ধ্বংস অনিবার্য।[৩]

১. ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মদ, মুফতী, *ফয়যে সাত্তার*, চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, তা. বি. পৃ. ১-৬৪।
২. ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মদ, মুফতী, *ফয়যে বে বাহা শরহে কারীমা*, চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, তা. বি. পৃ. ১-৩০
৩. ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মদ, মুফতী মসনবীয়ে দালাবীয, চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, তা. বি. পৃ. ২-১৫।

চ. পত্র রচনা

যে কোন মনীষীর চিঠিপত্র ও ওয়ায নসীহতের সংকলনসমূহ ঐ মনীষীর ধ্যান- ধারণা, চিন্তা- চেতনা, আবেগ, অনুভূতি, জ্ঞান, প্রজ্ঞার পরিচয় বহন করে। মুফতী সাহেব কী পরিমাণ চিঠি-পত্র রচনা করেছিলেন তার সঠিক পরিসংখ্যান করা কঠিন। তিনি ছাত্র, শিষ্য, শিক্ষক, আত্মীয় স্বজন- সুহৃদ অন্যান্য মনীষীগণের নিকট ১৬০টিরও বেশি পত্র রচনা করেছিলেন বলে অনুসন্ধান পাওয়া গেছে এবং ছাত্র-শিক্ষক অন্যান্যদের নিকট হতে কি পরিমাণ পত্র প্রাপ্ত হয়েছিলেন তার পরিসংখ্যান করা কঠিন। কারণ ফাতাওয়া জানতে চেয়ে তাঁর নিকট প্রেরিত পত্রের সংখ্যা কয়েক হাজার। তবে তাঁর রচিত ও প্রেরিত পত্রের সংখ্যা অনুমান ১৮৩টি। এ তথ্য উদ্ধার করেছেন মুফতী সাহেবের ঘনিষ্ট আত্মীয় শিষ্য মুফতী ইযহারুল ইসলাম চৌধুরী। তাঁর সংকলিত ***মাকতুবাতে মুফতী আযম*** শীর্ষক গ্রন্থে মুফতী সাহেবের ১৮৩টি পত্রের উল্লেখ রয়েছে। গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী চট্টগ্রাম। প্রকাশক মৌলবী মুহাম্মদ কাসিম ফয়যী। প্রকাশকাল অজ্ঞাত। গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫২। মুফতী সাহেবের রচিত পত্রের এ সংখ্যাই যে চূড়ান্ত এ কথা বলা যাবে না। এর বাইরেও তাঁর অনেক পত্র থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। হাটহাজারী মাদ্রাসার সকল

ছাত্রের উদ্দেশ্যে ১০টি অসীয়ত সম্বলিত একটি পত্র তিনি রচনা করেছিলেন ১৩৫৭ হি. জিলকদ মাসে। মুফতী সাহেবের প্রিয় ছাত্র ও শিষ্য ব্যারিস্টার মাওলানা সানাউল্লাহর উদ্দেশ্যে তিনি ১২টি পত্র রচনা করেছিলেন ১৩৫৯ হি.। জামাতা মৌলবী কাসিম ফয়যীর নামে ১৮টি পত্র রচনা করেছিলেন- ১২-৪-১৩৫৯ হি. এবং ৯ শাবান ১৩৫৯ হি.। কারী মুহাম্মদ আরিফের নামে একটি পত্র প্রেরণ করেছিলেন ১৩৫৯ হি. ১৩ জিলকদ। মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাবের নামে একটি পত্র রচনা করেছিলেন তারিখ বিহীন। কারী মকবুল আহমদের নামে একটি পত্র রচনা করেছিলেন তারিখ বিহীন। মুফতী সাহেব হাটহাজারী মাদ্রাসা ত্যাগ করার পর সেখানে পুনরায় দর্স দানের জন্য ছাত্রদের আবেদনের প্রেক্ষিতে একটি দীর্ঘ পত্র রচনা করেছিলেন।[১]

মুফতী সাহেব অপর একটি পত্র লিখেছিলেন ছাত্র ইউসুফ ইসলামাবাদীর উদ্দেশ্যে ২৬ জমাদিউল উলা ১৩৮৪ হি.। তার নামে অপর একটি পত্র লিখেছিলেন ৬ রবিউল আখির ১৩৮৪ হি.। ছাত্র খলীলুর রহমানের নামে অপর একটি পত্র লিখেছিলেন তারিখ বিহীন। মুহাম্মদ আমিনের নামে একটি পত্র লিখেছিলেন সন তারিখ ছাড়া। অপর একটি পত্র লিখেছিলেন আব্দুল গণির নিকট। মাওলানা মুহাম্মদ ঈসার নিকট বিভিন্ন সময় ৭টি পত্র লিখেছেন। একটি পত্র লিখেছিলেন মাওলানা মুয্যাম্মিলের নামে । ২৮টি পত্র লিখেছিলেন আব্দুর রায্যাকের নামে। এগুলোর রচনাকাল ১৩৭৯-১৩৯৫ হি.। হাফেজ আবূ জাফরের নামে একটি পত্র লিখেছিলেন ২৬ রবিউস সানী ১৩৯৫ হি.। মাওলানা জিয়াউল হকের নামে একটি পত্র রচনা করেছিলেন ২৫ শাওয়াল ১৩৯৩ হি.। মাওলানা নূর আহমদের নামে তিনটি পত্র রচনা করেছিলেন ১০ শাওয়াল ১৩৮৪ হি., ২৬ রমযান ১৩৮৪ হি., ২১ মহররম ১৩৮৪ হি.। জনৈক ৩ শিষ্যের নামে তারিখ উল্লেখ ব্যতিত তিনটি পত্র রচনা করেছিলেন। কন্যা রহিমা খাতুনের উদ্দেশ্যে ৬টি পত্র লিখেছিলেন ৬ শাওয়াল ১৩৬৭ হি., ২১ মহররম ১৩৮৬ হি.। কন্যাদ্বয়ের উদ্দেশ্যে ২০টি উপদেশ সম্বলিত একটি পত্র লিখেছিলেন ১০ জিলহজ্ব ১৩৫৯ হি.। মাওলানা হাবীবুল্লাহর নামে তিনটি পত্র লিখেছিলেন। ২টি পত্র লিখেছিলেন হাটহাজারী মাদ্রাসার প্রধানের নিকট চাকুরী হতে অব্যাহিত চেয়ে। হাটহাজারী মাদ্রাসার মুহতামিম হযরতের নিকট একটি পত্র লিখেছিলেন অর্থনৈতিক সাহায্যের আবেদন জানিয়ে সন তারিখ উল্লেখ ব্যতিত। হাটহাজারী মাদ্রাসার মজলিসে শূরার নিকট তিনটি পত্র রচনা করেছিলেন ১৪ জমাদিউল আখির ১৩৮৬ হি., সফর ১৩৮৮হি.। ছাত্রজীবনে পিতার নিকট একটি পত্র রচনা করেছিলেন। কাযী আযীয আহমদ চৌধুরীর নামে ৮টি পত্র লিখেছিলেন। এগুলোর রচনাকাল-১৩৮৬ হি. -১৩৯০ হি.। নাতিন জামাই মুফতী ইযহারুল ইসলাম চৌধুরীর নামে বিভিন্ন সময় ২৫টি পত্র লিখেছেন। এ পত্রগুলোর রচনাকাল ১৩৮৬ হি.-১৩৮৯ হি.।[২] নাতি মৌলবী হুসাইনের নামে রচনা করেছিলেন ৪টি পত্র। ২ রজব <u>১৩৮৫ হি. ও ১৫ জিলকদ ১৩৮৭ হি.। বড় নাতিন মুহসিনা</u> বেগমের নামে ৪টি পত্র লিখেছিলেন

১. *মাশায়েখে চাটগাম*, পৃ. ৩৭১-৩৭৩

২. ঐ, পৃ. ১০৪-১২০; *মাজমুআ রাসাইল ফয়যিয়া*, খ. ৩য়, পৃ. ১০৪-১২০।

২২ সফর ১৩৮৭ হি., ২৩ শাবান ১৩৮৮ হি. । নাতিন ফাতিমার নামে প্রেরণ করেছিলেন ২টি পত্র ৩০ জমাদিউল উলা ১৩৮৫ হি., ৩০ জমাদিউল আখির ১৩৮৬ হি.। ডা. বজলুর রহমানের নামে ১৩ রজব ১৩৮৮ হি. একটি পত্র রচনা করেছিলেন। হাজী নিয়ামত আলী সওদাগরের নামে একটি পত্র রচনা করেছিলেন ১৫ শাওয়াল ১৩৯১ হি.। জনাব আদালত খানের নামে একটি পত্র প্রেরণ করেছিলেন ১৩ মহররম ১৩৮৩ হি.। একটি পত্র লিখেছিলেন আব্দুল ওয়াহহাবের নিকট ২৮ রজব ১৩৬৯হি.। দেওবন্দের মুফতী ইবরাহীম বলিয়াবী র. নিকট ১৩টি পত্র রচনা করেছেন- ১ জমাদিউল আখির ১৩৮৪ হি. ,১২ মহররম ১৩৮৫ হি., ২৫ সফর, ১৩৮৫ হি., ২৭ রবিউল আউয়াল ১৩৮৫ হি.। একটি পত্র রচনা করেছিলেন মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী র. নিকট ২ রবিউল আখির ১৩৬৬ হি.। তিনটি পত্র রচনা করেছিলেন মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী র.-এর নিকট-৪ জিলকদ ১৩৮০হি., ২৫ জমাদিউল আউয়াল ১৩৮৪ হি., জমাদিউল আউয়াল ১৩৮৪ হি.। পাকিস্তানের সরকার বাহাদুর আইয়ূব খানের নিকট তিনটি পত্র লিখেছিলেন- ১৪ রমযান ১৩৮৪ হি. ২০ মহররম ১৩৮৫ হি., ১৯ জমাদিউল আখির ১৩৮৫ হি.। জনৈক জজ সাহেবের নামে একটি পত্র রচনা করেছিলেন ২৩ শাওয়াল ১৩৮৯ হি.। মুফতী

আযীযূল হকের নামে একটি পত্র লিখেছিলেন তারিখ উল্লেখ বিহীন। নদওয়াতুল উলামার নিকট একটি পত্র রচনা করেছিলেন তারিখ বিহীন। [১]

মুফতী সাহেব উল্লেখযোগ্য মনীষীগণের নিকট হতে বেশ কিছু পত্র প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যেমন: মুফতী ইবরাহীম বলিয়াবী র. এর নিকট হতে ৪টি পত্র প্রাপ্ত হয়েছিলেন- ৪ রবিউল আউয়াল ১৩৮৪ হি., ২২ জমাদিউল আখির ১৩৮৪ হি., ১১ সফর ১৩৮৫ হি.। শামছুল হক ফরিদপুরী র. এর নিকট হতে দুটি পত্র প্রাপ্ত হয়েছিলেন ২৬ শাওয়াল ১৩৮০ হি.। মৌলবী কাসিম ফয়যীর নিকট হতে একটি পত্র প্রাপ্ত হয়েছিলেন ৮ শাবান ১৩৬৭ হি.। পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি আইয়ূব খানের ডেপুটি সেক্রেটারী আব্দুল ওয়াহিদ-এর নিকট হতে একটি পত্র প্রাপ্ত হয়েছিলেন।[২]

মুফতী সাহেবের নিকট আগত এবং তাঁর রচিত চিঠিপত্রগুলো পর্যালোচনা করলে পরিষ্কারভাবে অনুভব হয় যে,নিজের জ্ঞান, প্রজ্ঞা, ধীশক্তি, চিন্তা শক্তি ও অধ্যয়নের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানের প্রাচুর্য, জ্ঞানের শুভ পরিণতি ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে পাকাপোক্ত করতে চেয়েছেন এবং নিজের আত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তি আরও বাড়াতে চেয়েছেন। মুফতী সাহেব কি পরিমাণ চিঠিপত্র লিখেছিলেন এবং অন্যের নিকট হতে প্রাপ্ত হয়েছিলেন তার সঠিক পরিসংখ্যান উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। মুফতী সাহেব আলিম, মাশাইখ, উস্তাদগণের সাথে পত্র যোগাযোগ বজায় রাখতেন। মুরুব্বীগণের নিকট কোন বিষয় জানতে চেয়ে পত্র লিখতেন এবং তাদের পক্ষ থেকেও প্রতিনিয়ত পত্র প্রাপ্ত হতেন। তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ কিছু পত্রের অনুসন্ধান লাভ করা গেছে। সেগুলো অভিসন্দর্ভে পত্রস্থ করা হলো:

শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী র. -এর সাগরেদ মাওলানা আব্দুর রহমান দেওয়ানপুরীর (চট্টগ্রাম) বর্ণনা, আমি যখন দ্বিতীয়বার শায়খুল ইসলামের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে দেওবন্দ গেলাম, একদিন আসর নামাযের পর আল্লামা ইব্রাহীম বলিয়াবী র. আমার হাত ধরলেন এবং অভ্যাস অনুযায়ী হাঁটতে হাঁটতে বললেন, তোমাদের মুফতী ফয়যুল্লাহর একটি পত্র আমার হস্তগত হয়েছে। তিনি তা পাঠ করে শুনালেন এবং বললেন, মুফতী ফয়যুল্লাহ বাংলা মুলুকে জন্মগ্রহণ করেছেন, বাঙালীরা তাঁকে মূল্যায়ন করতে পারেনি, তাঁর মতো মনীষী দেওবন্দে জন্ম নিলে অসামান্য মর্যাদা লাভ করতেন। তাঁর শান শওকত বহুগুণ বেড়ে যেত।

ঐ পত্রের উত্তরে আল্লামা ইব্রাহীম বলিয়াবী লিখেন,

বখেদমতে জনাব মাওলানা মুফতী ফয়যুল্লাহ সাহেব
সেরপুরুস্ত, মাদ্রাসা মুঈনুল ইসলাম, হাটহাজারী
আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ।

১-২. ইযহারুল ইসলাম চৌধুরী, মাকতুবাতে মুফতী আযম, চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি. পৃ. ১-১৫২

মুহতারাম, আশা করি মেজাজ, তবিয়ত ভালই আছে। আপনার চিঠি পাঠে খুব প্রভাবিত হলাম। আমি সর্বদা আপনার জন্য দুআ করি। আপনার হাল অবস্থা সম্বন্ধে আমাকে সর্বদা অবগত করাবেন। আপনার উসিলায় ঐ এলাকায় শায়খুল হিন্দের ফয়েয ও তরীকতের সিলসিলা জারী আছে। এখন ভাববার বিষয় হল এ ধারাবাহিকতা আপনার মৃত্যুর পরও অব্যাহত রাখা। আপনি কি এমন কিছু সদস্য তৈরী করতে পেরেছেন, যারা আপনার পর এ খিদমত চালু রাখবে? আশা করি অবশ্যই অবগত করাবেন। [১]

ফক্বত ওয়াসসালাম
মুহাম্মদ ইব্রাহীম বলিয়াবী, দেওবন্দ, ২২
জমাদিউস সানী,১৩৮৪ হিজরী।

মুফতী ফয়যুল্লাহর অপর এক পত্রের প্রেক্ষিতে ইব্রাহীম বলিয়াবী র. দেওবন্দ হতে লিখেন,

মুহতারাম,
মাওলানা মুফতী ফয়যুল্লাহ সাহেব
সেরপুরুস্ত, মাদ্রাসা মুঈনুল ইসলাম, হাটহাজারী

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ্।
মুহতারাম, মুকাররাম, আল্লাহ তাআলার অধিক দুআ বর্ষিত হোক আপনার জন্য। আমিও অনেক দুআ করছি। আপনার সাথে আমার সম্পর্ক সাধারণ নয় সুতরাং আপনি চিঠি পত্রের আদান প্রদান চালু রাখুন বা না রাখুন তারপরও আপনার সাথে আমার সম্পর্কের ঘাটতি হবে না। আপনার সুস্থতার বিষয়ে সর্বদা ব্যাকুল থাকি। আল্লাহর দরবারে দুআ করি জীবনের আবশ্যকীয় ও প্রয়োজনীয় কর্তব্য
সমূহ আদায়ে তিনি যেন আপনাকে কারো মুহতাজ না করেন। আপনি এতটুকু শক্তি অর্জন করুন যে, আপনার দ্বারা যে সব লোক ফয়েয প্রাপ্ত হয়েছেন তা যেন হ্রাস না পায়। আশা করি দুআয় এ বান্দাকে শরীক করবেন এবং নিজের ভাল মন্দ জানিয়ে দুশ্চিন্তা মুক্ত করবেন।[২]

ওয়াসসালাম
ইব্রাহীম
১ মহররম, ১৩৮৫ হিজরী।

অপর এক পত্রের প্রেক্ষিতে আল্লামা ইব্রাহীম বলিয়াবী লিখেন,
মুহতারাম মুফতী সাহেব
আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ ওয়াবারাকাতুহ
আপনার সুস্থতার জন্য দু'আ করছি। আপনি তো নিজেই শান্তির ঐ দর্শন সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর খাস বান্দাদেরকে কষ্টের আকারে পৌঁছে দিয়ে থাকেন।[৩]

ওয়াসসালাম
মুহাম্মদ ইব্রাহীম
২৭ মহররম, ১৩৮৫ হিজরী।

অপর এক পত্রের জবাবে আল্লামা মুহাম্মদ ইব্রাহীম বলিয়াবী লিখেন,
বান্দা মুকাররাম
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ
ইতোপূর্বে যে পত্র এসেছিল সেটার উত্তর পাঠিয়েছি। আশা করি পেয়ে থাকবেন। আমার প্রতি আপনি অসম্ভব মহব্বত রাখেন। আমিও আপনার প্রতি সেরকম মহব্বত রাখি। তাই আপনার ভালমন্দ জানার উদ্দেশে এই পত্র লিখছি। আশা করি অতীতের চেয়ে ভাল আছেন। আপনার মত আল্লাহ ওয়ালাদের প্রতিটি নিশ্বাসকে ভাল এবং প্রতিটি পরীক্ষাকে নিয়ামত মনে করি। আমাদের মত বাহ্যিক দৃষ্টিসম্পন্নরা খামাকা ভাল থাকার জন্য দৌড় ঝাঁপ দেই। অথচ বাতিনী দৃষ্টি সম্পন্নগণ বিষয়টিকে নিয়ামত মনে করেন।

১-৩.নোমান, পৃ. ২৮-৩০।

আশা করি ভাল মন্দ সম্বন্ধে জানাবেন ও আমাকে আপনার দুআর অন্তর্ভূক্ত করবেন।[১]

মুহাম্মদ ইব্রাহীম বলিয়াবী
১১ই সফর ১৩৮৫ হিজরী।

মুফতী ফয়যুল্লাহ হাটহাজারী মাদ্রাসায় অবস্থানকালীন সময়ে আল্লামা ইব্রাহীম বলিয়াবীর নিকট একটি পত্র লিখেছিলেন। পত্রের ভাষা ছিল ফার্সী। সন তারিখ উল্লেখ নেই পত্রে তাঁর যৌবনের পরিশ্রমের দিনগুলোর বিবরণ, সে সময়কার তাঁর আর্থিক সংকটের কথা ফুটে ওঠেছে। পত্রের ভাষ্য ছিল এমন- যৌবনের শক্তি থাকাবস্থায় অতিরিক্ত পরিশ্রম করেছি, কষ্ট উঠিয়েছি। মাদ্রাসায় সর্বদা তা'লীম, তাদরীসে লিপ্ত ছিলাম। প্রয়োজন ব্যতীত কখনও সবক নাগা করিনি। মাদ্রাসার বাইরের সময়টাতে ছাত্ররা বিভিন্ন কিতাব আমার নিকট পড়ে নিত । আশে পাশে ওয়ায-নসীহতের জন্য যেতে হয়। বাহন না পেয়ে দূর দূরান্তের পথ পায়ে হেঁটে যাই। ছুটির দিনসমূহে অর্ধেক দিন ছাত্রদের কিতাব পড়াই। বাকি অর্ধেক দিন আশে পাশে ওয়ায-নসীহত করি। এক রমযানের ছুটিতে ড. মাওলানা সানাউল্লাহকে তাফসীরে জালালাইন

পুরোটা পড়িয়েছি। এছাড়া অধিক পরিমাণে কিতাব মুতালাআ, ফাতাওয়া ফারাইয লিখি। মোট কথা সময় এতটুকু বেকার যায় না। ঠিকমত খাওয়া, নাওয়া, ঘুম কোনটাই হয়না। উস্তাদ ও আকাবির কেউ এ বিষয়ে আমাকে সতর্ক করেননি। এছাড়া অভাব অনটন, দারিদ্রতা, সবসময় এত প্রকটভাবে লেগে আছে যে, খাওয়া, পরার সামর্থ হারিয়ে ফেলেছি। তকদীরে যা আছে তা নিয়েই চলছি। এছাড়াতো অন্য কোন উপায় নেই। দুনিয়াতে যেহেতু এসেছি তাই মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই। যদি ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করতে পারি তবে খোশনসীব। এরপর তিনি ফার্সীতে কবিতার কয়েকটি লাইন লিখেন, যার মর্মার্থ:

কবর পর্যন্তই ঈমানকে সহী সালামতে নিয়ে যেতে চাই। এটাই যেন আমার শেষ অন্বেষণ হয়। দুআ করবেন আল্লাহ যেন মওত, আখিরাত, আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রচণ্ড মহব্বত এবং দুনিয়ার প্রতি অনীহা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দেন।[২] -ফয়যুল্লাহ ।

ঈদের চাঁদ দেখা বিষয়ে তৎকালীন মিশরের আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শায়খের একটি ফাতাওয়া নিয়ে সারা বিশ্বের মুসলিম পণ্ডিতগণের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এর ঢেউ পাকিস্তানেও আছড়ে পড়ে। উপমহাদেশের আলিমগণ ঐ বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। সে প্রেক্ষিতে সদর সাহেব হুজুর মুফতী সাহেবের নিকট পত্র লিখেন।

প্রেরক, শামছুল হক ফরিদপুরী
২৬ শাওয়াল ১৩৮০ হি.
প্রাপক, জনাব মুহতামিম সাহেব ও
জনাব মুফতী আযম পাকিস্তান
হাটহাজারী মাদ্রাসা।
আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

আল আযহারের শায়খ ঈদের নামাযের চাঁদ দেখা বিষয়ে যে প্রলাপ বকেছেন, যে বিষয়ে বিভিন্ন সংবাদপত্রের মাধ্যমে আপনি অবগত হয়েছেন। যার জবাব মাওলানা ইহতেশামুল হক থানবী র. কিছুটা দিয়েছেন। যা দৈনিক জং পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। সুতরাং পূর্ব পাকিস্তানের মুফতী আযমের পক্ষ হতে এর একটি তথ্যবহুল বিশ্লেষণমূলক উত্তর আসা চাই। আমার ধারণামতে ইখতিলাফি মাতালি' বিষয়ে আল্লামা যায়লাঈ র. এর বিশ্লেষণকে সর্বসম্মত ফাতাওয়া হিসেবে গ্রহণ করা আলিম সমাজের কর্তব্য। এটা এক ভয়ানক ফিতনা। এ গ্রন্থকেই এ ফিতনা থেকে উত্তরণের রাস্তা মনে হয়।[৩]

ওয়াল্লাহু আ'লাম
আহ্‌কার শামছুল হক, উফিয়া আনহু।

১-৩. ঐ, পৃ. ২৯-৩০,৪৭; *মাকতুবাতে মুফতী আযম*, পৃ. ২৬-৩৬

শামছুল হক ফরিদপুরী র. এর পত্রের উত্তরে মুফতী সাহেব লিখেন,

উত্তর বনাম শামছুল হক সাহেব ফরিদপুরী

আল্লাহ তাআলার প্রশংসা এবং দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী সা.-এর উপর। অত:পর কথা হল এটা শেষ জামানা, কিয়ামত নিকটবর্তী সময়, ফেতনা, ফাসাদ, নাস্তিকতা, ধর্মদ্রোহীতা ও স্বেচ্ছাচারিতার যুগ। নিজস্ব অভিমত, নিজস্ব পছন্দ, মনের মধ্যে ঝেঁকে বসেছে, প্রভাব বিস্তার করেছে। ইল্‌মের দাবীদারদের অধিকাংশ এবং দ্বীন ও মিল্লাতের অনুসরণীয় নেতৃস্থানীয়দের অধিকাংশ এবং আহলে ইসলামের প্রায় সবাই দ্বীন, মাযহাব, কুরআন, হাদীস, দ্বীনি বিধানকে নিজেদের চাহিদা, নিজেদের মতামতের অনুগত বানিয়ে নিয়েছেন। এমনকি رأيتم هوي متبعا و دينا مؤثرة و اعجاب كل ذي رأي برائه এর ন্যায় পরিনত হয়েছে। আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। সম্প্রতি জামিআ আযহারের ভাইস চ্যান্সেলর শায়খে আযহার এর একটি বিবৃতি প্রচার হয়েছে। তিনি বলেছেন, পৃথিবীতে যদি কোন এক শহরে চাঁদ দেখা যায়, তাহলে এটা অত্যাবশ্যক হয়ে যায় যে, সারা পৃথিবীতে একই দিনে ঈদ পালন করা। তিনি এও বলেছেন, যখই কোন মুসলিম রাষ্ট্রে চাঁদ দেখা যাবে তখন এ রাষ্ট্রের কর্তব্য

হবে টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, রেডিও ইত্যাদির মাধ্যমে অন্যান্য দেশবাসীকে জানানো'। আশ্চর্যের বিষয় কোন দলীল প্রমান ছাড়াই এত বড় একটি মাস'আলা তিনি প্রচার করলেন। এটা শুধু দাবীর উপর দাবী। এধরনের দাবী লজ্জাষ্কর। শেখ সাদী সিরাজী বলেছেন, মানুষ অপরাধ করে অনুতপ্ত হয় কিন্তু কোন দলীল প্রমাণ ছাড়া এমন আজগুবি দাবী বিনা অপরাধেই লজ্জাষ্কর। এধরনের বক্তৃতা, বিবৃতির লক্ষ্য নিজস্ব অভিমত, স্বাধীন চিন্তা-চেতনার প্রচার করা এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ ছাড়া অন্য কিছু নয়। আল-আজহারের শায়খ মুজতাহিদ না মুকাল্লিদ তা জানতে পারলামনা। যদি তিনি মুজতাহিদ হয়ে থাকেন তাহলে তার নিকট জিজ্ঞাসা, কোন কোন আয়াত এবং কোন কোন হাদীসের ভিত্তিতে এমন দাবী করেছেন। তার নিকট পবিত্র কুরআনের কোন আয়াত অথবা রাসূলুল্লাহ সা. এর কোন হাদীসের ইবারাতুন্‌নস অথবা ইশারাতুন্‌নস অথবা দালালাতুন্‌নস দ্বারা সরাসরি প্রমাণিত না বিষয়বস্তুর আঙ্গিকে প্রমানিত। পক্ষান্তরে তিনি যদি মুকাল্লিদ হয়ে থাকেন তাহলে তার উপর একান্ত কর্তব্য ছিল যেকোন মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কিতাবের মাধ্যমে তার বক্তব্যের স্বপক্ষে প্রমান পেশ করা। অথবা কোন মাযহাবের কোন নীতি, মূলনীতির আলোকে এ বক্তব্য দিয়েছেন তার ব্যাখ্যা দেয়া। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, ইনি এসবের কোনটিই করেননি। তবে কি সালফে সালিহীনের যুগে একই দিনে ঈদ উদযাপনের কোন ব্যবস্থা ছিল? না কখনো না। অথবা এবিষয়ে হাদীসে অথবা মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কোন কিতাবে তাকিদ করা হয়েছে? কখনই না। পক্ষান্তরে এ বিষয়ে সংবাদ ধর্মীয় বিধি-বিধানের দৃষ্টিতে গ্রহনযোগ্য হবার মত শরয়ী কোন প্রমান নেই। এ বিষয়ে যদি বিস্তারিত অনুসন্ধানমূলক তথ্য জানার ইচ্ছা থাকে তাহলে رسالة ازالة الخبط و الهيمان এবং رسالة اظهار الاختلال في الاعتدال পাঠ করা উচিত। ইনশাআল্লাহ। সংশ্লিষ্ট মাসআলা বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা অর্জিত হবে।[১]

আহ্‌কার ফয়যুল্লাহ আফাল্লাহু আনহু
৪ঠা জিলক্বদ ১৩৮০ হিজরী
হাটহাজারী।

অপর এক পত্রের মাধ্যমে শামছুল হক ফরিদপুরী র. মুফতী ফয়যুল্লাহর নিকট নারী নেতৃত্ব সম্বন্ধে জানতে চেয়েছিলেন। পত্রের বিষয়বস্তু ছিল:

বিষয়টি হলো পাকিস্তানে বর্তমানে সাধারণ নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি পদের জন্য দুজন প্রার্থীর নাম শোনা যাচ্ছে। তাদের মধ্যে একজন শরী'আত বিকৃতকারী, কুরআনের বিরুদ্ধাচারণকারী, সুন্নত

১-২. নোমান, পৃ. ৪৭,৭২-৭৩। হায়াতে মুফতী আযম, পৃ. ১১০-১১১; ***মাকতুবাতে মুফতী আযম***, পৃ. ৩৩-৩৫।

অস্বীকারকারী, গণতন্ত্র ধ্বংসকারী, একনায়কতন্ত্রের পক্ষপাতি, সাধারণ জনগণের মৌলিক অধিকার ভূলুণ্ঠিতকারী। দ্বিতীয় প্রার্থী হলেন মহিলা। যিনি জ্ঞান ও দ্বীন দুটোতেই অসম্পূর্ণ। এখন যদি আমরা প্রথম প্রার্থীকে সমর্থন করি তাহলে ধর্মদ্রোহীকে সাহায্য করা হবে। দ্বিতীয় প্রার্থীকে সমর্থন করলে মাকরূহ কর্মে তথা অনুচিত কর্মে সমর্থন দিতে হবে। এখন জানার উদ্দীষ্ট বিষয় হল, বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে কি আমরা গণতন্ত্র বজায় রাখতে, মৌলিক কর্তব্য আদায়ে এবং ইসলামী শরীআহ প্রবর্তনে বাধা দানকারী ও বিকৃতকারীকে প্রতিহত করতে জনাবা ফাতেমা জিন্নাহকে সমর্থন করতে পারি? এবং উপরোক্ত কর্তব্যসমূহ আদায়কল্পে মাকরূহ তথা অপছন্দনীয় কাজে জড়াতে পারি? এবং বর্তমান এই সংকটকে আল্লাহর হুকুম হজ্ব আদায়ের সাথে তুলনা করতে পারি? অর্থাৎ হজ্বের জন্য পাসপোর্ট সংগ্রহের স্বার্থে ফটো ওঠানোকে ফকীহ্‌গণ বৈধ বলেছেন। নাকি ঐ যুবতী মেয়ের সাথে তুলনা করা যায়, যিনি পানিতে ডুবে মৃত্যু পথ যাত্রী। তাঁর জীবন বাঁচাতে তাকে স্পর্শ করে তথা হাতে ধরে পানি থেকে উদ্ধার করার বিষয়টি। আশা করি এ প্রসঙ্গে আপনার অভিমত প্রকাশ করে কৃতজ্ঞ করবেন।[২]

ফক্‌ত ওয়াসসালাম।

উত্তর: আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ
আলহামদুলিল্লাহ। এক প্রকার ভাল আছি। তবে গত দুচারদিন যাবত খুব দুর্বল। চিন্তা শক্তি খুব দুর্বল হয়ে গেছে বলে মনে হয়। দুআর আবেদন। বর্তমানে কোন কাজকর্ম করতে পারিনা। তাই সংক্ষিপ্তভাবে উত্তর লিখছি। মহিলারা জ্ঞানের জগতে নিসন্দেহে অসম্পূর্ণ। রাষ্ট্রপ্রধান, খেলাফত প্রধান আমীর হওয়ার উপযুক্ত নয়। বর্তমান প্রেক্ষাপটকে উপরোক্ত সমস্যার সাথে তুলনা করা ঠিক হবে না।
এখানে উদ্দেশ্য পূরণার্থে মাকরূহতে লিপ্ত হওয়ার বিষয়টি সন্দেহজনক এবং বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এখানে মাকরূহতে জড়িত হলে সফলতা অর্জনের বিষয়টি সুনিশ্চিত নয়। অনুমানমাত্র। প্রথমত সফল না হওয়ার ধারণাই প্রবল। দ্বিতীয়ত মাকরূহতে লিপ্ত হওয়ার ফলে যদিও সফলতা অর্জিত হবে কিন্তু ইসলামী নেজাম প্রতিষ্ঠা এবং শরঈ বিধান চালু করার বিষয়টি সম্ভাবনাময়ী মাত্র, দৃঢ় বিশ্বাসযোগ্য নয়। যা সবার সামনে স্পষ্ট। তদপুরি মহিলা ধার্মিক নয়, তার আকীদা বিশুদ্ধ নয়। নিশ্চিত যে, তার আকীদা নষ্ট, তার কর্মও নষ্ট। মাসআলাটি ইজতিহাদযোগ্য। সুতরাং চিন্তা গবেষণার মাধ্যমে কাজ করতে হবে। পদক্ষেপ নিতে হবে।[১]

ওয়াস সালাম
অধম ফয়যুল্লাহ আফাল্লাহু আনহু
২৫ শে জমাদিউল উলা ১৩৮৪ হিজরী, হাটহাজারী।

মুফতী সাহেব পাকিস্তানের সাবেক সরকার প্রধান আইয়ুব খানের নামে ১৪ই রমযান ১৩৮৪ হিজরী সাতটি বিষয়ের জোরালো আবেদন জানিয়ে একটি পত্র প্রেরণ করেছিলেন। সাতটি বিষয়ের মধ্যে প্রধান বিষয় ছিল- পাকিস্তানে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করুন, দুই. ধর্ম ও শরীআত বিরোধী আইনসমূহ রহিত করুন ইত্যাদি। তখন পাকিস্তানের সরকার প্রধানের পক্ষ হতে যে উত্তর প্রেরণ করা হয়েছিল তা নিম্নরূপ :

প্রেরক, জনাব মহামান্য রাষ্ট্রপতির পক্ষ হতে আব্দুল ওয়াহিদ টি.কে ডেপুটি সেক্রেটারী,
৬৪, এফ প্রেস ৬৫
১৩ই মে ১৯৬৫ খৃ.
প্রসিডেন্ট হাউজ, রাওয়ালপিন্ডি।

শ্রদ্ধেয় মাওলানা ফয়যুল্লাহ সাহেব, মহামান্য রাষ্ট্রপতি আপনার ব্যক্তিগত পত্র পেয়ে অত্যন্ত খুশি হয়েছেন। রাষ্ট্রের একজন সাহায্যকারী এবং আপনার দাওয়াত গ্রহণ এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় বিষয়ে আপনার

১-২. নোমান, পৃ. ৭২-৭৩, মাকতুবাতে মুফতী আযম, পৃ. ৪২-৪৭; মাজমুআ রাসাইলে ফয়যিয়া, খ. ৩য়, পৃ. ৪২-৪৮।

ব্যক্তিগত পরামর্শের বিষয়ে অবগত হওয়ার ফলে আপনাকে মোবারকবাদ জানাই। হুকুমতের ঘোষণার সাথে আপনার ঘোষণার একাত্মতার কারণে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। আপনাকে জোরালো আশান্বিত করতে চাই যে, আপনার প্রেরিত প্রস্তাব এবং উপদেশ আপত্তির উর্ধ্বে, বাস্তবায়নযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত।[২]

আপনার অনুগত
আব্দুল ওয়াহিদ

পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান আইয়ুব খানের নিকট প্রেরিত অপরপত্রে মুফতী সাহেব লিখেন : আশা করি পবিত্র শরীআত বিরুদ্ধ যেসব আইন প্রবর্তন করা হয়েছে সেগুলো স্থগিত করবেন এবং আগামী দিনে আইন প্রবর্তনের সময় দুটো বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। ১. আইন যেন পবিত্র শরীআত বিরুদ্ধ না হয়। ২. সাধারণ জনগণ এবং নাগরিকদের কল্যাণের বিষয়টি সামনে রাখবেন।
জনগণ মূল শাসক বৃক্ষ,
বৃক্ষ মূলের চেয়ে শক্ত হে বৎস!

সারা পৃথিবীর সফলতা খায়ের ও বরকত আল্লাহর বিধান প্রবর্তন ও অনুসরণের মধ্যে নিহিত। আল্লাহর বিধান মানুষের জ্ঞানের অনুগত নয়। শরীআতের কোন বিধান বাহ্যিক দৃষ্টি, যুক্তির পরিপন্থী মনে হলেও তা মানতে হবে। কারণ মানুষের উপলদ্ধিতে ত্রুটি আছে, ব্যর্থতা আছে। উলামা-ই দ্বীনের সাথে পরামর্শ করে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা চাই। উলামা দ্বারা উদ্দেশ্য ঐসব আলিম যারা বিচক্ষণ, কুরআন, হাদীস ও ফিক্হ, ইল্ম পূর্ণ পারদর্শী ও অভিজ্ঞ, সুন্নতের অনুসারী, দ্বীনদার, মুত্তাকী। দুনিয়াদার, লোভী, দাবীদার আলিম যেন না হয়। এরা কখনো অনুসরণযোগ্য নয়।[২]

পাকিস্তানের শাসকগণের নিকট অপর এক পত্রে মুফতী সাহেব লিখেন, আফসোস! শত আফসোস! পাকিস্তান যাকে বলি মুসলিম রাষ্ট্র, এর আইন প্রণেতা, রাষ্ট্রের কর্ণধারও মুসলমান। এদেশে ইসলাম বিরোধী, কুরআন- হাদীস বিরোধী, আইন পাশ হওয়া কতই আফসোসের বিষয়। দেশের জ্ঞানী, গুণী, বুদ্ধিজীবিরা জানেন যে, আমরা মুসলমান হিসেবে, ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে, সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের বাধা দানের দায়িত্ব আদায়ার্থে এবং দেশের জনগণের কল্যাণ, তাদের প্রতি সহযোগিতা, সহমর্মিতা, ভালোবাসার দাবী আদায়ার্থে এ আহ্বান জানাচ্ছি। রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের কোন বিদ্বেষ এবং অকল্যাণ কামনা নেই। সুতরাং রাষ্ট্রের মালিকদের প্রতি অনুরোধ, পাকিস্তানকে সত্যিকার ইসলামী রাষ্ট্র এবং বিশুদ্ধ ইসলামী আইন চালুর ঘোষণা দিন। ইসলামী শাসন চালু করুন এবং শরীআত বিরুদ্ধ কাজ কর্ম, জুলুম, নিপীড়নমূলক কর্মকাণ্ড উঠিয়ে নিন। শরীআত বিরুদ্ধ কোন আইন চালু হলে কোন মুসলমানের জন্য ঐ আইন পালন করা বৈধ হবে না। হাদীসে এসেছে আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের মাধ্যমে কারো আনুগত্য করা বৈধ নয়।[৩]

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী র. অপর একটি পত্র

প্রেরক: মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী

প্রিন্সিপাল, জামিয়া কুরআনিয়া লালবাগ, ঢাকা।

প্রাপক: হযরাতুল আল্লাম মুফতী ফয়যুল্লাহ সাহেব যিদা মাযদাহু

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ।

সালাম ও শ্রদ্ধা নিবেদন পর গুযারিশ এই যে, বর্তমানে সাদারাতি ইনতিখাব (মাদ্রাসা প্রধান নির্বাচন) নিয়ে এক আশ্চর্য কঠিন সমস্যায় ফেঁসে গেছি। প্রসিদ্ধ প্রবাদ বাক্যের মতো 'না পারি ধরতে না পারি ছাড়তে।' বর্তমান সময়ে যেহেতু সারা পাকিস্তানে আপনার মহান ব্যক্তিত্ব এক উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত তাই এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিও আমরা আপনার দরবারে উপস্থাপন করতে বাধ্য হলাম। আশা করি এ বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট উত্তর দিয়ে কৃতজ্ঞতায় বাধিত করবেন।[৪]

১. ঐ, পৃ. ৭৩-৭৪; মাকতুবাতে মুফতী আযম, পৃ. ৪২-৪৭; মাজমুআ রাসাইলে ফয়যিয়া, খ. ৩য়, পৃ. ৪২-৪৮।

২. ঐ, পৃ. ৬৭-৬৮; পৃ. ৪২-৪৭; পৃ. ৪২-৪৮।

৩. ঐ, পৃ. ৬৮; ***মেশকাত শরীফ,*** (নূর মুহাম্মদ আজমী অনু:) প্রাগুক্ত, খ. ১ম, পৃ. ১৮৭, হাদীস নং- ১৬০।

৪. ঐ, পৃ. ৪৭; মাকতুবাতে মুফতী আযম, পৃ. ৪২-৪৭; মাজমুআ রাসাইলে ফয়যিয়া, খ. ৩য়, পৃ. ৪২-৪৮।

বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় বুযুর্গ হাকীমুল উম্মত শাহ আশরাফ আলী থানবী র.-এর উল্লেখযোগ্য খলীফা, আলিমকুল শিরোমনি মাওলানা মোহাম্মাদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর র. ইলম নবুওয়্যত ও ইল্ম গাইব সম্বন্ধে জানতে চেয়ে মুফতী সাহেবের নিকট একটি পত্র প্রেরণ করেন। পত্রের সারকথা হলো: সম্প্রতি মৌলবী আহমদ রেজা খানের الدولة المكية গ্রন্থটি ইল্ম গায়েব ও ইল্ম নবুওয়্যত বিষয়ে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দিয়েছে। ইল্ম নবুওয়্যত নামে কোন পরিভাষা বা শিরোনাম আমাদের পূর্ববর্তী বা পরবর্তী মনীষীগণের নিকট হতে বর্ণিত আছে কি? এ শব্দটির পরিচিতি এর মেসদাক বিষয়ে একটু পরিস্কার জানাবেন এবং এর সততার অনুমোদন বা প্রমাণ বিষয়ে একটু পরিস্কার লিখবেন আশা করি। অহী অথবা ইলহাম অথবা স্বপ্নের মাধ্যমে অদৃশ্য বিষয় সম্বন্ধে যা কিছু রাসূলুল্লাহ সা. কে জানানো হয়েছে ঐগুলোকে কি ইল্ম নবুওয়্যত বলা যাবে? যদি এর প্রয়োগ শুদ্ধ হয় তাহলে এর স্বপক্ষে প্রমাণ জানিয়ে বাধিত করবেন। ইল্ম গাইব বিষয়ে আমি চল্লিশ পৃষ্ঠা লিখেছি। এর সাথে বুযুর্গানে দ্বীনের কথা যুক্ত করতে পারলে মানসিক প্রশান্তি লাভ করব। পবিত্র কুরআনের প্রায় চল্লিশটি আয়াত, একশ'র ও বেশি হাদীস এবং এক'শ মনীষীর বক্তব্যে ইল্ম গাইবের বিষয়টিকে প্রত্যখ্যান করা হয়েছে। এ বিষয়ে আমার লিখা আপনার কোন লিখার

বিপক্ষে গেলে আমি তা প্রত্যাখ্যান করব। পক্ষান্তরে আমার লিখার সমর্থক হলে মনে প্রশান্তি লাভ করব। তাই ইল্‌ম গায়েবের পরিচয় এর সততার প্রয়োগ এবং ইলম নবুওয়্যতের পরিচয়, এর যথার্থ প্রয়োগ, সত্যায়ন স্পষ্ট করে লিখবেন আশা করি।[১] ওয়াস সালাম

দুআ প্রার্থী, অধম মুহাম্মদ উল্লাহ আফাল্লাহু আনহু,
মাদ্রাসা বড় কাটারা, ঢাকা, ১ রমযান ১৩৮৪ হিজরী

হাফেজ্জী হুজুরের পত্রের উত্তরে মুফতী সাহেব লিখলেন : কুরআন, হাদীস, ইল্‌ম কালাম ও ফিক্‌হ'র বক্তব্য দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায়, আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কেউ আলিমুল গাইব নন। অন্য কাউকে আলিমুল গাইব মনে করা কুফরী। এর দ্বারা ইল্‌ম গাইব কথাটির প্রয়োগের জন্য পুরো অদৃশ্য জগতের ইল্‌ম থাকা আবশ্যক। বিচ্ছিন্ন কোন অদৃশ্য বিষয় সম্বন্ধে অবগত হলে তাকে ইল্‌ম গাইব বলা যাবে না। রাসূলুল্লাহ সা. বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, কিছু অদৃশ্যের ইল্‌ম রাখতেন। তিনি এমন কিছু বিষয়ে অবগত ছিলেন, যে বিষয়ে অন্য কেউ অবগত ছিলেন না। এ কারণে রাসূলুল্লাহ সা. কে আলিমুল গাইব বলা যাবে এমন ধারণা সঠিক নয়। পবিত্র কুরআনের স্পষ্ট বর্ণনা, হাদীস, ফিক্‌হ, এবং ইল্‌ম কালামের বিবরণ পরিপন্থী। কেউ যদি এমন দাবী করে, তার উপর কর্তব্য হল, এর স্বপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করা। বিচ্ছিন্ন কিছু অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞান থাকলে তাকে আলিমুল গাইব বললে প্রতিটি মানুষ আলিমুল গাইব হিসেবে গণ্য হবে। কারণ প্রত্যেকেই এমন কোন অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞান রাখেন যা অপরে রাখে না। মোট কথা, রাসূলুল্লাহ সা. কে প্রচুর ইল্‌ম প্রদান করা হয়েছে। খতমে নবুওয়্যতের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ছিল ততটুকু তাকে দেওয়া হয়েছিল। যা তাঁর জন্য নবুওয়্যতের ইল্‌ম হিসেবে গণ্য। তারপরও তিনি আলিমুল গাইব ছিলেন না। এমন বলা বৈধ হবে না যে, রাসূলুল্লাহকে গাইবের ইল্‌ম প্রদান করা হয়েছিল। এ কথা সম্পূর্ণ সঠিক যে, তাঁকে যে ইলম প্রদান করা হয়েছিল তা নবুওয়্যতের ইল্‌ম। এর বিপক্ষে কুরআন, হাদীস এবং কোন শরঈ দলীল নেই। পূর্ব ও পরবর্তী যুগে মনীষীগণের মধ্যে ইল্‌ম নবুওয়্যতের কোন শিরোনাম বা পরিভাষা আলোচিত হয়েছে বলে চোখে পড়েনি। তারপরও বিষয়টি ঠিক আছে। শরীআত বিরুদ্ধ নয়। এ বিষয়ে আমি অনুসন্ধানের সুযোগ পাইনি। বর্তমানে আমি খুব দুর্বল। বাড়ীতে আছি। নিকটে কিতাবাদি নেই। তাই আমি অক্ষম। দুআ করবেন। [২]

অধম ফয়যুল্লাহ
২৮ রমযান ১৩৮৪ হিজরী, দারুল উলূম হাটহাজারী।

মুফতী সাহেবের রচিত চিঠিপত্রগুলো পর্যালোচনা করলে পরিষ্কারভাবে অনুভব হয় যে, নিজের চিন্তা-চেতনা, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, ধী শক্তি ও অধ্যয়নের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানকে পাকাপোক্ত করতে চেয়েছেন এবং নিজের আত্ম বিশ্বাস ও আত্মশক্তি বাড়াতে চেয়েছেন। রচিত পত্রসমূহ দ্বারা সংশ্লিষ্ট সবার কল্যাণ কামনা করেছেন।

১-২. ঐ, পৃ. ৭৪-৭৫। মাকতুবাতে মুফতী আযম, পৃ. ৪২-৫২; মাজমুআ রাসাইলে ফয়যিয়া, খ. ৩য়, পৃ. ৪২-৫২।

ছ. বিবিধ রচনা :

১. তালিমুল মুবতাদী আলা লিসানিল আরাবী

تعليم المبتدي اللسان العربي

মুফতী ফয়যুল্লাহ র. রচিত ১৬ পৃষ্ঠার এ পুস্তিকার ভাষা আরবী। প্রাথমিক স্তরের বাচ্চাদের আরবী শেখা ও উপদেশ গ্রহণের জন্য উপযুক্ত একটি পুস্তিকা। এর রচনাকাল অজ্ঞাত। পুস্তিকাটির দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭৮ খৃ.। প্রকাশ করেছে আলমাকতাবাতু আল ফয়যিয়া হাটহাজারী চট্টগ্রাম। পুস্তিকায় ছোট ছোট আরবী বাক্যের ব্যবহার করা হয়েছে; যেগুলোর অর্থ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং বাচ্চাদের জন্য উপদেশমূলক। এর দ্বারা বাচ্চাদের আরবী ভাষা শেখার পাশাপাশি মূল্যবান উপদেশ জ্ঞানও অর্জিত হবে। পুস্তিকার শেষ দিকে কুরআন, হাদীসে বর্ণিত বাচ্চাদের শেখার উপযোগী কিছু দু'আর উল্লেখ রয়েছে যা মুখস্থ করা এবং বাস্তব জীবনে আমল করার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।[১]

২. শারহু তালীমুল মুবতাদী

৩. কায়দা-ই বাগদাদী প্রতি শত

৪. আরবী আসান কায়দা শত

৫. তালীমুল ইসলাম বা নামায শিক্ষার ১ম ভাগ

এ পুস্তিকাগুলো বাচ্চাদের তালীমের সাথে সম্পৃক্ত। তালীম তার সাথে নৈতিক শিক্ষা ও আদর্শ কিভাবে অর্জন করা যাবে সেই চিন্তা ও গবেষণায় রচনা করা হয়েছে। যেগুলো শিশুদের এবং প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য খুব উপযুক্ত। এ ক্ষেত্রে মুফতী সাহেব শিশুদের উপযোগী পুস্তক রচনায় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।[২]

৬. বেহেশতের সামান

৭. আসরারুল মু'মিনীন

৮. তুহফাতুল মু'মিনীন

৯. হাদিয়াতুল মু'মিনীন

১০. রাহে হক

১১. পিতা-মাতার হক

১২. পশুপাখির হক

১৩. পর্দা ও ইসলাম

১৪. শুভ বিবাহের কাবিননামা

এ পুস্তিকাসমূহে মুফতী সাহেব তাসাউফ, সংশোধন, আত্নসংশোধন ও উপদেশ প্রদান করেছেন। মুসলিম জাতিকে সঠিক পথের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। প্রতিটি পুস্তিকায় বিষয়ভিত্তিক পবিত্র কুরআনের আয়াত এবং প্রাসঙ্গিক হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। কিভাবে জান্নাতের রাস্তা সুগম হবে,কি কি আমল জীবনে পালন করলে সহীহ দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা যাবে, ঈমানদারগণ কিভাবে দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবেন

১. ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মদ, মুফতী, *তালিমুল মুবতাদী আলা লিসানিল আরাবী*, চট্টগ্রাম আলমাকতাবাতুল ফয়যিয়া হাটহাজারী, ১৯৭৮ খৃ. পৃ. ১-১৪

২. ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মদ, মুফতী, *সীরাজুত তাবলীগ*, চট্টগ্রাম কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি. পৃ. ১৪।

সে সব বিষয় আলোচনা করেছেন। সন্তানের উপর পিতা-মাতার হক রয়েছে, মৃত পিতা-মাতার জন্য দু'আ করা, জীবিত পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করা। তাদের জন্য দু'আ করলে নেক সন্তান হিসেবে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্যতা লাভ করা যায় এ প্রসঙ্গের হাদীসসমূহ পিতার মাতার হক পুস্তিকায় আলোচনা করেছেন। মানব সম্প্রদায়ের নিকট পশু পাখিরও হক রয়েছে এবং সেগুলো আদায় করার মধ্যে দীনদারী ও নেকী রয়েছে; পশু পাখির হক পুস্তিকায় আলোচনা করা হয়েছে। শুভ বিবাহের কাবিননামা পুস্তিকায় বর্তমান সময়ে সরকারীভাবে রচিত কাবিননামা ফর্মে মুফতী সাহেবের বেশকিছু আপত্তি রয়েছে। সেখানে কিছু শর্ত, কিছু কোটা, কিছু বিষয়াবলী পুরোপুরি শরীআত সম্মত নয় বলে মুফতী সাহেবের অভিমত। এ পুস্তিকায় তিনি সেগুলো সংশোধনের আহ্বান জানিয়েছেন এবং কাবিননামা ফর্মের একটি রূপরেখা প্রদান করেছেন। পর্দা পালন করলে জীবনে বরকত আসে, জীবন হয় কল্যাণকর, এ বিষয়টি পর্দা ও ইসলাম পুস্তিকায় তুলে ধরেছেন। এসমূহ পুস্তিকা প্রকাশ করেছে কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী চট্টগ্রাম।[১]

১৫. তাবলীগের ছয় নাম্বার

১৬. যিয়ারত নামা

১৭. আসহাবে সুফ্‌ফা

১৮. চিশতিয়া খান্দানের সাবিরিয়া তরীকা

এ পুস্তিকাসমূহ প্রকাশ করেছে কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী চট্টগ্রাম। প্রকাশকাল অজ্ঞাত। তাবলীগের ছয়নাম্বার পুস্তিকা মুফতী সাহেব তাবলীগ জামা'আতকে দীন ও শরীআতের বাহক বলে আখ্যায়িত করেছেন। এর ব্যাপ্তি সারা দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়বে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। তাবলীগ জামাতের বর্তমান কার্যক্রমকে চূড়ান্ত লক্ষে পৌঁছার মাধ্যম হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। যিয়ারতনামা পুস্তিকায় যিয়ারতের ফযীলত তুলে ধরেছেন। আসহাবে সুফ্ফা পুস্তিকায় আসহাবে সুফ্ফার ফযীলত এবং তাঁদের ক্ষুধা, দু:খ, কষ্ট, অভাব ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করেছেন। দীনি ইলমের জন্য তাঁদের ঐ শ্রমকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেছেন। চিশতিয়া খান্দানের সাবিরিয়া তরীকা পুস্তিকায় সাহাবা, তাবিঈ, মুজতাহিদ ইমামগণের আদর্শ তুলে ধরেছেন। তাঁদের ন্যায় দীনদারী তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বনের আহ্বান জানিয়েছেন।[২]

জ. অপ্রকাশিত রচনাবলী

মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ র. রচিত গ্রন্থাবলী বা পাণ্ডুলিপিসমূহ তাঁর জীবদ্দশাতেই ছাপা শুরু হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর আশির দশক পর্যন্ত অধিকাংশ ধর্মীয় পুস্তক আরবী ফার্সী ও উর্দু ভাষায় রচিত হয়েছে সেগুলো ছাপা হয়েছিল। বাংলাদেশে প্রকাশনা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও সুযোগ সুবিধার ফলে আরবী, ফার্সী ও উর্দুর চর্চা বৃদ্ধি পেয়েছিল। বই পুস্তক সংরক্ষণের ব্যবস্থাও পূর্বের তুলনায় অধিক উন্নতি লাভ করে। মুফতী সাহেব রচিত কালজয়ী পুস্তক-পুস্তিকাসমূহ যুগের চাহিদা পূরণার্থে তাঁর জীবদ্দশাতেই প্রকাশিত হতে থাকে এবং পাঠকের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। তাঁর রক্ত সম্পর্কীয় নিকট আত্মীয়দের মধ্যে এমন যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন ও রয়েছেন যারা মুফতী সাহেবের সমুদয় গ্রন্থ প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন। মুফতী সাহেবের নাম ও স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্থে কুতুবখানা ফয়যিয়া নামক এক বিশাল প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। এ প্রতিষ্ঠানটি চট্টগ্রাম এমনকি বাংলাদেশের জন্য ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানটি মুফতী সাহেবের গ্রন্থ সমূহের বঙ্গানুবাদ বা বাংলা সংস্করণ প্রকাশেরও উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তবে বঙ্গানুবাদে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ এবং বিষয় ভিত্তিক বিন্যাসের অদক্ষতার ক্রুটি-বিচ্ছ্যুতি চোখে পড়ার মত। ২০১৬ খৃস্টীয় সনটি মুফতী সাহেবের ইন্তিকালের ৪০তম বছর অতিক্রম করছে। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তাঁর রচিত পাণ্ডুলিপি সমূহ ছাপার বা মুদ্রণের খুব একটা বাকি নেই। তবে মুফতী সাহেবের রচিত অসংখ্যা ফাতাওয়ার পাণ্ডুলিপি এখনও মুদ্রণের বাকি রয়েছে। ফাতাওয়ার পাণ্ডুলিপি সমূহের বৃহত্তম অংশ সংগৃহীত ও সংরক্ষিত আছে হাটহাজারী মাদ্রাসার ফাতাওয়া বিভাগে এবং কিছু পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে কুতুবখানা ফয়যিয়ার কর্তৃপক্ষের নিকট। কুতুবখানা ফয়যিয়ার কর্তৃপক্ষ মুফতী সাহেবের অপ্রকাশিত ফাতাওয়ার পাণ্ডুলিপিগুলো সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিন্যাস ও

১. *পিতা মাতার হক*, চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, তা. বি. পৃ. ১-৫; মাকতুবাতে মুফতী আযম, পৃ. ১২২।
২. *তাবলীগের ছয় নাম্বার*, চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, তা. বি. পৃ. ২৯-৩১।

সম্পাদনার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন মুফতী রহীম উদ্দীনের উপর। ইতিমধ্যে কুতুবখানা ফয়যিয়া এর পক্ষ হতে মুফতী রহীম উদ্দীনের সম্পাদনায় ১৪৩১ হি. / ২০১০ খৃ. ফাতাওয়া ফয়যিয়া ১ম খন্ড প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থে মুফতী সাহেবের ৩০৮টি ফাতাওয়া ছাপা হয়েছে। মুফতী সাহেবের আরো ১ হাজার ফাতাওয়ার পাণ্ডুলিপি মুফতী রহীম উদ্দীনের নিকট সংরক্ষিত, সংগৃহীত ও হেফাজতে আছে। যেগুলো ছাপানোর প্রস্তুতি চলছে। এ পাণ্ডুলিপিগুলো ফাতাওয়া ফয়যিয়া ২য় খন্ড এবং ফাতাওয়া ফয়যিয়া ৩য় খন্ড নামে মুদ্রণের প্রস্তুতি চলছে। এ অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিসমূহ ফাতাওয়া ফয়যিয়া ২য় খন্ড নিম্নোক্ত অধ্যায়সমূহে বিন্যাস করা হয়েছে-

كتاب الأيمان و النذور

كتاب البيوع
كتاب الاضحية والعقيقة

كتاب الحدود و التعذيرات

ফাতাওয়া ফয়যিয়া ৩য় খন্ড নিম্নোক্ত অধ্যায়সমূহে বিন্যাস করা হয়েছে-

كتاب الصيد والذبائح
كتاب الهبة والصدقة
كتاب الوديعة والامانة
الوصايا

كتاب القضي و الشهادة
كتاب الامارات و السياست

এ সমূহ বিষয়বস্তুর উপর বিন্যস্ত মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ র. রচিত ফাতাওয়ার পাণ্ডুলিপি সমূহ বর্তমানে মুফতী রহীম উদ্দীনের হেফাজতে রয়েছে। যেগুলো অচিরেই প্রকাশিত হবে ইনশা আল্লাহ।[১]

ফাতাওয়া দারুল উলূম হাটহাজারী

মুফতী সাহেবের কর্মজীবনে দীর্ঘ ত্রিশ বছর কেটেছে শিক্ষকতার মাধ্যমে হাটহাজারী মাদ্রাসায় তাঁর শিক্ষককতার দীর্ঘ কর্মজীবন অতিবাহিত হয়েছে। তিনি ছিলেন সেই মাদ্রাসার ছাত্র। পরবর্তীতে সেখানকার শিক্ষক এবং ফাতাওয়া বিভাগের প্রধান মুফতী। হাটহাজারী মাদ্রাসায় কর্মজীবনে তিনি প্রায় ৫ হাজার ফাতাওয়া রচনা করেছিলেন বলে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের দাবী। বর্তমানে হাটহাজারী মাদ্রাসার ফাতাওয়া বিভাগের প্রধান মুফতী জসীম উদ্দীন এ তথ্য জানিয়েছেন। তারা মুফতী ফয়যুল্লাহ র. ও অপরাপর মুফতীগণের রচিত ও সংকলিত ফাতাওয়াসমূহকে মাদ্রাসার প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগের পক্ষ থেকে কয়েক খন্ডে প্রকাশের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তবে খুব দ্রুত মুদ্রণ আকারে প্রকাশ পাবে এমন আশাবাদ তারা ব্যক্ত করেননি। তারা মুফতী ফয়যুল্লাহ ও অন্যান্য মুফতীগণের ফাতাওয়ার পাণ্ডুলিপিগুলোকে ফিকহী বিষয়বস্তুর আলোকে বিন্যাস করবেন, সাজাবেন ও প্রকাশ করবেন। ইতোমধ্যে তারা ১৪২৩ হি. / ২০০৩ খৃ. ফাতাওয়া দারুল উলূম হাটহাজারী ১ম খন্ড প্রকাশ করেছে। সামনে প্রকাশিতব্য ফাতাওয়ার খন্ডগুলোর সংখ্যা কত হবে এবং কোন খন্ড কোন বিষয় নিয়ে সাজানো হবে। এ বিষয়ে তারা চূড়ান্ত কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করেননি। হাটহাজারী মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের দাবী মুফতী ফয়যুল্লাহ র. রচিত ৫ হাজার ফাতাওয়ার পাণ্ডুলিপি এখনও তাদের সংগ্রহে রয়েছে। তবে সম্প্রতি যারা মুফতী সাহেবের ফাতাওয়াসমূহ নিয়ে গবেষণা করছেন এবং সেগুলোর বিন্যাস ও প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তাদের মতে

১. ফাতাওয়া ফয়যিয়া, চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, ২০১০ খৃ. খ. ১ম, পৃ. ৫৯২; মুফতী রহীম উদ্দীনের নিকট সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি থেকে।

মুফতী ফয়যুল্লাহ রচিত ও সংকলিত ফাতাওয়ার সংখ্যা অনুমান সর্বমোট ৫ হাজার হবে। তন্মধ্যে কুতুবখানা ফয়যিয়া তথা মুফতী সাহেবের নিকটাত্মীয়দের নিকট সংরক্ষিত ফাতাওয়ার সংখ্যা অনুমান দেড় হাজার এবং হাটহাজারী মাদ্রাসার ফাতাওয়া বিভাগে সংরক্ষিত মুফতী সাহেবের ফাতাওয়াসমূহ হবে সাড়ে তিন হাজার।

উনওয়ানাতি মাওয়াইযি মুফতী আযম عنوانات مواعظ مفتي اعظم

মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ র. দরস-তাদরীস গ্রন্থ রচনার পাশাপাশি ওয়ায নসীহতেও অংশগ্রহণ করতেন। ইতোপূর্বে গবেষণায় এ বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি গতানুগতিক ওয়ায করতেন না। ওয়ায নসীহতে শে'র, কবিতা ইত্যাদি আবৃত্তি করতেন না। তিনি বিষয়ভিত্তিক ওয়ায করতেন এবং প্রতিটি ওয়ায মাহফিল বা মজলিসের জন্য পূর্ব হতে বিষয়বস্তু নির্বাচন করে নিতেন। উক্ত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত পবিত্র কুরআনের আয়াত ও হাদীসসমূহ এবং ফিক্‌হী কিতাবের ভাষ্য আয়ত্ব করতেন ও লিখে নিতেন। উক্ত মাহফিলে তিনি সেগুলোই বলতেন। এর বাইরে কোন কথা বলতেন না। তিনি এ নীতি আজীবন পালন করেছেন এবং ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন যে, প্রতিটি মাহফিলের দিন, তারিখ, সময় ও স্থান নোট

করে রাখতেন এবং উক্ত মাহফিলের বিষয়বস্তু পূর্ব থেকেই নির্বাচন করে নিতেন। এভাবে তাঁর জীবনে প্রদত্ত ওয়ায নসীহতের অসংখ্য উনওয়ান তথা শিরোনাম, সন, তারিখ, সময় ও স্থানের ডায়রী রচিত হয়ে গেছে। উক্ত উনওয়ানগুলো তিনি আরবী, ফার্সী ও উর্দুতে সংক্ষেপে লিখে রাখতেন। সম্প্রতি মুফতী সাহেবের এ ধরণের প্রায় ২শ শিরোনাম বা উনওয়ান উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এ পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠা সংখ্যা আড়াইশ। তাঁর কয়েকটি ওয়াযের উনওয়ান হল -১৩ জমাদিউস সানী ১৩৮৫ হি. শাহ মিরপুর মাদ্রাসা, ১৮ রমযান ১৩৮৮ হি. মৌলবী কাসিমের বাড়ী ইত্যাদি। মুফতী সাহেবের এ অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি সমূহ দ্রুত প্রকাশের প্রস্তুতি চলছে বলে কুতুবখানা ফয়যিয়া এবং পাণ্ডুলিপিগুলোর সম্পাদক মুফতী মুহাম্মদ রহীম উদ্দীন এ তথ্য প্রদান করেছেন।[১]

পরিশেষে বলা যায়- মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ র. রচিত আমার নিকট সংগৃহীত ও বিভিন্ন মাধ্যমে ৮০টি বইয়ের অনুসন্ধান লাভ করতে পেরেছি। প্রাপ্ত গ্রন্থসমূহের আলোচনা, মন্তব্য ও বিশ্লেষণ করেছি। এগুলো ছাড়া মুফতী সাহেব রচিত আরও কোন গ্রন্থ, পুস্তক, পুস্তিকা, লিফলেট নেই এ কথা জোর দিয়ে বলা যাবে না তবে মুফতী সাহেবের গ্রন্থাবলীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান কুতুবখানা ফয়যিয়া এবং মুফতী সাহেবের পুস্তকগুলো নিয়ে যারা গবেষণা ও প্রকাশনার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন তাদের মতে উপরোক্ত গ্রন্থসমূহ ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থের অনুসন্ধান এ মুহুর্তে তাদের নিকট নেই। সুতরাং মুফতী সাহেবের যতগুলো গ্রন্থের অনুসন্ধান পেয়েছি সবগুলো আলোচনা করেছি। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ অধিকাংশই মৌলিক। কিছু গতানুগতিক, কিছু সংকলন, কিছু ব্যাখ্যামূলক এবং কিছু অনুবাদগ্রন্থ। আরবী ফার্সী ও উর্দুতে রচিত তাঁর গ্রন্থাবলী জাতিকে অনাগতকাল দিক নির্দেশনা দিয়ে যাবে। বিশেষ করে আলিম, তালিবে ইল্ম ওয়াইয ও দীনের রাহবরকে। মুফতী সাহেব জীবনে যে হাদীসগুলোকে বেশি ব্যবহার করেছেন ওয়ায-নসীহতে আবৃত্তি করেছেন সেগুলোর সংকলন হলো- ফয়যুল কালাম লি সাইয়্যিদিল আনাম এবং হিদায়াতুল ইবাদ ইলা সাবিলির রাশাদ গ্রন্থ। গ্রন্থ দুটো অভিনবত্বের দাবী রাখে। তাঁর রচিত গ্রন্থ আহকামু দা'ওয়াতিল মুরাওওয়াজা আলিম ও সুধী সমাজের মধ্যে নতুন চিন্তা গবেষণার জন্ম দিয়েছে। ভারতবর্ষে আলিম সমাজের প্রায় সবাই ফরয নামায জামাতের সাথে আদায় করার পর ইমাম -মুক্তাদী হাত উঠিয়ে দুআ করে থাকেন। বিষয়টিকে তারা মুস্তাহাব মনে করে। কিন্তু মুফতী সাহেব এর বিপক্ষে প্রমাণ দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি বিদআতকে শরীআতের জন্য আতংক হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাই এর বিরুদ্ধে অসংখ্য কিতাব রচনা করেছেন। ভন্ড, সূফী, পীর, দরবেশদেরকে ইসলামী সভ্যতা- সংস্কৃতি ও আখলাক ধ্বংসকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাই এদের বিরুদ্ধেও অসংখ্য পুস্তক রচনা করেছেন। তাঁর পুস্তক সমূহ এক শ্রেণীর পাঠকের নিকট যুগ যুগ ধরে সংরক্ষিত থাকবে।

---

১. পাণ্ডুলিপিসমূহ বর্তমানে মুফতী রহীম উদ্দীনের সংরক্ষণে রয়েছে।

২. জুনায়েদ বাবুনগরীর রচনাসমগ্র, পৃ. ৩৯৪।

ষষ্ঠ অধ্যায় :
সংস্কার কার্যক্রম

তাজদীনে দীন তথা দীনের সংস্কার বলতে বুঝায় কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূলের যে আমল যুগের পর যুগ ধরে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল তার পুনরুজ্জীবন দান করা। এ বিষয়ে মানুষের সীমালঙ্ঘন ও বাড়াবাড়ি প্রতিহত করা, মুর্খদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে অস্বীকৃতি জানানো এবং সঠিক, নির্ভুল ব্যাখ্যা প্রচার করা, সত্যমিথ্যার পার্থক্য দেখিয়ে দেয়া। যিনি একাজগুলো করেন তিনি মুজাদ্দিদ বা সংস্কারক। সহজ কথায় সংশোধনকারী, নবায়নকারী, নতুনভাবে সম্পন্নকারীকে বলে সংস্কারক বা মুজাদ্দিদ। অন্যথায় যত বড় আলিম, ফাযিল, ফকীহ, সাহিবে দিল, আমলদার ও সাহিবে কাশফ হলেও তিনি মুজাদ্দিদ হতে পারবেন না। মুজাদ্দিদ হওয়ার জন্য প্রয়োজন বিখ্যাত আলিমে দ্বীন হওয়া দ্বীনের জন্য ইঙ্গিতযোগ্য মনীষীতে

পরিণত হওয়া, ইলমে যাহির ও বাতিনে জগৎ বিখ্যাত হওয়া, সুন্নতের পুনরুজ্জীবন দানকারী ও বিদআত মুলোৎপাটনকারী হওয়া।[১]

জীবনের চাহিদা নিত্য নতুন, বস্তুবাদের বৃক্ষ চিরসবুজ, প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি পূজার জন্য কোন আন্দোলনের প্রয়োজন হয় না। এর প্রেরণা, উদ্দীপনা বস্তুর পদে পদে বিদ্যমান। কবির কবিতার মতো- ঈমানদার যদিও হয়েছে বৃদ্ধ, লাত মানাত কিন্তু যুবক।

ﻩ ﯾﺮ ﮨﮯ ﻣؤﻣﻦ ﺟﻮﺍﻥ ﮨﮯ ﻻﺕ ﻭ ﻣﻨﺎﺕ

তাই দ্বীনের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দীর্ঘদিন ধরে রাখতে, পরিবর্তনশীল জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে মাঝে মাঝে এমন সব মনীষীর আবির্ভাব ঘটে যাঁরা নিজেদের অসাধারণ যোগ্যতা, উন্নত মেধা, আধ্যাত্মিক যোগ্যতা, নি:স্বার্থপরতা ও ত্যাগের মাধ্যমে নবজীবনের সৃষ্টি করেন, অনুসারীদের মধ্যে নতুন আস্থা ও নতুন প্রেরণা যুগিয়ে থাকেন। ইসলামের দীর্ঘ ঘটনাবহুল ইতিহাসে স্বল্পতম সময় পর্ব এমন পাওয়া যায়না যেখানে ইসলামের দাওয়াতের কাজ একেবারে বন্ধ ছিল, ইসলামের প্রকৃত সত্য আড়াল হয়ে গিয়েছিল, মুসলিম জাতির বিবেক অনুভূতি শূন্য হয়ে গিয়েছিল এবং সমগ্র মুসলিম জাহান অন্ধকারে ছেয়ে গিয়েছিল। বরং এটি ঐতিহাসিক সত্য যে, যখনই ইসলামের সামনে কোন নতুন ফেতনার উদ্ভব হয়েছে, ইসলামকে বিকৃত ও কদাকার করার অপচেষ্টা করা হয়েছে কিংবা বস্তুবাদের কঠিন হামলা হয়েছে; তখনই এমন সব শক্তিশালী মনীষী ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছেন যিনি পূর্ণ শক্তিতে উক্ত ফেতনার মোকাবেলা করেছেন। বাতিলের এমন অসংখ্য দাওয়াত ও বিপ্লবী আন্দোলন ছিল যেগুলো স্বীয় যুগে খুবই প্রভাব ও শক্তিশালী ছিল। কিন্তু আজ সেগুলোর অস্তিত্ব কেবল ইতিহাসের কিতাবে রয়েছে। তার হাকীকত অনুধাবন করাও আজ কঠিন। যেমন কাদরিয়া, জাহমিয়া, মু'তাযিলা মতবাদ, খালকে কুরআন, ওয়াহ্দাতুল ওয়াজুদ, আকবরের দীনে এলাহী ইত্যাদি ফেতনা। এগুলোর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বিশাল সাম্রাজ্যের অধিশ্বর, বিরাট মেধা ও প্রতিভা সম্পন্ন সুযোগ্য ব্যক্তিগণ। কিন্ত শেষ পর্যন্ত এসবের অস্তিত্ব বিলীন হতে বাধ্য হয়েছে। পক্ষান্তরে ইসলামের হাকীকত ওসবের উপর বিজয়ী হয়েছে। দ্বীনের হেফাজতের এই চেষ্টা-সাধনা, বিপ্লবী প্রয়াস, দাওয়াত, সংস্কার, সংশোধন ইসলামের ইতিহাসে ততটাই প্রাচীন যতটা প্রাচীন মুসলিম পরম্পরা জীবন। ইসলামী রেনেসাঁ, সংস্কার, পুনর্জাগরণের অস্তিত্ব মুসলিম উম্মাহর প্রতিটি যুগে এবং প্রতিটি পর্যায়ে বিদ্যমান ছিল। আল্লাহ তাআলার এ অবদান থেকে তারা কখনো বঞ্চিত হননি।[২] 'মহান ক্ষমতাধর আল্লাহ তাআলা এ উম্মতের জন্য প্রতি শতাব্দীতে মাথায় এমন মনীষীকে পাঠাবেন যিনি তাদের দ্বীনকে তাজদীদ (সংস্কার) করবেন।'[৩] এ উম্মতের উপর যখনই বড় ধরণের বিপদ আপতিত হয়েছে, ঘন

১. নোমান, পৃ. ৮-২০; মাশায়েখে চাটগাম; পৃ. ৩৯১; আল্লামা হাফেজ জুনায়েদ বাবুনগরীর রচনাসমগ্র, পৃ. ৩৯৩-৩৯৫।
২. *সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস*, (আবু সাঈদ ওমর আলী অনুদিত), প্রাগুক্ত, খন্ড ১ পৃ. ৩৫-৩৭।
৩. *ফয়যুল কালাম*, পৃ. ১৬০, হাদীস নং-২১৫।

অন্ধকার ছড়িয়েছে; তখনই আল্লাহ তাআলা সেই প্রয়োজন পূরণ করার জন্য মহা মনীষীর আগমন ঘটিয়েছেন। গত চৌদ্দশ বছর ধরেই দ্বীন ইসলামের উপর চতুর্দিক থেকে যে অতর্কিত হামলা হচ্ছিল, ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের বাড়াবাড়িতে যেভাবে এর আকার বদলে যাচ্ছিল, তাতে এ চির শাশ্বত, সত্য, পবিত্র, ধর্মের বাস্তবরূপ রক্ষা করার জন্য প্রতি শতাব্দীতে একজন সংস্কারকের আগমন হয়েছিল। এভাবে ইসলামের ইতিহাসে শত শত মনীষীকে সংস্কারকের ভূমিকা পালন করতে দেখা গেছে। বিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে এমনি একজন সংস্কারক ছিলেন মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ র.। তিনি মুজাদ্দিদ বা সংস্কারক হিসেবে অসাধারণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিংশ শতাব্দীতে উপমহাদেশে যারা দ্বীনী সংস্কার কার্যক্রমে অসাধারণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন মুফতী ফয়যুল্লাহ ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ছিলেন মুজাদ্দিদে মিল্লাত, মুসলিহে উম্মত, হুজ্জাতুল ইসলাম, মুফতী আযম। তিনি সঠিক, নির্ভুল জ্ঞানের পুনরুজ্জীবন, ইলমে নববীর প্রচার, জাতির চিন্তাধারায় নবজীবন, সজীবতা দানে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর সংস্কারকর্ম ব্যাপকভাবে বিস্তৃত ছিল। দ্বীনকে পুনরুজ্জীবন দান করতে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলেন।

মানুষের আকীদা-বিশ্বাস সংশোধন, শির্ক, বিদ'আত দমন, কুরআন-সুন্নাহর ইলমের প্রচলন, বিভিন্ন বাতিল পীর, ফিরকার মতবাদ প্রত্যাখ্যান ও প্রতিহত করেছেন। জানা,অজানা সব বদরুসুম-রেওয়াজ, শরী'আত বিরুদ্ধ কর্মকাণ্ড সংশোধনের চেষ্টা করেছেন। দ্বীন, শরীআতের প্রতিটি শাখা-প্রশাখা সুন্নতের নূরে আলোকিত, সংশোধন, সংস্কার করেছেন।[১]

ছাত্রজীবন থেকেই মুফতী সাহেবের মধ্যে সংস্কার কর্মের প্রেরণা ও বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়াস ছিল। বিষয়টি তাঁর হাটহাজারী ও দেওবন্দের উস্তাদগণও স্বীকার করেছেন। অনেকেই মুফতী সাহেবের সংস্কার কর্মকে শ্রদ্ধা ও মূল্যায়ন করতে পারেন নি। এটা তাদের মুফতী সাহেব সম্বন্ধে অজ্ঞতার পরিচয়। বর্তমানে মানুষ সাধারণত ইল্ম দ্বীনের সাথে এতটাই সম্পর্কহীন যে, দ্বীনি বিষয়-আসয় অনুধাবন করাটাই অনেকের জন্য কঠিন হয়ে গেছে। তবে মুফতী সাহেবের বিরোধী পক্ষও তাঁর মহান ব্যক্তিত্বকে স্বীকার করেছেন। যেমন বিদআত পন্থীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন মাওলানা আমীনুল হক ফরহাদাবাদী। মুফতী সাহেবের সাথে তার প্রচণ্ড বিরোধ থাকার পরও মুফতী সাহেবের জ্ঞান গরীমা, কামালিয়াতকে স্বীকৃতি দিয়েছেন।[২]

মুফতী সাহেব প্রত্যক্ষ করলেন, মুসলিম মিল্লাতের গতি, প্রকৃতি, রুচি, প্রবণতায় বিকৃতি ঘটেছে। পীরের মুরিদী ব্যবসা, মুরীদদের পীর পূজা, ব্যক্তি স্বার্থ, মনগড়া রাজনৈতিক মতবাদ, সুবিধা গ্রহণের প্রবণতা প্রকট। হিদায়াত, দ্বীন, নবুওয়্যাতের ইলম ও ইসলামী সভ্যতার সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। তিনি এ অবস্থা পরিবর্তনে উদ্যোগী হন এবং কর্মপন্থা গ্রহণ করেন। বাংলাদেশের একটি প্রত্যন্ত গ্রামে নিভৃত কোণে বসে মানুষকে দ্বীনের প্রতি আহ্বানের কর্মপ্রয়াস চালিয়ে গেছেন। ইলমী ময়দানে বিচরণ করে দরস দিলেন, লিখনী পরিচালনা করলেন।[৩]

মুফতী সাহেবের সংস্কার কার্যক্রম সমূহকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা যায়:-

১. প্রতিটি ঘরে পবিত্র কুরআনের বিশুদ্ধ তিলাওয়াতকারী সৃষ্টি করা। এর অর্থ, মর্ম উদ্ধারের জন্য সুযোগ্য অধ্যয়নকারী সৃষ্টি করা। সাধারণ মানুষের নিকট পবিত্র কুরআনের শিক্ষা পৌঁছে দেয়া, এর বিষয়বস্তুসমূহ ব্যাপক প্রচার করা, এর মাধ্যমে মানুষের বাতিল- ভ্রান্ত আকীদা- বিশ্বাস, রীতি-নীতিসমূহের সংশোধন করা। সর্বসাধারণকে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত করা। মহানবী সা.-এঁর সুন্নাহর আলোকে মানুষের জীবন গড়া। আল্লাহ তাআলার নিরঙ্কুশ তাওহীদের আকীদা ঈমানদারদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা। শিরক প্রত্যাখ্যান করা এবং তা হতে বিরত থাকা।

২. ইসলামী ফিকহ, ফাতাওয়া, নির্ভুল চর্চা করা, ইজতিহাদী যোগ্যতা অর্জন করা। সমসাময়িক যুগে আলিম এবং সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত ভুল মাসআলাসমূহের সংশোধনে ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা

১-৩. নোমান, পৃ. ৮-২০; আল্লামা হাফেজ জুনায়েদ বাবুনগরীর রচনাসমগ্র, পৃ. ৩৯৩-৩৯৫; আব্দুল বাকী মুহাম্মদ, ড. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮-৮৯।

করা। মজবুত, নির্ভুল উৎসসমূহের অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ ও প্রকাশ করা। এক্ষেত্রে সলফে সালেহীনের (সাহাবা, তাবিঈন, তাবে' তাবিঈন) আমল, আখলাক, চিন্তা চেতনার পৃষ্ঠপোষকতা করা।

৩) নিরঙ্কুশ তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা, বিশুদ্ধ ঈমান আকীদার চর্চা করা, শিরকী আকীদা, আচার অনুষ্ঠানসমূহ প্রত্যাখ্যান করা। বিভিন্ন বাতিল ফিরকা, ভন্ড পীর, ভন্ড দরবেশ, ভন্ড ফকির, ভন্ড সুফীর মাধ্যমে প্রচলিত শরীআত বিরোধী কর্মকাণ্ডসমূহ- কবরপূজা, মাজারপূজা, দরগাপূজা, পীরপূজা, পীরের কীর্তন, বন্দনা, ওরশানুষ্ঠান, ওরশে নারী-পুরুষের নর্তন কুর্দন ইত্যাদি প্রতিহত ও সংশোধনের ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা।

১. আল্লাহতাআলার নিরঙ্কুশ তাওহীদ প্রতিষ্ঠিত সত্য। হযরত আদম আ. থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সা. সকলেই প্রাপ্ত অহীর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নিরঙ্কুশ তাওহীদ সম্বন্ধে একটি সুনির্দিষ্ট আকীদা-বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাওহীদের বিষয়ে বিন্দুমাত্র ফাঁক-ফোকর রাখেননি। বান্দার যাবতীয় নেক আমলের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভুল তাওহীদী আকীদার উপর নির্ভরশীল। আম্বিয়ায়ে কিরামের মাধ্যমে যে

ইল্‌ম ও মারিফাত নির্ভুলভাবে মানব জাতির নিকট পৌঁছেছে তন্মধ্যে সবচেয়ে উচ্চাঙ্গের, জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ ইলম হলো আল্লাহ তাআলার যাত, সীফাতের (সত্ত্বা, গুণাবলী) ইলম। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যকার বিশেষ সম্পর্ক এবং আবিদ ও মা'বুদের অবস্থান সুস্পষ্ট করার ইলম। বিশুদ্ধ আকীদা, আমলের উপর মানবজাতির সৌভাগ্য, কল্যাণ, শান্তি, দুনিয়া ও আখিরাতের মুক্তি নির্ভরশীল। বিশুদ্ধ আকীদা আখলাক, চরিত্র ও সভ্যতার মূল ভিত্তি। এর মাধ্যমে স্বজাতি ও সমমনাদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ আকীদা বিশ্বাসের ভিত্তিতে জীবনের গন্তব্য, সিদ্ধান্তগ্রহণ এবং লক্ষ্য স্থির করা হয়। বিশেষত: এ উম্মতের সাথে মহান আল্লাহর তাআলার যে সম্পর্ক, সমর্থন, সাহায্য, সন্তুষ্টি, ভালোবাসা, বিজয় ও সম্মানের প্রতিশ্রুতি রয়েছে; তা কেবল নির্ভুল আকীদা, বিশ্বাস, নিষ্কলুষ তাওহীদের উপর নির্ভরশীল। পবিত্র কুরআনে এসেছে : ১. الله لا اله الا هو الحي القيوم আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক।[১]

২. انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما তোমাদের ইলাহ তো কেবল আল্লাহই। যিনি ব্যাতীত অন্য কোন ইলাহ নেই । তাঁর জ্ঞান সর্ববিষয়ে ব্যাপ্ত।[২]

৩. و الهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم আর তোমাদের ইলাহ এক। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি অসীম দয়ালু ও দাতা।[৩]

৪. انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني و اقم الصلوة لذكري আমি আল্লাহ, আমা ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণে সালাত কায়েম কর।[৪]

৫. الله خالق كل شيء و هو علي كل شيء وكيل আল্লাহ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, এবং তিনি সব সবকিছুর কর্মবিধায়ক।[৫]

৬. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلا بعضهم علي بعض سبحان الله عما يصيفون আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি। তাঁর সাথে অপর কোন ইলাহ নেই। যতি থাকত তাহলে প্রত্যেক ইলাহ স্বীয় সৃষ্টিকে নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অপরের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করত। তারা যা বলে তা হতে আল্লাহ কত পবিত্র।[৬]

হাদীসে এসেছে-

بني الاسلام علي خمس شهادة الا اله الا الله و ان مـ
رسول الله و اقام الصلوة وايتاء الزكوة و الحج و صوم رمضان

১. আল কুরআন, ২: ২৫৫।
২. আল কুরআন, ২০ : ৯৮।
৩. আল কুরআন, ২ : ১৬৩।
৪. আল কুরআন, ২০ : ১৪।
৫. আল কুরআন, ৩৯ : ৬২।
৬. আল কুরআন, ৪০ : ৯১।

'ইব্‌ন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমার বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি। ১. আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ সা. আল্লাহর রাসূল এ সাক্ষ্য দেয়া। ২. সালাত কায়েম করা ৩. যাকাত দেয়া ৪. হজ্ব করা ৫. রমযানের সিয়াম পালন করা।'[১]

আম্বিয়ায়ে কিরামের ওয়ারিস এবং সত্যিকার প্রতিনিধি হক্কানী আলিমগণ; যারা আল্লাহর দ্বীনের স্বভাব, প্রকৃতি, চাহিদা, সম্পর্কে জ্ঞাত রয়েছেন তারা তাওহীদের আকীদাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ভূমিকে সম্পূর্ণরূপে পরিচ্ছন্ন ও সমতল করেন। শিরক ও অজ্ঞতার শিকড়গুলো যত প্রাচীনই হোক, পৌত্তলিকতার নতুন সংস্করণ হোক কিংবা জাতীয় ও স্থানীয় প্রভাবশালীদের প্রভাবের পরিণতিতেই হোক তা খুঁজে বের করেন এবং শিকড়গুলো উপড়ে ফেলেন। এতে তাঁদের যতই বিলম্ব হোক, যতই কষ্ট হোক, যতই যাতনা হোক তাঁরা সম্পূর্ণ দৃঢ়তা, নিষ্ঠা, ধৈর্য ও প্রত্যয়ের সাথে কাজ করেছেন।

শির্‌ক মানব জাতির সবচেয়ে ভয়াবহ ও পুরনো রোগ। এটা আল্লাহ তাআলার কুদরত, আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত করে, ক্রোধানল প্রজ্বলিত করে। এছাড়া বান্দার আত্মিক, চারিত্রিক, সাংস্কৃতিক

উন্নতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। শির্ক মানুষের শক্তি, সক্ষমতাকে গলাটিপে হত্যা করে, তাদের যোগ্যতাসমূহকে ধ্বংস করে, আত্ম পরিচয়কে বিলীন করে এবং আল্লাহ তাআলার উপর আস্থা ও আত্মবিশ্বাসের পতন ঘটায়। এর ফলে বান্দা সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, দয়ালু ও দাতা মার্জনাকারী, মহব্বতকারী, আল্লাহর নিরাপত্তা ও আশ্রয় থেকে বের হয়ে যায়। তাঁর অফুরন্ত কল্যাণের ধন-ভাণ্ডার থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে সে অক্ষম, দুর্বল, নি:স্ব, অসহায়, দৈন্য, নগণ্য, সৃষ্টি জীবের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে।[২] যা কখনো গ্রহণযোগ্য ও ক্ষমাযোগ্য নয়। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন :

১. ان الله لا يغفر ان يشرك به و يغفر ما دون ذالك لمن يشاء নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। এ ব্যতীত সবকিছু যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।[৩]

২. و الذين يدعون من دون الله لا بخلقون شيأ وهم يخلقون 'তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদের আহ্বান করে তারা কিছুই সৃষ্টি করে না, তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়।'[৪]

৩. ان الذين تدعون আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদেরকে ডাক তারা তো তোমাদের মতো বান্দা।[৫]

৪. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق وهم يعلمون আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাদেরকে ডাকে সুপারিশের ক্ষমতা তাদের নেই। তবে যারা সত্য উপলব্ধি করে এর সাক্ষ্য দেয় তারা ব্যতীত।[৬]

৫. الذي له ملك السموت والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী; তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি। তাঁর সার্বভৌমত্বে কোন শরীক নেই।[৭]

জীবিত বা মৃত কোন সত্তাকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে নেয়া, আল্লাহর গুণাবলী ও কাজকর্মকে তাঁর সাথে সম্পৃক্ত করা, আল্লাহর নৈকট্য লাভ ও তাঁর শাফাআত পাওয়ার প্রত্যাশায় কারো প্রতি অত্যধিক সম্মান প্রদর্শন করা তাঁর সাথে এমন সব আচরণ ও কাজকর্ম করা যা ইবাদাত তুল্য। যেমনটি পৌত্তলিকরা দেবতার সাথে করে থাকে আর বলে ما نعبدهم الا ليقربونا الي আমরা তাদের পূজা কেবল এ জন্য করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটতর করে দেবে।[৮] শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী

১. বুখারী শরীফ, সম্পাদনা পরিষদ, প্রাগুক্ত, খন্ড ১ম, পৃ. ১৫, হাদীস নং-৭।
২. *সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস*, (আব্দুল হালীম হুসাইনী, শাহ, অনূ), প্রাগুক্ত, খ. ৫ম, পৃ. ৯২-৯৫।
৩. আল কুরআন, ৪ : ১১৬।
৪. আল কুরআন, ১৬ : ২০।
৫. আল কুরআন, ৭ : ১৯৪।
৬. আল কুরআন, ৪৩ : ৮৬।
৭. আল কুরআন, ২৫ : ২।
৮. আল কুরআন, ৩৯ : ৩।

র.[১] *আল ফাওযুল কাবীর* গ্রন্থে লিখেছেন শিরক হচ্ছে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য এমন গুণাবলী সাব্যস্ত করা যে গুণাবলী আল্লাহর জন্য সুনির্দিষ্ট।[২]

মুফতী সাহেব তাওহীদ ও শিরকের মধ্যে প্রাচীর রচনা করেছেন। বিষয় দুটোকে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেছেন। তাওহীদের নিগূঢ়তা, বাস্তবতাকে প্রস্ফুটিত করেছেন। শিরকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংশয়, সংমিশ্রণের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন। আকীদা বিশ্বাসের দোষ-ত্রুটিসমূহ এবং এর মধ্যে শির্ক অনুপ্রবেশের উপাদানগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন। তিনি আকীদাসমূহের সংশোধন, তথ্য জ্ঞানের কাজসমূহ কুরআন, হাদীসের আলোকে আঞ্জাম দিয়েছেন। এ বিষয়ে সাহাবা-ই কিরাম, তাবেঈনের আদর্শ, চিন্তাধারা অনুযায়ী কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন। নিজে এর উপর আমল করে শিক্ষনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

২.ফিকহ্ শাস্ত্রের অনেক জটিল বিষয় যেগুলোর সমাধান দিতে যুগের আলিমগণ হিমশিম খেতেন মুফতী সাহেব সহজেই সেগুলোর সমাধান দিয়েছেন। ভবিষ্যতে দ্বীনের জন্য ক্ষতির কারণ হওয়ার আশংকা রাখে যে বিষয়গুলোকে সমসাময়িক আলিমগণ অদূরদর্শীতাবশত উপলদ্ধি করতে পারেননি বরং তাদের নিকট ভাল মনে হচ্ছিল; মুফতী সাহেব সে বিষয়গুলোকেও সংস্কার কর্মসূচীর অন্তর্ভূক্ত করেছেন। শরীআতের অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেগুলো সমাজে অপ্রচলিত ছিল, সাধারণ মানুষসহ আলিম, বিজ্ঞজনদের দৃষ্টিতেও আড়ালে ছিল; মুফতী সাহেবের দৃষ্টিতে সেগুলো ধরা পড়েছে। কোন কোন মাসআলায় সারা দেশের আলিমগণের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। শরীআতের দৃষ্টিতে যে বিষয়গুলো সত্য, শুদ্ধ, সেগুলো প্রকাশ করতে কোন সমালোচনা,লজ্জা, ভয়, পরনিন্দার পরোয়া করেননি। কেউ এমন অভিযোগ করতেন যে, মুফতী ফয়যুল্লাহর উস্তাদ সমতুল্য মুরুব্বীগণ যাঁরা তাঁর চেয়ে ইলম আমলে গ্রহণযোগ্য ও অগ্রগামী এবং সমাজে ব্যাপক পরিচিত; তাঁরা যেসব কাজ কোনরকম প্রশ্ন আপত্তি ব্যতিরেকে করে যাচ্ছেন; মুফতী সাহেব সেগুলো কেন নিষেধ করেন? তাঁদের এমন প্রশ্নের উত্তরে মুফতী সাহেব হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী'র এ উক্তি উদ্বৃত করতেন, 'আল্লাহ তাআলা আমার কলমের মাধ্যমে কোন কোন বিষয়ের ক্ষতিকর দিকগুলো প্রকাশ করিয়ে দেন যা অন্যরা প্রকাশ করেননি। একারণে মানুষ আমার ব্যাপক সমালোচনা করে থাকেন।'[৩] মুফতী সাহেব অন্যত্র বলেন, জনৈক ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি যেসব রুসুম-রেওয়াজ প্রথা পদ্ধতি নিষেধ করছেন, অপরাপর আলিমগণ কেন করেননা?

---

১. **শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবীঃ** তিনি ছিলেন যুগ শ্রেষ্ঠ আলিম, মুহাদ্দিস, দার্শনিক, মুজতাহিদ, রাজনীতিক, গ্রন্থকার ও সমাজ সংস্কারক। ১৭০৩ খৃ. দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আব্দুর রহীম'র নিকট কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিকহ ও দর্শন শিক্ষা লাভ করেন। ১৭ বছর বয়সে তরীকত শিক্ষা দানে পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। ১২ বছর পিতার রহীমিয়া মাদ্রাসায় অধ্যাপনা করেন। ১৭৩০ খৃ. মক্কা ও মদীনায় গমন করেন এবং তথাকার মুহাদ্দিসগণের নিকট হাদীসের উচ্চতর সনদ লাভ করেন। ১৭৩২ খৃ. ভারতে প্রত্যাবর্তন করে পুনরায় রহীমিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৭৬২ খৃ. ইন্তিকাল করেন এবং দিল্লীতে সমাহিত হন। তাঁর ধর্মীয়, রাজনৈতিক, আর্থ সামাজিক চিন্তাধারা মুসলিম জাহানে আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাঁর রচিত হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ গ্রন্থটি মুসলিম বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডারে অমূল্য সংযোজন। (ইকরাম, মুহাম্মদ, শায়খ, অধ্যাপক, *মওজে কাওসার*, লাহোর, ফিরোজ এণ্ড সন্স, ১৯৫৮, পৃ. ৩৪৫-৪৬।)

২. সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস, (আব্দুল হালীম হুসাইনী, শাহ, অনুঃ) প্রাগুক্ত, খ. ৫ম, পৃ. ১১০।

৩. *নোমান*, পৃ. ৮-৯।

৪. আহকামুদ দাওয়াতিল মুরাওওজাহ, পৃ. ৮।

এর উত্তরে তিনি বললেন, এ প্রশ্নটি আপনি আমাকে যেভাবে করেছেন, অন্যদেরকে কেন করেননা যে আপনারা যে, রুসুম-রেওয়াজকে নিষেধ করেননা মুফতী সাহেব কেন সেগুলো নিষেধ করেন? বিষয়টি নিয়ে আমার বিরুদ্ধে আপনার যেমন প্রশ্ন রয়েছে, তাদের বিরুদ্ধেও আমার তেমন প্রশ্ন রয়েছে।[১]

মুসলিম সমাজে বিয়ে একটি অপরিহার্য বিষয়। সমাজের প্রতিটি নারী-পুরুষ বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকেন কিন্তু মুসলিম সমাজের বিয়ে-শাদীর অনুষ্ঠানে বর্তমানে এতটা অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড রুসুম-রেওয়াজ, বদদ্বীনী অনুপ্রবেশ করেছে যেগুলো সম্পূর্ণভাবে শরীআত বিরুদ্ধ। সমাজে এসবের প্রভাব এত বেশি যে, এগুলো থেকে বেরিয়ে আসার চিন্তা, কল্পনা সাধারণ মানুষতো করেনই না অনেক দ্বীনদার মানুষও অসম্ভব মনে করেন। মুফতী ফয়যুল্লাহ এক্ষেত্রে একজন পূর্ণাঙ্গ সংস্কারকের ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি নিজের বিয়ে এবং কন্যাদের বিয়ে দিতে যেয়ে ইসলামী শরীআত সম্পূর্ণভাবে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। সলফে সালেহীনের আদর্শ অনুসরণে সফল হয়েছেন। প্রচলিত রুসুম-রেওয়াজ

সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ছোট কন্যা যয়নবের বিয়ের মজলিসে তিনি যে ভাষণ প্রদান করেছেন এবং জনগণকে প্রচলিত রুসুম-রেওয়াজ, প্রথার ক্ষতিকর দিকসমূহ বুঝাতে সক্ষম হয়েছেন তা নি:সন্দেহে তাজদীদী কার্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত। উক্ত বিয়েতে তাঁর প্রদত্ত খুতবার সার কথা ছিল : হে আল্লাহ! তুমি আমার ভাই ফয়েয আহম্মদ চৌধুরীকে দীর্ঘায়ু দান কর, সকল অনিষ্টতা ও বিপদ হতে রক্ষা কর । হে আমার ভ্রাতা আপনি আমাদের সর্দার আমাদের বয়োজ্যেষ্ট বরং সর্বদিক দিয়ে এলাকার সবার বড়। কী বয়সে কী মর্যাদায়, কী সম্মানে, কী প্রভাব প্রতিপত্তিতে, সব দিয়ে আপনি বড়। আমি আপনার ছোট ভাই, আপনাকে উদ্দেশ্য করে আমি কয়েকটি কথা বলেছি, আশা করি আপনারা এ কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনবেন ও এখলাসের সাথে গ্রহণ করবেন। আমরা, তোমরা সবাই অধিক বৃদ্ধ এবং দূর্বল হয়ে গেছি, মৃত্যুর কাছাকাছি চলে এসেছি, অচিরেই আমাদেরকে কবরে স্থাপন করা হবে; সুতরাং আমরা কি সে দিন সে অবস্থার জন্য প্রস্তুত আছি? হাশরের দিনে আমাদেরকে যে পাকড়াও করা হবে তার জন্য কি প্রস্তুতি নিয়েছি? শরীআতের দৃষ্টিতে বিয়ে -শাদী অত্যন্ত সহজ একটি কাজ। কিন্তু বর্তমানে আমরা সব দিক মিলিয়ে এটিকে অত্যন্ত কঠিন করে দিয়েছি। এর সঙ্গে আনুষাঙ্গিক অবার্চীন বিষয়গুলো যুক্ত করে অর্থ, বিত্ত ব্যয়ের মহড়া সাজিয়েছি। এসবই কৃত্রিম, শরীআত অস্বীকৃত। অনুসঙ্গ হিসেবে যুক্ত বিলাসিতা, ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হয়েছে দুনিয়াদারদের নিকট হতে। সল্‌ফে সালিহীনদের পক্ষ হতে নয়। এসব কৃত্রিমতার ভিত্তি ও উৎস হল লোক দেখানো, যশ, খ্যাতি, সুনাম, প্রশংসা, আত্মগৌরব অর্জন। বদনাম, অপবাদ থেকে বাঁচার অপচেষ্টা। এসবের মধ্যে বিন্দুমাত্র ইখলাস নেই, সওয়াব নেই। শুধুই অর্থের অপচয়। এসবে লিপ্ত হবার ফলে দ্বীন, দুনিয়া দুটোই ধ্বংস হয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং অসম্ভব নয় যে, এসব কৃত্রিমতা, প্রথা, প্রচলন, খারাপ পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। মুসলমানদের এসব পরিত্যাগ করা কর্তব্য। বিশেষ করে সুন্নত প্রেমিকদের উপর অবশ্যই কর্তব্য। আলিমদের এসবের সাথে জড়িয়ে যাওয়া অধিক গুমরাহীর কারণ। এতে গুমরাহীর নেতৃত্ব দেওয়া হবে। আল্লাহর কসম ! যদি এসব কৃত্রিম বিষয় সওয়াবের কাজ হত, ভাল কোন পরিণতি বয়ে নিয়ে আসত তাহলে আমরাই আগে এগুলোতে লিপ্ত হতাম এবং জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতাম। তাই আমি আপনাদেরকে এসব পরিত্যাগ করতে বলছি ও সতর্ক করছি। হে আমার বড় ভাই! এর পূর্বে আপনি দুই ছেলে ও তিন মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। নিজের ইচ্ছামত অনুষ্ঠান করেছেন। সুতরাং এ বিয়েটাকে গণীমত, উত্তম সুযোগ মনে করুন। এ বিয়েটাকে সব ধরণের বিলাসিতা, অপচয়, অপ্রয়োজনীয় কার্যাদি থেকে মুক্ত রাখুন। তাহলে উভয় জাহানে কামিয়াব হবেন। আল্লাহ আমাদের রব, আমরা তাঁর বান্দা, অধীনস্থ গোলাম। কিন্তু আজ আমরা রুসুম -রেওয়াজ প্রবৃত্তিকে প্রভূ বানিয়ে নিয়েছি। আল্লাহ তাআলা ও মহানবী সা. এর বিরুদ্ধাচরণ করতে কোন পরোয়া করছি না। আফসোস! কীভাবে সব ওলট পালট হয়ে গেল। আমার মেয়ে সুন্দরের অধিকারী নয় তবে ইল্‌ম, কামালতের অধিকারিণী আলহামদুলিল্লাহ। সে কিতাব পাঠ করেছে ,আরবী শিখেছে এবং কুরআন হাদীসের অর্থ বুঝেছে। প্রকৃত সৌন্দর্য মনের শুচি, শুদ্ধি, অভ্যন্তরীণ পূর্ণতা ও যোগ্যতা । আল্লাহতাআলা তাঁকে হায়াত দারাজ করুন এবং নেক ও দ্বীনদার কন্যায় পরিণত করুন। আপনার ছেলে আমার ছেলে, আমার মেয়ে আপনার মেয়ে
তাদের দ্বীন দুনিয়ার কল্যাণের জন্য আমরা সবার নিকট দু'আ প্রার্থনা করব। আপনার ছেলে ইল্‌মে দ্বীন শিখছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকেও হায়াত দারাজ করুন। নেক, দ্বীনদার, সুন্নতের অনুসারী, সুসন্তান হিসেবে গড়ে তুলুন এবং বিদআত থেকে বাঁচিয়ে রাখুন। আল্লাহ তাআলা এ বিয়েকে সাইয়্যিদুল কায়িনাতের পবিত্র স্ত্রী এবং তার কন্যাগণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বিয়ে হিসেবে কবূল করুন।[১]

ফরয নামাযের পর ইমাম, মুক্তাদীর মধ্যে প্রচলিত সম্মিলিত দুআর বিষয়েও মুফতী সাহেব দ্বিমত করেছেন। তাঁর বক্তব্য হলো, চার মাযহাবের প্রথম সারির আলিমগণের পক্ষ থেকে এ দুআ সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এদেশের অধিকাংশ আলিম বিষয়টি সম্বন্ধে অনবগত। তিনি প্রকৃত বিষয়টি আবিষ্কার করতে এবং জাতির সামনে পেশ করতে সক্ষম হয়েছেন। ফরয নামাযের পর ইমাম মুক্তাদীর সম্মিলিত মুনাজাতকে বিদ'আত আখ্যা দিয়ে প্রচণ্ড সমালোচনা সম্মুখীন হয়েছিলেন। অনেকের অভিযোগ ছিল, তিনি আকাবিরে দেওবন্দ এবং তরীকতের শায়খগণের আমল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। কেউ কেউ এমন বক্তব্যও লিখেছেন, কোন কিছু সুন্নত বা মুস্তাহাব হিসেবে গণ্য ও প্রমাণিত হওয়ার জন্য প্রয়োজন মহানবী

সা. এর পক্ষ থেকে প্রমাণ থাকা চাই। মুফতী সাহেবের মতে এ ধরণের প্রশ্ন বা সংশয় সম্পূর্ণ ভুল এবং প্রকৃত বিষয় সম্বন্ধে অজ্ঞতার প্রমাণ। তিনি তাঁর রচিত كام الدعوات المروجة في هذه الازمنة গ্রন্থে মুফতী রশীদ আহমদ লুধিয়ানুবী র. আহসানুল ফাতাওয়ায় শিরোনামে এবং মুফতী ইব্রাহীম সাদিকাবাদী طريقه গ্রন্থসমূহে আকাবিরে আলিমগণের অনেক বক্তব্য উদ্বৃত করেছেন এবং ফরয নামাযের পর প্রচলিত মুনাজাতকে অবৈধ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। উপরোক্ত গ্রন্থসমূহে কয়েকজন বিখ্যাত আলিমে দীন যেমন- আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি র., খলীল আহমদ সাহারানপুরী র., মাওলানা ইজায আলী দেওবন্দী র., মুফতী মুহাম্মদ শফী র., আল্লামা ইউসুফ বিননূরী র.[২] মুফতী মাহমূদুল হাসান গাঙ্গূহী এবং মাওলানা মনযূর আহমদ নোমানী র. প্রমূখের বক্তব্যের উদ্ধৃতি রয়েছে। বুখারী শরীফের ভাষ্যগ্রন্থ ফয়যুল বারীর ২য় খন্ডে ১৬৭ পৃষ্ঠায় আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি র. বলেন:

الادعية بهية الكذا ية لم يثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم ولم يثبت عنه رفع الايدي دبر الصلوات ভাল করে জানা উচিত আজকাল যেভাবে দুআ করার রেওয়াজ চলছে এটা রাসূলুল্লাহ সা.থেকে প্রমাণিত নয়। এবং নামাযের পরে যে দু'আ করা হয় তাতে হাত ওঠানোর বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সা. থেকে প্রমাণিত নয়।[৩]

আল উরফুশ্শুজী গ্রন্থে (পৃ. ৮৬) এসেছে, শাহ সাহেব অন্যত্র বলেছেন, نعم الادعية بعد الفريضة ثابتة كثيرا بلا رفع اليدين و بدون الاجتماع হ্যাঁ ফরয নামাযের পর দুআ করার বিষয়ে অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে তবে হাত ওঠানো এবং সম্মিলিতভাবে দুআ করার বিষয়টি প্রমাণিত নয়।[৪] উপরোক্ত গ্রন্থে (খন্ড ১ম, পৃ. ১৮৭) তিনি অন্যত্র বলেন, استدل بعض بحديث الباب علي الدعاء بعد المكتوبة با لهييأة المتعارفة في اصل العصر والحال انه لم يدل عليه فانه ليس فيه ذكر انهم دعوا مجتمعين বর্তমানে ফরয নামাযের পর যে দুআ প্রচলিত রয়েছে বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কেউ সংশ্লিষ্ট হাদীস দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করেছেন। প্রকৃত এ হাদীসটি এ বিষয়ের প্রমাণ বহন করে না। কেননা এর মধ্যে এমন কোন প্রমাণ নেই যে, সাহাবাগণ সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে দুআ করেছেন।[৫]

---

১. *আল-ফালাহু ফীমা ইয়াতাআল্লাকু বিন্নিকাহি*, পৃ. ২৬-২৭; *হায়াতে মুফতী আযম*, পৃ. ১৯৩-১৯৭।

২. আল্লামা ইউসুফ বিন নূরী র. ছিলেন সর্বজন পরিচিত খ্যাতিমান মুহাদ্দিস ফকীহ তাঁর রচিত *মাআরিফুস সুনান* গ্রন্থখানা মুসলিম মিল্লাতের জন্য এক বিরাট অবদান। এছাড়াও তিনি অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। করাচীর নিউটাউন মাদ্রাসার প্রধান পরিচালক ও শায়খুল হাদীস ছিলেন। তিনি আরবীতে অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারতেন। (নূর মোহাম্মদ আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩।

৩-৫. নোমান, পৃ.১১-১২; *আহকামুদ দা'ওয়াতিল মুরাওওয়াযাহ*, পৃ. ৫৯।

ফয়যুলবারী গ্রন্থে আরও এসেছে, আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি র. বলেন, نعم نحكم بكونها بدعة اذا افضي الامر الي النكير علي من تركها আমরা এভাবে দুআ করাকে বিদআত বলব। কারণ কেউ দুআ না করলে তাকে তিরষ্কার করা হয়।[১] তিনি অন্যত্র বলেন,

للدعاء كجماعة الصلوة و الانكار علي تاركها و نصب امام ثم اتمام به فيه وغير ذالك من قلة العلم و كثر الجهل و الجاه যেসব বিষয় নতুন পরে আবিষ্কার করা হয়েছে তা হলো, নামাযের ন্যায় দুআর জন্যও জমায়েত হওয়া বা একসাথে দুআ করা, কেউ দুআ না করলে তাকে তিরষ্কার করা হয়, দুআর জন্য একজন ইমাম নির্বাচন করা হয় এবং অন্যরা আমীন আমীন বলে তার আনুগত্য করে। এগুলো জ্ঞানের দৈন্যতা ও অজ্ঞতার কারণে হচ্ছে মূর্খরা হয়তো সীমাতিক্রম করবে অথবা প্রয়োজনীয় দায়িত্বের চেয়ে কম আদায় করবে।[২]

মাআরিফুস সুনান গ্রন্থে (খ. ৩য়, পৃ. ৪১০) এসেছে, আল্লামা ইউসুফ বিননূরী র. বলেন, و يقول بعض اهل العصر من الحنفية لما ثبت الدعاء بتلك الهيية في موضع فليعد الي دبر المكتو بات ايضا

و ليستدل لذالك بالعموم – قال شيخنا (الكشميري) القول ان الاحتجاج بالعموم انما ينبغي فيما لم يرد للخاس حكم عليحدة و نفس ثبوت الرفع في الدعاء بالامراخر ان الادعية عنه صلي الله عليه و سلم في اثرالمكتوبات لم يثبت فيه الرفع নফল নামাযের পর নবী করীম সা. দু জায়গায় হাত উঠিয়ে দুআ করেছেন বলে প্রমাণ আছে। এর ভিত্তিতে আধুনিককালে হানাফী মাযহাবের কোন আলিম বলেন, যেহেতু একটি নির্দিষ্ট সময়ে দুআ করার বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সা. হতে প্রমাণিত তাই ফরযের পর দুআ করার ক্ষেত্রে একে প্রয়োগ করা যাবে। কিন্তু আমাদের শায়খ আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি র. বলেন, সাধারণ অবস্থার দলীল দ্বারা বিশেষ অবস্থার জন্য তখনি প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা যাবে যখন বিশেষ অবস্থার জন্য পৃথক কোন আদেশ বা বিধান থাকবে না কিন্তু এখানে এ বিধান আরোপিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সা. ফরয নামাজের পর সম্মিলিতভাবে এবং হাত উঠিয়ে দুআ করেননি। দুআর সময় দুহাত উত্তোলনের বিষয়টি প্রমাণ হওয়া একটি ভিন্ন বিষয়। আর ফরয নামাযের পর দুআ করার জন্য হাত ওঠানো ওপর একটি ভিন্ন বিষয়। সুতরাং ফরয নামাযের পর দুআ করার সময় হাত ওঠানোর বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সা. হতে প্রমাণিত নয়।[৩]
অন্যত্র তিনি পরিষ্কার বলেছেন, قد راج في كثير من البلاد الدعاء بهيية الاجتماعية رافعين ايديهم بعد الصلوة المكتوبة ولم يثبت ذالك في عهده صلي الله عليه و سلم و بالاخص بالمواظبت نعم ثبتت ادعية كثيرة بالتواتر بعد الكمتوبة ولكنها من غير رفع الايدي ومن غير هيية اجتماعية অসংখ্য শহর বন্দরে এটা প্রথা হয়ে গেছে যে, লোকেরা ফরয নামাযের পর সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে দুআ করে। অথচ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সা. এর সময় কখনো প্রচলিত ছিল না। সব সময় করবেন তো দূরের কথা। হাঁ ফরয নামাযসমূহের পর দুআ করার বিষয়টি মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তবে ঐ দুআ ইজতিমাঈ ভাবে হাত উঠিয়ে করেননি।[৪] মুফতী সাহেবের মতে, কোন কাজ বা আমল তা'মীলযোগ্য হওয়ার জন্য সালফে সালিহীনের আমলের প্রমাণ থাকতে হবে। অন্যথায় সবকিছুকে আমল যোগ্য মনে করা হলে বিদআত আর বিদআত থাকবে না। কেননা, প্রতিটি বিদআতের স্বপক্ষে কিছু না কিছু যুক্তি, প্রমাণ ও প্রয়োজনের কথা উত্থাপন করা হয়ে থাকে। কারণেই সুন্নত, মুস্তাহাব, প্রমাণ করতে হলে প্রয়োজন বিশেষ কোন দলীল অথবা উত্তম তিন যুগের কোন আমল।[৫]

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি ও ইউসুফ বিন নূরী র. এর বক্তব্য দ্বারাও প্রচলিত দুআর বিষয়টি অবৈধ প্রমাণিত হয়েছে। কারণেই মুফতী সাহেব তাঁর الدعوات المروجة في هذه الازمنة গ্রন্থে বিষয়টি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যার কিছু সারকথা হলো: বিষয়টি গুরুত্বের সাথে অনুধাবন করতে হবে যে, হাদীস বর্ণনাকারীগণ রাসূলুল্লাহ সা.এর বক্তব্য, কর্ম ও সম্মতিসমূহ অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করেছেন। এমনকি ঘরের ভেতর অন্ধকার রাতে যখন তিনি ছাড়া আর কেউ থাকতনা সেসময় তিনি কি কি আমল করেছেন ও কি কি দুআ করেছেন সেগুলোর খুটিনাটি বিষয়ও

১-৩. ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মদ, মুফতী, *আহকামুদ দা'ওয়াতিল মুরাওওয়াযাহ, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০,৬১; নোমান, পৃ. ১২,১৫।
৪-৫. ঐ, পৃ. ৬১, নোমান ১২-১৩।

বর্ণনাকারীগণ বর্ণনা করেছেন। কিছু আমল এমন ছিল যেগুলো শুধুই অভ্যাসবশত প্রকাশ পেত যে বিষয়গুলো ইবাদত, আনুগত্যের অন্তর্ভূক্ত ছিলনা সেগুলোও তারা বর্ণনা করেছেন। যেমন- আকাশের দিকে তাকিয়ে মহানবীর হাসি দেয়া, চিন্তা গবেষণার সময় লাঠি দিয়ে মাটিতে আলতো আঘাত করতে থাকা ইত্যাদি। এসব বিষয়ও মুহাদ্দিস, বর্ণনাকারীগণের নিকট অজ্ঞাত থাকেনি। সুতরাং যে আমল রাসূলুল্লাহ সা.প্রকাশ্যে সম্মিলিতভাবে আদায় করেছেন সেগুলো কোন বর্ণনাকারী বর্ণনা করবেন না তা কেমনে হয়? এটা অসম্ভব! যদি সাহাবাগণের যুগে ফরয নামাযের পর রাসূলুল্লাহ সা. একবারও মুনাজাত করতেন বিষয়টি কত সংখ্যক হাদীসে বর্ণিত হতো তার কোন হিসেব থাকতো না। পক্ষান্তরে প্রসঙ্গটির নাম নিশানাও হাদীসের গ্রন্থসমূহে উল্লেখ নেই। আরো একটি বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে যে, নবুওয়্যতের তেইশ বছরে তিনি একা নামাযের ইমামতি করেছেন। দীর্ঘ দিনের ইমামতিতে যদি ফরয নামাযের পর সাহাবীগণকে নিয়ে হাত উঠিয়ে একদিন বা একবারও দুআ করতেন তাহলে অবশ্যই তাঁরা বিষয়টি বর্ণনা করতেন। অথচ বিশুদ্ধ বা দুর্বল কোন প্রকারের হাদীসেই প্রসঙ্গটি আসেনি। বরং সাহাবা,

তাবেঈন এবং মুজতাহিদ ইমামগণের মাধ্যমে এ ধরণের দুআর বিষয়টি বর্ণিত হয়নি। সুতরাং বিষয়টি নাজায়িয তাই প্রমাণিত হয়।[১]

মুফতী সাহেব অন্যত্র বলেন, لاذكار و بعض الفاظ اللادعية بعد المكتوبات ثابتة مسنونة يقينا لكن علي طور الانفراد بغير رفع الايدي لا علي طور الهيية الاجتماعية رافعين الايدي ফরয নামাযের পর কিছু যিক্‌র এবং দুআর বাক্য পাঠ করার বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সা. এর পক্ষ হতে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত এবং সুন্নত। তবে হাত ওঠানো ব্যতীত এবং একাকীভাবে। সম্মিলিতভাবে, হাত উঠিয়ে নয়। পাঠকগণ! বিষয়গুলো আমার মত দরদের সাথে পাঠ করবেন এবং নীরবে চিন্তা গবেষণা করবেন। বিস্তারিত জানতে আমার কিতাবটি পড়বেন।[২]

মুফতী ফয়যুল্লাহ র. ফরয নামাযের পর প্রচলিত ইজতিমাঈ দুআকে প্রতিহত করতে অত্যন্ত জোরালো ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি বলেন, এটা স্পষ্ট যে, এ প্রচলিত মুনাজাত বিষয়ে তাহকীক করার পূর্বে আমি নিজেও বৈধ ও সুন্নত মনে করতাম। কিন্তু চূড়ান্ত তাহকীক, বিশ্লেষণ, অনুসন্ধান ও গবেষণার পর বুঝতে পারলাম এর কোন ভিত্তি নেই। সহীহ্, যয়ীফ, এমনকি বানোয়াট হাদীসেও এর কোন প্রমাণ নেই। অনুসরণীয় তিন যুগে এ আমলের প্রচলন ছিল না। সুতরাং আগে আমি এ দুআর বিষয়টিকে যে সুন্নত বলেছিলাম তা প্রত্যাখ্যান করলাম। এখন সবাইকে ঘোষণার মাধ্যমে জানিয়ে দিচ্ছি যে, এটা দ্বীনের মধ্যে বিদআত হিসেবে অনুপ্রবেশ করেছে। তিনি এও জানিয়ে দিলেন যে, অনারব দেশে সাধারণ মানুষ এবং আহলে ইলমগণও নেক নিয়তেই এ আমলটি করে আসছিল। এটা অসম্ভব কিছু নয়। অনেক সময় বড়দেরও ভুল হয়ে থাকে। যেমন- *হায়াতে আশরাফ* গ্রন্থে (পৃ. ২৮৬) এসেছে, হাকীমুল উম্মত শাহ আশরাফ আলী থানবী র. বলেন, লিখনীর জগতে কোন কোন স্থানে ব্যক্তিগত ধারণা অথবা অমনোযোগিতার কারণে কিছু ভুল-ক্রটি হয়ে গিয়েছিল। যা এখন বুঝে আসছে। পৃথকভাবে বিষয়টি অবগত করিয়ে দিচ্ছি। অনেক সময় লিখার পর আমার নিজেরও মনে পড়ে যে, পূর্বের কোন কোন উত্তর যে গলদ ছিল এটা প্রমাণ হয়েছে। প্রশ্নকারীর ঠিকানা অবগত হবার পর তাকে বিষয়টি জানিয়ে দিয়েছি। ঠিকানা না জানা থাকলে অথবা তার কাছে আমার সংশোধিত কপি না থাকলে তার ভুলের মধ্যে নিপতিত থাকার আশংকা থাকে। তাই সতর্কতার জন্য এ সংশোধনী লিখে দিলাম।[৩]

মুফতী সাহেবের দর্শনমতে দুআর ক্ষেত্রে এ বিদআতটি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার কারণ দ্বীনের নামে কোন একটি ভুল, অশুদ্ধ বিষয় চালু হয়ে গেলে সাধারণ মানুষের কাছে সেটি পবিত্র ও শরীআতসিদ্ধ হিসেবে স্থান লাভ করে। তখন এর বিপক্ষে, বিরুদ্ধে কথা বললে তারা শুনতে রাজী হয় না। তাইতো আজকাল সমাজে দ্বীনের নামে প্রচলিত অমূলক বর্ণনা, ঘটনা, মনচাহী অভ্যাস, রুসুম-রেওয়াজ, নিজেদের আবিস্কৃত বিদআত ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে। যেগুলো প্রত্যাখ্যান করতে সাধারণ মানুষ রাজী হচ্ছে না। শাহ

১-২. ঐ, পৃ. ৬১, নোমান ১২-১৩।
৩. ঐ, পৃ. ১৪-১৫, ১৬।

ওয়ালী উল্লাহ র. বলেন, ইসলামে বিদআতকে গুরুতর অপরাধ হিসেবে গণ্য করার কারণ এটা ইসলামকে বিকৃত করে। আগেকার মুসলমানগণ আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহর সুন্নতের মধ্যে নিজেদের পক্ষ থেকে কিছু সংযোজন করেছেন। পরবর্তী প্রজন্ম তন্মধ্যে আরো কিছু সংযোজন করেছে। এভাবে সংযোজন পরম্পরার কারণে শেষ পর্যন্ত বলা যাচ্ছেনা যে, মূল দ্বীন কোনটি এবং মানুষের পক্ষ থেকে সংযোজিত হয়েছে কোনটি? আফসোস! রাসূলুল্লাহ সা. -এর সুন্নতের এত গুরুত্ব দেয়া এবং শরীআতের পাবন্দি সত্ত্বেও উম্মতে মুসলিমা এত বাড়াবাড়িতে আক্রান্ত হয়েছে যে, দ্বীনের প্রতিটি শাখা প্রশাখায় এর প্রভাব দৃষ্টিগোচর হয়।[১]

হাদীসে এসেছে- قال مابتدع قوم بدعة في دينهم الا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها اليهم الي يوم القيامة হযরত হাস্‌সান রা. বলেন, কোন জাতি দ্বীনের মধ্যে কোন বিদআত অনুপ্রবেশ করালে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সে পরিমাণ সুন্নত উঠিয়ে নেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত উক্ত সুন্নত তাদের মধ্যে ফিরিয়ে দেননা। (দারামী, মিশকাত)।[২] অপর হাদীসে এসেছে,

قال ما اعرف شيأ مما كنا علي عهد رسول الله   فقلت اين الصلوة

হযরত আনাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা.এর যুগে আমরা দ্বীন ও শরীআতের যে বিষয়গুলোর উপর ছিলাম সেগুলোর কোন নমুনাই আজ অবশিষ্ট নেই চেনার মতো। তাঁর এক শিষ্য বললেন, তাহলে আমাদের নামাযের কি অবস্থা? তিনি বললেন, তবে কি তোমরা তোমাদের নামাযের এমন কিছু করছ না যা তোমাদের কাছে ভাল মনে হয়।[৩]

يأتي علي الناس من عام الا احدثوا فيه بدعة و اماتوا سنة حتي تحي

ইব্‌ন আব্বাস রা. বলেন, মানুষের উপর কোন বছর গত হয়না কিন্তু তারা একটা না একটা বিদ'আত আবিস্কার করেই এবং সাথে একটি সুন্নতকে মিটিয়ে দেয়। এভাবে চলতে চলতে এক সময় বিদ'আত জীবিত হয় এবং সুন্নতসমূহ মিটে যায়।[৪]

ঈদের নামাযে খুৎবার পর, তারাবীর নামাযের প্রতি চার রাকাআত পর পর, বিশ রাকাআত আদায়ের পর, বিতর নামাযের পর, বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হবার পর, যিয়ারতের পর, বুখারী শরীফ খতমের পর সম্মিলিতভাবে হাত উত্তোলন করে দুআ করাকে তিনি বিদআত বলেছেন। যদিও বাংলাদেশে অসংখ্য নির্ভরযোগ্য আলিমের মধ্যে এভাবে দুআ করার অভ্যাস ও আমল চালু রয়েছে। মুফতী সাহেব এসবের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। কারণ, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, উম্মতের মধ্যে কিছু লোক এমন হবে যারা দুআ ও পবিত্রতার ক্ষেত্রে সীমালংঘন করবে।[৫]

দ্বীনের আমলের মাপকাঠি প্রসঙ্গে মুফতী সাহেব বলেন, আমি মুজাদ্দিদে আলফে সানীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা বলব, সীরাতে ইমামে রব্বানী গ্রন্থের ২৬৮ পৃষ্ঠায় এসেছে, মুজাদ্দিদে আলফে সানীর খলীফা মাওলানা সালিহ র.বলেন, শায়খের অযীফাসমূহ একত্রিত করার পর আমলের অনুমতি প্রার্থনা করলাম। তখন তিনি বললেন, আনুগত্য করার উপযুক্ত তো রাসূলুল্লাহ সা.-এর আমল ও কর্মসমূহ যেগুলো হাদীসের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। আমি বললাম, হযরতের আমল তো রাসূলের আমলের মতই। তখন তিনি বললেন, যাও তোমাকে অনুমতি দিলাম। এ কথাটি স্মরণে রাখবে যে, আমার কোন আমল রাসূলুল্লাহ সা.এর সুন্নত মোতাবেক না হলে ত্যাগ করবে। খতমে খাজেগান যা প্রায় সব কওমী মাদ্রাসায় প্রচলিত রয়েছে। মুফতী সাহেব বিষয়টিকে বিদআত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এ বিষয়ে বাংলাদেশের হাজারো আলিমের সাথে দ্বিমত করেছেন।[৬]

১.*মাআরিফুল কুরআন*, (অনূ) ঢাকা, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০, ১ম স.. খ.২য়, পৃ. ৬০৩-৬০৪

২. *ফয়যুল কালাম*, পৃ.৯০, হাদীস নং ১২৪।

৩. ঐ, পৃ. ১১০, হাদীস নং- ১৪১।

৪. *ফয়যুল কালাম*, পৃ.১১২, হাদীস নং ১৪৬।

৫-৬. নোমান, পৃ. ১৪-১৮।

৩. ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রতি যুগেই জাহিল, মূর্খ ও পথভ্রষ্ট- ভন্ডপীর, ভন্ড দরবেশ, ভন্ড ফকীর, ভন্ড সূফী ও বাতিল ফিরকার মাধ্যমে দরগাপূজা, কবরপূজা, মাজারপূজা, পীরপূজা, ওরশ-কীর্তন, পীর-বন্দনা ইত্যাদির মাধ্যমে শির্‌কী আকীদা- বিশ্বাস, ধ্যান- ধারণা, বিদআতী রীতিনীতি, শরী'আত বিরোধী কর্মকাণ্ড ভয়ানক রূপ ধারণ করেছে। অজ্ঞ মুসলমানরা তাদের ধর্মীয় পীর, দিশারী, পথপ্রদর্শক, তরীকতের মাশাইখ, আউলিয়া কিরাম, পূন্যাত্মা বুযুর্গানে দ্বীনের বিষয়ে এমন উচ্চ পর্যায়ের শির্‌কী ধ্যান-ধারণা ও ভ্রান্ত আকীদা পোষণ করে। যেমনটি খৃস্টানরা হযরত ঈসা আ. এবং ইহুদীরা হযরত উযাইর আ. ও পোপ, পাদ্রীদের ক্ষেত্রে করে থাকে। আমাদের বুযুর্গদের মাজারে এমন সব অপকর্ম চলে যেগুলো অমুসলিমদের উপাসনালয় ও তাদের পূণ্যবানদের কবরে হয়ে থাকে। কবরবাসীর নিকট প্রকাশ্যে আবেদন-নিবেদন, ফরিয়াদ, সাহায্য প্রার্থনা, মনোবাঞ্চনা পূরণের আরাধনা চলে। তাদের কবরের উপর মসজিদ ও গম্বুজ নির্মাণ করা, কবরকে সিজদার স্থান বানানো, কবর বা মাজারে প্রতি বছর মেলার আয়োজন করা, দূর দূরান্ত থেকে সেখানে লোকজনের আগমনের প্রথা চালু রাখা, কবরে, মাজারে পূজা

দেয়া, মাজারওয়ালার প্রতি ভয়ভীতি রাখা, বুযুর্গদের প্রতি প্রভুত্বের সমপর্যায়ের বিশ্বাস রাখা, কবরের দিকে মুখ করে নামায আদায় করা, তাদের নিকট ফরিয়াদ করা, তাদের দোহাই দেয়া, আমার উপর দয়া কর এমন কথা বলা, দরগা ও মাজারে সাজসজ্জা করা, বুযুর্গদের উদ্দেশ্যে জীবজন্তু মান্নত ও জবাই করা, পীর ও তার বিবিদের উদ্দেশ্যে রোযা রাখা, পীরদের সম্মানসূচক সিজদা করা, মৃত পীরদের কবরে চাদর জড়ানো, পীর সূফীদের সাথে নারীদের বেপর্দা আনাগোনা, বেপর্দা সম্পর্ক স্থাপন করা ইত্যাদি জাহিলি যুগের জীবনধারা ও রূপরেখা।[১]

সুফীদের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তাদের মধ্যে এমন সব কথা মুখে মুখে প্রচলিত আছে কুরআন হাদীসের সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই। এক্ষেত্রে এতটা বাড়াবাড়ি আকীদা ও আমলের বিপর্যয় ও বিকৃতি ঘটেছে যা, জাহিলিয়াতের পথভ্রষ্টতাকেও হার মানিয়েছে। বহু লোক মৃত ব্যক্তিকে খোদার মর্যাদায় বসিয়ে দিয়েছে। জীবিত পীর, কবরের খাদেমকে পয়গাম্বরের আসনে বসিয়ে দিয়েছে। এরা আল্লাহকে ভয় করে না। পক্ষান্তরে মাজারের খাদেমকে ভয় করে। মসজিদ মাদ্রাসার বিষয়ে তাদের কোন ভয় থাকে না, সেখানে চেঁচামেচি করতে দ্বিধা করেনা। অথচ মাজারের গম্বুজ দেখলেই চুপ হয়ে যায়, শায়িত লোকটিকে ভয় করে, তার নিকট হতে বিপদের আশংকা করে। অনেক মূর্খ, জাহিল, বুযুর্গানে দ্বীন সম্বন্ধে মনে করে তারা দুনিয়ার তাবৎ ব্যাবস্থাপনা আঞ্জাম দিয়ে থাকেন। বিপদ আপদ দূর করাই তাদের কাজ। কিন্তু মুসলমানদের কখনো এ জাতীয় আকীদা থাকতে পারে না। এগুলো কেবলমাত্র খৃস্টানরা মসীহ আ. এর ক্ষেত্রে করে থাকে। অনেকেই পীর বুযুর্গকে হালাল হারামের মালিক বানিয়ে দিয়েছে। কখনো এমন হয় যে, কেউ মাজার যিয়ারতে গেলে খাদেম ভিতরে ঢুকে এবং ফিরে এসে বলে, আমি হযরতের কাছে আপনার আরজ পেশ করে দিয়েছি। তিনি হযরত পয়গম্বর সাহেবকে বলে দিয়েছেন। আর পয়গম্বর সাহেব তা আল্লাহর দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন। এমন ভয়ানক চাতুরী প্রায় সব কবর ও মাজারে সর্বদায়ই চলছে। আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্র কালামে বলেন, و كيف
با الله مالم ينزل به عليكم سلطانا فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون তোমরা যাকে আল্লাহর শরীক কর আমি কিভাবে তাকে ভয় করব? অথচ তোমরা আল্লাহর শরীক করতে ভয় করনা, যে বিষয়ে তিনি তোমাদেরকে কোন সনদ দেননি। সুতরাং যদি তোমরা জান তবে বল, দুই দলের মধ্যে কোন দল নিরাপত্তা লাভের অধিকারী?[২]

অনেকেই মসজিদগুলোকে জনশূন্য, ভগ্নদশা ও প্রায় ধ্বংস অবস্থায় ফেলে রাখে। পক্ষান্তরে মাজারগুলোকে জমজমাট রাখে। মাজারের ওপর গেলাফ, স্বর্ণ রৌপ্যের ঝালর লটকানো হয়। মেঝে ও গায়ে মর্মর পাথরের মোজাইক করা হয়। সকাল সন্ধ্যায় নযর নিয়ায আসে। এসবই আল্লাহ-রাসূলের প্রতি অবজ্ঞা এবং শির্কের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। যদি মসজিদ ও মাজারের নামে ওয়াকফ থাকে, তাহলে দেখা

১. সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস, (আব্দুল হালীম হুসাইনী অনু:) প্রাগুক্ত, খ. ৫ম, পৃ. ৯৬-৯৭।
২. আল কুরআন, ৬ : ৮২-৮৩

যায়, মাজারকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। এহেন আচরণ আরবের মুশরিক এবং ইহুদী খৃস্টানরাও পছন্দ করে না। এ ধরণের ধোকা প্রতারণায় কেউ প্রবেশ করতে চায় না। অনেক প্রতারক মাজারে প্রদত্ত মান্নতের দ্রব্যকে স্বর্গীয় প্রসাদ বলে প্রচার করার অপচেষ্টা করে। দর্শনার্থীর নিকট হতে অর্থ উপার্জনের পথ আবিস্কার করে। যেন পবিত্র কুরআনের এ আয়াতের পূর্ণ চিত্র ফুটে ওঠে: يا ايهاالذين امنوا ان كثيرا
من الاحبار و رهبان ليأكلو امول الناس با لباطل ويصدون عن سبيل الله হে মু'মিনগণ! ইয়াহুদী পন্ডিত ও খৃস্টান বৈরাগীরা মানুষের ধন সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করে থাকে এবং মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে।[১]

একটি মুসলিম দেশ, ইসলামের বড় বড় হাজারো ইমাম, মুহাদ্দিস, মুফতী, ফকীহ, আলিম, অসংখ্য মাদ্রাসা ও ইলমী মারকায থাকার পরও মুসলমান জনসাধারণ কিরূপ মূর্খতা, ভ্রান্ত আকীদা ও গুমরাহীর মধ্যে লিপ্ত আছে তা সহজেই অনুমেয়। মুফতী ফয়যুল্লাহ এসব শিরকী কর্মকাণ্ড, রীতিনীতি,

আকীদা ও ধ্যান ধারণা প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং ওগুলোর মূলে আঘাত করেছেন। তিনি স্পষ্ট ঘোষণা দিলেন, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট দুআ প্রার্থনা করা বৈধ নয়। কোন জীবিত বা মৃত ব্যক্তির সামনে সিজদায় অবনত হওয়া বৈধ নয়। এগুলো শিরক, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল হারাম ঘোষণা করেছেন। তিনি আরো বলেন, মৃতের নিকট প্রয়োজনীয় জিনিস চাওয়া, ফরিয়াদ জানানো, চাই তিনি পয়গাম্বর হন বা আল্লাহর ওয়ালী বৈধ নয়। শরী'আতে মুহাম্মদীর সাথে এসবের কোন সম্পর্ক নেই। প্রকৃত অর্থে এগুলো মূর্তিপূজা। এ সম্বন্ধে মুসলিম উম্মাহর ইমামগণ একমত। ইসলামের সোনালী ও সর্বোত্তম যুগে এসবের প্রচলন ছিল না। মানুষ আল্লাহ তাআলার ইবাদাত করে সাথে অন্য মানুষ এবং শক্তিরও পূজা করে। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন, জেনে রাখ, শিরক মুক্ত, অবিমিশ্রিত আনুগত্যই আল্লাহর প্রাপ্য।[২]

শিরকের মধ্যে সবচেয়ে বড় শিরক হল কবরে সিজদা করা, কবরবাসীর নিকট কোন কিছু প্রার্থনা করা। তাদের সুপারিশে কোন কিছুর আশা করা। যে কোন নেককার, পরহেযগার, বুযুর্গ, সুফী, দরবেশ কেন বরং কোন নবী বা ফিরিশতার নিকট কোন কিছু প্রার্থনা করা বৈধ নয়। আমরা সকলেই আল্লাহর ভিক্ষুক, কেউ কারো উকিল, তদবীরকারক নই। ভাল, মন্দ সবকিছু আল্লাহর দান। শিরকমুক্ত খালেছ তাওহীদ, একমাত্র আল্লাহর আনুগত্যের শিক্ষা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নবীগণ দিয়ে গেছেন। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের শিক্ষাও তাই। আল্লাহর অলিদের কবর হাতে স্পর্শ করা, কবরে হাত মুছে মুখে, কপালে লাগানো এবং পূণ্যের কাজ মনে করা গুনাহ। অনেকেই কবরে শায়িত ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা ও মুনাজাত করেন এবং বলেন, তারা যেন জীবিতদের জন্য কল্যাণ কামনা করে। এসবই ভ্রান্ত ধারণা। কারণ, জীবিত ব্যক্তি নিজের জন্য এবং অন্যের জন্য দুআ করতে পারে, মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ করতে পারে। তা কবুলেরও সম্ভাবনা থাকে, অনেক মহাপাপীর দুআও আল্লাহ কবুল করে থাকেন। পক্ষান্তরে মৃত ব্যক্তির দুআ কবুল হয় না, কারো জন্য কোন কিছু কামনা করার শক্তিও তার থাকে না, জীবিত ও মৃতদের সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। মৃত বুযুর্গের নিকট দুআর জন্য আবেদন করা মূর্তিপূজার অন্তর্ভূক্ত।[৩] মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ বিদআত পরিত্যাগ করে সুন্নাহর অনুসরণের প্রতি মানুষকে আহ্বান করেছেন। আল্লাহর যে নির্দেশগুলো মানুষ ভুলে গেছে বা উপেক্ষা করছে সেগুলোর দিকে আহ্বান করেছেন। সমাজে প্রচলিত জাহিলিয়াত যুগের বিদ'আত ও শির্ক মুক্ত ঈমান রাখা ও আমল করার প্রতি আহ্বান করেছেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস, বদরুসুম, শরী'আত বিরোধী কর্মকাণ্ড, সংস্কার ও সংশোধনের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলার সাথে সাধারণ মানুষের মজবুত সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষে শরঈ ইলম শিক্ষাদান, রচনা- পরিচালনা, ওয়ায- নসীহতের পথ বেছে নিয়েছিলেন। পবিত্র কুরআন হাদীসের মাধ্যমে আকীদা ও চরিত্র সংশোধনের ফলপ্রসু চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। উগ্রবাদীদের বিকৃতি, রদ-বদল, মিথ্যা পূজারী ও মূর্খদের অপব্যাখ্যা থেকে দ্বীনকে হেফাজত করেছেন। কবর, মাজার, দরগা, ওরশ, ভন্ডপীর,

১. আল কুরআন, ৯ : ৩৪।

২. আল কুরআন, ৩৯ : ৩।

৩. *ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা*, বর্ষ, ৪৫, সংখ্যা ২য়, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৫, পৃ. ১৬১।

ভন্ড ফকির, ভন্ড সুফীদের কার্যক্রমকে শরীআতের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য নাফরমানী বলে আখ্যায়িত করেছেন। এগুলো সংশোধনে চ্যালেঞ্জ হিসেবে ভূমিকা রেখেছেন। তাঁর সংস্কার কর্মসূচী বিষয়টি লিখনীর মাধ্যমেও ছড়িয়ে দিতে حق کي رهنماي – المسلك الصريح - - دلاويز - ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি পরিষ্কারভাবে লিখেছেন, সুফীগণের মধ্যে প্রচলিত বিলায়াতের রাস্তা একটি স্পর্শকাতর বিষয়। পক্ষান্তরে নবুওয়্যতী তরীকা হলো রাজপথের ন্যায়। যার উপর দিয়ে গন্তব্যে পৌঁছা সহজ। তাই তিনি বিলায়াতের পথ অবলম্বন না করে নবুওয়্যতের রাস্তা অবলম্বন করেছেন এবং উম্মতকেও আহ্বান জানিয়েছেন। রাহে নবুওয়্যত প্রাপ্তির জন্য তিনি পনেরটি আমলের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।[১]

তিনি ছিলেন উচ্চস্বরে যিকিরের ঘোর বিরোধী। এর প্রমাণ হিসেবে রাসূলুল্লাহ সা. এর এ হাদীস পেশ করেছেন: যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য সালাত কায়েম করল, সে শিরক করল। যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য দান করল সেও শিরক করল। (*মুসনাদে আহমদ*) । ওয়াজ মাহফিলে ইসলামের মূল

বিষয় বাদ দিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত কাওয়ালী ঢঙে কবিতা পাঠেরও তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। আত্মশুদ্ধির জন্য সুফীগণের বাতলানো যিকর, মুরাকাবা, মুশাহাদাকে তিনি সঠিক মনে করতেন না। তাঁর মতে এসবের ফলে মূল ইবাদাত, ফরয, ওয়াজিব পালনের পরিবর্তে প্রবৃত্তি পূজা নর্তন কুর্দনের আয়োজন হয়। কখনও নর-নারী একত্রে গান বাজনার আসর বসায়, যা শরীআত সিদ্ধ নয়। তিনি বিশ্বাস করতেন, এগুলো ইসলামের অপব্যাখ্যা ও বিকৃত আচরণ। তিনি মহিলাদের কবর যিয়ারতকে সমর্থন করেননি। রাসূলুল্লাহ সা. কবর যিয়ারতকারী নারীর উপর লানত করেছেন। কবরস্থানে সিজদা দেয়া, বাতি জ্বালানো, আলোকসজ্জা করার বিরুদ্ধে জোরালো ভূমিকা পালন করেছেন। উম্মত মাতা হযরত আয়িশা সিদ্দীকার রা. বর্ণনা, 'রাসূলুল্লাহ সা. মৃত্যু শয্যায় ঐসব ইহুদি খৃস্টানের উপর লানত করেছেন যারা তাদের নবীগণের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে।' এসব গুমরাহী শরীআত বিরোধী কর্মকাণ্ড সংস্কারে মুফতী সাহেব মুজাহিদের ভূমিকা পালন করেছেন। সুফীগণের রাহে বিলায়াত তরীকার বিরুদ্ধে সভা, সমিতি, ওয়াজ, নসীহত ও শক্তিশালী লিখনীর মাধ্যমে সংস্কার আন্দোলন পরিচালনা করেছেন। সত্যের সন্ধান ও আত্মশুদ্ধি নামক গ্রন্থে তিনি এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। অশ্লীল, অশালীন আচরণ, নারীদের বেপর্দা, নিমজ্জিত করে এ জাতীয় তাসাউফ, তরীকতের কূনীতি হতে তিনি জাতিকে উদ্ধারের চেষ্টা করেছেন। মানুষকে সীরাতে মুস্তাকীমের উপর চলার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি শাহ আব্দুল ওয়াহ্হাব নজদীর ন্যায় বলতেন, যারা মানুষকে দ্বীনের মৌলিক শিক্ষার দিকে আহ্বান করে, দ্বীনের কোন বিধান লঙ্ঘন করে না; তারাও যদি কবরপূজা, বিদআত ইত্যাদির বিরুদ্ধে কথা বলেন, তখনই কবরপূজারীরা সত্যানুসারীদের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগে যায়। তাদের কুৎসা রটনা করে। পক্ষান্তরে, বিদআতপন্থীরা ক্ষমতাসীনদের দেবত্যরূপে গ্রহণ করে। তাদের প্রশংসা, স্তুতি গায়।[২] মুফতী সাহেব ছিলেন বাংলাদেশের আলিমদের মধ্যে উপরোক্ত গুণের সর্বোচ্চ অধিকারী, উলূমে নববীর প্রচার, দ্বীনি নিদর্শন সংরক্ষণ, আল্লাহর বিধান, নবীর সুন্নত প্রবর্তন করা ছিল তাঁর মজ্জাগত বিষয়। সুন্নতে নববীর পুনরুজ্জীবন দান করা ও বিদআত উৎখাতের যুদ্ধ সংগ্রামের জন্য আল্লাহ তাআলা তাঁকে অস্বাভাবিক শক্তি দান করেছিলেন। তিনি তাঁর সর্ব শক্তি ও যোগ্যতা দিয়ে মানুষকে আল্লাহর দ্বীনের সাথে যুক্ত করেছেন। সঠিক মুহূর্তে দ্বীন হেফাজতের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর অসামান্য যোগ্যতা, ইলমী দক্ষতা, রূহানী কামালত এবং সমুদয় সংস্কারমূলক কার্যক্রমের ভিত্তিতে তাঁর জীবদ্দশাতেই মানুষ তাঁকে মুজাদ্দিদ ভাবতে শুরু করেছিল। মাসআলা, মাসাইলে যেসব ভ্রান্তি ঘটেছিল। সেগুলো পরিস্কার করে ঔজ্জ্বল্য দান করেছেন। বিদআতের স্তম্ভের উপর ইসলামী শরীআতের সৌধ নির্মাণ করেছেন। তিনি কোন বিষয়ে কলম ধরলে মনে হতো গায়েবের পক্ষ থেকে ইলমের ঝর্ণাধারা তাঁর সামনে প্রবাহিত হচ্ছে এবং তাঁর ইলমের বাগানকে সিঞ্চিত করছে। সুন্নত পুনরুজ্জীবনে তিনি ছিলেন মুজাদ্দিদে আলফে সানীর নীতি অবলম্বনকারী, ইলম ও

১. ঐ, পৃ. ২০০।
২. ঐ, পৃ. ১৫৫।

মারিফাতে শাহ ওয়ালী উল্লাহ র.-এর দৃষ্টান্ত, বিদআত নির্মূলে শাহ ইসমাঈল শহীদ র.[১] এর ন্যায় মর্দে মুজাহিদ, ইল্‌ম কালাম ও মুনাযারায় ছিলেন মাওলানা কাসিম নানুতাবীর[২] দৃষ্টান্ত, ফিকহ ও ফাতাওয়ায় মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গূহীর ন্যায় আন্তঃ মুজতাহিদ। ইসলাহ ও তরবিয়তে ছিলেন মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর নমুনা। তিনি সর্বক্ষেত্রে সাহাবা-ই কিরামের নকশা তুলে ধরেছেন। সত্য প্রকাশে নির্ভীক সাহসী বাগ্মীর ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর সংস্কার কর্ম ছোট থেকে বড়, সাধারণ থেকে অসাধারণ সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর অন্তরে যেসব বিষয় ইলকা করেছেন তা বক্তৃতা ও লিখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। তাঁর সংস্কার মূলক লিখনী ও সংকলনের বিশাল ভাণ্ডার এখন পর্যন্ত মওজুদ রয়েছে। যদ্বারা উম্মতে মুহাম্মদী এখন পর্যন্ত উপকৃত হচ্ছে।[৩]

১. শাহ ইসমাঈল শহীদ র. ছিলেন শাহ ওয়ালীউল্লাহর পৌত্র। ১৭৭৯ খৃ. মোজাফফর নগর জেলার ফুলাতে তাঁর জন্ম। মাত্র ষোল বছর বয়সে লেখাপড়া সমাপ্ত করেন। সায়্যিদ আহমদ শহীদের (১৭৮৬-১৮৩১ খৃ.) হাতে বায়আত হয়ে ওয়াজ বক্তৃতার মাধ্যমে মানুষকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করেন। সামরিক বিদ্যায় ব্যাপক অভিজ্ঞ ছিলেন। ১৮৩১ খৃ. ৬ মে পাঞ্জাবের শিক নেতা রণজিৎ সিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদত বরণ করেন। তাকবিয়াতুল ঈমান তাঁর অমর গ্রন্থ। (আব্দুল মান্নান, সৈয়দ, (অনূ.), *মুজাহিদ বাহিনীর ইতিবৃত্ত* ঢাকা, ই.ফা.বা. ১৯৮৮, পৃ. ১১৩-১২৯।)

২.মাওলানা কাসিম নানুতবী র. ১৮৩২ খৃ. সাহারানপুর জেলার নানুতায় জন্মগ্রহণ করেন। ধর্মীয় কিতাবাদী পাঠ করেন মাওলানা মামলূক আলীর নিকট। হাদীসের কিতাবসমূহ পাঠ করেন মাওলানা আব্দুল গণী মুজাদ্দিদী ও আহমদ আলী সাহারানপুরীর নিকট। তাসাওফের দীক্ষা লাভ করেন হাজী ইমদাদ উল্লাহ মুহাজিরে মক্কীর নিকট। ১৮৫৭ খৃ. স্বাধীনতা সংগ্রামে সিপাহসালার ছিলেন। ১৮৬৭ খৃ. দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠায় অনন্য ভূমিকা পালন করেন। ১৮৮০ খৃ. তিনি ইন্তিকাল করেন। (সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ঢাকা, ই.ফা.বা. ১৯৮৭, পৃ. ২৭০-২৭১)।

৩. নোমান, পৃ. ১৭-১৯।

সপ্তম অধ্যায় :
দেশপ্রেম ও রাজনৈতিক কার্যক্রম

মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ র. একজন খ্যাতিমান শিক্ষক, লেখক, সংস্কারক হিসেবে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছেন। শিক্ষকতা ও লিখনীর ময়দান ছিল তাঁর জন্য উর্বর। রাজনৈতিক দৌড় ঝাপ দেয়ার অবসর তাঁর জীবনে ছিল না। তাই তিনি রাজনীতিতে সরাসরি জড়িত ছিলেন না। তারপরও প্রয়োজনের সময় গর্জে ওঠতে পিছপা হননি। সাম্রাজ্যবাদ বৃটিশ, পাকিস্তান এমনকি বাংলাদেশ আমলেও ধর্মদ্রোহী শাসকদের বিরুদ্ধে সত্য উচ্চারণ করতে বিন্দুমাত্র ভয় পেতেন না। বৃটিশ নির্যাতন, জুলুমের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিয়েছেন। ১৯৪৭ এর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক হয়েছেন। তবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় তিনিসহ লক্ষ লক্ষ আলিম আশাহত হন। ১৯৬১ খৃ. আইয়ুব খান কর্তৃক *মুসলিম পারিবারিক আইন*, *জন্মনিয়ন্ত্রণ আইন*, ড. ফজলুর রহমান রচিত ইসলামের ইতিহাস বিকৃত পুস্তক *ইসলাম ও খতমে নবুওয়্যাত*, মির্জা গোলাম আহমদের কাদিয়ানী ফেতনা, পুঁজিবাদ, সমাজবাদ, ইহুদি, খৃস্টান পরিচালিত মিশনারী ষড়যন্ত্রসহ দেশ ও ধর্মবিরোধী যাবতীয় চক্রান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার ভূমিকা রেখেছেন। ছাত্র, শিস্য, মুরীদ, খলিফাদের ঐসব আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য তাগিদ করতেন। সে সময়ের বৃহত্তম ইসলামী দল নেজামে ইসলাম পার্টির দায়িত্বশীলদের সাথে আলোচনা, পরামর্শ অব্যাহত রাখতেন। ঐক্যবদ্ধভাবে জোরদার আন্দোলনের পরামর্শ দিতেন, উৎসাহ যোগাতেন এবং বলতেন তোমরা পাকিস্তানে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চালিয়ে যাও। আল্লাহর পক্ষ হতে সাহায্য আসবে।

মুফতী সাহেব প্রচলিত রাজনীতির ময়দানে সরগরম না থাকলেও ইসলামী রাজনীতির মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য তিনি কখনও ভুলেননি। তিনি ইসলামী রাজনীতিকে দ্বীন ও ইসলামী আমলের সাথে তুলনা করেছেন। আল্লাহ তাআলার ঘোষণা- ان الدين 'নি:সন্দেহে ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন।'[১] ومن يبتغ غير دينا فلن يقبل منه و هو من الخاسرين 'কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো কবূল করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হবে।'[২] অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ এ দায়িত্ব আদায়ে কখনও কোন ত্রুটি করেননি। তিনি ইসলামী হকুমত আদায়ের জন্য সংগ্রাম- সাধনা করেছেন। আল্লাহর দীনের শাসন ব্যতীত ইসলামী জীবন পূর্ণতা পায় না। ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون 'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই কাফির।'[৩]

هم الـ 'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই জালিম।'[৪]

يحكم بما انزل الله فاولئك هم ا 'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই ফাসিক।'[৫] এছাড়া শাসকদেরকে দেয় পত্র দাওয়াত এবং শায়খ আহমদ সেরহিন্দীর পত্র দাওয়াত পদ্ধতির মাধ্যমে সংশোধন প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন। তিনি শাসক এবং সাধারণ জনগণের আচার আচরণ পর্যবেক্ষণ করতেন। তাতে যে পরিমাণ ধর্মহীনতা, বিদআত, শরী'আত বিরুদ্ধ কর্মকাণ্ড, প্রতারণা, আত্মপ্রবঞ্চনা প্রবেশ করেছিল সেগুলোর সমালোচনা করেছেন, সংশোধনের পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর মতে ইসলামী রাজনীতিই হলো প্রকৃত ন্যায় ও ইনসাফের রাজনীতি। এর মধ্যে যাবতীয় কল্যাণ, বরকত,

১.আল-কুরআন, ৩ : ১৯।

২. আল-কুরআন, ৩ : ৮৫।

৩. আল-কুরআন, ৫ : ৪৪।

৪. আল-কুরআন, ৫ : ৪৫।

৫. আল-কুরআন, ৫ : ৪৭।

সৌভাগ্য এবং উভয় জাহানের সফলতা নিহিত। عليهم اهل

يكسبون هم যদি সেসব জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত ও তাকওয়া অবলম্বন করত তবে আমি তাদের জন্য আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর কল্যাণ উন্মুক্ত করতাম। কিন্তু তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল। সুতরাং তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলেন।[১] তিনি আলিম সুলভ জীবন যাপন করা এবং ইলমের জগতে গভীরভাবে নিমগ্ন থাকার পরও সাধারণ জনগণের জীবন যাপন পর্যবেক্ষণ করতেন। তিনি মুসলিম উম্মাহর নানাবিধ রোগ ব্যধি, দূর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করেছেন। এ বিষয়ে গভীর দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। সমাজে যেসব শরীআত ও নৈতিকতা বিরোধী গর্হিত অপরাধ অনুপ্রবেশ করেছিল সেগুলো সংশোধন করেছেন। রাষ্ট্রের মালিক, কর্মকর্তা, কর্মচারী, সাধারণ জনগণ যেই হোক না কেন সবাইকে সংশোধনের আহ্বান জানিয়েছেন। এক্ষেত্রে কোন আলিমকেও শাসাতে, সংশোধন করতে দ্বিধা করেননি। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর নিকট তিনি পত্র মারফত ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য বারবার আহ্বান জানিয়েছেন এবং শরীয়ত বিরোধী আইন ফরমান থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি খুব অনুশোচনা করেছেন যে, পাকিস্তান একটি মুসলিম রাষ্ট্র, এখানকার অধিবাসীরা মুসলমান, আইন প্রণেতারা মুসলমান, শাসকগণ মুসলমান তারপরও কুরআন-হাদীস ও ইসলাম বিরোধী আইন চালু রয়েছে।[২]

১. আল কুরআন, ৭ : ৯৭

২. নোমান, পৃ. ৬৫; মাকালাতে মুফতী আযম, পৃ. ৩৮, ৩৯, ; মুজিবুর রহমান, মোহাম্মদ, ***মুসলিম পারিবারিক আইন পরিচিতি***, ঢাকা, কামরুল বুক হাউস, ২০১২, পৃ. ২৬১-২৬৬, ২৯২-২৯৭; ***হাফেজ্জী হুজুরের রচনাসমগ্র*** , মুজিবুর রহমান হামিদী, সংকলিত, ঢাকা, হাফেজ্জী হুজুর গবেষণা ফাউণ্ডেশন, ২০১২, পৃ. ৮২।

অষ্টম অধ্যায় :
আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

বায়‘আত বা আধ্যাত্মিক কার্যক্রম কী? এ প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয়, বায়’আত নি:সন্দেহে মহানবী সা. এর একটি সুন্নত, নেহায়াত বরকতময় তরীকা। রাসূলুল্লাহ সা. সাহাবাগণ হতে আল্লাহর রাস্তায় জান-মালসহ সবকিছু কুরবান করা শপথ নিতেন। নামায কায়িম করা শরীআতের বিধান পালন করার ও শপথ নিতেন। হযরত জাবির রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, بايعنا رسول الله صلي الله عليه وسلم علي اقامة الصلوة و ايتاء الزكوة و النصح لكل مسلم ‘আমরা রাসূলুল্লাহ সা: এর নিকট নামায কায়িম করা যাকাত আদায় করা এবং মুসলমানকে সদুপদেশ দেয়ার বিষয়ে শপথ নিলাম। রাসূলুল্লাহ সা. হিজরত ও জিহাদের শপথ নিতেন। কখনও ইসলামের রুকন কায়িমের শপথ নিতেন। কখনও কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে দৃঢ়পদ থাকার শপথ নিতেন, কখনও সুন্নত আঁকড়ে ধরা এবং বিদআত পরিত্যাগ করার শপথ নিতেন। বর্তমানে বায়’আত কয়েক প্রকারের হয়ে গেছে। ১. বায়’আতে খিলাফত ২. বায়’আতে তাকওয়া ৩. বায়আতে হিজরত ও জিহাদ। এসব বায়আত মহানবী সা. হতে প্রমাণিত। যারা মনে করেন সম্মানিত সুফীগণের বায়’আত মহানবী সা. হতে প্রমাণিত নয়, ঐ সময় শুধু খিলাফতের বায়’আত প্রচলিত ছিল তা ঠিক নয়। যে বিষয়টি হযরত জারীর রা. সহ অন্যান্য সাহাবীগণের বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত যে, মহানবী সা. বিভিন্ন বিষয়ে বায়’আত নিতেন। কুফ্‌র ত্যাগ করে মুসলমান হওয়ার জন্যও বায়’আত নিতেন। তবে ইসলাম গ্রহণের বায়’আত রাসূলুল্লাহ সা.-এর ইন্তিকালের পর রহিত হয়ে গেছে। কারণ খুলাফা-ই রাশিদীনের যুগে মানুষ স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তখন বায়’আত প্রথা ছিল না। উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনামলে বায়’আত ইত্যদির প্রথা ছিল না। তখন উত্তরাধিকারসূত্রে খেলাফত প্রাপ্তির প্রথা হিসেবে জনগণের নিকট হতে বায়’আত নেয়া হতো। এমনকি খুলাফা-ই রাশিদীন, বনী উমাইয়া ও আব্বাসীয়দের শাসনামলে তাকওয়ার বায়’আতও উঠে গিয়েছিল। খুলাফা-ই রাশিদীন এবং সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সা.-এর সান্নিধ্য ও সোহবত লাভের বরকতে মহানবীর নূরে নূরান্বিত এবং নবুওয়্যতী শিষ্টাচার দ্বারা সমৃদ্ধ ছিলেন। তাঁদের জন্য তাকওয়ার বায়’আত প্রয়োজন ছিল না। খুলাফা-ই রাশিদীনের পর যেহেতু নানা ফেতনা, বদদ্বীনি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল তাই তাকওয়া ইত্যাদি বিষয়ে বায়’আতের সুন্নত তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। তবে সুফীগণের দৃষ্টিতে তাকওয়ার বায়’আতের প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়নি। কিন্তু তাঁরা সাধারণ মানুষের নিকট হতে এ ভয়ে বায়’আত নেননি যে খলীফা ও আমীর -উমারা তাদেরকে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অপরাধে অভিযুক্ত করবেন। খুলাফা-ই রাশিদীন ও আমীর উমারার খিলাফতপ্রথা ওঠে যাওয়ার পর সূফীগণ উক্ত বায়’আতের মৃত সুন্নতকে জিন্দা করার সুযোগ পেলেন। মানুষের মনে যখন কুফ্‌র আস্তে আস্তে বাসা বাঁধল, ঈমান-আকীদা মাখলুকের ক্ষমতার উপর বসতে শুরু করল, মানুষের দৃষ্টি মূল শক্তি হতে ফিরে বাহ্যিক কারণের উপর সীমাবদ্ধ হতে থাকল; তখন সূফীগণ মানুষের দিল মাখলুক হতে সরিয়ে খালিকের (সৃষ্টিকর্তা) সাথে স্থাপনের বিভিন্ন তরীকা উদ্ভাবন করলেন। কাজটি ছিল অত্যন্ত কঠিন। কারণেই তারা মানুষের ভেতর ও বাহির পরিস্কার করার জন্য বিভিন্ন তরীকা ও অযীফা আবিস্কার করেন। এর জন্য রাহে বিলায়াত, রাহে সুলুক, রাহে মারিফাত নামে কিছু পরিভাষা আবিষ্কার করেন এবং বিষয়টিকে একটি বিদ্যা বা শাস্ত্র হিসাবে আবিস্কার ও প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সূফীবাদের এ বিষয়টি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে উম্মতের ফায়দা পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু কালের পরিক্রমায় এর মধ্যে বিকৃতি এসেছে। হালে এমন অসংখ্য বিভ্রান্ত দল উপদলের এত বাড়াবাড়ি শুরু হয়েছে যে শুধুমাত্র মারিফাতকেই তারা মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য মনে করছে।[১] পক্ষান্তরে শরীআতের বিধি বিধানের অনুসরণ, আল্লাহ রাসূলের, আনুগত্য, ফরয, ওয়াজিব আদায় হতে বিরত রয়েছে। এমনকি এসব আদায়ের গুরুত্বকেও অস্বীকার করছে। ফলে এ সূফীবাদ ও সুলুকের

১. *হায়াতে মুফতী আযম*, পৃ. ২০০; মাশায়েখে চাটগাম, পৃ. ৩৮৬।

রাস্তা যা হিদায়াত প্রাপ্তির রাজপথ ছিল তা গুমরাহীর কারণে পরিণত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা এসব কিছু সংশোধনের জন্য যুগে যুগে একদল মুজাদ্দিদ, মুত্তাকী, মুসলিহে উম্মত, হক্কানী সূফী পাঠিয়েছেন। তারা সূফীবাদ ও মারিফাতের প্রকৃত রাস্তা ও উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছেন। শরীআত ও তরীকতকে একত্রে সমন্বিত করেছেন। যারা তরীকতকে মূল এবং শরীআতকে লঘু মনে করতেন তাদেরকে কুরআন হাদীসের আলোকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছেন যে, শরীআতই মূল আর প্রচলিত তাসাউফ তরীকা এর সহযোগী মাত্র। মুজাদ্দিদগণের এ সাধনা সর্বযুগেই ছিল এবং কিয়ামত পর্যন্তই অব্যাহত থাকবে। হাদীসে এসেছে- ان الله عز و جل يبعث لهذه لامة علي رأس كل مأة سنة من يجدد لها دينها নি:সন্দেহে মহান ক্ষমাধর আল্লাহ তা'আলা এ উম্মতের জন্য প্রতি শতাব্দীতে এমন মনীষী প্রেরণ করবেন, যিনি তাঁদের দ্বীনকে সংস্কার করবেন। আবূদাউদ '[১] মুজাদ্দিদগণের সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন। তবে গত দু-চার শতাব্দীতে যে কয়জন মুজাদ্দিদ অতিবাহিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মুজাদ্দিদ শায়খ আহমদ সিরহিন্দী র. ছিলেন দুনিয়াখ্যাত। ভারতের পূর্বাঞ্চল, বাংলা, আসামের জন্যও একদল মুজাদ্দিদ আল্লাহ তাআলা প্রেরণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে বিংশ শতাব্দীতে যিনি অনন্য ভূমিকা রেখেছেন তিনি হলেন, মুজাদ্দিদে মিল্লাত,মুসলিহে উম্মত মুফতী আযম ফয়যুল্লাহ র.। জীবনের প্রথম দিকে তিনি বায়'আতের তরীকর উপর চলার জন্য প্রচলিত তাসাউফের মতই বায়'আত গ্রহণ করতেন। পরবর্তীতে বায়'আত ও তাসাউফের প্রচলিত তরীকা সম্বন্ধে তাঁর মধ্যে এক ধরণের সংশয় সৃষ্টি হয় যে তাসাউফের নামে আস্তে আস্তে পীর পূজা, সুন্নতে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ, শরয়ী বিধি- বিধানের প্রতি অবজ্ঞা চলছে। তাই তিনি শরীআত ও তরীকতের হাকীকত এবং তরীকত ও তাসাউফের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট বিষয়গুলো মানুষকে পরিস্কার করে বুঝাতে লাগলেন এবং দীর্ঘদিনের প্রচলিত শরীআত ও সুন্নাত বিরোধী ফকীরি, দরবেশী, পীর-মুরীদির বিরুদ্ধে বক্তৃতা ও লিখনী পরিচালনা করেন। তিনি বিলায়াতের রাস্তা পরিত্যাগ করে নবুওয়্যতের রাস্তা অবলম্বন করেন এবং নিজের অনুসারীদেরকেও নবুওয়্যতের তরীকা অবলম্বন করার দাওয়াত দিতে থাকেন। তিনি লক্ষ্য ও উসীলা এ দুটোর মধ্যকার পার্থক্য অনুসারীদেরকে বুঝাতে সক্ষম হন যে, সূফীগণ ইসলাহে বাতিনের জন্য বিভিন্ন তরীকা বা ওষুধ আবিস্কার করেছিলেন , কিন্তু আস্তে আস্তে বিষয়টি এমন পর্যায়ে পৌঁছল যে, মানুষ উক্ত ওষুধকে মূল খাদ্য মনে করতে লাগল। পক্ষান্তরে মূল খাদ্য অর্থাৎ শরীআতের অনুসরণ, আল্লাহ ও রাসূলের পাবন্দির বিষয়ে অমনোযোগী রয়ে গেল। মুফতী সাহেব সারা জীবন প্রকাশ্যে, অপ্রকাশ্যে লিখনী, বক্তৃতার মাধ্যমে এসবের হাকীকত উম্মোচন করতে সক্ষম হয়েছেন। বিভিন্ন প্রবন্ধ, কবিতা ও গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে বিষয়টি পরিস্কারভাবে জাতির সামনে তুলে ধরেছেন। তাঁর রচিত - الحق الصريح - حق كي رهنماي- حب ايماني - مثنوي دلاويز গ্রন্থসমূহে তাসাউফের হাকীকত জাতির সামনে তুলে ধরেছেন এবং আত্নসংশোধনের পরামর্শ দিয়েছেন।[২]

বায়'আত লাভ ঃ মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ স্বীয় উস্তাদ সাঈদ আহমদ র. এর নিকট হতে ইজাযত ও খিলাফত লাভ করেছেন বলে আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন। এর পূর্বে তিনি কিভাবে ও কার নিকট বায়আত গ্রহণ করেছিলেন সে বিষয়ে জানা সম্ভব হয়নি । তবে মুফতী ইজহারুল ইসলাম চৌধুরী'র জিজ্ঞাসাবাদের প্রেক্ষিতে তিনি বলেছিলেন, দেওবন্দ থেকে ফেরার দুই তিন বছর পর অন্তরে বায়'আত হওয়ার চিন্তা জাগ্রত হয়। তবে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলাম কাকে শায়খ হিসেবে গ্রহণ করব এবং কার হাতে হাত রেখে বায়'আতের সুন্নত কাজটি আদায় করব। বিষয়টি নিয়ে আমি ইস্তিখারা করার পর দিল ও মন বড় মুহাদ্দিস সাহেব হুজুরের (সাইদ আহমদ) প্রতি রায় দিল। জীবনের শুরু থেকেই মুহাদ্দিস সাহেবের প্রতি প্রবল মহব্বত ছিল। তা'লীমি অনুগ্রহ, ভালবাসা, আদর, স্নেহের কারণে এমনিতেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট ছিলাম। তদপুরি ইস্তিখারার পর তাঁর প্রতি দিল ধাবিত হলে বিষয়টিকে গায়েবী ইঙ্গিত মনে করলাম। হযরতের নিকট আমার এ অভিপ্রায় প্রকাশ করলে তিনি আমাকে

---

১. *ফয়যুল কালাম*, পৃ. ১৬০, হাদীস নং ২১৫।

২. *হায়াতে মুফতী আযম*, পৃ. ২০০-২০৫; মাশায়েখে চাটগাম, পৃ. ৩৮৬-৩৮৭।

বায়'আত করলেন এবং বায়'আতের নিয়ম অনুযায়ী অযীফা তাসবীহ ইত্যদির সবক দিলেন। কিন্ত তা'লীম, তাদরীস, তাবলীগ, তাসনীফ এবং ফাতাওয়া, ফারাইয নিয়ে এত ব্যস্ত থাকতাম যে, ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অযীফাসমূহ আদায় করা সম্ভব হতো না। তথাপি আদায় করার চেষ্টা অব্যাহত ছিল। এভাবে দুয়েক বছর পার হওয়ার পর রমযানের আগমন খুব নিকটে ছিল। একদিন মুহাদ্দিস সাহেব হুজুর আমাকে বললেন, তুমি তো সারা বছর ব্যস্ততার মধ্যে কাটাও তবে এবারের রমযানের ছুটিতে কমপক্ষে চল্লিশ দিন ওয়ায-নসীহত, লিখনী ইত্যাদি বন্ধ রেখে দিনে দু বার আমার তাসবীহ ও অযীফাসমূহ আদায় করবে। তিনি হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গূহীর একটি ঘটনার বর্ণনা করলেন যে, হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী র.[১] একবার রশীদ আহমদকে এভাবেই আদেশ করেছিলেন। অল্প কিছুদিনের জন্য সবধরণের ব্যস্ততা থেকে নিজেকে অবসর করে তাসবীহ তাহলীল ও অযীফাসমূহ আদায় করার নির্দেশ দিলেন। স্বীয় মুর্শিদের নির্দেশ মতে তিনি কিছুদিন অযীফাসমূহ পাবন্দি করলেন এবং নিজের অবস্থা শায়খকে জানাতে থাকলেন। তবে তিনি জানালেন যে, সাধারণত সালিকীনদের যে অবস্থা হয় আমারও সেই অবস্থা। এর বাইরে কিছু নয়। হাজী সাহেব তখন তাকে শান্তনা দিতেন। ইতোমধ্যে মুহাদ্দিস সাহেব হুজুর আমাদের বাড়ীতে সময় সময় আসতে থাকেন। কখনও কখনও ওয়ায, নসীহতের জন্য হযরতকে আমাদের আশেপাশের এলাকায় দাওয়াত করা হত। একদিন বৃহস্পতিবার আমাদের মহল্লায় ওয়াজের জন্য তাঁকে দাওয়াত করা হলো। হযরত ঐদিন এবং পরেরদিন আমাদের বাড়ীতে অবস্থান করলেন। এরই মধ্যে আমাদের উপস্থিতিতে তিনি বললেন, 'কেউ যদি আমার হাতে আল্লাহর নাম নিতে চায় (বায়'আত হতে চায়) তাহলে সে যেন আমাকে জানিয়ে দেয়।' মুফতী সাহেব তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেন, যেহেতু আমার বয়স চল্লিশ পেরিয়েছিল আর মুফতী সাঈদ আহম্মদ সাহেবের হাজারো দয়া-অনুগ্রহের মধ্যে নিমজ্জিত ছিলাম, তাই তিনি আমাকে ইজাযত ও খিলাফত অর্পণ করলেন। ইজাযত প্রাপ্তির পর আমি কাউকে বায়'আত করিনি। এর মধ্যে একদিন এক জায়গায় আমার ও হযরতের দা'ওয়াত ছিল। সেখানে জনৈক মহিলা আমার নিকট বায়'আত হওয়ার জন্য আবেদন জানালে আমি তা প্রত্যাখ্যান করি। কিন্তু হযরত বললেন, তাকে বায়'আত করে নাও। এরপর থেকে আমি বায়'আত করতে থাকি।[২]

আনুষ্ঠানিক বায়'আত গ্রহণ

মুফতী ফয়যুল্লাহ ছোটকাল থেকেই সকলের প্রিয় ছিলেন। বয়সে ছোট হলেও সবাই তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। ছাত্রজীবনে সাথী বন্ধুদের নিকট সম্মানের পাত্র ছিলেন। উস্তাদগণের নিকটও আলাদা সম্মানের পাত্র ছিলেন। ছাত্রজীবনেই ছোট বড় সকলে তাঁকে বুযুর্গ মনে করতেন। মুফতী সাহেবের উস্তাদগণের জীবদ্দশাতেও ছাত্ররা কিতাব নিয়ে, সাধারণ মানুষ ফাতাওয়া- মাসাইল নিয়ে এবং বিপদ-মসীবতে আক্রান্তরা দু'আর আবেদন নিয়ে তাঁর দরবারে ভীড় করতেন। চল্লিশ বছর বয়সে আল্লাহর নবী-রাসূলগণ আসমানী অহী প্রাপ্ত হয়ে মানুষকে হিদায়াতের দায়িত্বে নিয়োজিত হতেন; তিনিও সে বয়সে খিলাফত প্রাপ্ত হয়ে উস্তাদ শায়খের পক্ষ থেকে ইজাযত নিয়ে উম্মতের ইসলাহ্'য় আত্মনিয়োগ করেন। প্রথমে তিনি সবাইকে যিকির করার সবক দিতেন। যিনি আসতেন তাকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী তাসাউফের প্রচলিত কিছু সবক দিতেন। জীবনের শেষ দিকে কেউ বায়'আত হতে আসলে তাকে

---

১. হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী র. ১৮১৭ খৃ. মুজাফফর নগর জেলার থানাবন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা হাফিজ মুহাম্মদ আমীন। বংশসূত্রে তনি ফারূকী, জমিদার পরিবারের সন্তান। পবিত্র কুরআন হিফজ করার পর আরবী, ফার্সী কিতাবসমূহ মুন্সী আব্দুর রায্যাক ও মুফতী ইলাহী বখশের নিকট পাঠ করেন। এরপর আর নিয়মতান্ত্রিক লিখা পড়া করেননি। তিনি ছিলেন ইল্ম লাদুন্নীর অধিকারী। ১৮৫৭ খৃ. আযাদী আন্দোলনে তিনি বীর সেনানীর ভূমিকা পালন করেন। ১৮৫৯ খৃ. ৪৩ বছর বয়সে মক্কায় গমন করেন এবং প্রায় ৪১ বছর সেখানে অবস্থান করেন। ১৮৯৯ খৃ. তিনি ইন্তিকাল করেছেন। (আব্দুর রশীদ আরশাদ, *বীস বড়ে মুসলমান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪-৯৫

২. *হায়াতে মুফতী আযম*, পৃ.২০৭-২০৯; মাশায়েখে চাটগাম, পৃ. ৩৮৯-৩৯০।

জিজ্ঞেস করতেন, আপনি কি বায়'আত হতে চান? যদি উত্তর দিত জ্বী হ্যাঁ, তাহলে পুনরায় জিজ্ঞেস করতেন এর পূর্বে কি কারো নিকট বায়'আত হয়েছিলেন? যদি উত্তর হতো হাঁ, তাহলে তিনি বলতেন, বায়'আত হওয়া তো ফরযও নয়, ওয়াজিব ও নয়, বরং মুস্তাহাব। আর ইহা যেহেতু একবার কারো নিকট আদায় হয়ে গেছে সেটাই যথেষ্ট। দ্বিতীয়বার বায়'আত হওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে যার হাতে সে বায়'আত হয়েছিল, সেই মুর্শিদ যদি সত্যিকার দ্বীনদার এবং জীবিত থাকতেন তাহলে তাকে বায়'আত করতেননা। পক্ষান্তরে মুর্শিদ বিদ'আতী, ফাসিক হলে আর আগন্তক বায়'আত হওয়ার জন্য আবেদন জানালে তিনি বায়'আত করতেন। যাদের মুর্শিদ জীবিত ছিলনা এমন কেউ বায়'আত হতে চাইলে বলতেন, বায়'আত হওয়ার মুস্তাহাব দায়িত্ব একবার আদায় হয়েছে সুতরাং দ্বিতীয়বার আর প্রয়োজন নেই। এ প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বার বার আবেদন জানালে তিনি তাকে বায়'আত করতেন। যদি দূর দূরান্ত থেকে কোন মহিলা বায়'আত হওয়ার জন্য আসতেন তাহলে তিনি খুব অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন এবং বলতেন, একটি মুস্তাহাব কাজের জন্য মেয়েদেরকে এত দূর আসা উচিত হয়নি। কেউ যদি নিজের স্ত্রী বা নিকটাত্মীয়া কোন মহিলাকে মুফতী সাহেবের নিকট নিয়ে আসার অনুমতি প্রার্থনা করত তাহলে তিনি অনুমতি দিতেননা বরং বলতেন, এই মুস্তাহাব কাজের জন্য এত কষ্ট উঠানো এবং এত গুরুত্ব দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তবে পত্র মারফত কোন মহিলা বায়'আত হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি অনুমতি দিতেন এবং পত্রে মহিলার জন্য প্রয়োজনীয় হিদায়াত দিতেন।যদি আশেপাশের কোন মহিলা বায়'আত হওয়ার জন্য আবেদন জানাত তাহলে পর্দার আড়াল হতে রুমাল সম্প্রসারিত করে তার মাধ্যমে বায়'আত করে নিতেন। কোর ছাত্র বায়'আত হতে চাইলে তিনি বলতেন, লেখাপড়ায় মনোযোগ দাও। কোন ছাত্র অতিশয় আবদার জানালে তাকে বায়'আত করতেন। কেউ পূর্বে কোথাও বায়'আত না হয়ে থাকলে এবং ছাত্র ও মহিলা না হলে আবেদন জানালে বায়'আত করতেন। কাউকে বায়'আত করাবার আগে অযু করিয়ে নিতেন এবং নিজের সামনে বসার জন্য আদেশ করতেন। তিনি চকি বা কাঠের উপর বসা থাকলে তাকেও সেখানে বসার আদেশ দিতেন। কেউ বেআদবীর কারণে উপরে বসতে অপারগতা প্রকাশ করলে চকির নিচে বসতেন এবং নিজের দু'হাতের মধ্যে মুরীদের হাত দুটো রাখতেন। সংগে সংগে তার দিল মোমের মত নরম হয়ে যেত, অশ্রু নির্গত হত। যখন তিনি লা-ইলাহার তালকীন দিতেন তখন এক ধরণের নীরব পরিবেশ বিরাজ করত, উপস্থিত সবার কল্বে মত্ততা বিরাজ করত। সবাই নিজের গুনাহর কথা স্বরণ করে অনুতপ্ত হতো; চাই সে বায়'আত হওয়ার জন্য আসুক বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে আগমন করে থাকুক । সবার মধ্যে সম্মোহন অবস্থা বিরাজ করত এবং সকলেই কলবে প্রশান্তি লাভ করতেন। রাসূলুল্লাহ সা.- এর হাদীসে এসেছে- التائب من الذنب كمن لا ذنب له – গুনাহ থেকে তওবাকারী ঐ ব্যক্তির ন্যায় যার কোন গুনাহ নেই।[১]

তওবার বাক্য :

মুফতী সাহেব নিম্নোক্ত বাক্য সমূহের মাধ্যমে মুরীদগণের বায়'আত নিতেন। তিনি একটি একটি করে বাক্যের তালকীন দিতেন। لا اله الا الله محمد رسول الله -

امنت با لله و ملئكته و كتبه و رسله واليوم الاخر والقدر خيره و شره من الله تعالي والبعث بعد

ইত্যাদি বাক্যদ্বারা তাওবা পাঠ করাতেন। এছাড়াও নিম্নোক্ত বাক্যসমূহও তাওবার সময় পাঠ করাতেন; আমি তাওবা করছি সমস্ত গুনাহ হতে, প্রকাশ্য গুনাহ হতে, বাতিনী গুনাহ হতে, শির্ক, কুফ্র ও বিদ'আত হতে। হে আল্লাহ! আমার তাওবা কবূল কর। আমি ওয়াদা করছি, পাঁচ ওয়াক্ত নামায যথাসময়ে আদায় করব, সামর্থ অনুযায়ী আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম পালন করব। আমি ওয়াদা করছি ,শির্ক করব না, কবীরাহ গুনাহ করব না, নামায কাযা করব না, শরীআত পরিপন্থী কোন কাজ করব না। যদি শরীআত পরিপন্থী কোন কাজ আমার দ্বারা হয়ে যায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তাওবা করব।

আমি তাওবা করছি ফয়যুল্লাহর হাতে। হে আল্লাহ আমার বায়'আত, তুমি কবূল কর। হে আল্লাহ!

---

১. *ফয়যুল কালাম*, পৃ. ১৯৮, হাদীস নং ২৮৩; *হায়াতে মুফতী আযম*, পৃ. ২০৯-২১৩; মাশায়েখে চাটগাম, পৃ. ৩৯০-৩৯১।

তোমার মহব্বত, তোমার রাসূলের মহব্বত, কুরআন- হাদীসের মহব্বত, দ্বীন ও শরীআতের মহব্বত, বুযুর্গ ওয়ালীগণের প্রতি মহব্বত আমার অন্তরে দান কর , তাঁদের দলে রেখে আমার হাশর করো এবং তাদের সুপারিশ আমায় নসীব কর।[১]

বায়'আত করানো হয়ে গেলে মুফতী সাহেব সংক্ষিপ্ত নসীহত করতেন এবং বলতেন, মূল কাজ হলো শরীআতের আনুগত্য করা, সুন্নতের অনুসরণ করা। সুন্নতের খেলাপ কাজ করে অধিক ইবাদত করলেও কোন লাভ হয় না, সুন্নত মুতাবিক চললে অল্প ইবাদতও লাভজনক। প্রতি কাজে সুন্নতকে আগে রাখতে হবে। মাসনূন যিক্‌র, দু'আসমূহ আদায় করবেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামায ছাড়াও সামর্থানুযায়ী তাহাজ্জুদ, ইশরাক, চাশত এবং আওয়াবীন নামায আদায় করবেন। দরূদ শরীফ, দুআ ইউনুছ, ইস্তিগফার, অধিক পরিমাণে পাঠ করবেন। আমার রিসালাহসমূহ পাঠ করবেন, সত্য লালন করবেন, ইসলাহে নফ্‌স, নিয়তের পদ্ধতি,দু'আ মাসূরা বিশেষভাবে আমল করবেন। এসব আমল অল্প পরিমানই যথেষ্ট।[২] মুফতী সাহেবের কোন মুরীদ কোন অযীফা বা দরূদের প্রার্থনা জানালে তিনি এর উত্তরে বলতেন, আলহামদুলিল্লাহ। জীবন সুন্দর হোক, আমি তোমার জন্য দুআ করছি, তোমরাও আমার জন্য দুআ করো। অযীফা তো এটাই যে, প্রতিটি কাজ সুন্নত মোতাবেক আদায় করবে, বিদআত এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে, দুআ মাসূরাসমূহ আয়ত্ব করে সময়মত আদায় করবে। সর্বদা নিয়তকে ইসলাহ করার চেষ্ঠা করবে। নিয়ত সংশোধনের কিতাব আরবী, বাংলা যে ভাষারই হোক পাঠ করবে। ইসলাহী নিয়তের বিষয়টি মশ্‌ক করতে হবে। হক্ক কী রেহনুমাই, ইসলাহুন নুফূস, পুস্তিকা দুটো গভীরভাবে পাঠ করবে।[৩]

আত্মশুদ্ধির বিষয়ে মুফতী সাহেব এমন কিছু নীতিমালা উপস্থাপন করেছেন, যেগুলোর উপর আমল করে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের উঁচু সিঁড়িগুলো অতিক্রম করা যায়, বিলায়াতের স্তরসমূহ অতিক্রম করে মর্যাদার আসনে পৌঁছা যায়। তিনি নবুওয়্যতের তরীকা অবলম্বনকারী, সালিকীনদের, ইসলাহে নফ্‌সের জন্য পনেরটি আমলের অযীফা তাঁর *ইসলাহুন নুফূস* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থের শুরুতে তিনি বলেছেন, অত্যন্ত লাভজনক, সহজ এবং বাস্তবসম্মত কিছু আমল যেগুলো ভেতর, বাহির সংশোধনের জন্য প্রযোজ্য, আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক স্থাপনে গভীর প্রভাব রাখে, যেগুলোর উপর আমল করলে গুমরাহীর আশংকা নেই। এ আমলগুলোর কথা সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে সূফীগণের আমল ও অযীফায় এমনকিছু অর্থহীন কঠোরতা রয়েছে যেগুলো হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত নয়, মানুষের যাহির, বাতিন সংশোধনে তেমন কোন প্রভাব রাখে না এবং যেগুলো ইবাদত হিসেবেও গণ্য নয়। তাই নিজের এবং মুসলমান ভাইদের জন্য পনেরটি আমলের কথা উল্লেখ করা হলো। যদিও এগুলোতে যাওক, শাওক, জযবা নেই, তবে উম্মতের জন্য খুব লাভজনক।

১. ইসলাহে নিয়্যত : প্রতিটি কাজে নিয়্যত আগে সহীহ্ করতে হবে। তাহলে মুবাহ, অভ্যাস ও দায়িত্ব হিসেবে আদায়কৃত কাজগুলোতেও সওয়াব পাওয়া যাবে। রিসালাহ তারগীবুল উম্মাহ ইলা তাহসীনিন নিয়্যাহ رساله ترغيب الامة الي تحسين النية পুস্তিকা পাঠের মাধ্যমে নিয়্যতের শুদ্ধতা ঠিক করে নেবে। ইনশাআল্লাহ অল্প কিছুদিন মশ্‌ক করলে উদ্দেশ্যে পৌঁছা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ নামায ও অযূর মধ্যে বিশুদ্ধ নিয়্যতের বিষয়টি মশ্‌ক করলে আস্তে আস্তে অন্যান্য বিষয়েও মশ্‌ক হয়ে যাবে।[৩]

২. যিক্‌রুল্লাহ : মুজাদ্দিদে আলফে সানীর র. মতে শরীআত সম্মত প্রতিটি কাজ আল্লাহর যিক্‌রের অন্তর্ভূক্ত। যদিও সেটা বেচাকেনাই হোক না কেন।[৪]

৩. আহলে যিক্‌রের সান্নিধ্য লাভ করা : রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে বলব না, দ্বীনের দৃঢ়তা এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ কীসে? আহলে যিক্‌রের সান্নিধ্য অবলম্বন কর। একাকী সময়ে মাসনূন দুআ ও যিক্‌র পাঠ করবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কারো সাথে বন্ধুত্ব করবে এবং আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার নিমিত্ত কারো সাথে দুশমনি রাখবে।[৫]

১-২. হায়াতে মুফতী আযম, পৃ. ২১৩-২১৪,২১৫; মাশায়েখে চাটগাম, পৃ. ৩৯০-৩৯১।

৩. মাজমুআ রাসাইলে ফয়যিয়া, খ. ৪র্থ, পৃ. ১৬-১৭।

৪. ঐ, পৃ. ১৮,

৫. *মেশকাতশরীফ*, (নূর মোহাম্মদ আ'জমী অনূ), প্রাগুক্ত, খ. ১ম, সং ৬ষ্ঠ, পৃ. ৫৪, হাদীস নং ২৮।

৪. মৃত্যুর কথা স্মরণ করাঃ রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, 'তোমরা স্বাদ বিনাশকারী মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর। কবর প্রতিদিন ডাকে এবং বলে, আমি মুসাফিরখানা, আমি একাকী থাকার ঘর, আমি মাটির ঘর, আমি পোকামাকড়ের বাসস্থান।'[১]

৫. কুরআন তিলাওয়াত করা : কুরআন তিলাওয়াতের ফযীলত কুরআন ও হাদীসে অসংখ্যবার উচ্চারিত হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল ইয্যতের আয্মত,আল্লাহর কালামের মর্যাদা অন্তরে উপস্থিত রেখে মা'বুদের সাথে কথা বলা এবং জিহ্বা, কান, চোখের হক আদায় করার নিয়্যতে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা। কলব পরিষ্কার করতে পবিত্র কুরআন দ্রুত ক্রিয়া করে।[২]

৬. কবর যিয়ারত করা : রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, আমি তোমাদেরকে প্রথমে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, এখন বলছি, তোমরা কবর যিয়ারত কর, এটা দুনিয়ার প্রতি আসক্তি কমায় এবং আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি আরো বলেন, প্রত্যেক মাইয়্যাত কবরের মধ্যে ফরিয়াদকারীর ন্যায় চিৎকার করতে থাকে। বাপ, ভাই, দোস্ত ও পরিচিতজনদের অপেক্ষায় থাকে যে, আমাদের কবরে দুআ পৌঁছাও। যখন দুআ পৌঁছে তখন দুনিয়ার সব নিয়ামত থেকে একে উত্তম নিয়ামত মনে করে। দুনিয়ার বাসিন্দারা কবরবাসীর জন্য যখন দুআ ও সওয়াব পাঠায় তখন আল্লাহ তাআলা সওয়াবের বিষয়টিকে পাহাড়ের মত বিশাল আকার দিয়ে মৃতের নিকট উপস্থাপন করেন। জীবিতদের হাদিয়া মৃতের জন্য আল্লাহর নিকট মাগফিরাত কামনা করে। [৩]

৭. পিতা মাতার কবর যিয়ারত করাঃ রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যে ব্যক্তি প্রতি শুক্রবার তাঁর পিতা মাতা বা তাদের কোন একজনের কবর যিয়ারত করবে, তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে এবং তাকে সদাচরণকারীদের অন্তর্ভূক্ত করা হবে।[৪] এ হাদীস এবং অন্যান্য হাদীসের ভিত্তিতে উক্ত ফযীলত অর্জনের নিয়্যতে প্রতি শুক্রবার পিতা-মাতার কবর যিয়ারত করবে এবং তাদের জন্য দুআ করবে। ইনশা আল্লাহ অনেক ফায়দা হবে।

৮. দয়ার দৃষ্টিতে মা বাবার চেহারা দর্শন করা : রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যে কোন পিতা মাতার নেক্কার সন্তান, নিজের পিতা মাতার চেহারার দিকে অনুগ্রহের দৃষ্টিতে তাকাবেন, আল্লাহপাক তার প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে একটি করে কবূল হজ্বের সওয়াব লিখেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, যদি প্রতিদিন একশ বার দৃষ্টি প্রদান করে তবেও? তিনি বললেন, হাঁ, তবেও। আল্লাহ মহান ও পবিত্র।[৫]

৯. ইয়াতিমের মাথায় হাত বুলানো এবং মিসকীনকে খাদ্য খাওয়ানোঃ বিখ্যাত সাহাবী আবূ হুরায়রা রা. বলেন, এক ব্যক্তি নিজের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল যে, আমার হৃদয় খুবই কঠোর, সুতরাং কী করব? রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, 'ইয়াতিমের মাথায় হাত বুলাও এবং মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াও। তিনি আরো বললেন, যে ব্যক্তি ইয়াতিমের মাথায় হাত বুলায় সে তার (ইয়াতিম) মাথার প্রতিটি চুলের বিনিময়ে অনেক গুণ বেশি নেকি লাভ পাবে।'[৬] রাসূলুল্লাহ সা.-এর হাদীসের উপর আমল করতঃ দয়া, অনুকম্পার সাথে ইয়াতিমের মাথায় হাত বুলালে এবং মিসকীনকে খাদ্য খাওয়ালে অন্তরের কঠোরতা দূরীভূত হয়ে কোমল হবে, নিজের জন্য অনেক ফায়দা অর্জিত হবে।[৭]

১০. দুনিয়ার বিষয়ে নিজের চেয়ে নিম্ন শ্রেণীর মানুষের দিকে তাকাতে হবে : রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যার মধ্যে দুটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে আল্লাহ তাআলা তাকে কৃতজ্ঞ ও ধৈর্য্যশীল হিসেবে গ্রহণ করবেন। দ্বীনের বিষয়ে নিজের চেয়ে উপর শ্রেণীর দ্বীনদারগণের দিকে তাকানো এবং তাঁদের অনুসরণ করা। দুনিয়ার বিষয়ে নিজের চেয়ে দূর্বলদের প্রতি তাকিয়ে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করা। প্রত্যেকের উপর কর্তব্য হলো এ হাদীস মোতাবেক আমল করা।[৮]

১-২. রিসালাহ ইসলাহুন নুফূস, পৃ. ২০।

৩. *মেশকাতশরীফ*, (নূর মোহাম্মদ আ'জমী অনূ), খ. ৪র্থ, সং ৯ম, পৃ. ১০৫, হাদীস নং-১৬৭৭।

৪. ফয়যুল কালাম, পৃ. ৪০৬, হাদীস নং ৮২৫।

৫. ঐ, পৃ. ৪০৪, হাদীস নং ৮২০।

৬-৮. রিসালাহ ইসলাহুন নুফূস, পৃ. ২২,২৩।

১১. একাধারে চল্লিশ দিন তাকবীরে উলার সাথে জামাআতে নামায পড়া : রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন 'যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে একাধারে চল্লিশ দিন তাকবীরে উলাসহ জামাআতের সাথে নামায আদায় করবে তার জন্য দুটি মুক্তি বা পরিত্রাণ নির্ধারিত হয়। তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও মুনাফিকী থেকে মুক্ত ঘোষণা করা হয়।'[১] এ হাদীসের উপর আমল করা অত্যন্ত জরূরী। এর দ্বারা দ্বীনের সাথে সম্পৃক্ততা বাড়বে এবং চিল্লার ফযীলত ও বুযুর্গী অর্জিত হবে। দোযখ ও মুনাফিকী থেকে মুক্তির ঘোষণার চেয়ে বড় বুযুর্গী আর কি হতে পারে?

১২. তাওবার নামায পড়াঃ 'রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যখন কোন ব্যক্তি গুনাহ করে সেখান থেকে ওঠে ভালভাবে পাক-পবিত্র হয়, অত:পর নামায আদায় করে আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে; তখন আল্লাহ তাআলা তাকে নিশ্চিত ক্ষমা করে দেন।'[২]

১৩. সালাতুত তাসবীহ্ আদায় করাঃ এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীসটি বেশ প্রসিদ্ধ এবং এ নামায আদায় করার পদ্ধতিও অনেকের জানা। সুতরাং আগ্রহ, উৎসাহের সাথে এ নামায আদায় করলে অনেক ফায়দা হবে।[৩]

১৪. তাহিয়্যাতুল অযু : একদিন রাসূলুল্লাহ সা. ফজর নামাযের পর হযরত বিলালকে জিজ্ঞেস করলেন, হে বিলাল! তুমি বল দেখি মুসলমান হয়ে এমন কোন আমলটা করেছ, যার সওয়াবের আশা তুমি করতে পার? কারণ বেহেশতে আমি আমার সম্মুখে তোমার জুতোর শব্দ শুনেছি। হযরত বিলাল বললেন, হুযুর আমি এ ছাড়া এমন কোন আমল করিনি, যা আমার নিকট অধিক সওয়াবের কারণ হতে পারে। তবে আমি রাতে বা দিনে, যখনই অযু করেছি তখনই সে অযু দ্বারা কিছু নামায (নফল) আদায় করেছি, যা আমাকে তাওফীক দেওয়া হয়েছে।[৪]

১৫. কোন বৈঠক থেকে ওঠার পূর্বে নিম্নোক্ত দুআটি পাঠ করাঃ ভাল মন্দ যে কোন বৈঠক হোক না কেন, নিম্নোক্ত দুআটি কমপক্ষে একবার পড়া চাই। سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك হাদীসে এসেছে, এ দুআর বরকতে ঐ বৈঠকে অনিষ্টকর কিছু থাকলে ক্ষমা পাওয়ার আশা করা যায়। আর যদি ভাল বৈঠক হয় তাহলে কবূলের জন্য মহর মেরে দেয়া হয়।[৫]

এ পনেরটি আমলের কথা বলা হল, ভেতর বাহির ইসলাহের জন্য এগুলো যথেষ্ট। এগুলোতে শুধুই লাভ রয়েছে। গুমরাহ হওয়ার আশংকা নেই। সরাসরি ইবাদতও বটে।[৬]

মুফতী সাহেব তাঁর রচিত তাসাউফ বিষয়ক গ্রন্থ ***হক কি রহনুমায়ী*** তে বলেন, প্রতিটি মুসলমানের উপর কর্তব্য হল, নিজের বাহির, ভেতর, সংশোধনের জন্য অনবরত চেষ্টা, সাধনা, ফিকির, চালিয়ে যাওয়া। উদ্দেশ্য থাকবে শরীআতের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকা, দ্বীনী বিধি-বিধানের গুরুত্ব অন্তরে স্থান দেয়া, ইবাদতে পূর্ণ মনোযোগ সৃষ্টি হওয়া, প্রতিটি কাজে ইখলাস অর্জিত হওয়া, ঈমানের পরিপূর্ণতা ও পরিপূর্ণ তাকওয়া অর্জন করা। এ সবকটি বিষয় আদায় করার জন্য বান্দা আদেশপ্রাপ্ত এবং মানব জীবনের মূল লক্ষ্য।

এটাই প্রকৃত পথ, এটাই বিলায়াত, এটাই আল কুরআনের ভাষায় দরবেশী। এসব কিছু অর্জন করার জন্য সহজ তরীকা হলো- সুন্নতের অনুসরণ করা, নিজের যাবতীয় কাজকর্ম, চলাফেরা, ওঠাবসায়, রাসূলুল্লাহ সা. -এর আদব, আখলাক, চালচলন, অবলম্বন করা। এটাই আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয় তরীকা ও কুরআনের সার নির্যাস। পবিত্র কুরআন ও রাসূলের সুন্নাহর উপর আমল করা অত্যন্ত সহজ কাজ। এর মধ্যে অসম্ভব বা কঠোরতার কিছু নেই। বর্তমানে কুরআন সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা কঠিন মনে হওয়ার কারণ, কুরআন, সুন্নাহ এবং শরীআত নয় বরং যুগের ফিতনা, যুগের চাহিদা, মানুষের চিন্তা-

---

১. ফয়যুল কালাম, পৃ. ২৬১, হাদীস নং ৪২২।
২. ঐ, পৃ. ১৯৯, হাদীস নং ২৮৮।
৩. রিসালাহ ইসলাহুন নুফূস, পৃ. ২৪।
৪. *মেশকাতশরীফ*, (নূর মোহাম্মদ আ'জমী অনূ), খ. ৩য়, সং ৯ম, পৃ. ১৬০, হাদীস নং ১২৪৬।
৫. ঐ, পৃ. ২৩৫-২৪০।
৬. হায়াতে মুফতী আযম, পৃ. ২৩৫-২৪০; রিসালাহ ইসলাহুন নুফূস, পৃ. ১৬-১৯।

চেতনার বিবর্তন। আধুনিককালে অনেকে মনে করেন যে, কোন প্রসিদ্ধ সিলসিলার অন্তর্ভূক্ত না হলে এবং শায়খের দেয়া দরূদ, অযীফা, যিক্র,আমল না করলে ইসলাহে নফ্স সম্ভব নয়। এমন ধারণা অমূলক এবং পবিত্র কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক। ইসলাহে নফ্স বলতে বুঝায় শরীআতের উপর পূর্ণ অবস্থান করা, শরঈ বিধি- বিধানসমূহের আযমত ও সর্বোচ্চ ধ্যান খেয়ালের সাথে ইবাদত করা। কারামত, অলৌকিক, হালাতে মাযযূব, আলমে মালাকূতে ভ্রমণ করা, আলমে আরওয়াহের সাথে সাক্ষাত এগুলো ইসলাহে নফ্স বা বুযুর্গী নয় এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নয়। কারণ, এগুলো আহ্লে কুফ্র দ্বারাও প্রকাশ পেতে পারে। ভয়ানক কাফির, দাজ্জাল এ ধরণের অনেক অলৌকিক, অসম্ভব ঘটনা ঘটাতে সক্ষম । সুতরাং অসম্ভব, অলৌকিক কিছু ঘটানোর সাথে ইসলাহে নফসের কোন সম্পর্ক নেই। মুরীদ, সাগরেদগণের মধ্যে দুআ, যিক্র, অযীফা ইত্যাদির প্রচলন করাই মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবং ইবাদত নয়। বরং লক্ষে পৌঁছার মাধ্যম। রাসূলুল্লাহ সা., সাহাবা, তাবিঈন, আয়িম্মা-ই মুজতাহিদীনের মধ্যে এমনটি পাওয়া যায়নি। বরং মাশাইখে কিরাম এগুলো নির্বাচন করে থাকেন। আরও সহজভাবে বলা যায় যিক্র, দুআ ইত্যাদির ব্যবহার ওষুধ পথ্যের ন্যায়। এগুলো গ্রহণের মূল লক্ষ্য সুস্থতা অর্জন করা। তাই শরীআতের সীমানার মধ্যে থেকে দুআ, যিক্র ইত্যাদি আদায় করতে হবে। কোন কোন সালিকীন উচ্চস্বরে যিক্র করা এবং চল্লিশ দিন পর্যন্ত ই'তিকাফ করার যে প্রথা পালন করেন এগুলো বাড়াবাড়ি, শরীআতের সীমালঙ্ঘন এবং প্রকাশ্য গুমরাহী। মুজাদ্দিদে আলফে সানী র. বলেন, কোন একটি মুস্তাহাব আদায় করা এবং মাকরূহে তানযিহী থেকে বেঁচে থাকা যিক্র, ফিক্র, মুরাকাবা ও তাওয়াজ্জুহ থেকে কয়েক দফা উত্তম। মিশকাত শরীফের ভাষ্য গ্রন্থ মিরকাত এ বলা হয়েছে সুন্নত মোতাবেক প্রস্রাব-পায়খানা, ইস্তিঞ্জা ব্যবহার করা মুসাফিরখানা ও মাদ্রাসা বানানোর চেয়ে উত্তম। কারণ বাইতুলখোলা ও ইস্তিঞ্জায় সুন্নতের অনুসরণ করলে তা ইবাদতে পরিণত হয়। দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মুজাদ্দিদ শায়খ আহমদ সিরহিন্দী র. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা.-এর সুন্নতের বিন্দু পরিমাণ আদায় করা দুনিয়া ও আখিরাতের সকল নিয়ামতের চেয়ে উত্তম। যেমন সুন্নত আদায়ের নিয়্যতে দুপুরে আহার গ্রহণের পর শোয়া রাতভর জাগ্রত থেকে ইবাদত করার চেয়ে উত্তম। যদিও দুপুরে শোয়ার বিষয়টি ইবাদত নয় কিন্তু রাসূলুল্লাহ সা. -এর সুন্নত হওয়ার কারণে এর মর্যাদা বেশি। পক্ষান্তরে সারারাত জাগ্রত থেকে ইবাদত করা বাহ্যিকভাবে মনে হয় ইবাদত, কিন্তু এটা রাসূলের সুন্নত নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ সা. রাতের কিছু অংশ ঘুমাতেন এবং কিছু অংশ জাগ্রত থাকতেন। মুজাদ্দিদে আলফে সানী র. বলেন, প্রকৃত অর্থে তরীকত হল শরীআতের খাদেম। তিনি আরো বলেন, হুব্বে নবুওয়্যত, হুব্বে ইশ্ক বিলায়াতের চেয়ে হাজারগুণ উত্তম। বিলায়াতের রাস্তা ছেড়ে দিয়ে নবুওয়্যতের রাস্তা অবলম্বন করলে ফানাহ, বাকা, জযবা, সুলূক এসবের দরকার হয় না। হুব্বে নবুওয়্যত হলো মূল, হুব্বে বিলায়াত হলো ছায়া। নবুওয়্যতের রাস্তা অবলম্বনকারী, ঈমানকে মহব্বতকারী সালিকীন, লক্ষ্য উদ্দেশে পৌঁছতে সক্ষম হন। অর্থাৎ আল্লাহর প্রিয় বান্দায় পরিণত হন। পক্ষান্তরে বিলায়াতের রাস্তা অবলম্বনকারী আশিকীনরা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন। মুজাদ্দিদে আলফে সানী র. আরো বলেন, আমার পিতা বলতেন, গুমরাহ বাহাত্তুর দলের অধিকাংশই সূফীদের রাস্তা অবলম্বনের কারণে গুমরাহ হয়েছে এবং ভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হওয়ার ফলে গন্তব্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়েছে।[১]

মুফতী সাহেবের নিজস্ব মাসলাক তাঁর রচিত গ্রন্থ ***আলহাককুস্ সরীহ্ ফী আল-মাস্লাকিস্ সহীহ্*** তে বিধৃত হয়েছে। তাতে তিনি বলেন, বেরাদরানে মিল্লাত! দীনের বিষয়ে আমার তরীকা, মাসলাক, ইমাম হলো কিতাব, সুন্নাহ অর্থাৎ কুরআন ও হাদীস, নির্ভরযোগ্য ফিক্হ'র কিতাবসমূহ। সলফে সালিহীন অর্থাৎ সাহাবা, তাবিঈন ও আইম্মা-ই মুজতাহিদীনের তরীকার পরিপন্থি চলাকে আমি অপছন্দ করি। কোন কোন সূফীর মাধ্যমে কোন কোন আমল, বক্তব্য, কুরআন, সুন্নাহ এবং সলফে সালিহীনের আমলের খেলাফ প্রকাশ পেয়ে থাকে। সেগুলো তাদের নিজস্ব ইজতিহাদী ভুল, হালের প্রভাব এবং মত্ততার কারণে হয়ে থাকে। তাই তিনি ক্ষমাযোগ্য, নিন্দার উপযুক্ত নন। তবে এসব বিষয়ে তাঁর অনুসরণ বৈধ মনে করিনা। অধিকাংশ বিদআত ও নিষিদ্ধ কাজকর্ম প্রকাশ পাচ্ছে অদক্ষ সূফী, দুনিয়াদার পীর মুর্শিদের কারণে। তারচেয়ে বরং সুন্নতের অনুসারী শরীআতপন্থী কামিল আলিমের হাতে বায়আত হওয়া এবং শরীআতের

১. *হক কি রহনুমা-ই*, পৃ. ১-১৫।

উপর ইস্তিকামাত থাকা অনেক ভাল। বরং এটাই প্রয়োজন। বেশরা, খেলাফে সুন্নত পীরের মাধ্যমে অসম্ভব, অলৌকিক, কাশফ, কারামত, প্রকাশ পেলেও তাদের হাতে বায়'আত হওয়া যাবে না। কারণ বায়'আত হওয়া এবং সুলূকের রাস্তা অবলম্বন করার উদ্দেশ্য হল শরীআতের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং একাগ্র চিত্তে ইবাদত করা। আফসোস অজ্ঞতার কারণে মানুষ তরীকতকে মূল উদ্দেশ্য মনে করছে এবং বায়'আত হওয়ার মাধ্যমে দুনিয়ার উন্নতি কামনা করছে। অধিকাংশ অজ্ঞ, মূর্খের ধারণা মুরীদ না হলে মানুষ বেহেশতে যেতে পারবে না। আর যার পীর নাই তার পীর শয়তান। এ ধরণের ধারণা, বিশ্বাস সম্পূর্ণ বাতিল এবং অমূলক। কুরআন ও হাদীসে এর কোন দলীল নেই বরং মুক্তি এবং জান্নাতে প্রবেশের শর্ত হল শরীআতের অনুসরণ করা, সে মোতাবেক জীবন পরিচালনা করা। যিনি এ কাজ করবেন তিনি জান্নাতে যাবেন, যদিও কারো মুরীদ না হয়ে থাকেন। পক্ষান্তরে কেউ শরীআত পালন না করে শুধু পীরের মুরীদ হলে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। কুরআন-হাদীসে এর অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। কামিল পীরের নিকট মুরীদ হওয়া এবং তাঁর দীক্ষা অনুযায়ী মুজাহাদা করার মূল লক্ষ্য হল শরীআতের অনুসরণ যেন সহজ হয় এবং দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা যায়। কোন বেশরা পীরের হাতে মুরীদ হওয়া মানে শয়তানের হাতে মুরীদ হওয়া। মাওলানা জালাল উদ্দীন রূমীর র. কবিতায় এ কথাটি বলেছেন, মানুষরূপী অনেক শয়তান আছে, তাই যার তার হাতে হাত রাখবেন না।[১]

ইজাযত প্রাপ্তগণের পরিচিতি : যদিও খিলাফত, ইজাযতের বিষয়টিকে মানুষ মূল লক্ষ্য মনে করে কিন্তু মুফতী সাহেবের দৃষ্টিতে তা একেবারেই গৌণ। তাঁর দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সুন্নতের অনুসরণ, বিদআত পরিহার করা। যার মধ্যে যত বেশি শরীআতের অনুসরণ ও সুন্নতের পাবন্দি ছিল তিনি মুফতী সাহেবের নিকট ততই প্রিয় ছিলেন। তিনি বলতেন, পীরের খলীফা হওয়ার পরিবর্তে রাসূলুল্লাহ সা. এর খলীফা হওয়ার চেষ্টা কর। তিনি আরো বলতেন, পীরের খলীফা তো সবাই কিন্তু সুন্নতের অনুসরণ তো কারো মধ্যে নেই। সুন্নতের অনুসরণ ব্যতীত খিলাফতের বিন্দুমাত্র মূল্য নেই। নিজের ইজাযত প্রাপ্ত খলীফার চেয়ে অন্য কারো মধ্যে সুন্নতের অনুসরণ দেখলে তাকে প্রিয় মানুষ হিসেবে গণ্য করতেন। মোট কথা প্রথাগত পীর-মুরীদি, খিলাফত, ইজাযত, এসব তাঁর কাছে অপছন্দনীয় ছিল। তাঁর নিকট হতে ইজাযতপ্রাপ্ত খলীফাগণের বিষয়ে তাঁকে কেউ জিজ্ঞেস করলে তিনি অসন্তুষ্ট হতেন। মৃত্যুর পূর্বে তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি খুব অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

মৃত্যুর পূর্বেও তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে খুব অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। অনুমান ১৪৮০ হি. আগে মাওলানা ইউসুফ সাহেব বারবার তাঁকে আবদার জানালে তখন পর্যন্ত যারা তাঁর নিকট হতে ইজাযত প্রাপ্ত হয়েছিলেন তাদের নামের তালিকা এক পত্রের জবাবে উল্লেখ করলেন।

খলীফাবৃন্দ :

১. খতীবে আযম মাওলানা সিদ্দীক আহমদ র.। প্রাক্তন শায়খুল হাদীস হাটহাজারী ও পটিয়া মাদ্রাসা, প্রাক্তন এমপি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ এবং প্রাক্তন সভাপতি বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি।
২. মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম র. । প্রাক্তন শায়খুল হাদীস হাটহাজারী মাদ্রাসা।
৩. ড. মাওলানা সানাউল্লাহ র.। প্রাক্তন এমপি বৃটিশ পার্লামেন্ট।
৪. মাওলানা সালিহ আহমদ।
৫. হাফেজ মাওলানা উবায়দুর রহমান র.। হাটহাজারী মাদ্রাসা।
৬. মাওলানা ফয়যুল কবীর। চকোরিয়া, কক্সবাজার।
৭. সূফী আব্দুল ওয়াদুদ র.। চট্টগ্রাম মহানগর।
৮. মাওলানা আজিজুল্লাহ র.। প্রাক্তন মুহতামিম, মেখল মাদ্রাসা।
৯. মাওলানা আলী আহমদ।
১০. মাওলানা খায়ের মোস্তফা। শায়খুল হাদীস, উলামাবাজার মাদ্রাসা, নোয়াখালী।

১. *আল হাক্কুস সারীর ফী আল মাসলাকীস সহীহ্*, পৃ. ১-১৫; মাশায়েখে চাটগাম, পৃ. ৩৯৫-৩৯৬।

১১. হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ হামেদ র.। প্রাক্তন মুহতামিম, হাটহাজারী মাদ্রাসা।
১২. মাওলানা সাইফুল ইসলাম র.। হামিউস সুন্নাহ মাদ্রাসা, হাতিয়া।
১৩. মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম ফয়যী, মেখল।
১৪. মাওলানা ফতেহ আলী।

১৫. মাওলানা আব্দুল হাই, মাদার্শা।
১৬. মাওলানা আযীযুল্লাহ নোয়াখালী।
১৭. হাকীম ফজলুলল করীম। চট্টগ্রাম মহানগরী।
১৮. মাওলানা ইসহাক, গিরদওয়ারী।
১৯. মাওলানা জালাল আহমদ, মাদার্শা।
২০. প্রমূখ।[১]

শিষ্যবৃন্দ :

বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, বার্মা, আরবসহ সারা বিশ্বে মুফতী সাহেবের অগণিত ভক্ত, অনুরক্ত ও শিষ্য রয়েছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকজন শিষ্য হলেন:

১. মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব র.। প্রাক্তন শায়খুল হাদীস, হাটহাজারী মাদ্রাসা।
২. শাহ আব্দুল ওয়াহহাব র.। প্রাক্তন মুহতামিম, হাটহাজারী মাদ্রাসা।
৩. মাওলানা সায়্যিদ মুসলিহ উদ্দীন র.। প্রতিষ্ঠাতা ও প্রিন্সিপাল হয়বতনগর আলীয়া মাদ্রাসা কিশোরগঞ্জ।
৪. মাওলানা কারী উবায়দুর রহমান চৌধুরী। প্রাক্তন উস্তাদ, হাটহাজারী ও চারিয়া মাদ্রাসা এবং প্রাদেশিক কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য।
৫. মাওলানা আবুল হাসান র.। প্রাক্তন শায়খুল হাদীস হাটহাজারী মাদ্রাসা।
৬. মাওলানা হাজী মুহাম্মদ ইউনুস র.। মুহতামিম, পটিয়া মাদ্রাসা।
৭. মাওলানা নূর আহমদ। প্রাক্তন মুহতামিম, নাজিরহাট মাদ্রাসা।
৮. মাওলানা আব্দুল আযীয র.। প্রাক্তন শায়খুল হাদীস, হাটহাজারী মাদ্রাসা।
৯. মুফতী আহমদুল হক। প্রধান মুফতী, হাটহাজারী মাদ্রাসা।
১০. মাওলানা শাহ আহমদ শফী দা: বা:। মহা পরিচালক, হাটহাজারী মাদ্রাসা।
১১. মুফতী ইজহারুল ইসলাম চৌধুরী। প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম, লালখান বাজার মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম।
১২. মুফতী নূর আহমদ। হাটহাজারী মাদ্রাসা।
১৩. প্রমূখ।[২]

মুফতী সাহেব তাঁর পক্ষ হতে ইজাযতপ্রাপ্তগণের উদ্দেশ্যে বলেন, হযরতগণের নিকট আমার আরয, আপনারা অত্যন্ত সতর্কতা ও সাবধানতার সাথে চলবেন। যেন আপনাদের দ্বারা অনাসৃষ্টি, অশোভন কিছু প্রকাশ না পায়। শরীআত পরিপন্থী এবং নিজের ভারসাম্যতা ক্ষতি করে এমন কোন কিছু যেন প্রকাশ না পায়। এমন আচার আচরণ করবেন না যদ্বারা ইজ্জত আব্রুর ক্ষতি হয় এবং মানুষের কাছে ঘৃণা ও বদনামের পাত্র হতে হয়। যে কোন ধরণের গুমরাহী চাই বিশ্বাসগত হোক, আচরণগত হোক, কর্মমূলক হোক বা বক্তব্যমূলক আপনাদের দ্বারা যেন কিছুতেই প্রকাশ না পায়। প্রতিটি কাজকর্ম, নড়াচড়া, ওঠা-বসা, প্রতি হালতে শরীআতের অনুসরণ, সুন্নতের পাবন্দী করার জোর চেষ্টা করবেন। উম্মতের পথপ্রদর্শক হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার চেষ্টা করবেন, দ্বীনের খেদমতে লেগে থাকবেন এবং অবৈধ কার্যক্রম থেকে দূরে থাকবেন।[৩]

১. আব্দুর রহমান চৌধুরী, '*মুফতী- এ আজম ফয়জুল্লাহ রহ. এর জীবন, কর্ম ও দর্শন*', ২৭ জুন ২০০৮খৃ. হাটহাজারী পার্বতী উচ্চ বিদ্যালয় হলরূমে পঠিত প্রবন্ধ। পৃ. ৩; নোমান, পৃ. ১০১; *হায়াতে মুফতী আযম*, পৃ. ২১৭; ফাতাওয়া ফয়যিয়া, খ. ১ম, পৃ. ৩০।
২-৩. ঐ , পৃ. ৩, ৩০; নোমান, পৃ. ১০১; হায়াতে মুফতী আযম, পৃ. ২১৭।

মুফতী সাহেবের আত্মশুদ্ধির উপাদানসমূহ বিভিন্ন সহীহ হাদীস ও পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। তিনি ক্রমাগত দু:খ ব্যাথা ও রোগ ব্যাধির চিকিৎসা শরীআত সম্মত ইবাদত, যিক্র, তিলাওয়াত এবং মানব সেবার মাধ্যমে নির্বাচন করেছেন। বদঅভ্যাস, নিচু চরিত্রের চিকিৎসা এবং উত্তম, উন্নত স্বভাব চরিত্র অর্জনের পন্থা শরীআত ও সুন্নতের সুস্পষ্ট নির্দেশনার মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর কিতাবসমূহে বিভিন্ন যিক্র, দু'আ, এবং ইস্তিগফার, তাওবার গুরুত্বপূর্ণ বাক্যাবলী, মাকবুল দুআর পদ্ধতি ও শর্তাবলী বর্ণনা করেছেন। মানবিক চাহিদা, জীবনের প্রয়োজনাদি ও ধর্মীয় আমলগুলো পরিচ্ছন্ন নিয়্যতের সাথে আদায় করার তাগিদ করেছেন। উন্নত চরিত্র গঠন, সৃষ্টি জীবের অধিকার সংরক্ষণ ও উত্তম আচার আচরণের কিছু তরীকা বাতলে দিয়েছেন। যেগুলোর উপর আমল করলে মানুষ কল্যাণ ও পবিত্রতার উচ্চস্তরে পৌঁছতে সক্ষম হয়। তিনি বলেন, হিদায়াতের নূর সূর্যের মতো। পূর্ণ ক্ষিপ্রতার সাথে বিভিন্ন শহর,নগর ও মানুষের অন্তরে উদ্ভাসিত হয়। ভাগ্যবান লোকজন যারা পরকালের প্রতি মনোযোগী হয়ে শির্ক, বিদআত, ইত্যাদি নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে তাওবা করে তাওহীদ ও সুন্নতের পথ অবলম্বন করতে থাকে। মুফতী সাহেব পীর মুরীদি দর্শন বিষয়ে হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী র. এর ন্যায় বলতেন, আমার মধ্যে পীরালি দরবেশী বলতে কিছু নেই বরং আমি একজন তালিবে ইল্‌ম । আমার

নিকট মানুষ কুরআন হাদীসের কথা জানতে চায়, আমার মুখ দিয়ে কুরআন হাদীসের কথাই বের হয়। এটাকে আমি প্রকৃত দরবেশী মনে করি। তিনি মুজাদ্দিদে আলফে সানীর র. মাকতুবাতে তরজুমান ছিলেন। আমি যদি শায়খগীরি করি তাহলে দুনিয়াতে কোন শায়খই মুরীদ পাবে না। বরং আমার কাজ হল অন্যকে আদেশ দেওয়া। অর্থাৎ আমি যদি প্রথাগত পীর হয়ে যাই তাহলে কোন পীর দুনিয়াতে মুরীদ খুঁজে পাবে না। বরং আমাকে অন্য কোন কাজের জন্য আদেশ করা হয়েছে। আর সে কাজটা হল সংস্কারের কাজ। তাঁর দর্শন ছিল ইল্‌ম দ্বীন অর্জন করা ব্যতীত কেউ বুযুর্গ হতে পারে না। তিনি বলতেন, মানুষের প্রবৃত্তি এমন হয়ে গেছে যে, শরীআতের সাদাসিধে বিধানসমূহ তাঁদের ভাল লাগে না এবং শরীআতের অনুসারীগণকে মর্যাদা দেয় না। পক্ষান্তরে ফকীরি, দরবেশীর ভাব নিয়ে কেউ চললে শরীআতের যত বড় নাফরমানই হোক না কেন তাঁকে কামিল মনে করে। বযুর্গ ভাবতে শুরু করে। অনেক বড় কিছু মনে করে এবং তাদের প্রতি ভাল ধারণা বিশ্বাস নিয়ে আচরণ করে কারণেই দরগা শরীআত পরিপন্থী পীর ফকীরদের দরবারে মানুষের ভীড় পড়ে যায়। পক্ষান্তরে মাদ্রাসা, মসজিদ, হক্কানী বুযুর্গগণের খানকা শূন্য পড়ে থাকে। [১]

১. ঐ , পৃ. ৩, ৩০; নোমান, পৃ. ১০১; হায়াতে মুফতী আযম, পৃ. ২১৭।

নবম অধ্যায় : আত্মজীবনী

মুফতী সাহেব মৃত্যুর ষোল বছর আগে দোস্ত আহবাবের অনুরোধে একটি সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী রচনা করেন। এর রচনাকাল ৫ রবিউল আখির ১৩৭৯ হি. এবং রচনার ভাষা ফার্সী।

এ অধমের জন্ম সন ১৩১০ হি. মোতাবিক ১৮৯২ খৃ.। আড়াই বছর বয়সের সময় মাতা ইন্তিকাল করেছেন। আমার মুহতারামা আম্মা আমার মুহতারাম আব্বাকে অসীয়ত করেছিলেন আমাকে আলিমে দ্বীন বানানোর জন্য। আমার আম্মার অসীয়ত মতে আমার পিতা দ্বীনী ইলম ব্যতীত অন্য কোন বিষয় এমনকি মাতৃভাষা বাংলা আমাকে শিক্ষা দেননি। সাত বছর বয়সে আমার খতনা হয়েছে। এ উপলক্ষে চারটি গরু জবাই করে এক বিশাল মেহমানীর আয়োজন করা হয়। এতে আশেপাশের সাধারণ ও বিশিষ্ট সকলকে দাওয়াত করা হয়। বিষয়টির আলোচনা ঘটনা প্রসঙ্গে লিখা হয়েছে। অন্যথায় ইসলামী শরীআত মতে এ

ধরণের অনুষ্ঠানের বৈধতা প্রমাণ নেই। যেমন হযরত উসমান ইব্ন আবুল আস রা. বলেন, 'আমাদের সাহাবায়ে কিরামের যুগে খাতনার দাওয়াত ইত্যাদির প্রচলন ছিল না।' মাওলানা আব্দুল কাদির র. উক্ত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ছিলেন। তিনি রশীদ আহমদ গাঙ্গূহীর নিকট সিহাহ সিত্তাহ পাঠ করেছেন। তিনি ছিলেন সে সময়ের নামকরা আলিম, ফাযিল। আশে পাশের ছোট, বড়, ভদ্র ও নেতৃস্থানীয় সবাই ছিল তাঁর ভক্ত, অনুরক্ত। ফকিরহাট সংলগ্ন মেখলে তিনি বসবাস করতেন। তিনি সেদিন রাতে ওয়াজ করলেন। সেসময় রাতে ওয়ায- নসীহত অনুষ্ঠিত হত। এ প্রথার উচ্ছেদ করেন মাওলানা আব্দুল হামীদ র. (১৮৬৯-১৯২০ খৃ.)। তিনি দিনের বেলায় ওয়ায-নসীহতের অনুষ্ঠান পরিচালনার প্রথা চালু করেন। উক্ত ওয়ায- অনুষ্ঠানে আমার পিতা আমাকে উত্তম পোশাকে সজ্জিত করে নিয়ে যান এবং হযরতের মাধ্যমে আমার জন্য দু'আ প্রার্থনা করেন। তিনি প্রাণভরে দু'আ করলেন। আমাকে আলিফ, বা, তা, ছা সবক দিলেন। তখন এ এলাকায় কোন মাদ্রাসা ছিল না। আমার বয়স যখন ৯/১০ বছর তখন হাটহাজারী মাদ্রাসার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। আমার পিতা সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান মৌলভী আমীর আলী রাউজানী নামক এক ছাত্রকে আমাকে পড়ানোর জন্য জায়গীর নিয়ে আসেন। আমাকে ১১ বছর বয়সের সময় মাদ্রাসায় সোপর্দ করা হয়। মাওলানা আব্দুল হামীদ র. এবং তাঁর উছিলায় মাওলানা হাবীবুল্লাহ র. (১৮৬৫-১৯৪৩ খৃ.)- এর সাথে আমার পিতা গভীর সম্পর্ক রাখতেন। তাঁরা আমার পিতাকে যথেষ্ট তাযীম, তাকরীম করতেন। আমাদের এলাকায় আমার পিতাই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি মাওলানা আব্দুল হামীদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং তাঁর আদেশ অনুপাতে কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তাঁর ঘনিষ্ট ভক্তে পরিণত হন। আল্লাহ তাঁকে জান্নাত নসীব করুন।

হাটহাজারী মাদ্রাসায় আমার প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয়। দশ বছর মাদ্রাসায় থাকলাম। সেসময় মাদ্রাসা প্রাথমিক পর্যায়ের ছিল বিধায় চাঁদা ইত্যাদির ব্যবস্থা ছিলনা। ওয়ায-নসীহত, খিদমত, তাবলীগ মাওলানা আব্দুল হামীদ র.-এর দায়িত্বে ছিল। তিনি পূর্ণ উৎসাহ-উদ্দীপনার মাধ্যমে মানুষকে হিদায়াত করতেন, সুন্নতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন, বিদ'আত পরিহারে সচেতন করতেন। অধিকাংশ সময় তিনি সফরে থাকতেন এবং আহলে বিদআতের সাথে মুবাহাসা, মুনাযারা, দ্বীনি সংস্কার কর্মের দায়িত্ব পালন করতেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উত্তম পুরস্কার দান করুন ও জান্নাত নসীব করুন।

একুশ বছর বয়সে আমি দেওবন্দ গমন করি। সেখানে সিহাহ সিত্তাহ ও বিভিন্ন ফনের কোন কোন কিতাব অধ্যয়ন করি। পূর্ণ দুই বছর তিন মাস সেখানে অবস্থান করি। আমার দেওবন্দ যাবার ছয় মাস পর আমার পিতা ইন্তিকাল করেন। ঐ সময় বাড়ীতে অভিভাবকের দায়িত্ব নেয়ার মত কেউ ছিলনা।
বাড়ীর সবাই ছিল ছোট, ইয়াতিম, বিধবা নারী। ভাইদের মধ্যে আমিই ছিলাম সবার বড়। তাই দেওবন্দে বেশী দিন অবস্থান করা সম্ভব হয়নি। অন্যথায় আরো দু'বছর দেওবন্দে অবস্থান করার ইচ্ছা ছিল। শেষ পর্যন্ত ১৩২৪ হি. মহরম মাসে ২৪ বছর বয়সে বাড়ীতে ফিরে আসলাম। ছাত্র জীবনে হাটহাজারী ও দেওবন্দে সর্বত্র, সর্বদা উস্তাদ ও মুরুব্বীদের নেক নজরে ছিলাম। আমার জীবনে কারো সাথে ঝগড়া, বিবাদ, মারামারি হয়নি। সব ছাত্রই আমার সাথে সম্মানজনক আচরণ করতেন। পরীক্ষাসমূহে অধিকাংশ সময় আমি প্রথম স্থান অধিকার করেছি। ছুটির দিনসমূহে কোন কোন ছাত্র আমার নিকট বিশেষ বিশেষ কিতাব পাঠ করত। প্রতিটি ছুটি বা অবকাশকালে একটি করে পুস্তিকা রচনা করেছি। কোন ছুটি এ নিয়ম বা অভ্যাসের বাইরে ছিল না। লিখনী চলতই। আমি যখন জামা'আতে উলায় পড়ি তখন মাওলানা আব্দুল হামীদ র.-এর আদেশে *কাসিদা-ই বানাতি সু'আদ* (قصيد) গ্রন্থের একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ *আল ইকতিসাদ ফী শারহি বানাতি সা'আদ*

( ) রচনা করি। আর *সুল্লামুল উলূম* ( ) গ্রন্থের কঠিন অধ্যায় তানাকুস ( ) এবং আকসে মুস্তাবী ও আকসে নকীয (عكس مستوي و عكس نقيض) এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফার্সী ভাষায় রচনা করি। এভাবে অসংখ্য রিসালাহ (পুস্তিকা) হাটহাজারী মাদ্রাসার ছাত্র জীবনে রচনা করেছি। কিন্তু দেওবন্দে যাওয়ার পর এগুলো হারিয়ে গেছে। দেওবন্দে অবস্থানকালে সিহাহ সিত্তাহ

পাঠ করার বছর রমযানের ছুটিতে *উমদাতুল আকওয়াল* ( ) রচনা করি। গ্রন্থটিকে দেওবন্দের উস্তাদগণ খুবই পছন্দ করেন এবং এর প্রশংসায় মুখবন্ধ লিখে দেন। আলহামদুলিল্লাহ উস্তাদগণ আমার সম্বন্ধে অসম্ভব পরিমাণ নেক ধারণা ও বিশ্বাস রাখতেন। আমার উপস্থিতিতে বা অনুপস্থিতিতে হাটহাজারী ও দেওবন্দ সর্বত্র আমার প্রশংসাবাক্য নির্গত হয়েছে। আমার জন্মের সময় এবং কিশোর বয়সে আমার বিষয়ে অনেক মনীষী এমনই ভবিষ্যত বাণী করেছিলেন। তদ্রুপ দেওবন্দে যাবার পূর্বে ও পরে কোন কোন দোস্ত আহবাব শুভ স্বপ্নে আমার সম্বন্ধে অনেক সুসংবাদ দেখতে পেয়েছিলেন। মূলত এসব কিছুই আল্লাহর অসীম দয়া ও অনুগ্রহ। অন্যথায় আমি এর উপযুক্ত নই।

داد اورا قابلیت شرط نیست - بلکه شرط قابلیت داد او ست

মোট কথা, দেওবন্দ হতে ফেরার পর কাল বিলম্ব না করে উস্তাদগণের আদেশমতে এই অধম ইলমের মাতৃভূমি মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্রাসায় শিক্ষক নিযুক্ত হই। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই দারুল ইফতার (ফাতাওয়া বিভাগ) দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হয়। দাওয়াত ও তাবলীগের কাজটিও আমার যিম্মায় অর্পিত হয়। আশে-পাশের এলাকাসমূহে বহু ওয়ায- নসীহত করতে হয়েছে। শুরু থেকে আমার অভ্যাস ছিল কুরআন, হাদীস এবং গুরুত্বপূর্ণ বিধি বিধান বর্ণনা করা। কবিতা, গজল গাওয়া, কিস্‌সা- কাহিনীর বর্ণনা দেয়া যা আজকালকার বক্তাদের অভ্যাস তা কখনো আমার দ্বারা হয়নি। আলহামদুলিল্লাহ আমার বয়ান পদ্ধতি উস্তাদগণ পছন্দ করেছেন। এরই মধ্যে আরবী, ফার্সী, উর্দূ ভাষায় অসংখ্য লিখনী গদ্যে, পদ্যে সম্পন্ন করেছি। একবার স্বপ্নে দেখলাম বাতাসে উড়ছি। অন্য একবার দেখলাম একটি বিশাল হাতীর উপর আরোহন করছি। এরপর যাবতীয় সাহিত্যকে শুধুমাত্র *পান্দেনামা খাকী* ছাড়া অন্যের দায়িত্বে ন্যস্ত করলাম। ইতিমধ্যে কোন কোন কাব্যগ্রন্থ ও গদ্যাকৃতির লিখা পুস্তক ছাপা হয়ে গেছে। কিছু পাণ্ডুলিপি এখনও ছাপার বাকি রয়ে গেছে।

দেওবন্দ হতে ফেরত আসার পর অসংখ্য দ্বীনী পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। যেমন সরকারী মাদ্রাসাসমূহে বড় বড় পদ ও উচ্চতর স্কেলে লোভনীয় চাকুরির প্রস্তাব । আলহামদুলিল্লাহ, ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর সাহায্য, গায়েবী শক্তি, সর্বদা সঙ্গে ছিল। অন্যথায় পদস্খলন ঘটত। যখন আমার বয়স চল্লিশ বছর তখন আমার উস্তাদ মাওলানা সাঈদ আহমদ র. যার দয়া, অনুগ্রহের সাগরে আমি নিমজ্জিত এবং যেভাবেই তার আখলাকে হামীদাসমূহ বর্ণনা করিনা কেন তার কৃতজ্ঞতা শেষ হবে না; তিনি আমাকে বায়আতের সনদ তথা ইজাযত দান করেন। ঐ সময়ে এ বান্দার উপর বিদআতপন্থী

নেতা যিনি শেরে বাঙাল হিসেবে পরিচিত ছিলেন, তার সাথে কিছু ভয়ানক ঘটনা ঘটে যায়। আল্লাহ পাক যেন তাকে হিদায়াত দান করেন, আমার জন্য গায়েবী শক্তি ও তাঁর সাহায্য অব্যাহত রাখেন। তার সব ধোকা, প্রতারণা অসার প্রমাণিত হয়। শুভ পরিণতি আমার ভাগ্যে রয়ে যায়। আলহামদুলিল্লাহ, ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ।

দেওবন্দে অবস্থানকালে এক শবে বারাআতে মসজিদে ঢুকে কিছু নামায, যিক্‌র আদায়ের পর হাত উঠিয়ে একান্ত বিনয় ও চূড়ান্ত মিনতির সাথে আল্লাহর দরবারে আকুতির ভাষায় দু'আ করলাম, হে আল্লাহ! তোমার এই অধম বান্দাকে শেষ জীবন পর্যন্ত একান্তই তোমার দয়া ফযল ও করমের মাধ্যমে দুনিয়ার সব ধরণের সম্পর্ক হতে পবিত্র রাখো। ইলমের জগতে লিপ্ত রাখ। আলহামদুলিল্লাহ, ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। আমার ধারণা যে, আল্লাহ তাআলার দরবারে ঐ দুআ কবূলের মর্যাদা লাভ করেছে। এ বান্দা আজ সত্তর বছর বয়সে ওরকমই আছি যেরকম দু'আ করেছিলাম।

আমার মনের ভেতর কিতাব পাঠ করার সীমাহীন ও অদম্য আগ্রহ সর্বদায় ছিল। কিতাব অধ্যয়ন জীবনে পানাহারের ন্যায় অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। লেখাপড়া ছাড়া সময় কাটাতে পারি না। এমনকি অনেক সময় খাওয়া, পান করা, চলাফেরার সময় কিতাব পাঠে মগ্ন থাকি। বর্তমানে নানা রকম রোগে আক্রান্ত হয়েছি। শারীরিক দুর্বলতা, দৃষ্টি শক্তির দুর্বলতা আমাকে দুর্বল করে দিয়েছে। তারপরও কিতাব অধ্যয়ন সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করিনি। আলহামদুলিল্লাহ।

আমার বয়স যখন ষাট বছর আল্লাহতাআলার তাওফিকে বায়তুল্লাহর হজ্ব এবং পবিত্র স্থানসমূহ যিয়ারত করার খোশনসীব হয়। আল্লাহতাআলা হাজী মীর হুসাইন সওদাগরকে উভয় জাহানের কামিয়াবী দান করুন যে, তিনি আকাশ পথে এ বরকতপূর্ণ সফরের যাবতীয় খরচ বহন করেছেন। যে পরিমাণ খেদমত, আরাম-আয়েশ, শান্তি দেওয়া সম্ভব তা করেছেন। কোন ত্রুটি করেননি। সফর সঙ্গীদের প্রয়োজন অনুযায়ী আয়াতে কুরআনী, হাদীসে রাসূল সা. এবং গুরুত্বপূর্ণ বিধানাবলী বর্ণনা করতাম। তারা খুব সন্তুষ্ট হতেন। আজকে আমার সত্তুর বছর বয়সেও ঐ বরকতময় সফরের আনন্দে উদ্বেলিত হই। অভ্যন্তরীন বিষয়ে নানান প্রতিবন্ধকতা ও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তদুপরি শরমের বিষয় বিধায় অনেক কথাই লিখা হয়নি। কোন কোন দোস্তের অতিরিক্ত পীড়াপীড়িতে এ পর্যন্ত লিখেই সমাপ্ত করলাম। প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।[১]

আহ্‌কার ফয়যুল্লাহ
৫ রবিউল আখির ১৩৭৯ হি.
হাটহাজারী।

---

১. *হায়াতে মুফতী আযম, পৃ. ১-১১।*

দশম অধ্যায় :

দেশ- বিদেশে মুফতী ফয়যুল্লাহ'র গ্রহণযোগ্যতা

বিখ্যাত আলিমেদ্বীন, উস্তাদগণের উস্তাদ, ফকীহুল উম্মত, হামিউস্‌সুন্নাহ, মাহিউল বিদ'আত, মুজাদ্দিদে মিল্লাত, হুজ্জাতুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ র. -এর জীবন ও কর্ম, ইলমী যোগ্যতা, রচনাসমগ্র ও ফিকহী ইজতিহাদকে দেশ বিদেশের মনীষীগণ গ্রহণ করেছেন ও স্বীকৃতি দিয়েছেন। বাস্তবতা হলো কোন মনীষীর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, পাণ্ডিত্য ও সমাজকর্মকে জ্ঞানীদের পক্ষ থেকে স্বীকৃতি দেয়া মানে গ্রহণযোগ্যতার শক্তিশালী প্রমাণ। কারণেই সুফীগণ হাজার হাজার মানুষ বা মুরীদের সমাগমকে কোন গুরুত্ব দেননা, বরং কামিল মনীষীগণের স্বীকৃতি ও সমর্থনকে গ্রহণযোগ্যতার সনদ মনে করেন। রাসূলুল্লাহ

সা. তাঁর বাণীতে বলেছেন, 'আল্লাহতাআলা এ উম্মতের জন্য প্রতি শতাব্দীতে একজন করে সংস্কারক পাঠাবেন। যিনি দ্বীনের সংস্কার করবেন।'[১] মুফতী ফয়যুল্লাহ র. ছিলেন উক্ত সংস্কারক শ্রেণীর একজন। বাংলাদেশসহ পাক ভারতে তাঁর ইলমী যোগ্যতা, আমলী কামালিয়াত ও শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের প্রভাব রয়েছে। তাঁর যুগোত্তীর্ণ রচনাবলী আলিম সমাজে মানসিক বিপ্লবের জন্ম দিয়েছে। উপমহাদেশে যে কয়জন আলিমেদ্বীনের ব্যক্তিত্ব মুসলিম সমাজের দিল ,দেমাগ, চিন্তা ও জ্ঞানের জগতকে আচ্ছন্ন করেছিল মুফতী ফয়যুল্লাহ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর ব্যক্তিত্ব ,উঁচু মানসম্পন্ন রচনাবলীর গুরুত্ব সকলেই স্বীকার করেছেন। তাঁর রচনাসমগ্র পাঠকদের মনকে প্রচণ্ড নাড়া দেয়, প্রভাবিত করে। মুফতী সাহেব ছাত্র জীবনেই লেখালেখি, গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন। ছাত্র অবস্থাতেই ছাত্ররা তাঁর গভীর জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হয়েছেন । তাঁর শিক্ষকতা, লিখনী যোগ্যতা, সংস্কার কর্মকে সমসাময়িক আলিমগণ অকপটে স্বীকার করেছেন। ইল্ম, তাসনীফ, তাকওয়া, বুযুর্গীতে সমসাময়িক যুগে তিনি সবার উপরে চলে গিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন জ্যোতির্ময়, অন্তর্চক্ষুসম্পন্ন রহস্য উন্মোচনকারী আলিম। কখনো কখনো তাঁর শিক্ষকগণও কঠিন ও জটিল বিষয়ে সমাধান লাভে ধন্য হয়ে মুফতী সাহেবের জ্ঞানের স্বীকৃতি দিয়েছেন। নিকট অতীতে যে কোন আলিমের চেয়ে তিনি ছিলেন সফল। তাঁর অধ্যাপনা, ফিক্‌হ ও ফাতাওয়া চর্চা, ইসলামী জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, রচনা ভাণ্ডার, সংস্কার কর্ম, ইসলাহী কার্যক্রম, ইজতিহাদী যোগ্যতাকে দেশ বিদেশের অসংখ্য মনীষী স্বীকৃতি দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে দেওবন্দের শায়খদের মধ্যে হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী র. (১৮৬৩-১৯৪৩ খ.), আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি র. (১৮৭৫-১৯৩৩ খৃ.) শাব্বীর আহমদ উসমানী র. (১৮৮৭-১৯৪৯ খৃ.), মুফতী আযীযুর রহমান দেওবন্দী, আল্লামা মুহাম্মদ ইব্রাহীম বলিয়াবী র.(১৩০৪-১৩৮৭ হি.), মাওলানা গোলাম রসূল র., শায়খুল আদব মাওলানা ইজায আলী র. (১৩০০-১৩৭৪ হি.),মাওলানা আব্দুস সামী র., মুফতী মুহাম্মদ শফী র. (মৃ.১৯৭৬ খৃ.), মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী র. ডেরাগাজী (১৮৭২-১৯৩৯ খৃ.),বর্তমান দুনিয়ার খ্যাতিমান ইসলামী পণ্ডিত, ফকীহ্, পাকিস্তানের ইসলামী শরয়ী আদালতের প্রধান বিচারপতি মুফতী তকী উসমানী (দাঃ বাঃ),প্রমুখ। এঁরা সকলে মুফতী ফয়যুল্লাহর ফিকহী, ইজতিহাদী যোগ্যতার স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের বিষয়বস্তু নির্ভুলতার স্বাক্ষী দিয়েছেন এবং অনেকেই মুফতী সাহেবের গ্রন্থসমূহের ভূমিকা, বাণী বা অভিমত দিয়ে মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। সমসাময়িক যুগের বাংলাদেশের আলিমগণ তাঁর ইলমী, ফিকহী কামালতকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, শায়খুল হাদীস জমীর উদ্দীন র. (১২৯৬-১৩৫৯ হি.), হাটহাজারী মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা হাবীবুল্লাহ র. (১৮৬৫-১৯৪৩ হি.) মাওলানা আব্দুল হামীদ র. (১৮৬৯-১৯২০ খৃ.), পটিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মুফতী আযীযুল হক র., মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব র. (১৩১৭-১৪০২ হি.), খতীবে আযম মাওলানা সিদ্দীক আহমদ র. (১৯০৫-

১. *ফয়যুল কালাম*, পৃ. ১৬০, হাদীস নং-২১৫।

১৯৮৭ খৃ.), মাওলানা মুহাম্মদ হারূন ইসলামাবাদী র., মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর র. (১৮৯৫-১৯৮৭ খৃ.)[১], মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী র. (১৮৯৫-১৯৬৯ খৃ.) প্রমুখ[২]।

মুফতী সাহেব বলেন, হাকীমুল উম্মত শাহ্ আশরাফ আলী থানবী র. -এর সাথে আমার ব্যক্তিগত ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল না। তথাপি যদি আমার কোন ফাতাওয়া, লিখনী হযরতের নিকট পাঠাতাম তিনি সেগুলো মনোযোগের সাথে পড়তেন, দেখতেন, সত্যায়ন করতেন, মন্তব্য লিখতেন। যেমন- মুফতী সাহেবের رافع الاشكلات علي حرمت الاستيجار علي الطاعات পুস্তিকার মন্তব্যে তিনি লিখেছেন, আমি আশরাফ আলী বলছি, আমি এ পুস্তিকার বিষয়বস্তু দেখেছি, এর কোন কোন বাক্য আমি পাঠ করেছি মাশা আল্লাহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পুস্তিকাটি যথেষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ। নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত আছে, মুফতী ফয়যুল্লাহর কোন একটি ফাতাওয়ার নির্ভুলতা যাচাইয়ের জন্য কেউ থানাবনে (উত্তরপ্রদেশ, ভারত) হযরত থানবীর নিকট পাঠিয়েছিল। জনৈক মাওলানা আব্দুল করীম ফাতাওয়াটি পাঠ করে থানবী র. কে শুনাচ্ছিলেন।

হযরত থানবী র. তখন বিছানায় শুয়েছিলেন। পত্রের কিছু অংশ শোনার পর বিছানা হতে ওঠে বসলেন এবং তিনবার বললেন, ইনি তো মুফতী, ইনি তো মুফতী, ইনি তো মুফতী। অত:পর তাঁর ফাতাওয়াকে যথার্থ বলে সত্যায়ন করলেন। تفقه میں وہ نعمان و امام وقت خویش আল্লামা নূরূল ইসলাম।[৩]

মুফতী ফয়যুল্লাহ দারূল উলূম দেওবন্দে লেখাপড়া করার সময় দাওরায়ে হাদীসের বছর রমযানের ছুটিতে বিদ'আত প্রতিরোধকল্পে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটি রচনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার কারণ ছিল চট্টগ্রামের দক্ষিণ সীমান্তের অধিবাসী জনৈক বিদ'আতী আলিম যিনি এক সময় মিরাঠের ইসলামিয়া মাদ্রাসার ছাত্র ছিলেন। তিনি احسن المقال في جواز الخيرات المروجة في ملك البنجال নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি ইবাদত বন্দেগীর বিনিময়ে অর্থ উপার্জন বৈধ বলে ফাতাওয়া প্রদান করেন। তারই প্রতিবাদে মুফতী সাহেব রচনা করেন ***উমদাতুল আক্বওয়ালে ফী রাদ্দি মা ফী আহসানিল মাকালি*** গ্রন্থটির কিছু অংশ রচনার পর এর পাণ্ডুলিপি মুফতী আযীযুর রহমান দেওবন্দীকে দেখালেন। তিনি খুশি হলেন, এর প্রশংসা করলেন। প্রশংসা বাক্যে লিখলেন,সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। দরূদ ও সালাম তাঁর নির্বাচিত বান্দার উপর। অত:পর কথা হল এ বান্দা পুস্তিকার বক্তব্য প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনেছে। লেখকের বিশ্লেষণ বিশুদ্ধ এবং হানাফী আলিমগণের অভিমত অনুকূল। আর *আহসানুল মাক্বালের* লেখক বিদ'আতের পক্ষে যেসব দূর্বল, অগ্রহণযোগ্য দলীল প্রমাণ পেশ করেছেন সেগুলোকে শক্তিশালী দলিল প্রমাণের মাধ্যমে চমৎকারভাবে প্রতিহত করেছেন। আল্লাহতাআলা তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করুন। হিদায়াতের অনুসারীদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

-আযীযুর রহমান দেওবন্দী।
মুফতী, মাদ্রাসা আলিয়া, দেওবন্দ
১৩৩৩ হি.।

---

১. বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের অধিকারী মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর র. ১৮৯৫ খৃ. লক্ষীপুর জেলার রায়পুর থানার লুধুয়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রিস র.। প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর প্রথমে লাকসাম পরে রায়পুর খিলবাইছা মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেন। ১৯০৬ খৃ. পানিপথ গমন করেন এবং মাওলানা আব্দুস সালামের নিকট পবিত্র কুরআনের হিফজ সম্পন্ন করেন। অত:পর সাহারানপুর মাদ্রাসায় ও দারুল উলূম দেওবন্দ হতে শিক্ষা লাভ করেন। ১৯১৮ খৃ. হাকীমুল উম্মতের সান্নিধ্য লাভ করেন। ১৯৩০ খৃ. কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ইউনুছিয়া মাদ্রাসা, ফরিদাবাদ মাদ্রাসা, বড়কাটারা মাদ্রাসা, লালবাগ মাদ্রাসা এবং কামরাঙ্গীরচর নূরীয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা ও প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখেন। ১৯৮১ খৃ. রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রকাশ্যে রাজনীতিতে আবির্ভূত হন। ১৯৮৭ খৃ. এ মনীষী ইন্তিকাল করেছেন। (ফখরুল ইসলাম, মুফতী, *কারামতে হাফেজ্জী হুজুর রহ.*, ঢাকা, জাবালে নূর প্রকাশনী, ২০১২, পৃ. ১৫-৩০।)

২-৩. নোমান, পৃ. ২২।

উপরোক্ত সমর্থন, প্রশংসা বাক্যে আনওয়ার শাহ কাশ্মীরিরও স্বাক্ষর রয়েছে।[১]

উক্ত পুস্তিকার প্রশংসায় মুফতী সাহেবের উস্তাদ আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী র. লিখেন, এ গ্রন্থের লেখক আমার ভাই মৌলভী ফয়যুল্লাহ সাল্লামাল্লাহু কে আল্লাহতা'আলা ইল্ম ও আমলে উচ্চ মর্যাদা প্রদান করুন, উভয় জগতে কামিয়াবী দান করুন। আল্লাহতা'আলার দয়ায় তিনি কঠোর পরিশ্রম, পূর্ণ সতর্কতা, মনোযোগ, দূরদৃষ্টি ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে পদক্ষেপ নিয়েছেন। এ সময়ের মানবরূপী শয়তান দানবের ভ্রান্তির মূলোচ্ছেদ করেছেন। মানুষকে কুপথে পরিচালনার যে সয়লাব ছড়িয়ে দিচ্ছিল এর মূল ও শিকড় উৎপাটন করেছেন। মনে হচ্ছে বিদ'আতকে ছড়িয়ে দিতে এবং ইবাদতের বিনিময়ে মূল্য গ্রহণ করা বৈধ ; এমন জাতীয় বক্তব্যপূর্ণ বই-পুস্তকের সংখ্যা কম বলে ***আহসানুল মাক্বাল*** গ্রন্থটি ঐ বিদ'আতী আলিম রচনা করেছেন। এর মাধ্যমে ইবাদতের বেচা-কেনা, ইবাদতকে উদরপূর্তির মাধ্যম, কামাই রুজির হাতিয়ার বানানোর লক্ষ্যে এগুলোকে বৈধ প্রমাণ করার অপচেষ্টা করেছেন। কিন্তু বিধিবাম যে আমার প্রিয় মানুষ

মৌলভী ফয়যুল্লাহ চাঁটগামী, যিনি দেওবন্দের একজন মেধাবী ছাত্র, বাতিলের বিরুদ্ধে আপোষহীন, ধর্মের বিষয়ে ঔদ্ধত্যের জবাব দিতে দৃঢ় প্রত্যয়ী, তিনি ঐ গ্রন্থের বক্তব্যের বিরুদ্ধে দৃঢ় পদক্ষেপে নিজের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। বলা যায়, তিনি এ যুগের সিরাজীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন।[২]

শাব্বীর আহমদ উসমানী

আল্লামা ইব্রাহীম বলিয়াভীর ন্যায় ভারতের প্রায় একশ' আলিম,শায়খ উক্ত গ্রন্থের বিশুদ্ধতার সত্যায়তন করেছেন এবং দস্তখত প্রদান করেছেন। চট্টগ্রামের বিশিষ্ট আলিম শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানী র. এর খলীফা মাওলানা আব্দুর রহমান দেওয়ানপুরী বলেন, 'আমি যখন দ্বিতীয়বার দারুল উলূম দেওবন্দ গমন করলাম তখন আল্লামা ইব্রাহীম বলিয়াবী র. একদিন আসর নামাযের পর হাটতে হাটতে আমার হাত ধরে বললেন, তোমাদের মুফতী ফয়যুল্লাহর চিঠি এসেছে। তিনি চিঠি পড়ে শুনালেন। আর বললেন মুফতী ফয়যুল্লাহ বাংলা মুলুকে জন্ম গ্রহণ করলেও বাঙ্গালীরা তাঁর মর্যাদা অনুমান করতে পারেনি। তাঁর মত ব্যক্তি দেওবন্দে জন্মগ্রহণ করলে তাঁকে নেহায়েত ইজ্জত দেয়া হত। তাঁর শান, মর্যাদা প্রকাশ পেত'।[৩]

দারুল উলূম দেওবন্দের হাদীস, ফিক্‌হ'র উস্তাদ, শায়খুল আদব মাওলানা ইজায আলী র. দরস, তাদরীস, লিখনীতে প্রচণ্ড ব্যস্ত থাকার কারণে সবার লিখা চিঠিপত্র পড়া ও শোনার সময়, সুযোগ পেতেন না। তবে মুফতী ফয়যুল্লাহর কোন চিঠি বা ফাতাওয়া তাঁর নিকট পৌঁছলে তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সাথে পাঠ করতেন আর বলতেন, তাঁর ফাতাওয়া ইল্‌মসমৃদ্ধ এবং ফিক্‌হর মূলনীতির আলোকপাত থাকে। চট্টগ্রামের জীরি মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম মাওলানা আহমদ হাসান র. বলেন, মুফতী ফয়যুল্লাহকে আমি শিক্ষা জীবনের ছোটকাল থেকে দেখে আসছি। আমার ধারণামতে তিনি মা'র পেট হতে একজন ওয়ালী হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছেন। আমরা যতদিন একসাথে ছিলাম তাঁর মাধ্যমে মাকরূহে তানযীহ'র ন্যায় গুনাহ প্রকাশ পেতে দেখিনি। ছাত্র জীবনের প্রথম অবস্থায় তিনি ফার্সীতে অসংখ্য কবিতা লিখতেন। অতি সহজেই ফার্সী কাব্য রচনা করতেন। এ জন্য আমরা তাঁকে কবি বলতাম। ফার্সী ভাষায় তাঁর অসম্ভব দখল ছিল। পরীক্ষার উত্তরপত্র তিনি ফার্সী ভাষায় লিখতেন। উপরের ক্লাসে পড়ার সময় কবিতা, গল্প এবং পরীক্ষার উত্তরপত্র আরবী ভাষায় লিখতেন। শৈশব কাল থেকেই তাঁর মধ্যে কিতাব পাঠ করার অধিক আগ্রহ ছিল। এ অভ্যাস তাঁর জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।[৪]

১-২ ***হায়াতে মুফতী আযম***, পৃ ৯৮-৯৯; নোমান, ২৩-২৪; উমদাতুল আকওয়ালি ফী রাদ্দি মা ফী আহসানিল মাকালি, পৃ. ১-৫; আব্দুল বাকী, মুহাম্মদ, ড. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪।
৩-4 নোমান, পৃ ৩১, ২৮; মাকতুবাতে মুফতী আযম, পৃ. ২২-৩৪।

মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস মুহাজিরে মাদানী র. এর উক্তি :

হাটহাজারী মাদ্রাসার প্রাক্তন মুহতামিম মাওলানা মুহাম্মদ হামীদ র. বলেন, ' রাসূলুল্লাহ সা. এর পবিত্র রওযা শরীফ যিয়ারতের সময় মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস মুহাজিরে মাদানীর মজলিসে আমাদের মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ প্রসঙ্গে আলোচনা ছড়িয়ে পড়ল। তখন আব্দুল কুদ্দুস র. বললেন, যেহেতু পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করছি তাই সারা দুনিয়ার উলামা, ফুযালা এবং আল্লাহর ওয়ালীদের সাথে আমাদের যোগাযোগ সর্বদা বজায় থাকে। সুতরাং সবার অবস্থা আমাদের জানা আছে। এ হিসেবে আমার এ সিদ্ধান্ত বিশুদ্ধ বলে পরিগণিত হবে যে, বর্তমান দুনিয়ায় তিনজন মনীষীর মর্যাদা সবার উর্ধ্বে। একজন সিরিয়া অঞ্চলের, যার নাম এ মুহূর্তে স্মরণে নেই। দ্বিতীয় জন শায়খুল হাদীস যাকারিয়া র.। তৃতীয় জন পূর্ব

পাকিস্তানের (বাংলাদেশ) হযরত মুফতী আযম মাওলানা ফয়যুল্লাহ সাহেব। এ তিনজনের মধ্যে তুলনা করলে ইলমী অনুসন্ধান, আমল, ইত্তিবায়ে সুন্নত বিবেচনায় শেষোক্ত জনের ব্যক্তিত্ব সবচেয়ে বড় মনে হয়।[১]

হাকীমুল উম্মত শাহ আশরাফ আলী থানবী র. তাঁর *ইমদাদুল ফাতাওয়ার* প্রথম খণ্ডে লিখেন, ১৩৫৫ হি. ঘটনা। একবার মুসলমান পুরুষ ও কাফির মহিলার ঔরসে ভূমিষ্ট জারজ সন্তান শিশু অবস্থায় মারা গেলে তাঁর দাফন, কাফন, জানাযার নামায ইত্যাদি মুসলমান শিশুদের ন্যায় সম্পন্ন করতে হবে কি না? এ নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার আলিমদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিল। কেউ বলছিলেন, ঐ শিশুর জানাযার নামায উচিত হবে না। কেউ বলছিলেন, জানাযা পড়তে হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়টি নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার আলিমগণ ভারতবর্ষের মাদ্রাসার আলিমে দ্বীনের শরণাপন্ন হয়ে সমাধান জানতে চাইলেন। তখন অবিভক্ত পাকিস্তানের (বাংলাদেশ) দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্রাসায় এর ফাতাওয়া জানতে চাওয়া হল। মুফতী ফয়যুল্লাহ এর উত্তর লিখে পাঠালেন।
তাঁরা মুফতী ফয়যুল্লাহর বক্তব্যকে হযরত থানবীর বক্তব্যের অনুরূপ দেখতে পেল। যেহেতু প্রদত্ত ফাতাওয়াসমূহে বৈধ, অবৈধ এ ধরণের বিভিন্ন বক্তব্য ছিল তাই তাঁরা একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্যে ফাতাওয়াসমূহ হযরত থানবীর নিকট পাঠিয়ে দিল। তিনি জানাযা বৈধ নয় মর্মে আদেশ দিলেন। এরপর লিখলেন, 'যেহেতু তাঁর (মুফতী ফয়যুল্লাহ) রচিত ফাতাওয়া একটি বিশেষ মাসআলাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে তাই একে গুরুত্বপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ মনে করি। কেউ যদি তার ফাতাওয়ার সাথে অপরাপর বক্তব্যসমূহ ছাপিয়ে বিতরণ করেন তাহলে খুব উপকার হবে।' মূলত দক্ষিণ আফ্রিকার আলিমগণ হযরত থানবীর ন্যায় মুফতী ফয়যুল্লাহকেও নির্ভরযোগ্য পণ্ডিত মনে করতেন। তাঁর পরিচিতি আফ্রিকা মহাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছিল।[২]

শায়খুল আরব ও ওয়ালআযম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী র. একবার হাটহাজারী মাদ্রাসায় আগমন করলে মুফতী সাহেবের একটি ফাতাওয়া তাঁর সামনে পেশ করলে তিনি বললেন এ ধরণের ফিকহী ইলম সমৃদ্ধ ফাতাওয়া আমাদের মুরুব্বীদের মধ্যেও কম দেখা যায়।[৩] একবার তাঁর নিকট বায়আত হওয়ার জন্য চট্টগ্রামের দুজন আলিম গমন করেন। তখন তিনি বললেন, চট্টগ্রামে মাওলানা সাঈদ আহমদ সাহেব (বড় মুহাদ্দিস হুজুর) এবং মুফতী ফয়যুল্লাহ বিদ্যমান আছেন। বায়আত হওয়ার জন্য তোমাদের এখানে আসার কি প্রয়োজন?[৪] দেশের শীর্ষ স্থানীয় বুযুর্গ, ওলীয়ে কামিল, বাংলাদেশে আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী মনীষী মাওলানা মুহাম্মদ উল্লাহ হাফিজ্জী হুজুর র. প্রেরিত এক পত্রের মধ্যে মুফতী ফয়যুল্লাহর ইলমী যোগ্যতা স্বীকৃতি রয়েছে। পত্রের বিষয়টি ছিল ইলমে গায়েব (অদৃশ্য জগতের ইলম) সম্বন্ধে। তৎকালে মৌলভী আহমদ রেজা খান ইলমে গায়বের দাবীদার ছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁর রচিত الدولة المكيه গ্রন্থের কিছু বক্তব্য

১. নোমান, পৃ. ৬৬।
২-৪ ঐ, পৃ. ৭০-৭১ ; ফাতাওয়া ফয়যিয়া, খ. ১ম, পৃ. ২৪৫।

জাতিকে বিভ্রান্ত করেছিল। সে প্রেক্ষিতে হাফিজ্জী হুজুর মুফতী সাহেবের শরনাপন্ন হয়েছিলেন। পত্রের মাধ্যমে তিনি জানতে চেয়েছিলেন, অহী অথবা ইলহাম অথবা স্বপ্নের মাধ্যমে অদৃশ্য যেসব বিষয় সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ সা. কে অবগত করানো হয়েছিল ঐ গুলোকে নবুওয়্যাতের ইলম বলা যায় কিনা? যদি ঐ গুলোকে নবুওয়্যতী ইল্‌ম বলা হয় তাহলে এর স্বপক্ষে প্রমাণ জানিয়ে বাধিত করবেন। ইলমে গায়েব সম্বন্ধে এ অধম বান্দা ৪০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত লিখেছি। এর স্বপক্ষে বুযুর্গদের কোন বক্তব্য যুক্ত করতে পারলে বিষয়টি শক্তিশালী হবে এবং আমি মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে পারব। পবিত্র কুরআনের কমপক্ষে চল্লিশটি আয়াত, একশ'র ও বেশি হাদীস এবং মনীষীগণের একশ'রও বেশি উক্তি ইলমে গায়বের বিষয়টিকে অস্বীকার করেছে। তাই আমি চাচ্ছি, আমার কোন লিখা যদি আপনার লিখার সাথে সাংঘর্ষিক হয় তাহলে প্রত্যাখ্যান করব। পক্ষান্তরে সাংঘর্ষিক না হলে প্রশান্তি লাভ করব। তাই ইলমে গায়েবের

পরিচিতি, এর প্রয়োগ, ইলমে নবুওয়্যাতের পরিচিতি ও প্রয়োগ বিষয়টি একটু পরিষ্কার করে লিখবেন আশা করি।[১]

দু'আর আবদার
আহ্কার মুহাম্মাদুল্লাহ
আফাল্লাহু আনহু
মাদ্রাসা বড় কাটারা, ঢাকা, ১ রমযান, ১৩৮৪ হি.

শত বছরের প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হাটহাজারী মাদ্রাসার অসংখ্য শিক্ষক এমনকি মুফতী সাহেবের উস্তাদগণও তাঁর প্রদত্ত ফাতাওয়া নি:সংকোচে গ্রহণ করতেন। তাঁর সমুদ্রসম ইল্ম গভীর অধ্যয়নকে সবাই শ্রদ্ধা করতেন। তারাবীর নামাযের পর মুনাজাত করার আমল দেওবন্দের আলিমগণের মধ্যেও প্রচলিত আছে। কিন্তু মুফতী সাহেব তা বন্ধের জন্য ফাতাওয়া লিখলে হাটহাজারী মাদ্রাসার সকল শিক্ষক তাতে স্বাক্ষর করেন।[২]

মুফতী আযম সম্বন্ধে খতীবে আযম আল্লামা সিদ্দীক আহমদ র.- এর অভিব্যক্তি :
নাহমাদুহু ওয়ানুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম । হামদ ও সালাতের পর

আমার উস্তাদ, শায়খ. মুহিউস্‌সুন্নাহ, মাহিউল বিদ'আত, মুজাদ্দিদে মিল্লাত, মুসলিহে উম্মাত মুফতী আযম হযরত মাওলানা ফয়যুল্লাহ র. ইতিহাসের এক অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মনীষী । যাঁর পরিচয় তুলে ধরতে এক বিরাট দপ্তরও যথেষ্ট নয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ইলমী ও আমলী জগতে যেমন পূর্ণাঙ্গতা দান করেছিলেন তেমনি সব ধরণের যাহিরী ও বাতিনী যোগ্যতা, সৌন্দর্য দান করেছিলেন। তাঁর আখলাক ছিল আখলাকুল্লাহর আদলে্। আদব, অভ্যাস, আচরণ ছিল শামাইলে নববীর আদলে। তিনি জীবনের শৈশবকাল থেকে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত আল্লাহর প্রকৃতির উপর কাটিয়েছেন। তিনি বাইরে, সভা-সমাবেশে ছিলেন ধীর,স্থির স্বভাবসম্পন্ন বুযুর্গ। ভেতরে অভ্যন্তরে, ধৈর্য, বিনয়ের প্রতিক। ইলমী ও আমলী কামালাত তাঁর মধ্যে আল্লাহ তা'আলা ভরে দিয়েছিলেন। তিনি উলূমে আকলী (বুদ্ধি ভিত্তিক জ্ঞান) ও উলূমে নকলী (কুরআন, হাদীস ভিত্তিক জ্ঞান)-এর ছিলেন ইমাম। বিশেষ করে ফিক্‌হশাস্ত্রে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এমন এক উচ্চাসন দান করেছিলেন যা ইবন হুমাম র., রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী র. -এর পর সম্ভবত তিনিই অর্জন করেছিলেন। তা'লীম, তরবিয়্যাত, তাদরীস, তাসনীফ, তা'লীফ, তাযকীর, তাবলীগ, তাযকিয়া এমন কোন শাখা নেই যার পরিচালকের ভূমিকা তিনি পালন করেননি। এসবই ছিল তার ইলমী কারামত। তাঁর আমলী কারামত হল তিনি ছিলেন একজন জন্মগত ওয়ালী। স্বীয় উস্তাদগণের স্বাক্ষ্য, বিবরণ মতে তাঁর মাধ্যমে সারা জীবনে

১ -২. ঐ, পৃ. ৮১; আল্লামা হাফেজ জুনায়েদ বাবুনগরীর রচনাসমগ্র, পৃ. ৩৯৩-৩৯৪।

একটি কবীরা গুনাহ প্রকাশ পায়নি। তাঁর পুরো জীবনে কেউ তাঁর দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হননি। কোন কর্ম সুন্নতের পরিপন্থী প্রকাশ পায়নি। তিনি রাসূলের সুন্নতকে জিন্দা করেছেন এবং সকল প্রকার বিদআত সাহসের সাথে মোকাবেলা করেছেন। আফসোস এমন একজন সর্বগুণ সম্পন্ন শরীয়তের ঝাণ্ডাবাহী মনীষী দুনিয়া থেকে চলে যাওয়া কায়নাতের জন্য কি পরিমাণ ক্ষতির কারণ তা না ভাষায় প্রকাশ করা যায়, না খাতা কলমে লিখে প্রকাশ করা যায়। সত্যিই তিনি ছিলেন একজন অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব।[১]

মুফতী সাহেবের দীর্ঘ দিনের সান্নিধ্য লাভে ধন্য, তাঁর একান্ত ঘনিষ্ট সহযোগী ও নাতিন জামাই মুফতী ইযহারুল ইসলাম চৌধুরী যিনি মুফতী সাহেবের বাহির, ভেতর, নিদ্রা, জাগ্রত, উঠা, বসা, খুব কাছে থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাঁর প্রতিটি হরকত নরকত অবলোকন করেছেন। মুফতী ইযহারুল ইসলাম চৌধুরীর মতে মুফতী ফয়যুল্লাহ র. ছিলেন পুরো মানব সভ্যতার জন্য পথ ও হিদায়াতের সূর্য তুল্য। তাঁর

জীবনে একটি কর্মও সুন্নতের বাইরে যায়নি। তাঁর প্রতিটি নিশ্বাস ইলমী গবেষণা ও আখেরাতের চিন্তায় গত হয়েছে। তাঁর নান্দনিক জীবন গত হয়েছে শামাইলে নববীর আলোকে । আল্লাহ তাআলা তাঁকে প্রশংসিত গুণ দ্বারা সমৃদ্ধ করেছিলেন। তাঁর অভ্যাস ছিল কিতাব মুতালাআ, তাঁর জীবন চলার মশাল ছিল আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নত। কঠোর সাধনার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহর মুর্দা সুন্নতকে জিন্দা করেছেন। বিদআতের আগাছা শেকড় শুদ্ধ উপড়ে দিয়েছেন। তিনি ছিলেন আফতাবে হিদায়াত, পয়কারে সুন্নত, মুজাস্‌সাম যুহ্‌দ ও তাকওয়া।[২]

হাটহাজারী মাদ্রাসার সাবেক পৃষ্ঠপোষক মাওলানা জমীর উদ্দীন র. এর উক্তি হল দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী লাখো টাকার বিনিময়ে মুফতী ফয়যুল্লাহর ন্যায় আলিমে দ্বীন এবং রহমতুল্লাহর ন্যায় হাফিজে কুরআন জন্ম দিতে পেরেছে। এটাই তার সফলতা।[৩]

বিখ্যাত বুজুর্গ এবং হাটহাজারী মাদ্রাসার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মুফতী হাবীবুল্লাহ র. বলতেন কেয়ামতের দিন যদি আল্লাহ পাক জিজ্ঞেস করেন দুনিয়াতে কি করে আসলি? তখন বলব, হে আল্লাহ! মুফতী ফয়যুল্লাহর মতো দ্বীনদার, মুত্তাকী, ফকীহ আলিম তৈয়ার করে এসেছি।[৪]

মুফতী ফয়যুল্লাহর গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ হলো, তিনি যে দুটো মাদ্রাসা অর্থাৎ হাটহাজারী ও দারুল উলূম দেওবন্দে লেখাপড়া করেছেন সেখানকার উস্তাদগণ তাঁর ইলমী, আমলী, ফিকহী, ইজতিহাদী, তাজদীদী কার্যক্রমকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, তাঁকে সমর্থন করেছেন তাঁর বক্তব্য লিখনী সিদ্ধান্তসমূহকে নির্ভুল আখ্যায়িত করেছেন। মুফতী ফয়যুল্লাহর প্রিয় শিক্ষক মুর্শিদে হক খ্যাতিমান মুহাদ্দিস মাওলানা সাঈদ আ্যাদ বলতেন, তোমরা যদি এ যুগে সাহাবী দেখতে চাও তাহলে মুফতী ফয়যুল্লাহকে দেখ।[৫]

মুজাহিদে আযম মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী র. এর স্বীকৃতি:-

ঈদের চাঁদ দেখার বিষয়ে সে সময়ে মিশর আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক শায়খ এমন একটি ফাতাওয়া প্রচার করেছিলেন যা নিয়ে সারা বিশ্বে আলিমদের মধ্যে বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। এর জের পাকিস্তানে এসেও আঘাত করল। তখন মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী র. মুফতী ফয়যুল্লাহর নিকট পত্র মারফত তাঁর বক্তব্য ও অভিমত জানতে চাইলেন। পত্রে তিনি মুফতী ফয়যুল্লাহকে পূর্ব পাকিস্তানের মুফতী আযম আখ্যায়িত করলেন এবং তাঁর বক্তব্যকে চূড়ান্ত হিসেবে গ্রহণ করবেন বলে জানালেন। তাঁর চিঠির ভাষা ছিল; শায়খুল আযহার ঈদের চাঁদ দেখা বিষয়ে যে প্রলাপ বকলেন যা

১-২. *হায়াতে মুফতী আযম, পৃ. খা, দাল, যাল।*

৩-৪. নোমান, পৃ. ৩২, ৩৩।

৫. ঐ, পৃ. ৩৭।

বিভিন্ন সংবাদপত্রের মাধ্যমে হয়ত আপনিও অবগত হয়েছেন। এর উত্তর মাওলানা ইহতিশামুল হক থানবী কিছুটা দিয়েছেন। যা দৈনিক জং পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। সুতরাং পূর্ব পাকিস্তানের মুফতী আযমের (ফয়যুল্লাহ) পক্ষ থেকেও এর একটি তথ্য সমৃদ্ধ, বিশ্লেষণমূলক উত্তর আসা চাই। আমার ধারণামতে ইখতিলাফে মাতালি' বিষয়ে আল্লামা যায়লাঈ র. এর বিশ্লেষণকে সর্বসম্মত ফাতাওয়া হিসেবে গ্রহণ করা আলিম সমাজের কর্তব্য। এটা এক ভয়ানক ফেতনা। যায়লাঈ'র বক্তব্যকেই এ ফেতনা থেকে উত্তরণের রাস্তা মনে হয়। আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞাত।[১]

আহকার শামসুল হক
উফিয়া আনহু
২৬ শাওয়াল ১৩৮০ হি.

মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী র. লালবাগ মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল তথা সদর থাকাকালীন মাদ্রাসার প্রধান নির্বাচন বিষয়ে একটি জটিলতা থেকে উদ্ধারকল্পে মুফতী ফয়যুল্লাহর নিকট পত্র লিখলেন। উক্ত পত্রেও তিনি মুফতী ফয়যুল্লাহকে সারা পাকিস্তানের মুফতী আযম আখ্যায়িত করেন। তাঁর চিঠির একটি বাক্য ছিল বর্তমান সময়ে সারা পাকিস্তানে আপনি মহান ব্যক্তিত্বের আসনে অধিষ্টিত। শামসুল হক ফরিদপুরী র. ছিলেন বাংলার গৌরব, আলিম সমাজের সদর। বাংলার এমন কোন ঘর নেই যে ঘরে তাঁর ফয়েয,বরকত পৌঁছেনি। তাঁর মত মহান সাধক,বুজুর্গ, আলিমে দ্বীন মুহাদ্দিস, লেখক, অনুবাদক গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল বিষয়গুলো নিয়ে মুফতী ফয়যুল্লাহর শরনাপন্ন হওয়া মানেই মুফতী সাহেবকে স্বীকৃতি দেয়া। এতে বুঝা যায়, পাক ভারত মহাদেশে আলিম সমাজ থেকে শুরু করে সাধারণ জনগণ মুফতী সাহেবের বক্তব্য ,আলোচনা, লিখনীকে নির্ভরযোগ্য মনে করতেন।[২]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর জমিদারী প্রথা বিলুপ্তির বিষয়ে আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী র. মুফতী মুহাম্মদ শফী র. প্রমুখ অভিজ্ঞ উলামায়ে কিরাম দ্বিধা দ্বন্দ্ব ও দুশ্চিন্তায় পতিত হয়ে মুফতী আযমের (ফয়যুল্লাহ) নিকট এর ফাতাওয়া জানতে চাইলেন। মুফতী সাহেব যে উত্তর লিখে পাঠালেন তার উপর ভিত্তি করে সরকার জমিদারী প্রথাকে সরকারের অধীন নিয়ে যায়।[৩]

বেরলবী সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট আলিম আমিনুল হক ফরহাদাবাদী মুফতী সাহেবের সাথে অসংখ্য বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করতেন। তারপরও তিনি বলতেন হাটহাজারীর আলেমরা সবাই ফয়েযী। কেউই হানাফী নয়। হানাফী শুধু মুফতী ফয়যুল্লাহ। একমাত্র সেই হানাফী কিতাবসমূহ যাচাই বাছাই করে বলার যোগ্যতা রাখে। অন্যরা তার বিবরণ অনুযায়ী আমল করে।[৪]

দারুল উলূম দেওবন্দের শায়খুল হাদীস আনওয়ার শাহ কাশ্মীরির ছেলে আনযার শাহ র. রচিত *নকশে দাওয়াম* (আনওয়ার শাহ কাশ্মীরির জীবনী গ্রন্থ) এ পিতার ছাত্রগণের তালিকায় লিখেন, বৃক্ষের পরিচয় ফল দ্বারা। এ কথা বললে অতিরঞ্জিত হবে না যে, কমপক্ষে অর্ধ শতাব্দীকাল ভারতবর্ষে উত্তর পাকিস্তান এলাকায় মরহুমের এমন অনেক ছাত্রের আবির্ভাব হয়েছে যারা উস্তাদের পূর্ণ পরিচিতি দুনিয়া ব্যাপী ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর শিক্ষাদানের সময়কাল চারদশকেরও বেশি। এ সময়ের মধ্যে হাজার হাজার ছাত্র তাঁর নিকট ইলম শিক্ষা লাভ করে ধন্য হয়েছেন। 'তাঁদের মধ্যে মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহর নাম তিনি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেছেন।'[৫]

পটিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা বিখ্যাত আলিমে দ্বীন কুতুবে যামান মুফতী আযীযুল হক র. অনেক মাসআলায় মুফতী সাহেবের সাথে দ্বিমত করতেন। তারপরও তিনি মুফতী ফয়যুল্লাহ'র আলোচনা, বক্তব্য, ফাতাওয়া সম্বন্ধে বলতেন, তিনি আমাদের মুরুব্বী, তাঁর ইলমী গবেষণা, অধ্যয়ন

১-২. নোমান, পৃ. ৪৭; মাকতুবাতে মুফতী আযম, পৃ. ৪৩-৪৫।

৩-৪. ঐ, পৃ. ৪৮, ৪৯।

৫. ঐ, পৃ. ৫২, নকশে দাওয়াম, (আব্দুল মতিন জালালাবাদী অনু:) ঢাকা, ইফাবা, ২০০২, পৃ. ২০৬।

অনেক গভীর। তাঁর সম্বন্ধে কোন খারাপ মন্তব্য সমীচীন নয়। তিনি আমাদের উপদেশদাতা, সংশোধনকারী। যদি তাঁর বক্তব্যসমূহ আজকে আমাদের সামনে না থাকত হয়তবা আমরা সীমাতিক্রম করতাম।[১] মাওলানা হারূন ইসলামাবাদীর মন্তব্য হলো যদি বাংলাদেশের কোন আলিম ইসলামী শরী'আতকে অনুধাবন করে থাকেন তিনি হলেন, মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ।[২]

হাটহাজারী মাদ্রাসার সাবেক উস্তাদ মাওলানা মুহাম্মদ আলী র. বলতেন, পবিত্র কুরআনের কোন কোন আয়াত এবং রাসূলুল্লাহ সা.-এর কোন কোন হাদীস যুগ যুগ ধরে পাঠ করে আসলেও এসবের অর্থ মর্ম আমাদের বুঝে আসেনি। কিন্তু মুফতী সাহেবের ওয়ায ও ভাষণে সেগুলোর মর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছি।[৩]

দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্রাসার শায়খুল আদব মাওলানা নযীর আহমদ র. (মৃ.১৩৯৩ হি.) উর্দু কাব্যে মুফতী সাহেবের একটি মানাকিব রচনা করেছিলেন। এর রচনাকাল ১৯৫০ হি.

মানাকিবের বঙ্গানুবাদ হলোঃ

মুফতী আযম এটাই পরিচয়
তার মধ্যে ঈমানের ঝর্ণা উৎসারিত হয়
যামানার মুজাদ্দিদ, হাদিয়ে দ্বীন
ফিক্‌হ, হাদীস, কুরআনের মূর্ত প্রতীক
উলুমে দীনের আমানতদার সীনা
ফয়যে বাতেন খাঁটি সোনার খাযানা
রাত দিন ছিল সাধনা ফিক্‌হ সুন্নাহ
যথার্থ হবে যদি বলি নোমান,আবূ হানীফাহ
অনন্য ফকীহ, অদ্বিতীয় মুফতী
ইলমে যাহির, বাতিনের সম্রাট
সুন্নতের নূর, ওয়াহ্‌দাতের সাগরে নিমজ্জিত
যাহির বাতিন ফয়যে ইহ্‌সানে সজ্জিত
তাঁর আত্মিক শক্তিতে পরাস্ত বাহিনী শয়তান
দীনে ফিত্‌রাতের সিংহাসনের সম্রাট
আল্লাহর অনুগ্রহে অবিরাম চলে ইলমের ফয়েয
আল্লাহর অনুগ্রহে সমৃদ্ধি নির্গত হয়
ইবাদত আমলে খালিছ পূর্ণ বিশ্বাসী
ফুনুনে দীনে যুগের গায্‌যালী
আলহামদু লিল্লাহ তাঁর খ্যাতি বিশ্বব্যাপী
বার্মা, আসাম, বাংলার প্রতি প্রান্তব্যাপী
হাদীস, ফিক্‌হ, কুরআন ছাড়া সব বাতিল
দীনের বুনিয়াদ হল এ তিন
পথভ্রষ্ঠ, বিদ'আতপন্থির পথপ্রদর্শক, পন্ডিত
যাকে দেখলে জ্ঞানীরা হয় অভিভূত[৪]।

মোট কথা, মুফতী আযম ফয়যুল্লাহ র. বাংলাদেশসহ উলামায়ে দেওবন্দের বড়দেরও ইলম ও মারিফাতের নির্ভরতার প্রতীক ছিলেন। বিংশ শতাব্দীর মহান সংস্কারক, পথপ্রদর্শক ছিলেন। তাঁর ফিকহী ইলম, দক্ষতা, যোগ্যতা দ্বারা মানবজাতি পূর্ণভাবে উপকৃত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাঁর ফয়েয ও বরকত অব্যাহত রাখুন এ প্রার্থনা।

১-৩. নোমান, পৃ. ৫২, ৬৩, ৬৪।
৪. *হায়াতে মুফতী আযম*, পৃ. ছা, জীম; আল্লামা হাফেজ জুনায়েদ বাবুনগরীর রচনাসমগ্র; পৃ. ৩৯৩-৩৯৪।

একাদশ অধ্যায় : জীবনাদর্শ ও দর্শন

মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ র. ছিলেন অত্যন্ত নম্র, ভদ্র ও সদালাপী । তাঁর হৃদয় ছিল স্বর্ণের মতো দুর্লভ, দুর্মূল্য, সত্যপ্রিয়, স্পষ্টভাষী ও সবধরণের পক্ষপাতমুক্ত। অহংকার, দাম্ভিকতা, পরনিন্দা, পরচর্চা, ছিদ্রান্বেষণ এবং বিপদে অধীরতা প্রকাশ ইত্যাদি ক্রটিমুক্ত ছিলেন। অত্যন্ত ধীর ও স্থির, ধৈর্য ও বিচক্ষণতার সাথে বিপদ মোকাবেলা করেছেন। তাঁর বাড়িতে ভারতবর্ষের খ্যাতিমান আলিম, গবেষক,

পণ্ডিত, শিক্ষক ও উচ্চপদস্থ আমলারাও যাতায়াত করতেন। তিনি প্রায়ই এঁদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতেন। সত্যের প্রতি ছিলেন অবিচল ও নির্ভীক। ছাত্রদের প্রতি স্নেহপূর্ণ আচরণ করতেন। তাঁদের অভাব-অভিযোগ, দাবী-দাওয়া শুনতেন, সমাধান দিতেন। তাঁর রায় সংশ্লিষ্ট সবাই মেনে নিতেন। তিনি দায়িত্ববান অভিভাবক ও মেধাবী শিক্ষকের মতো ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ করতেন। একজন নির্ভরযোগ্য আমানতদার অভিভাবক মনে করে ছাত্ররা তাঁর নিকট নিজ নিজ সমস্যা অকপটে প্রকাশ করত। তাঁর পরামর্শ ও হিদায়াত মনে প্রাণে গ্রহণ করত। দুনিয়ার ধন-দৌলত ও লোভ-লালসা হতে নিস্পৃহ হলেও বাস্তব জীবনকে অস্বীকার করেননি। বরং গভীরভাবে অনুধাবন করতেন। কথাবার্তা, আচার-আচরণে, চলাফেরা, রীতি-নীতি, স্বভাব চরিত্রে সর্বদা সুন্নত অনুসরণ করতেন। আল্লাহ তা'লার খাছ বান্দাগণের প্রতি আর্কষণের যেসব গুণাবলী আছে তাঁর মধ্যে পুরোমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। মহানবী সা. -এর আদব, আখলাকের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত তাঁর মধ্যে পেয়ে অগণিত মানুষ তাঁর নিকট মা'রিফাতের আধ্যাত্মিক সবক লাভের জন্য আগ্রহী ছিলেন। তাঁর শান্ত, সৌম্য ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, অকৃত্রিম ব্যবহার ও গাম্ভীর্য দেখে সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা জানাত। মুফতী সাহেব সত্যকে জ্ঞান, মায়া, মমতা দ্বারা অনুধাবন ও গ্রহণ করার পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। এটা তাঁর অনুপম চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি সময়ানুবর্তী ছিলেন। সময় পেলেই গ্রন্থপাঠ, পুস্তক প্রণয়ন, জ্ঞান বিতরণে আত্মনিয়োগ করতেন। তিনি কথা ও কাজে অপূর্ব মিল দেখে চলতেন। ব্যক্তি জীবনে তিনি কোমল হলেও আদর্শের প্রশ্নে অনড়, অটল ও দৃঢ় ছিলেন। বাস্তব জীবনকে অস্বীকার করেননি, বৈরাগ্যব্রতও গ্রহণ করেননি। সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট সবকিছুর জন্য প্রার্থনা করতেন। সৃষ্টির প্রতি কখনো হাত প্রসারিত করেননি। বিদ'আত ও বদরুসুম দূরীকরণে তাঁর ভূমিকাকে সায়্যিদ আহমদ শহীদ র.[১] এর মন মানসিকতা, ধ্যান ধারণা, কর্মসূচীর সাথে তুলনা করা যায়। পারিবারিক জীবনে তিনি ছিলেন একজন আদর্শকর্তা। অধীনস্থ ও পোষ্যদের প্রতি সহানুভূতির আচরণ করতেন। কাউকে কখনো আমার মুরীদ এমন শব্দ প্রয়োগ করে পরিচয় দেননি। অপরাধীকে তিরস্কার না করে স্নেহপূর্ণবাক্য ব্যয়ে সংশোধনের চেষ্টা করেছেন। তাঁর অসংখ্য সৎগুণ, চারিত্রিক মাধুর্য, সৌন্দর্য ও নান্দনিকতা তাঁকে অসাধারণ মনীষীতে পরিণত করেছে। তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল:

উম্মতের জন্য অসম্ভব দরদ ভালোবাসা : মুফতী সাহেব উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য সর্বদা দরদ ভালোবাসায় ব্যাকুল ও ব্যস্ত থাকতেন। দ্বীন ও মিল্লাতের ক্ষতি হতে দেখলে, দ্বীনের যুক্তিযুক্ত নিয়মনীতি নষ্ট হতে দেখলে বা দ্বীনের উপর কোন হামলা হলে তিনি ভীষণ পেরেশান হতেন এবং

১. সায়্যিদ আহমদ শহীদ র. ১৭৮৬ খৃ. অযোধ্যা প্রদেশে রায়বেরেলীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সেনানী ও অন্যতম আধ্যাত্মিক মনীষী। কুরআন হাদীস এবং অন্যান্য বিষয়সমূহ শিক্ষালাভ করেন শাহ আব্দুল কাদির র. -এর তত্ত্বাবধানে । ২২ বছর বয়সে শাহ আব্দুল আযীয র. -এর হাতে বায়'আত হয়ে খিলাফত লাভ করেন। ১৮১০ খৃ. টংকের নবাব আমীর খানের অধীনে সিপাহীর চাকুরি গ্রহণ করেন। ১৮১৩ খৃ. টংকের নবাব ইংরেজদের সাথে আপোষ করলে তিনি সিপাহীর চাকুরি ছেড়ে দিয়ে দিল্লী চলে আসেন। ১৮২০ খৃ. শাহ আব্দুল আযীয র., শাহ ইসমাঈল শহীদ র. সহ প্রায় চারশ সাথী নিয়ে হজ্ব আদায় করেন। ১৮২৩ খৃ. ভারতে প্রত্যাবর্তন করে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৮৩১ খৃ. পাঞ্জাবে রাজা রণজিৎ সিংয়ের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে করতে শাহাদাত বরণ করেন। (হুসাইন আহমদ মাদানী, *নকশে হায়াত*, দেওবন্দ, মাকতুবা-ই দ্বীনিয়া, ১৯৫৩, খ. ২য়, পৃ. ২৫-২৯।)

প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতেন। শরীআত বিরোধী কার্যকলাপ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন। দ্বীনের বিশুদ্ধ নীতিভ্রষ্ট, বিদআতীদের তিনি কঠোর সমালোচনা করেছেন। এ জন্য তিনি স্বীয় কলমকেও বিশেষভাবে ব্যবহার করেছেন। দেশের ক্ষমতাসীনদের সংশোধনের উপদেশ দিয়েছেন। তাঁদের ভুল ক্রটিগুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছেন। দেশের সেবা এবং সত্যের বাণী সমুন্নত রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। জীবনের শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহর জন্য দুআ করেছেন, আল্লাহ তাআলার রহমত প্রার্থনা করেছেন, তাদের ঈমানের নিরাপত্তা, উত্তম পরিণতি কামনা করেছেন।[১]

তাকওয়া : মুফতী সাহেব ছিলেন তাকওয়া পরহেযগারীর মূর্তপ্রতীক। আল্লাহর প্রতি পূর্ণ অনুগত এবং সব ধরণের গুনাহ হতে মুক্ত থাকতে আজীবন সংগ্রাম করেছেন। প্রকাশ্যে, গোপনে, সুখে, দুখে, সুস্থ ও

অসুস্থ সর্বাবস্থায় তাকওয়া ধরে রেখেছেন। তিনি সর্বদা তাকওয়ার উপর চলতেন। বৈধ হওয়ার সম্ভাবনা বা সুযোগ আছে এমন বিষয়ের উপর আমল করতেন না। উত্তম আমল গ্রহণ করতেন। ফাতাওয়া লিখার সময় তাকওয়ার দর্শনকে সামনে রাখতেন। জীবনে সগীরা গুনাহ করেছেন এমনটিও তাঁর সুহৃদ, সহপাঠীদের চোখে পড়েনি। তিনি ছিলেন প্রচারবিমূখ। নীরবে একাকীত্বে থাকতে পছন্দ করতেন। তিনি ছিলেন মুহিউস্‌সুন্নাহ। তাঁর উস্তাদ মাওলানা আব্দুল হামীদ র. তাঁকে এ দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যে, 'যেখানেই যাও আরশে আরোহন করলেও সুন্নতের অনুসরণ ও দ্বীনদারী না থাকলে আত্মা খুশি হবে না, শান্তি পাবে না। তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে চলতেন। তাঁর এক ভাবীর স্বাক্ষ্য হলো, ফয়যুল্লাহকে কোলে নিয়ে তাঁর নানী যখন নারী মহলে যেতেন, ফয়যুল্লাহ তখন নারীদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন। ছোট বয়সেও ঘরে ঢুকলে কোন মহিলার পেট উদোম দেখলে সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতেন অথবা অন্য দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকতেন। তিনি যখন হাটহাজারী মাদ্রাসায় প্রাথমিক স্তরে লেখাপড়া করেন তখন থেকেই মহিলাদের সাথে পর্দা করতে আরম্ভ করেন। তবে শিক্ষকগণের পরামর্শের ভিত্তিতে প্রাপ্ত বয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত বিষয়টির আর কঠোরতা অবলম্বন করেননি। হাটহাজারী মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়ার আগে থেকেই তিনি চলাফেরা, কথাবার্তায় দ্বীন ও তাকওয়ার বিষয়ে খুব সতর্ক ছিলেন। তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন, শিশু বয়স থেকেই আমি বাড়ীতে এবং মাদ্রাসায় যাওয়ার পর কোনদিন কারো সাথে ঝগড়া করিনি। বরং সবার সাথে সমান সুন্দর আচরণ করেছি। আলহামদুলিল্লাহ, আমার মাধ্যমে কারো কোন কষ্ট পৌঁছেনি। কারো সাথে খারাপ আচরণ করিনি। মুফতী ফয়যুল্লাহর জীবনাচার নিয়ে গবেষণায় একটি বিষয় বেরিয়ে এসেছে তিনি ছিলেন জন্মগতভাবে তাকওয়ার অধিকারী। পরনিন্দা, পরচর্চা, গীবত, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সমালোচনা করাকে তিনি অপছন্দ করতেন। মানুষ এমনকি পশু পাখির হক আদায়ে তিনি দায়িত্বশীলের পরিচয় দিয়েছেন।[২]

কাওকে কষ্ট না দেয়া : মুফতী সাহেবের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল কাউকে আঘাত না করা, কারো সাথে ঝগড়া বিবাদ না করা, অত্যাচার না করা। এ গুণটি তাঁর মধ্যে প্রবল ছিল। যে কেউ তাঁকে তাচ্ছিল্য বা ঘৃণা করলে তার জবাব দেননি এবং সাথীদেরকে এর জবাব দিতে বারণ করতেন। অপরের অকল্যাণ কামনা করা এবং প্রতিশোধ নেয়ার প্রবণতা তাঁর মধ্যে ছিল না। অন্যের চারিত্রিক ক্রটি বিচ্ছুতি খুঁজতেন না। এমনকি বিরোধী পক্ষের নাম মুখে উচ্চারণ করতেন না। তাঁর জীবনের বার্ধক্যকালে মানুষ যখন সাক্ষাতের জন্য ভীড় করত, তখন অনেকেই মুফতী সাহেবকে এমন প্রস্তাব করেছিলেন যে, হুজুর! আপনার সাথে সাক্ষাতপ্রার্থীদের একটি সময় নির্দিষ্ট করে দেই। যাতে উক্ত সময়ের বাইরে কেউ সাক্ষাত করতে এসে আপনাকে বিরক্ত না করে অথবা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে। তখন তিনি বললেন, মানুষ আমাকে দেখতে আসে, আমার প্রয়োজনে আসে এতেই আমার লজ্জা হয়। তাদেরকে পরে আসতে বলা বা অপেক্ষা করতে বলা আমার মন চায় না। আমি তো জীবনে কাউকে কষ্ট দিতে চাই না। আমার সাথে কেউ সাক্ষাত করতে আসলে আমি রাসূলুল্লাহ

১-২. হায়াতে মুফতী আযম, পৃ. ২৪-২৬; নোমান, পৃ. ৩৭; আল্লামা হাফেজ জুনায়েদ বাবুনগরীর রচনাসমগ্র, পৃ. ৩৯৩-৩৯৫; মাশায়েখে চাটগাম, পৃ.৩৮১-৩৮২।

সা.-এর এ হাদীসকে সামনে রাখি- من قضي لاحد من امتي حاجة يريد ان يسره فقد سرني ومن سرني فقد سر الله ومن سر الله ادخله الله الجنة 'যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কারো কোন প্রয়োজন নিছক তাকে খুশি করার উদ্দেশ্য পূরণ করবে সে নিশ্চিত আমাকে খুশি করবে। আর যে আমাকে খুশি করবে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।'[১]

ইখলাসের আদর্শ প্রতীক : মুফতী সাহেবের দীর্ঘ ষাট বছরের কর্মজীবনে এবং তদপূর্বে ছাত্র জীবনে যে বিষয়টি উজ্জ্বল হয়ে আছে তা হলো তাঁর ইখলাস, লিল্লাহিয়াত। তিনি ইখলাসকে সফলতার মাপকাঠি মনে করতেন। তিনি ইল্‌ম দ্বীন অর্জন করার পেছনেও একটি নিখুঁত ইখলাস সম্পন্ন নিয়্যত করেছিলেন। জীবনের সব অনুভূতি, অনুভব, চিন্তা, চেতনা, কার্যক্রমকে ইখলাসের মধ্যে আবদ্ধ করেছিলেন, আল্লাহর

সন্তুষ্টি কামনা করেছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন, 'ছোট সময় থেকেই আমার মধ্যে দুনিয়ার কোন মোহ ছিল না। বরং দ্বীন ছিল আমার জীবনের পরম লক্ষ্য। তিনি খুলুসের মধ্যে আত্মশক্তি উপলব্ধি করতেন। প্রভাবশালী ব্যক্তিরা তাঁকে আলীয়া মাদ্রাসা হতে ডিগ্রী অর্জনের পরামর্শ দিলে তিনি বলতেন, জমজমের পানি পান করার পর নোনা পানি কিভাবে পান করব, রাজত্ব ছেড়ে চৌকিদারী কেন করব? দেওবন্দের বড় বড় উস্তাদগণের সোহবত লাভে ধন্য হওয়ার পর অন্যদের সোহবত কেমনে নিব।[৩] সফলতার উন্নতি খুলুসের মধ্যে নিহিত আছে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। তিনি ছিলেন একজন পাক্কা মু'মিন, ঈমানের দৌলতে সমৃদ্ধ। আসন্ন বিপদ পূর্বেই অনুমান করতে পারতেন। ইখলাসের উপর বিশ্বাস, আল্লাহপাকের যাতের উপর ভরসা এবং দুআর উপর আস্থা রেখে ময়দানে নামতেন এবং সফলতার স্তর অতিক্রম করতেন। দেওবন্দে ছাত্র জীবনে পবিত্র শবে বরাতে মসজিদে ঢুকে কান্নার ভাষায় আল্লাহতাআলার নিকট নিবেদন করেছিলেন; 'হে আল্লাহ তোমার এ বান্দাকে জীবনের শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত তোমার দয়া, অনুগ্রহের মধ্যে রাখ। ইলমী দুনিয়ার সাথে আমাকে যুক্ত রাখ।' মুফতী সাহেব উল্লেখ করেছেন যে, আমার ইলমী উন্নতি বলে দেয় যে, আল্লাহ তাআলা ঐদিন আমার দুআ কবূল করেছিলেন। দুনিয়ার নাম ধাম, যশ, খ্যাতি, কোনটিই তাকে স্পর্শ করেনি। শেষ জীবন পর্যন্ত লিল্লাহিয়ত, ইখলাস, বিশুদ্ধ নিয়্যতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। দুনিয়া অর্জনের লক্ষে দ্বীনী ইলম শিক্ষা করাকে গুনাহর কাজ মনে করতেন। কারণেই সরকারী মাদ্রাসায় সম্পৃক্ততাকে তিনি অনুচিত মনে করতেন। যেহেতু ওখানে পড়ালেখার উদ্দেশ্য খালেস আল্লাহর সন্তুষ্টি থাকে না । রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, من تعلم علما مما يبتغي به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يعني ريحها 'ইল্‌ম যদ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, দুনিয়ার কোন বস্তু লাভের উদ্দেশ্যে তা শিক্ষা করবে সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের গন্ধও লাভ করতে পারবে না, (মিশকাত)।[৩] মুফতী সাহেব ছিলেন আকাশের মত উদার। দ্বীন ও মিল্লাতের কাজে অংশগ্রহণকারী সবাইকে আন্তরিকভাবে স্থান দিতেন। তাঁর চাল চলন ছিল অত্যন্ত সাদাসিধে। তিনি সাধারণ মানুষদের ভাল দিকগুলো মেনে নিতেন এবং সমর্থন জানাতেন। যাদের সাথে মিশতেন তাদের মধ্যে মৌলিক কোন ত্রুটি আছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখতেন। অতপর তাদের সাথে মেশা ও অবস্থান করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতেন। তবে নিজের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্রতা বজায় রাখতেন।[৪]

আত্মত্যাগী মহাপুরুষঃ মুফতী সাহেব ছিলেন আত্মত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত। ভোগের জীবন তাকে কখনো স্পর্শ করেনি। পার্থিব সম্পদের প্রতি ছিলেন নির্মোহ। আর্থিক দিক দিয়ে তিনি কখনো স্বচ্ছল ছিলেন না। তথাপি হালাল উপায়ে অর্জিত অর্থের উপর তার লোভ নিয়ন্ত্রিত ছিল। তিনি সাধারণ মানের পোশাক পরতেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে দুনিয়ার ভোগ বিলাস হতে পবিত্র রেখে ছিলেন। হাটহাজারী মাদ্রাসায় অল্প বেতনে অধ্যাপনা করেছেন। পরবর্তীতে মেখলে নিজ বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় ছাত্রদেরকে বিনা বেতনে পড়িয়েছেন। উচ্চ বেতন ও আকর্ষণীয় সুযোগ সুবিধার প্রস্তাবগুলো তিনি সব সময় নাকচ করেছেন। হাটহাজারী মাদ্রাসার শিক্ষক হিসেবে যোগদানের প্রাক্কালে জনাব

১. *ফয়যুল কালাম*, পৃ.২৬, হাদীস নং ৩২; *হায়াতে মুফতী আযম*, পৃ. ২৪-২৬।

২. হায়াতে মুফতী আযম, পৃ. ৬৫, ১০০-১০১; মাশায়েখে চাটগাম, পৃ. ৩৫৮,

৩. *মেশকাত শরীফ*, (নূর মোহাম্মদ আ'জমী, অনূ), প্রাগুক্ত, খ. ২য়, সং. ৫ম, পৃ. ২২।

৪. *হায়াতে মুফতী আযম*, পৃ. ৬৫, ১০০-১০২।

ইয়ার আলী চৌধুরী নামক তাঁর জনৈক আত্মীয় চট্টগ্রাম মুহসিনিয়া মাদ্রাসায় (বর্তমানে মহসিন কলেজ) তিনশত পঞ্চাশ টাকা বেতনের একটি চাকরির প্রস্তাব পেশ করলেও তিনি তা নাকচ করে দেন। অথচ তখন তিনি হাটহাজারী মাদ্রাসা হতে মাত্র পনের টাকা বেতন পেতেন, সংসারের অভাব অনটনে জর্জরিত ছিলেন। তিনি মনে করতেন, ঐ লোভনীয় প্রস্তাবে সায় দেয়া মানে ইল্‌ম নববীর উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়া, তাই তিনি সে প্রস্তাব নাকচ করে দেন।[১]

নম্রতা : নম্রতা ছিল মুফতী সাহেবের চরিত্রের অন্যতম ভূষণ। ছোট বড়, ধনী গরীব সবার সাথে নম্র আচরণ করতেন। তিনি ছিলেন, রাসূলুল্লাহ সা. -এর হাদীসের আদর্শ প্রতীক। যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে নম্রতা অর্জন করে আল্লাহ তাআলা তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন। তাঁর মধ্যে কোন অহংকার ছিলনা।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাধ্যমে অনেক খেদমত নিয়েছেন বটে কিন্ত তিনি কখনো এমন দাবী করেননি যে, একাজটি আমি করেছি। এ বিবেচনায় দেখা যায় তিনি ছিলেন সমগ্র বিশ্বের জন্য এক মহান আদর্শ। রুহানিয়্যত, আত্মিক উন্নতির প্রধান শর্ত আত্মবিলোপ, শায়খে কামিলের পূর্ণ আনুগত্য। এ গুন পূর্ণভাবে মুফতী সাহেবের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তিনি উস্তাদ মুরুব্বীগণকে মান্য করতেন, তাঁদের কথা, অনুমতি ও সিদ্ধান্তের বাইরে কিছু করতেন না। তিনি মনে করতেন, আজকাল আমাদের তালিবে ইলম এবং আহলে ইলম তবকার মনীষীদের মধ্যে যে মহা দূর্ভিক্ষ এবং আদর্শের মহা সংকট দেখা দিয়েছে তার প্রধান কারণ আমরা উস্তাদ ও মুরুব্বীদের হাতে নিজেকে সোপর্দ করি না। আমরা নিজেদের মতের উপর নির্ভর করি। তাই অসংখ্য সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তা ধীরে ধীরে হারিয়ে যাই।[২]

নামায ও জামা'আতের ইহতিমাম ঃ মুফতী সাহেব নামাযে জামা'আতের খুব ইহতিমাম করতেন। আযানের পূর্বেই নামাযের প্রস্তুতি নিতেন, আযান শুনেই মসজিদে চলে যেতেন। হাদীসে এসেছে, সাত শ্রেণির মানুষ হাশরের দিন আল্লাহ তা'আলার আরশের নিচে আশ্রয় পাবেন। তন্মধ্যে যার দিল সর্বদা মসজিদের সাথে লেগে থাকে তিনিও রয়েছেন। আযানের পর বাসায় অবস্থান করাকে তিনি পছন্দ করতেন না, অপর পুরুষের জন্যও না। জীবনের শেষ দিকে যখন মসজিদে যাওয়ার শক্তি ছিলনা তখনো তিনি সাথী সংগীদের মসজিদে পাঠিয়ে দিতেন এবং নিজে একা নামায পড়তেন। তিনি বলতেন, শরয়ী ওযরের কারণে নামাযের জামা'আতে হাজির না হওয়ার জন্য আমার অনুমতি থাকতে পারে কিন্ত তোমাদের জন্য নেই, সুতরাং তোমরা মসজিদে যেয়ে জামা'আতে শরিক হও।[৩]

পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও অনাড়ম্বর জীবনঃ মুফতী সাহেব পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে খুব খেয়াল রাখতেন। তাঁর জীবন ছিল সহজ, সরল , অনাড়ম্বর। লেবাস ,পোষাকে তাঁর কোন জৌলুস ছিলনা। তিনি দাম্ভিকের মত চলতেননা। তাঁর মধ্যে কোন লৌকিকতা ছিলনা। সব কাজ ছিল গোছানো, পরিপাটি, সুশৃংখল। তিনি ঝাঁকঝমক পছন্দ করতেননা। রাসূলে পাকের সা. পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা এবং সুন্নতের প্রতি তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। তিনি পোশাক পরিচ্ছদ, বেশ ভূষায় সুন্নাহর অনুসরণ করতেন। সব সময় পায়জামা- পাঞ্জাবী পরেই বাইরের পরিবেশে আসতেন। ঘরোয়া পরিবেশে লুঙ্গী, টুপি পরতেন। মাথায় পাগড়ী বাঁধতেন। গরমের সময় বাড়ীতে উদোম দেহে সময় কাটাতেন এবং অধিকাংশ সময় গেঞ্জী না পরে পাঞ্জাবী পরতেন। তিনি চা পানে অভ্যস্ত ছিলেন। অতিথি অভ্যাগতদেরকে চা পানে আপ্যায়িত করতেন। তামাক ও তামাক জাতীয় বস্তু কখনও স্পর্শ করেননি। সর্বদা পরিপাটি থাকতে ভালোবাসতেন।[৪]

শোকরগুযারী : মুফতী সাহেবের পিতা বলতেন, 'আমার সন্তান ফয়যুল্লাহ আমার মা'র মতো কৃতজ্ঞ। অল্পে তুষ্ট। আমার মা শাক ভাতকে গণীমত মনে করতেন।' মুফতী সাহেব অসামান্য খ্যাতি ও পরিচিতি লাভ করার পরও কারও উপকার ও ইহসান কখনও ভুলতেন না। বরং বিভিন্ন মজলিসে তা ব্যক্ত করতেন এবং আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করতেন। তিনি বড় হওয়ার মূলে আল্লাহ তাআলার মেহেরবানী, পিতা মাতার তরবিয়ত,উস্তাদগণের মহব্বতের অবদানকে অকপটে স্বীকার

১. নোমান, পৃ. ৯১-৯২; *হায়াতে মুফতী আযম*, পৃ. ১০০-১০৩।
২. *ফয়যুল কালাম*, পৃ. ৪৪০, হাদীস নং ৯০৮; নোমান, পৃ. ৯০-৯২; *হায়াতে মুফতী আযম*, পৃ. ১০২-১০৪
৩. *ফয়যুল কালাম* পৃ. ২৫৯, হাদীস নং ৪১৬।
৪. *হায়াতে মুফতী আযম*, পৃ. ১৫৬-১৫৭।

করতেন। শাক ভাত জুটলেই আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করতেন। তিনি সকাল আটটায় ঘরে যা থাকতো তা খেয়েই মাদ্রাসার উদ্দেশ্যে বের হতেন। সারাদিন দরস দিতেন। সন্ধ্যার পূর্বে বাড়ী ফিরতেন। এর মধ্যে খাওয়া, পরার কোন ব্যবস্থা ছিল না। এ নিয়ে তাঁর কোন অভিযোগও ছিল না। তাঁর জীবনে অর্থ বিত্তের চাওয়া পাওয়া ছিল না। তিনি বলতেন, খাওয়া, পরার জন্য আমার অতিরিক্ত কিছু প্রয়োজন নেই। নানা প্রকার রান্না, মজাদার খাবার ইত্যাদির আয়োজন প্রয়োজন মনে করতেন না।

কর্মবীর : মুফতী সাহেব ছিলেন কর্মবীর। কর্ম ছিল তাঁর সাধনা। কর্মবিহীন এক মুহূর্ত কেউ তাঁকে দেখেনি। তাঁর কর্ম ছিল ইলমী দুনিয়ার সাথে, রচনা জগতে, আধ্যাত্মিক সাধনায়, মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসার। মুফতী সাহেব বলেন, 'মাদ্রাসার ছুটির দিনসমূহে তুলনামূলকভাবে বেশি ব্যস্ত থাকতাম। ছাত্রজীবনে ব্যস্ত ছিলাম, লেখাপড়া, তাকরার, পাঠোদ্ধার ও লিখনীতে। শিক্ষক জীবনে ব্যস্ত

ছিলাম অধ্যাপনা, মুতালা'আ, গবেষণা, রচনা, সংস্কার কর্ম নিয়ে।' তাঁর জীবনে কর্মের দর্শন ছিল ছোট ছোট সুন্নতের উপর আমল করে বড় বড় ফযীলত অর্জনের চেষ্টা করা। অধিক আমল, অধিক মুজাহাদা ছিল পূর্বেকার উম্মতের বৈশিষ্ট্য। আর কম আমল অধিক নেকী এ উম্মতের বৈশিষ্ট্য। তাই তিনি সর্বদা সুন্নত খুঁজেছেন। অধিক নেকী অর্জনের চেষ্টা করেছেন। বিষয়টি তাফাক্কুহ ফিদ্দীন ও হিকমত হিসেবে গণ্য। তিনি হাটহাজারী মাদ্রাসা হতে সরে আসার পর কখনো কখনো হাটহাজারী মাদ্রাসায় যেতেন। তখন মাদ্রাসার অর্থ সংকটের কথা শুনতেন ও অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতেন। তিনি মুহতামিম সাহেব ও অন্যান্য শিক্ষকগণকে বলতেন, 'আপনারা খালিস নিয়তে হক আদায় করুন। খেয়ানত থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখুন। যা মিলে তার উপর সবর করুন। ইনশা আল্লাহ আল্লাহর গায়বী সাহায্য আসবে।' অভিজ্ঞতার দেখা গেছে যারাই মুফতী সাহেবের কথা মত কাজ করেছেন তাদের আজ পর্যন্ত কোন অভাব অভিযোগ নেই। সকলেই আল্লাহর রহমতে স্বচ্ছল, নির্বিঘ্নে, নিশ্চিন্তে জীবনযাপন করেছেন। তাঁর জীবনের অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল একাকীত্বে, নিভৃতে, নীরবে, অপরিচিত থাকা। একাকী ও নীরবে থাকার জন্যই হাটহাজারী মাদ্রাসা থেকে নিজেকে আস্তে আস্তে গুটিয়ে নিতে চেয়ে ছিলেন। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। প্রয়োজনের তাগিদে তাঁর প্রতিষ্ঠিত হামিউস সুন্নাহ মেখল মাদ্রাসায় দেশের প্রতিটি অঞ্চল থেকে শত শত ছাত্র আগমনের ফলে তাঁর একাকীত্ব থাকা হলনা। বরং অবস্থা ও পরিবেশ সম্পূর্ণ উল্টে গেল। কারণেই তিনি এ কবিতা আবৃত্তি করতেন, ر شهرت هوس داري اسير كنج عزلت شو বিখ্যাত, নামযাদা হওয়ার আকাঙ্খা থাকলে একাকীত্বে, নির্জনে বসে যাও।

মুফতী সাহেবের আমল, আখলাক, তাকওয়া, যুহদ, নি:স্বার্থ জীবন, পার্থিব জগত হতে বিমুখতা, ত্যাগ ও কুরবানী, নি:স্বার্থ খিদমতে খাল্‌ক ও ইলমী মাশগালা বাংলাদেশের আলিম মাশাইখসহ সাধারণ মানুষের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁর ব্যক্তি স্বত্তায় ইলমী সম্ভ্রম বিদ্যমান ছিল। তাঁর প্রতিটি মূহুর্ত ছিল অতি মূল্যবান, ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে নিবেদিত। রাসূলের সুন্নত যিন্দা করা, কুরআন হাদীস ইলম দ্বীনের তা'লীম তরবিয়তে নিয়োজিত ছিলেন। অত্যন্ত উঁচু মাপের আলিম হওয়া সত্ত্বেও ছিলেন বিনয়ী ভদ্র ও অতিথি পরায়ন। তাঁকে দেখলে অন্তরে শ্রদ্ধা জাগত। তিনি ছিলেন সুন্নতের প্রতিকৃতি। যিক্‌র, দুআ, মুনাজাত, রচনা, জ্ঞান সাধনায় সব সময় তন্ময় থাকতেন। ধৈর্য্য ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম ভূষণ। জীবনের আরাম আয়েশ ও ভোগ বিলাসিতার দিকে না থাকিয়ে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করেছেন। শহরের কোলাহল, জীবনের হাঙ্গামা থেকে নিজেকে পৃথক করে নিয়েছিলেন। মুসলিম উম্মাহর রূহ হলো আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা, ইসলামী যিন্দেগীর উৎস কুরআন, হাদীস সেগুলোর হেফাযতে ব্যস্ত ছিলেন। প্রতিটি মাসআলায় কুরআন, হাদীস যুক্তিসঙ্গত দলীল-প্রমাণ দ্বারা মীমাংসা দিয়েছেন। যতকাল মানুষ জ্ঞান সাধনার প্রতি অনুরাগী থাকবে ততকাল এ মনীষী মানব সভ্যতার ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন। তাঁর মতো কীর্তিমান মনীষীর মৃত্যু নেই।[১]

১. *হায়াতে মুফতী আযম*, পৃ. ১৫৭-১৫৮। *মাশায়েখে চাটগাম*, পৃ. ৩৫৮-৩৬২; *আল্লামা হাফেজ জুনায়েদ বাবুনগরীর রচনাসমগ্র*, পৃ. ৩৯৩-৩৯৫।

দ্বাদশ অধ্যায় :
উপসংহার

আমরা আমাদের পুর্বসূরীদের নিকট হতে উত্তরাধিকার সূত্রে ও বংশ পরম্পরায় যে মহামূল্যবান সম্পদ লাভ করেছি তা হলো পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বিশাল জ্ঞান ভাণ্ডার, সুদৃঢ় ও সংরক্ষিত ঈমান, আকীদা, মহান চরিত্র, ফিকহ, শরী'আত এবং শানদার ইসলামী সাহিত্য। এসবের প্রতিটি মুফতী ফয়যুল্লাহ লাভ করেছিলেন এবং জাতিকেও উপহার দিয়েছেন। চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানাধীন মেখল গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৩১০ হি. তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩৯৬ হি. ইন্তিকাল করেন। প্রথমে

হাটহাজারী মাদ্রাসা পরে দারুল উলূম দেওবন্দ হতে হাদীসের সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করেন। হাটহাজারী মাদ্রাসায় শিক্ষকতার মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন আরম্ভ হয়। মাদ্রাসায় হাদীস, ফিকহ, নাহু, সরফ, মানতিক, সাহিত্য ইত্যাদি পাঠদান করতেন। সাথে ফাতাওয়া প্রদানের দায়িত্ব পালন করতেন। কালক্রমে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, লেখক, সংস্কারক, বর্ষীয়ান আলিমে দ্বীনের খ্যাতি ও মর্যাদা অর্জন করেন। তাঁর পূর্ব পুরুষগণ ছিলেন আরব বংশোদ্ভুব। আভিজাত্য, শ্রেষ্ঠত্ব, খোদাভীরুতা, বিশ্বস্ততা, জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতীক ছিলেন। ঐতিহ্যগতভাবে আধ্যাত্মিক সাধনায় অভ্যস্ত ছিলেন। মুফতী সাহেব অনুপম চারিত্রিক মাধুর্যের পরিমণ্ডলে লালিত পালিত হয়েছেন। সে পরিবেশে তাঁর শৈশব, কৈশর ও যৌবন অতিবাহিত হয়েছে। জন্মগত পরিবেশ পরিমণ্ডলের মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব তাঁর ব্যক্তিত্বে ক্রমান্বয়ে বিস্তার করেছিল। শরীআত ও ধর্মীয় বিকৃতি ও অপব্যাখ্যা তাঁকে আহত করেছিল। তাই দ্বীনী ইলম এদেশের প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার জন্য হাটহাজারী মাদ্রাসায় অধ্যাপনার বিশাল দায়িত্ব পালন করেছেন। পরবর্তীতে নিজ বাড়ী মেখলে প্রতিষ্ঠা করেছেন হামিউসসুন্নাহ মেখল মাদ্রাসা। কুরআন, হাদীসের উপর আমল করাই ছিল তাঁর জীবনের বৈশিষ্ট্য। এক্ষেত্রে কারো আপত্তির পরোয়া করতেন না। এর ফলে অনেকের সাথে তার দূরত্বের সৃষ্টি হয়। তাই তিনি স্বাধীন চিন্তা, চেতনা, স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে পবিত্র মদীনার প্রথম মাদ্রাসা আসহাবুস সুফফার অনুকরণে এ মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠিত করেন। একটি অজপাড়াগাঁয়ে, নিভৃত পল্লীতে তিনি ইলমী আন্দোলনের যে জাগরণ সৃষ্টি করে গেছেন তা অভাবনীয় ও অভূতপূর্ব বিষয়। সেই জাগরণের ঢেউ সারা দেশে আছড়ে পড়েছে। দেশের প্রতিটি আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা হাজার হাজার তালিবে ইলম তাঁর প্রতিষ্ঠিত মেখল মাদ্রাসায় প্রতি বছর শিক্ষা লাভে ধন্য হয়।

তিনি জাহিলিয়্যাত ও ভোগবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করেছেন, ইসলামের যে বৈশিষ্ট্যগুলো সমাজ হতে মিটে গিয়েছিল সেগুলো আলোকোজ্জ্বল করেছেন, উম্মাহর অন্তরে ঈমানের নূর প্রজ্জ্বলিত করেছেন, দ্বীনের মূল উৎসসমূহ হেফাজতের চেষ্টা করেছেন, হাদীস ও ফিক্হশাস্ত্র নতুন করে সম্পাদনের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন, সমাজের প্রতি হিসাব নিকাশের আবশ্যিক দায়িত্ব পালন করেছেন। সঠিক, বিশুদ্ধ, প্রকৃত ইসলামের প্রতি মানুষকে প্রকাশ্যে দাওয়াত দিয়েছেন। দ্বীনের প্রচার প্রসারে চরম আত্মত্যাগ স্বীকার করে সকল প্রতিকূলতা মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছেন। বিলাসী, আয়েশী জীবন যাপনের পরিবর্তে নির্লোভ, নির্মোহ, সাদাসিধে জীবন যাপন করেছেন। রূহানিয়াতের আলোকধারায় মানুষকে হিদায়াত করেছেন। নিজের জ্ঞান, মেধা, মনন, প্রজ্ঞা ও দূরদর্শীতা ও আধ্যাত্মিক শক্তি বলে মুসলিম উম্মাহর চালিকা শক্তির ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছেন। বিভিন্ন শাস্ত্রের প্রতিভাবান আলিম, ফকীহ, মুফতী হিসেবে সমধিক খ্যাতি লাভ করেছেন। একজন জ্ঞান তাপস, শিক্ষক, ফকীহ, লেখক, সমাজ সংস্কারক হিসেবে জাতিকে সেবা দিয়ে গেছেন। বিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে যে কয়জন খ্যাতিমান আলিম, মাশাইখ, সংস্কারকের আবির্ভাব হয়েছে মুফতী ফয়যুল্লাহ ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ইলমী ময়দানের মানুষ হিসেবে খ্যাত ছিলেন। তাঁর লিখনী ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য যুগ যুগ ধরে ইল্মী রেহনুমায়ী করবে এটাই প্রত্যাশা। তাঁর রচনাসমূহ ছিল মৌলিক। বেশ কিছু গ্রন্থ সংকলন হিসেবেও তৈরী করেছেন। তাঁর রচনাসমূহ আরবী, ফার্সী ও উর্দূ ভাষায়। রচনার ভাষা সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল। তাঁর রচনায় পবিত্র কুরআনের তাফসীর, হাদীসের ব্যাখ্যা, মুসলিম মিল্লাতের ধর্মীয়, নৈতিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়সমূহ স্থান লাভ করেছে। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, গ্রন্থ রচনা, তাঁর মজ্জাগত বিষয় ছিল। শিক্ষা বিস্তার ও গবেষণায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। আধ্যাত্মিকতা, আত্মশুদ্ধি ছিল তাঁর জীবনের ভূষণ। ভোগ বিলাস, লোভ লালসা হতে দূরে অবস্থান করে পূতপবিত্র জীবন যাপন করেছেন। ভারতবর্ষের মানুষ তাঁকে মুফতী আযম উপাধিতে ভূষিত করেছেন। তিনি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভূক্ত হানাফী মাযহাব অনুসরণ করতেন। আজীবন হানাফী মাযহাব সম্মত ফাতাওয়া ও ফিকহ চর্চা ও রচনা করেছেন। ফিকহ ও ফাতাওয়া চর্চায় তাঁর অবদান অসামান্য। এক্ষেত্রে তিনি নিজস্ব চিন্তাধারার স্ফূরন ও স্বকীয় চেতনাবোধের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছেন। ফিকহ, ফাতাওয়া, ইসলামী আইন বিদ্যায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য, প্রজ্ঞা,

ইজতিহাদী যোগ্যতার উদ্ভাবনী শক্তির ফলে ফিকহশাস্ত্রে স্বতন্ত্র ভূমিকা রাখতে সক্ষম হন। একজন আদর্শ শিক্ষক হিসেবে অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি ছাত্রদের সাথে স্নেহপূর্ণ আচরণ করতেন। মাদ্রাসায় আনুষ্ঠানিক শিক্ষা দানের পরও নিজ বাসস্থান এমনকি চলার পথে শিক্ষার্থীকে পাঠদান করতেন। এজন্য কোন ধরণের পারিশ্রমিক নিতেন না। জ্ঞানার্জন ও জ্ঞান বিতরণে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। কর্মজীবনে অসংখ্য উদাহরণের পাশাপাশি গ্রন্থ রচনায়ও তাঁর অবদান অপরিসীম। তিনি ছিলেন মৌলিক প্রতিভার অধিকারী। ইলমী দুনিয়ায় নিজস্ব চিন্তা, কর্ম, নিজস্ব ভাষা, শক্তি ও স্বাতন্ত্রের যে পরিচয় রেখেছেন বাংলাদেশের আলিমদের মধ্যে তা কমই দেখা যায়। তিনি ছিলেন বাস্তববাদী, জীবনধর্মী, সমাজ সচেতন, ইলমী জগতের জ্যোতির্ময় নক্ষত্র, ইসলামী চিন্তাবিদ, ফকীহ, মুফতী, সমাজের অভিভাবক, হক ও হক্কানিয়তের মূর্ত প্রতীক। হাজারও আলিম, ফকীহ, মুফতী সৃষ্টিতে তিনি যেমন অনন্য ভূমিকা রেখেছেন, তেমনি নিজস্ব চিন্তা, গবেষণা উদ্ভাবনী শক্তিকে অনবদ্য লিখনীর মাধ্যমে প্রচার করে গেছেন।

তাকওয়া ও পবিত্রতার এক অদ্ভুত নমুনা ছিলেন তিনি। তাঁর চলাফেরা কথাবার্তা, আচার, আচরণ, ইখলাস, লিল্লাহিয়ত সবাইকে মুগ্ধ করেছে। তাঁর পুরো জীবন ছিল ইখলাসে পরিপূর্ণ, ইখলাসের মূর্তপ্রতীক, লিল্লাহিয়াতের জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি। লেখাপড়ায় তাঁর গভীর মনোযোগ, তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা, তাঁর বাড়ীঘর দেখলেই অনুমান করা যায় তিনি কত বড় মুখলিস ছিলেন। তিনি মনীষী হিসেবে অনেক উঁচু স্তরের ছিলেন বটে কিন্তু তাঁর চালচলন ছিল একজন অতি সাধারণ মানুষের মত। তাঁর খাওয়া-পরা, ওঠা-বসা, চাল-চলন ছিল সাধারণের চেয়েও সাধারণ। যে বিষয়টিকে তিনি কুরআন সুন্নাহর আলোকে হক মনে করতেন তার জন্য ছিলেন বজ্রের মতো কঠিন, হিমালয়ের চেয়ে অটল। দ্বীনের জন্য দরদ, আন্তরিকতা, মানুষ গড়ার চিন্তায় ছিলেন নিমগ্ন। উম্মতের কল্যাণ কামনা ও সঠিক নেগরানীর জন্য সর্বদা ব্যাকুল ছিলেন। হাদীস ও ফিকহে অভিজ্ঞ এ আলিমে দ্বীনের নিকট অনেক প্রশ্নের উত্তর সহজে খুঁজে পাওয়া যেত। সারা দেশে অসংখ্য ছাত্র ভক্ত, অনুরাগী ও তাঁর আদর্শের অনুসারী রয়েছেন। দলীয় রাজনীতির সাথে তিনি সক্রিয় ছিলেন না, কিন্তু দেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিষয়ে গভীর দৃষ্টি রাখতেন।

তিনি নিজের ভুল স্বীকার করতেন এবং আল্লাহর নিকট সঠিক হিদায়াত কামনা করতেন। তাঁর মধ্যে যেসব গুণাবলীর সমাগম ছিল, তাঁর খেদমতে বসে যে মানসিক প্রশান্তি লাভ করা গেছে তা অন্য কারো নিকট পাওয়া যায়নি। তাঁর মৃত্যু সংবাদ অন্তর সমূহে বজ্রপাতের ন্যায় আঘাত করেছিল। সূর্য যেমন পূবে উদয় হলে পশ্চিমের অধিবাসীরাও আলো অনুভব করেন এবং পশ্চিমে অস্তমিত হলে পূবের অধিবাসীরাও অন্ধকার অনুভব করেন; তাঁর মৃত্যুতেও এমন সব মানুষের অন্তর ব্যাথা বেদনায় অস্থির হয়ে উঠেছিল যাদের সাথে তাঁর আত্মীয়তার কোন সম্পর্ক ছিল না।

মুফতী সাহেব ছিলেন অত্যন্ত নিরহংকার ও অমায়িক মানুষ। সহকর্মী ও ছাত্রদের প্রতি তাঁর দায়িত্ব জ্ঞান ছিল প্রখর। ছোটবড় সবার সাথে হাসিমুখে মেলামেশা করতেন। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, শিক্ষকগণের প্রতি সীমাহীন বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল আকর্ষণীয়, সমালোচনার উর্ধ্বে। সর্বস্তরের মানুষ তাঁকে অতি আপনজন মনে করতেন। দুনিয়াতে যারা আল্লাহর নৈকট্য লাভে ধন্য হয়েছেন এবং আল্লাহ পাক যাদেরকে তাঁর নৈকট্য দানের জন্য নির্বাচিত করেছেন, যারা ইলমে দ্বীনের নূর প্রচারে ছিলেন নিবেদিত প্রাণ, মুফতী ফয়যুল্লাহ ছিলেন তাদের একজন। ইল্‌ম ফিক্‌হ'র প্রতি তাঁর উৎসাহ, উদ্দীপনা, নিমগ্নতা ছিল অস্বাভাবিক। কালক্রমে তিনি ফিক্‌হ, ফাতাওয়ায় গবেষণা ও উদ্ভাবনী শক্তি অর্জন করেন। ইসলামী আইন বিদ্যায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং ইজতিহাদি যোগ্যতার ফলে ফিক্‌হশাস্ত্রে স্বতন্ত্র ভূমিকা রাখতে সক্ষম হন। অসংখ্য আলিম, মুফতী, ফকীহ সৃষ্টিতে অনন্য ভূমিকা রাখেন। বিংশ শতাব্দীর একজন পূর্ণাঙ্গ ফকীহ মুফতী ছিলেন তিনি। সমসাময়িক যুগের ফিক্‌হ চর্চায় তাঁর ন্যায় দ্বিতীয় কেউ ভূমিকা রাখতে পারেননি। ভারতবর্ষে উল্লেখযোগ্য মনীষীগণের প্রায় সবাই তাঁর দরবারে এসেছেন, সাক্ষাত করেছেন। তিনি হাটহাজারী মাদ্রাসার মজলিসে ইলমীর শিরোমনি ছিলেন। সর্বসম্মতিক্রমেই তিনি ছিলেন যুগের শ্রেষ্ঠ ফকীহ, মুফতী। তিনি মুজতাহিদ সুলভ জ্ঞান, প্রজ্ঞা দ্বারা দলীল প্রমাণের মাধ্যমে যুগের চাহিদা পূরণে গৌরবজনক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছেন। ফিক্‌হ ও ফাতাওয়া রচনায় পবিত্র কুরআনের উপর তাঁর দীর্ঘ গবেষণা, বিস্ময়কর সম্পৃক্ততা, গভীর জ্ঞান, আয়াতসমূহের সূক্ষ্ম

ইঙ্গিতের সাথে আত্মিক আকর্ষণ এবং মেধার প্রখরতার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এর ফলে প্রজ্ঞাবান ও দূরদর্শীগণ বিবেচনা করতে পেরেছেন যে, মুফতী সাহেবের জ্ঞান, প্রজ্ঞা, পুথিগত অর্জন ছিল না। এর সম্পর্ক মহান আল্লাহ তাআলার অনুকম্পার সাথে। আল্লাহ প্রদত্ত রূহানী শক্তি, কাজের উপর দৃঢ়তা, কলম শক্তি ও ভাষা জ্ঞানকে তিনি মানব কল্যাণে ব্যয় করেছেন। ঈমান ও মা'রিফাতে ইলাহীর নূরের বদৌলতে ইসলামের সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম বিষয়গুলো অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন। ফিক্হ ইসলামীতে ইজতিহাদী যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। কুরআন সুন্নাহর নিকটতম মর্মস্থলে পৌঁছার চেষ্টা করেছেন। তিনি ইসলামের সঠিক বক্তব্য প্রকাশ করতে কখনো দ্বিধা করেননি। প্রচলিত প্রথা পদ্ধতি সম্বন্ধে একটি সঠিক, নির্ভুল, সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় পন্থা গ্রহণ করেছেন। দ্বীনের মৌলিক বিষয়, দ্বীনি ফিক্হ ও বিধি বিধান জানতে তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো আলিম সমাজের জন্য আবশ্যিক হয়ে গেছে। হিজরী প্রথম শতাব্দীতে ফিক্হ প্রণয়ন ও সংকলনের যে কাজ আরম্ভ হয়ে হিজরী দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে পূর্ণতা লাভ করেছিল; মুফতী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ ঐসব ফকীহ ও মুহাদ্দিসের খিদমত, চার মাযহাবের ইমামগণের বৈশিষ্ট্যসমূহ ও তাঁদের মর্যাদাকে পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়েছেন। চার মাযহাবের ইমামগণ যে অক্লান্ত পরিশ্রম সাধনার মাধ্যমে ইসলামী শরীআতের জন্য সুবিন্যস্ত আইন- কানুন, বিধি- বিধান রচনা করেছেন তাদের ফিক্হর ভান্ডারকে তিনি মূল্যবান ও কল্যাণকর সম্পদে পরিণত করেছেন। এ থেকে বিচ্যুতিকে ধ্বংস ও ক্ষতির কারণ মনে করেছেন। হানাফী ফিক্হ বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। বিশ্বের সব দেশেই ইসলামী মনীষীগণ ফিক্হ হানাফী নিয়ে গবেষণা ও সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। মুফতী ফয়যুল্লাহ ছিলেন হানাফী মাযহাবের বিশ্লেষক ও আন্ত মুজতাহিদ। তিনি হানাফী মাযহাব মতে ফিক্হ ও ফাতাওয়া চর্চা করেছেন। হানাফী মাযহাব একটি ফিকহী সংকলনের নাম। কুরআন হাদীসকে সামনে রেখে খুলাফা-ই রাশিদীন ও অন্যান্য সাহাবাগণের কর্মপন্থা অবলম্বন করে যুগশ্রেষ্ঠ চারশ' গবেষক, ফকীহ দ্বারা গঠিত বোর্ড দীর্ঘ চল্লিশ বছরের সাধনা ও অক্লান্ত গবেষণার ফসল ফিক্হ হানাফী। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে যুগের সেরা ফকীহ, মুহাদ্দিস, আরবী ভাষাবিদ ও ইতিহাস গবেষকদের নিয়ে কুরআন, হাদীস চয়ন করে ফিক্হর রাজত্বের এক বিশাল ভান্ডার গড়ে তোলার অনন্য নজীর স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফকীহ ইমাম আবূ হানীফা র.। দীর্ঘ চল্লিশ বছরের সাধনায় তিনি প্রায় সব বিষয়ে সব ধরণের সমাধান দিতে সক্ষম হয়েছেন। পরবর্তীকালে তাঁর অনুসারীগণ এর সাথে আরো বিভিন্ন বিষয় সংযোজন করে একে বৈশ্বিক এক ফিক্হী সংকলন হিসেবে দুনিয়ার সামনে তুলে ধরেন। যে কারণে হানাফী মাযহাবের অনুসারী এখন পর্যন্ত দুনিয়াতে বেশি। ভারতীয় উপমহাদেশে এ মাযহাব বেশি প্রসার লাভ করেছে। এ ফিক্হ'র উপর অধিকতর গবেষণা ও সুক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ হয়েছে।[১] মুফতী সাহেব হানাফী মাযহাবের গন্ডির ভেতর থেকে ফিক্হ চর্চা করেছেন। তিনি হানাফী ফিক্হর গবেষণালব্ধ উসূলের (মূলনীতি) অধিকতর ব্যাখ্যা করেছেন। এছাড়া নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, ভৌগোলিক পরিবেশ, পরিধির মধ্যে উপস্থিত সমস্যাবলী বিষয়ে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে আন্ত ইজতিহাদ করেছেন। তিনি ইসলামী ইলম্কে প্রচলিত ধারায় ব্যখ্যা না করে প্রচলিত প্রথা সংশোধন করে ইসলামী শিক্ষাকে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন। তিনি ছিলেন জ্ঞান তত্ত্ববিদ। তিনি মনে করতেন একজন আলিমের জন্য কুরআন, হাদীস সম্বন্ধে জ্ঞান রাখা, সেগুলো থেকে দলীল, প্রমাণ গ্রহণের যোগ্যতা থাকা, হাদীস ও তাফসীরের ব্যাখ্যা জানা, ফিক্হ ও উসূল আল- ফিক্হ'র জ্ঞান অর্জন করা, সাহাবা ও তাবিঈনগণের উক্তি জানা থাকা, বিভিন্ন মাসআলায় চার মাযহাবের অভিমত, আরবী ভাষা, ইল্ম নাহু, বালাগাত, ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা আবশ্যিক। হযরত হাসান বসরী র.-এর মতে যারা পরকালমুখী, ইহকাল বিমুখ, দ্বীনের প্রতি সতর্ক দ্রষ্টা, প্রভূর ইবাদতে সদালিপ্ত, মুসলমানের ইজ্জত বিনষ্টকরণ থেকে সদা বিরত ও সতর্ক; তারাই ফকীহ। এ সংজ্ঞার বাস্তব দৃষ্টান্ত ছিলেন মুফতী ফয়যুল্লাহ। তাঁর জীবনের প্রতিভা ঈর্ষনীয়। তিনি ফিক্হী জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি জ্ঞান বিতরণ করেছেন। কর্মজীবনের অনেক উজ্জল দৃষ্টান্তের পাশপাশি পুস্তক প্রণয়ন, গ্রন্থ রচনায় তাঁর অবদান অপরিসীম। বিশেষ করে ফিক্হ, ফাতাওয়া চর্চায় তাঁর অবদান অসামান্য। ফিক্হ চর্চায় তিনি নিজস্ব চিন্তাধারার স্ফূরণ ও স্বকীয় চেতনাবোধের স্বাক্ষর রেখেছেন। ফিক্হ, ফাতাওয়া রচনায় তিনি তাকওয়ার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিতেন। তিনি ছিলেন মুহতাত, মুহাক্কিক, মুদাক্কিক। তিনি আকাবিরের

ইজতিহাদী বয়ান, বক্তব্য যেগুলো দলীল-প্রমাণ দ্বারা সমৃদ্ধ নয় সেগুলো গ্রহণ করেননি এবং প্রমাণ হিসেবে পেশ করেননি। তাঁর মতে বুযুর্গদের কথা যদি কুরআন, হাদীস, ফিক্হর, অনুকূল না হয় সেগুলো গ্রহণযোগ্য নয়। অনেক বৈধ বিষয় যেগুলো প্রবীণ বুযুর্গগণ আদায় করতেন সেগুলো সন্দেহাতীত দলীল প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত না হওয়ার কারণে তিনি সেগুলো পালন করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বিংশ শতাব্দীতে ঈমান, আকীদা সম্পর্কিত নানা ফেতনা, বিদআত, কুসংস্কারসমূহের সন্তোষজনক জবাব দিতে সক্ষম হয়েছেন। বিরোধী মতবাদসমূহ যুক্তি, দলীল, প্রমাণের মাধ্যমে খন্ডন করতে সক্ষম হয়েছেন। কালপরিক্রমায় উদ্ভাবিত আধুনিক দর্শন, মতবাদ ও বিজ্ঞানের প্রভাবে যেসব জিজ্ঞাসার উদ্ভব হয়েছে সেগুলোর উপযুক্ত, সঠিক জবাবও সমাধান পেশ করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি কয়েক হাজার ফাতাওয়া এবং প্রায় একশত গ্রন্থ রচনা করেছেন। এসবের মধ্যে অধিকাংশই ফিক্হ সংক্রান্ত। তিনি শাহ আনওয়ার কাশ্মীরির ইলম ও অভ্যাস উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন। তাঁর ন্যায় পাঠদান, রচনা, মৌলিক বা শাখা প্রশাখায় মাসআলার আলোচনায় সাল্ফ ও খাল্ফ, আকাবিরে উম্মতের অভিমত ও দলীল, প্রমাণসমূহ সামনে রাখতেন এবং সেখান থেকে নিজস্ব অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে বিশদ বিবরণ পর মাসআলা বর্ণনা করতেন। বিষয়টিকে কেউ হিকমত পরিপন্থী মনে করলেও তিনি সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করতেন না। বাস্তবতা হলো মুফতী ফয়যুল্লাহর কঠোর অবস্থানের কারণেই আলিম সমাজের দৃষ্টি শক্তি ফুটে ওঠেছে। অন্যথায় দুর্বল ইলম সম্পন্নরা সে অন্ধকারেই থেকে যেতেন। শুধু সুযোগ সুবিধার বিষয়গুলো গ্রহণ করতেন। অপরদিকে শরীআত তার প্রাণ শক্তি হারিয়ে ফেলত। সত্য প্রকাশ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যেত।[২] তিনি নিজস্ব চিন্তা, গবেষণা, উদ্ভাবনী শক্তিকে অনবদ্য লিখনীর মাধ্যমে প্রচার করে গেছেন। কুরআন সুন্নাহর বিধানাবলিকে সহজবোধ্য করে জাতির সামনে পেশ করেছেন। ফিক্হ সংক্রান্ত তিনি অসংখ্য ফাতাওয়া ও গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। তাঁর ফাতাওয়ার সংখ্যা অনুমান পাঁচ হাজার বলে গবেষকদের অনুমান। কয়েক হাজার পৃষ্ঠার ফাতাওয়ার পাণ্ডুলিপি রেখে গেছেন; যা এখনো ছাপা হয়নি। ফিক্হ সংক্রান্ত প্রায় পঞ্চাশটি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

বিংশ শতাব্দীর এই স্বনামধন্য পণ্ডিত মনীষীর জীবন ও কর্ম প্রতিভা ছিল ঈর্ষনীয়। দেশ-বিদেশে যেভাবে তাঁর যোগ্যতা ও প্রতিভার আকুণ্ঠ স্বীকৃতি রয়েছে; তাঁর সমপেশা, সমবয়সী, সমশিক্ষিত ও সমকালীনগণ তাঁকে যেভাবে মূল্যায়ন ও মর্যাদা দান করেছেন তাতে দৃঢ়তার সাথে বলা যায় যে, এ মনীষী কালের গহবরে কখনো হারাবেন না। নিকট ও দূর অতীতেও তিনি থাকবেন নন্দিত, পাবেন স্বীকৃতি। তাঁর মহান শিক্ষা, আদর্শ, সংস্কার কর্মের সার্বজনীনতা, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনাগতকাল অব্যাহত থাকবে। তাঁর জীবন, কর্ম, চিন্তা, চেতনা বহুকাল আমাদের প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

গ্রন্থপঞ্জী:

যেসব গ্রন্থ থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে

আমীমুল ইহসান, মুহাম্মদ, সায়্যিদ, মুফতী : **কাওয়াইদুল ফিক্হ**
দেওবন্দ, দারুল কিতাব ১৯৯১।

: **তারীখে ইল্‌ম ফিক্হ**
দিল্লী, কুরআন বাজার, উর্দু জামে মসজিদ, ১৯৬২।

আব্দুর রহীম, মাওলানা : **ইসলামী অর্থনীতির ভূমিকা**
ঢাকা, খায়রুল প্রকাশনী, ১৯৮৭।

	:	**হাদীস সংকলনের ইতিহাস** ঢাকা, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ ১৯৮৬।
আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ, মুফতী	:	**মাযহাব মানব কেন** সাভার, বাতিল প্রতিরোধ লাইব্রেরী, ১৯৯৯।
আব্দুল কাইয়ুম হাক্কানী	:	**ইমাম আযম আবূ হানীফা র.** দেওবন্দ, মাকতাবাতুর রিয়াদ, তা. বি.।
	:	**আল মুনজিদ** দেওবন্দ, কুতুবখানা-ই মুস্তকাফিয়া, ১৯৭৪।
আলী হায়দার, এ,আর,এম, ড.	:	**উচ্চ মাধ্যমিক ইসলাম শিক্ষা** ঢাকা, পাঞ্জেরী, পাবলিকেশান্স, ২০০৩।
আকলা, মুহাম্মদ, ড.	:	**দিরাসাতুন ফিল ফিকহিল মুকারিন** জর্দান, মাকতাবাতুর রিসালাহ, ১৯৮৩।
আব্দুল করীম যায়দান, ড.	:	**আল-ওয়াযিয ফী উসুলিল ফিক্হ** বৈরুত, মুআসসারাতুর রিসালাহ, ১৯৯৬।
আবূ আব্দুর রহমান ইব্ন শুয়াইব আন নাসায়ী	:	**নাসায়ী শরীফ** করাচী, নূর মুহাম্মদ প্রকাশনী, তা. বি.।
	:	**সুনান আন-নাসায়ী** দেওবন্দ, দারুল কিতাব, ১৩৫০ হি.।
আব্দুল ওয়াহ্হাব শা'বানী র.	:	**আল-মীযানুল কুবরা** দামেশক, দারুল ফিক্র, ১৯৮৫।
আব্দুর রহীম, মুহাম্মদ, ড.	:	**বাংলাদেশের ইতিহাস** ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ২০০১।
আব্দুল করীম	:	**বাংলার সুলতানী আমল** ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭।
আব্বাস আলী খান	:	**বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস** ঢাকা, বাংলাদেশ, ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৪।
আকরম খাঁ, মাওলানা	:	**মুসলিম বাংলার সামাজিক ইতিহাস** কলিকাতা, ১৩৫৮ বাংলা।
আব্দুর রহমান, মুহাম্মদ ড. ও অন্যান্য	:	**বাংলাদেশের ইতিহাস** ঢাকা, ১৯৯৭।
আব্দুল করীম, ড.	:	**চট্টগ্রামে ইসলাম** চট্টগ্রাম।
আব্দুল মান্নান মোহাম্মদ	:	**বাংঙালী মুক্তিসংগ্রামের মূলধারা** ঢাকা, সৃজন প্রকাশনী, ১৩৯৭ বাংলা।
আব্দুল গফুর, অধ্যাপক	:	**ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ** ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, মুসলিম বিশ্ব সংখ্যা
আব্দুল হক দেহলবী	:	**আখবারুল আখবার ফী আসবাবিল আবরার** দিল্লী ১৩৩২ হি.।
আব্দুল মান্নান তালিব	:	**বাংলাদেশে ইসলাম** ঢাকা, ইফাবা, ২০০২।
আব্দুল করিম, ড.	:	**মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য**

ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪।

আসখার ইবন শায়েখ : **মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা**
ঢাকা, ইফাবা, ২০০৩।

আব্দুল্লাহ, মুহাম্মদ, ড. : **বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ**
ঢাকা, ইফাবা, ১৯৮৬।

আব্দুল করিম, মোঃ : **রাজশাহী জেলার কতিপয় সূফী সাধক**
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, ঢাকা, ৪১ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (এপ্রিল-জুন ২০০২)

আব্দুর রহীম মুহাম্মদ, ড. : **সুস্যাল এন্ড কালচারাল হিস্ট্রি অব বেঙ্গল**
করাচী, ১৯৬৩।

আব্দুল হাই : **নুযহাতুল খাওয়াতির**
হায়দারাবাদ, দায়িরাতুল মা'আরিফে উসমানিয়া, ১৯৬৮।

আব্দুল জলিল, এম.এফ. এ : **সুন্দরবন্দের ইতিহাস**
খুলনা, মেহেদী বিল্লাহ, ১৯৬৭।

আব্দুল করীম খাকী : **রিসালাহ-ই চেরাগে ঈমান**
কলিকাতা, রিপন প্রেস, ১৩০৬ বাংলা।

আব্দুল বাকী, মুহাম্মদ, ড. : **বাংলাদেশে আরবী ফার্সী ও উর্দুতে ইসলামী সাহিত্য চর্চা**
ঢাকা, ইফাবা, ২০০৫।

আফাজ উদ্দীন, মুহাম্মদ : **ফুরফুরা শরীফের দাওয়াতি আন্দোলনের গতি প্রকৃতি ও ধারা**
ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ, ডিসেম্বর, ১৯৯৯।

আব্দুল্লাহ, মুহাম্মদ, ড. মাওলানা : **আব্দুল আওউয়াল জৌনপুরী**
ঢাকা, ইফাবা, ১৯৯৫।

আমীমুল হক, এম, এফ, এ, ড. : **মুফতী, সায়্যিদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান, জীবন ও অবদান**
ঢাকা, ইফাবা, ২০০২।

আব্দুর রহমান : **তাহরীকে রেশমী রুমাল**
লাহোর, ক্লাসিক উর্দু প্রেস, ১৯৬০।

আহমদুল্লাহ, হাফেজ, মুফতী, আল্লামা 'সম্পাদিত : **মাশায়েখে চাটগাম**
চট্টগ্রাম, ওয়াদুদী দারুল মুতাআলা, ২০১১।

আব্দুর রশীদ আরশাদ : **বীস বড়ে মুসলমান**
নবম সংস্করণ
লাহোর, মাকতাবা-ই রশীদিয়া, ১৯৯৯।

আহমদ নাওয়াজ : **হাজার হামদ**
ঢাকা, অনন্ত প্রকাশনী, **২০০৯।**

আব্দুল মান্নান, সৈয়দ, অনূ : **মুজাহিদ কাহিনীর ইতিবৃত্ত**
ঢাকা, ইফাবা, ১৯৮৮।

আব্দুল মতীন জালালাবাদী অনু : **নকশে দাওয়াম**
ঢাকা, ইফাবা, ২০০২।

আবূ তাহের মিসবাহ অনু : **মাযহাব কি ও কেন**
ঢাকা, মোহাম্মদী বুক হাউস, ১৩৯৬ হি.।

আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী অনূ : **সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস'**
খন্ড ১ম
ঢাকা, মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ২০১০,

আব্দুল হালীম হুসাইনী শাহ্ অনূ : **সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস,**
খন্ড ৪র্থ
ঢাকা, মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ২০১০,

ইবন হাজার মক্কী র. : **ফাতহুল মুবীন ফী শারহি আরবাঈন**
দামেশক, দারুল ফিক্র, ১৯৮৩।

ইউসুফ বিন্নুরী র. আল্লামা : **আল খাযরাতুল হিসান**
লাহোর,ইসলামিক একাডেমী,তা. বি.

ইব্ন হাজার আল-আসকালানী র. : **ইসাবা ফী তামইজে সাহাবা**
মিসর, মাতবাউস, সা'আফাহ, ১৩২৮ হি.।

ইব্ন আব্দিল বার : **আল-ইস্তিয়াবা ফী মা'আরিফিল আসহাব**
মিসর, মাকতাবাহ নাহফাহ, তা.বি.

ইব্ন সা'আদ : **আত-তাবাকাত**
করাচী, নাফীস একাডেমী ১৯৭২ ৮ম খন্ড।

ইসহাক মো. ড. : **ইলমে হাদীসে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান**
ঢাকা, ইফাবা, ১৯৯০।

ইসহাক ভাট্টি : **বাররে সগীরে পাক ও হিন্দ মে ইল্ম ফিক্হ**
লাহোর, ইদারা-ই ইসলামিয়া, ১৯৭৩।

ইকবাল আমীর, সৈয়দ : **মাশরিকী বাঙ্গাল মে উর্দু**
ঢাকা, আগা সাদেক রোড, ১৯৫৪।

ইযহারুল ইসলাম চৌধুরী, মুফতী : **হায়াতে মুফতী আযম**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, ১৩৯৭ হি.।

এম, এইচ. আলী : **বাংলাদেশ বিষয়াবলী**
ঢাকা, মিলারস প্রকাশনী, ২০০৫।

এম,এ, রহীম, ড. : **বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস**
ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮২

এম,এ, আজিজ, ড. : **বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ**
আহমদ আনিসুর রহমান ড.
ঢাকা, ইফাবা, ১৯৯৩।

এ,কে,এম, নজীর আহমদ : **বাংলাদেশে ইসলামের আগমন**
ঢাকা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৯।

এমদাদুল হক, মুহাম্মদ, শাহ : **বাংলাদেশে সাহাবীর হাতে গড়া মসজিদ**
দৈনিক ইনকিলাব, ২৩ মে ১৯৮৮।

ওয়ালী উদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ আল- খাতীব, আত-তাবরীজ : **মিশকাতুল মাসাবীহ**
ঢাকা, আল-মাকতাবা আল- ইসলামিয়া, তা. বি.।

ওবায়দুল হক, এম, মাওলানা : **বাংলাদেশে পীর আউলিয়াগণ**

		ফেনী, হামিদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৬৯।
কাসিম ফিরিশতা, মুহাম্মদ, আব্দুল হাই অনু.	:	**তারীখে ফিরিশতা** দেওবন্দ, মাকতবা-ই মিল্লাত, ১৯৮৩।
কে আলী	:	**পাক ভারতের ইতিহাস** ঢাকা, গ্লোব লাইব্রেরী, ১৯৯৪।
	:	**বাংলাদেশ ও পাক ভারতের ইতিহাস** ঢাকা, গ্লোব লাইব্রেরী, ১৯৯৭।
গোলাম আহমদ মোর্তজা	:	**চেপে রাখা ইতিহাস** ঢাকা, মুন্সী মোহাম্মদ মেহের উল্লাহ একাডেমী, ২০০৩।
ছমীর উদ্দীন, মাওলানা, অনূ	:	**ইসলামী আইনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস** ইফাবা, ১৯৮৬।
জুলফিকার, আহমদ, কিসমতী	:	**বাংলাদেশের পীর মাশাইখ** ঢাকা, প্রগতি প্রকাশনী, ১৯৮৮।
জামাল উদ্দীন, মুহাম্মদ, ড.	:	**রিজালশাস্ত্র ও জালহাদীসের ইতিবৃত্ত** ঢাকা, ইফাবা, ২০০৪।
জসীম উদ্দীন, মুফতী	:	**দারুল উলূম হাটহাজারীর ইতিহাস** চট্টগ্রাম, বুখারী একাডেমী হাটহাজারী, ২০০২।
জ্যোসনা বিকাশ চৌধুরী	:	**শিক্ষার ইতিহাস** ঢাকা।
তোহা, ড.	:	**দিরাসাতুল ফিল ইখতিলাফাত আল ফিকহিয়্যাহ** বৈরূত, মাকতুবাতুর রিসালাহ, ১৯৮৫।
তকী উসমানী, আল্লামা	:	**উসূলুল ইফতা** ঢাকা, মাকতুবাতু শায়খুল ইসলাম, ১৪২৬ হি.।
	:	**তাকলীদ কী শরয়ী হায়সিয়্যাত** করাচী, মাকতাবা-ই দারুল ’উলূম, ১৩২৮ হি.।
তোফায়েল আহমদ	:	**যুগে যুগে বাংলাদেশ** ঢাকা, ১৯৯২।
তারা চাঁদ, ড.	:	**ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব** ঢাকা, ইফাবা, ১৯৯১।
তায়্যিব, মুহাম্মদ, মাওলানা	:	**তারীখে দারুল উলূম দেওবন্দ** করাচী, তা. বি.।
দীন মুহাম্মদ, ড.	:	**বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ** ঢাকা, ইফাবা, ১৯৯৩।
নূর মোহাম্মদ ’আজমী অনূ	:	**মেশকাত শরীফ** ৫ম সংস্করণ, ১ম খন্ড। ঢাকা, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৮৭,
	:	**হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস** ৪র্থ সংস্করণ ঢাকা, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯২।
নেছার উদ্দীন, ম.ই.আ. ড.	:	**ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন প্রেক্ষিত বাংলাদেশ**

		ঢাকা, ইফাবা, ২০০৫।
নুরুল ইসলাম ওলীপুরী	:	**মাযহাব কি ও কেন** ঢাকা, আলকাউসার প্রকাশনী, ২০১০।
নুরুল আলম, এ, কে, এম ; **আফাজ উদ্দীন, মুহাম্মদ,**	:	**ইসলামী অনুসঙ্গে বঙ্গে হাদীস চর্চার ঐতিহ্য** আইবিএস জার্নাল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ইনিস্টিটিউট অব স্টাডিজ, ১৯৯৬।
নোমান, মুহাম্মদ, মাওলানা,	:	**মুফতী আযম আকাবিরে উম্মত কি নযর মে** কক্সবাজার, ফয়যিয়া ইসলামিক রিচার্স ফাউন্ডেশন, মহেশখালী, ১৪১৮ হি.।
ফখরুল ইসলাম, মুফতী,	:	**কারামতে হাফেজ্জী হুজুর রহ.** ঢাকা, জাবালে নূর প্রকাশনী, ২০১২।
ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মদ, মুফতী	:	**আল ফয়সালাতুল জালিয়্যাতু লি আহকামিস সিমা ওয়া সিজদাতিত তাহিয়্যাতু,** চট্টগ্রাম, কুতুবখানা, ফয়যিয়া, হাটহাজারী, তা. বি.।
	:	**আল-কালামুল ফাসিলু বায়না আহলিল হাক্কি ওয়াল বাতিলি** চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।
	:	**আর রিসালাতুল মুখতাসারাতু ফী রাদ্দি আলাল ফিরকাতিন ন্যাচারিয়্যাহ** চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।
	:	**হিফযুল ঈমান আন মাকাইদে দাজ্জাল কাদিয়ানী** চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।
	:	**ইরশাদুল উম্মাহ ইলাত তাফাররুকাতি বায়নাল বিদ'আতি ওয়াস সুন্নাহ** চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।
	:	**ওয়াহাবী কারা?** চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।
	:	**ফয়যুল কালাম লি সায়্যিদিল আনাম** চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, ১৩৯৯ হি.
	:	**হিদায়াতুল ইবাদ ইলা সাবীলির রাশাদ** চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।
	:	**চেহেল হাদীস** চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।
	:	**ফাতাওয়া ফয়যিয়া** ১ম খন্ড চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, ২০১০।
	:	**ফাতাওয়া দারুল উলূম হাটহাজারী** ১ম খন্ড চট্টগ্রাম, প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ, দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম, হাটহাজারী মাদ্রাসা ২০০৩।
	:	**আল- আদ ইয়াহ মাসূরা আনিন নাবিয়্যি সা.** চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **তারগীবুল উম্মাতি ইলা তাহসীনিন নিয়্যাতি**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **রিসালাতুত তামবীহ আলা মুনকিরাতিল কুবূরি**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **উমদাতুল আকওয়ালি ফী রাদ্দি মা আহসানিল মাকালি**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **রাফিউল ইশকালাতি ফী হুরমাতিল ইসতীজারি আলাত তোয়াতি**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **আল ফালাহু ফীমা ইয়াতাআল্লাকু বিন্নিকাহি**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **হাদিয়্যাতু রমযান**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **সালাতুল মুসাফির**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **ফাযায়িলে যিলহাজ্ব ওয়া মাসাইলে কুরবানী**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **হুকুকুল ওয়ালিদাইন**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **দাফউল ই'তিসাফি ফী আহকামিল ই'তিকাফি**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **ইযহারুল ইখতিলাল**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **ইযহারুল খিয়ালি**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **মাকালাতি মুফতী আযম**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **ইস্তিহবাবুদ দাওয়াতি ফী নাযরি আল মুফতী আল-আযম**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **তাওযীহুল বায়ানি ফী হুকমি তালাকিল গাযবান**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **আহকামুদ দাওয়াতিল মুরাওওয়াজাহ**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **দরুদ ও কিয়াম**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **হুকমু ইস্তিমালি মুকাব্বিরাতিস সাওত**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **কারাহাতু তাকরারিল জামাআতি**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **ইযহারু মুনকিরাতিশ শায়্যিয়াহ ফিল মাদারিস ওয়াল জালসাতির রায়িজাহ**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **হুকমুত তাকাল্লুমি বিন্নিয়াতি বিল্লিসানিল আরাবিয়্যি**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **আল কাওলুস সাদীদু ফী হুকমিল আহওয়ালি ওয়াল মাওয়াজিদে**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **যাম্মুল ইকসারি ফী ইনশাদিল আশআরি ওয়াল ই'রাযি আন বয়ানিল আহকামি ওয়াল আসারি**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **ইনজাহুল হাজাতি রিসালাতু রাহে নাজাত ফার্সী**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **তা'লীমুল ইসলাম**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **পর্দা আওর ইসলাম**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **আল মানযুমাতুল মুখতাসারাতু ফী ইসবাতি হুকমিল উজরাতি আলাত তোয়াতি**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **ইযালাতুল খাবতি ওয়াল হায়মানি ফী রুয়াতি হিলালিল ঈদ ওয়া রমাদান**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **সীরাজুত তাবলীগ**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **কাবিন নামা-ই নিকাহ**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **সামানে বেহেশত**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা, ফয়যিয়া, হাটহাজারী, তা. বি.।

: **চিশতিয়া খান্দান কি সাবিরিয়্যাহ শাজারাহ**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা, ফয়যিয়া, হাটহাজারী, তা. বি.।

: **তারগীবুল উম্মাতি ইলা ইত্তিবায়িস সুন্নাহ**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা, ফয়যিয়া, হাটহাজারী, তা. বি.।

: **ইসলাহুন নুফূসি ওয়াল হাক্কুস সারীহ**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **ফাযায়িলে দরুদ শরীফ**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **শূমী মা'আসী**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **আল হাক্কুস সারীহ ফী আল মাসলাকিস সাহীহ**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **ওসীয়ত নামাহ**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা, ফয়যিয়া, হাটহাজারী, তা. বি.।

: **ইরশাদুত তালিবীনা ইলা হাক্কিল মুবীন**

চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **হুব্বে ঈমানী ও হুব্বে ইশকী**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **দাফিউল বালা**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **আল-ফাওয়াইদুন নাফিয়্যাহ**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **হক কী রাহনুমায়ী**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **মসনবীয়ে খাকী**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **ফয়যে বেবাহা শরহে কারীমা**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **ফয়যে সাত্তার হাশিয়া আত্তার**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **ফয়যে বে কারা শরহে উর্দু বোস্তাঁ**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **ফয়যে বে পায়া শরহে উর্দু গুলিস্তাঁ**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **কান্দে খাকী**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **পান্দে ফয়েয**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **পান্দে নামা-ই খাকী**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **মসনবীয়ে দিলপযীর**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **মসনবীয়ে দালাবীয**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **রাহে হক**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **আসরারুল মু'মিনীন**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **ফাওয়ায়িদে নাফিয়াহ গরীবিয়্যাহ**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **তুহফাতুল মু'মিনীন**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **হাদিয়াতুল মু'মিনীন**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **আসহাবে সুফফাহ**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **যিয়ারতনামাহ**

চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **কাওয়ায়িদে বাগদাদী**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **আরবী আসান কায়দা**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **খাততে ইমাম গায্যালী**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **শারহু তা'লীমুল মুতা'আল্লিম**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **দরসে ইবরত**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **তা'লীমুল মুবতাদী আলা লিসানিল আরাবী**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **মাকতুবাতে মুফতী আযম**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **উনয়ানাতি মাওয়াইযে মুফতী আযম**
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

: **মাজমু'আ রাসাইলে ফয়যিয়া**
(১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ খন্ড)
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া হাটহাজারী, তা. বি.।

ফজলুর রহমান, মুহাম্মদ, ড. : **আধুনিক আরবী বাংলা অভিধান**
ঢাকা, রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৭।

মোস্তাফিজুর রহমান, ড. : **ভাষা ও ইসলাম**
চট্টগ্রাম, মাসিক আল হক, জুলাই, ১৯৯৭।

মাহবুবে এলাহী, মাওলানা : **হায়াতুল মুসান্নিফীন**
ঢাকা, আনোয়ার লাইব্রেরী, ২০১৩।

মহি উদ্দীন, এম, কে, এ : **চট্টগ্রামে ইসলাম**
ঢাকা, ইফাবা, ১৯৯৬।

মুহিউদ্দীন খান ও অন্যান্য সম্পাদিত : **ফিক্হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন**
ঢাকা, ইফাবা।

মুহিউদ্দীন খান অনু : **ইয়াহইয়াউ উলূমিদ্দীন**
২৭তম সংস্করণ, খন্ড ১ম
ঢাকা, মদীনা পাবলিকেশান্স, ২০১০,

: **মাআরিফুল কুরআন**
১ম খন্ড
ঢাকা, ইফাবা, ১৯৮০,

: **মাআরিফুল কুরআন**
২য় খন্ড
ঢাকা, ইফাবা, ১৯৮০,

মুহিউদ্দীন খান : **জীবনের খেলাঘরে**
ঢাকা, মদীনা পাবলিকেশান্স, ২০০৩।

: **বাংলাদেশে ইসলাম কয়েকটি তথ্য সূত্র**

ঢাকা, ইফাবা, ১৯৮৮।

মোল্লা জিউন আহমদ : **নূরুল আনওয়ার**
ঢাকা, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৩৯৬ বাংলা।

মাহমূদুল হাসান, বুলন্দশহরী, মুফতী : **গায়রে মুকাল্লিদীন কা মাযহাব**
নতুন দিল্লী, ফরিদ বুক ডিপো, তা. বি.।

মাহবুব রিজভী, সায়্যিদ : **তারীখে দারুল উলূম দেওবন্দ**
২য় খন্ড
দেওবন্দ, ইদারা-ই ইহতিমাম-ই দারুল উলূম দেওবন্দ, ১৯৯২।

যায়নুদ্দীন ইব্ন ইবরাহীম (ইব্ন নুযাইম) : **আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর**
দামেশক, দারুল ফিক্র, ১৯৮০।

রেজাউল করীম ইসলামাবাদী অনূ. : **মুয়াত্তা ইমাম মালিক**
ঢাকা, ইফাবা, ১৮৮৭।

রফী উসমানী, মুহাম্মদ, মুফতী : **মুফতী শফী র : জীবন ও কর্ম**
ঢাকা, মাকতাবাতুল হেরা, ২০১৪।

রহীম উদ্দীন, মুহাম্মদ, মুফতী, সম্পাদিত : **ফাতাওয়া ফয়যিয়া**
১ম খন্ড
চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া, হাটহাজারী, ১৪৩১ হি. / ২০১০ খৃ.,

রহিম, এ, এম, : **বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস**
ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৯৪।

রামেশ মজুমদার, : **বাংলাদেশের ইতিহাস**
কলকাতা, ১৩৮০ বাংলা।

লতীফুর রহমান, সৈয়দ, : **নাসসাখ সে ওয়াহশাত তক**
করাচী, ১৯৫৯।

লিয়াকত আলী, মাওলানা, সম্পাদিত : **হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী র.**
ঢাকা, আলকাউসার প্রকাশনী,১৯৯৯।

শাহ ওয়ালী উল্লাহ, দেহলবী, : **হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ**
লাহোর, ইসলামিক একাডেমী, ১৯৮৪।

: **ইকদুল জীদ ফী আহকামিল ইজতিহাদি ওয়াত তাকলীদি**
লাহোর, ইসলামিক একাডেমী, ১৩৭৯ হি.।

: **ফুয়ূযুল হারামাইন**
লাহোর, মাকতাবা-ই দারুল 'উলূম, ১৯৪৭।

শামছুল হক ফরিদপুরী র. অনু : **বেহেশতী জেওর**
১ম খন্ড
ঢাকা, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৮।

শামস নাবীদ, উসমানী, মাওলানা : **আবি আগার না জাগে তু**
লাহোর, পাকিস্তান ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯০।

শিবলী নোমানী, আল্লামা;
সুলায়মান নদবী, আল্লামা, : **সীরাতুননবী সা.**
করাচী, দারুল ইশায়াত, ১৯৮৫

সুলায়মান নদবী, সায়্যিদ : **আরব হিন্দ কা তা'আল্লুকাত**
এলাহাবাদ, ১৯৩০।

শিবলী নোমানী : **মাকালাতে শিবলী**
আজমগড়, তা. বি. ।

শরীফুল ইসলাম ফুয়াদ, সম্পাদিত : **আল্লামা হাফেজ জুনায়েদ বাবুনগরীর রচনাসমগ্র**
ঢাকা, মাকতাবাতুল আতীক, ২০১৩ ।

সিরাজুল ইসলাম এম, এম ,এ অনূ : **‘ইসলামী শরীয়াহ ও সুন্নাহ**
ইফাবা, ১৮৮৯ ।

: **ইমাম আযম আবূ হানীফা র.**
ঢাকা, ইফাবা, ২০০৭ ।

: **সীরাতুন নো’মান’,**
২য় খন্ড
দিল্লী, তা. বি.

সাখাবী, ইমাম : **আল-মাকাসিদুল হাসানা**
বৈরূত, দারুল কুতুব আল-ইসলামিয়া, তা. বি. ।

সম্পাদনা পরিষদ : **সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ**
ঢাকা, ইফাবা, ১৯৮৭ ।

সম্পাদনা পরিষদ : **বুখারী শরীফ**
১ম খন্ড
ঢাকা, ইফাবা, ২০১১,

: **ইসলামী বিশ্বকোষ**
২য় খন্ড
ঢাকা, ইফাবা, ১৯৮২

সম্পাদনা পরিষদ : **ফাতাওয়া ও মাসাইল**
১ম খন্ড
ঢাকা, ইফাবা, ১৯৯৬,

সম্পাদনা পরিষদ : **ফাতাওয়া রহমানিয়া**
১ম খন্ড
ঢাকা, মাকতাবাতুল আশরাফ, ১৪৩১ হি. ।

সম্পাদনা পরিষদ : **শিক্ষা, দর্শন ও ইসলাম**
ঢাকা, ইফাবা, ২০০৪ ।

সম্পাদনা পরিষদ : **পরিচিতি দারুল উলূম মুঈনুল ইসলা**
হাটহাজারী, ১৯৭৭ ।

সম্পাদনা পরিষদ : **আল মাওসুয়াতুল ফিকহিয়া**
কুয়েত, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়,২০০৭ ।

হাসান, জামান, ড. : **সমাজ সংস্কৃতি, সাহিত্য**
ঢাকা, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৮০ ।

হুসাইন হামীদ, হাসান, আল মাদখান : **আল- মা’রিফাতু ইলাল ফিক্‌হিল ইসলামী**
জর্দান, ২০০৭ ।

হাবীবুর রহমান, মুহাম্মদ, মাওলানা : **আমরা যাদের উত্তরসূরী**
ঢাকা, আলকাউসার প্রকাশনী, ১৯৯৮ ।

: **হায়াতুল মুসান্নিফীন**
ঢাকা, আলকাউসার প্রকাশনী, ২০১২ ।

হুসাইন আহমদ মাদানী : **নকশে হায়াত**

২য় খন্ড
দেওবন্দ, মাকতবা-ই দীনিয়াহ, ১৯৫৩।

অপ্রকাশিত যেসব পাণ্ডুলিপি থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে

আবুল বাশার মোঃ : **ইসলামে তাসাউফ তত্ত্ব ও বাংলাদেশে এর প্রভাব**
এম.ফিল থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

কবির উদ্দীন, এ, বি, এম, খন্দকার, ড. : **কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ফাতাওয়া ও এর প্রায়োগিক বিশ্লেষণঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ**
এম.ফিল থিসিস,
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া, ২০০৩।

ছাইদুল হক, মুহাম্মদ, ড. : **ইসলামী বিচার ব্যবস্থা; প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ**
পি-এইচ.ডি. থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-২০০৭।

রশীদ, মুহাম্মদ, : **বাংলাদেশে ফিকহশাস্ত্রের উন্নতি ও অগ্রগতি**
পি-এইচ.ডি. থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯০।

রুহুল আমীন, মুহাম্মদ, : **বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সূফীদের অবদান**
পি-এইচ.ডি. থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬।

পত্র - পত্রিকা

ইসলামী আইন ও বিচার : ৭ম বর্ষ, ২৫ সংখ্যা, জানু-মার্চ ২০১১।
ইসলামী আইন ও বিচার : ৫ম বর্ষ, ২০ সংখ্যা, অক্টো-ডিসেঃ ২০০৯।
ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ঢাকা, : ইফাবা, ৪৯ বর্ষ, ২য় সংখ্যা।
ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ঢাকা, : ইফাবা, ৪৮ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা (জানুঃ- মার্চ ২০০৯)।
ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ঢাকা, : ইফাবা, ৪৫ বর্ষ, ২য় সংখ্যা (অক্টোঃ-ডিসেঃ ২০০৫)।
দৈনিক বাংলা : ১ম বর্ষ, ৩৫ সংখ্যা, তারিখ ২৮-১০-১৯৭৪।
দৈনিক আমারদেশ : ৩১ জুলাই ২০০৯।
মাসিক মদীনা : বর্ষ ৪৮, সংখ্যা ৩, জুন ২০১২।
মাসিক আর রশীদ : লাহোর, দারুল উলূম দেওবন্দ সংখ্যা, তা. বি.।
মাসিক রহমত : বর্ষ ২০, সংখ্যা ২৩৭, (সেপ্টেম্বর ২০১২)।
মাসিক আল ইরশাদ : শায়খুল ইসলাম মাদানী কা তরীকে দরস
পেশওয়ার, ১৯৭৮।